পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

(নব পর্য্যায়)

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

ষষ্ঠ বর্ষ।

প্রথম খণ্ড।

১৩২৮ সনের অগ্রহায়ণ—১৩২৯ সনের বৈশাখ।

কোচবিহার।

কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

-:*:

সূচীপত্র—৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড।

অ

অনাদৃতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	৩০৫
অন্নদা দিদি প্রসঙ্গে অবান্তর কথা	সঃ সঃ	২৮
অবাক্ (উপন্যাস)	শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া	২৬৩, ২৮৮, ৩৫২

ই

ইংলণ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠা—	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ,	১৩৫

উ

উদাসী (গল্প)	শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা রায়	৫৩

এ

এ দিনে—	সঃ সঃ	২৮১

ক

কালের খেয়াল (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৯৬
কুমীর (গল্প)	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল,	৬৬, ১২৩
কৃষিকথা—	সঃ সঃ	১৮৫, ২৫৯
কৃষ্ণরূপ (কবিতা)	সম্পাদিকা	৫৮৬

গ

গান	শ্রীযুক্ত দ্বিজচরণ মিত্র	১১২
গান	বেলা গুহ	১১২

ঘ

ঘরে ও বাইরে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	১৮৪

পরিচারিকা—সূচী

চরকায় জাতীয় জীবন সঃ সঃ ৩০৯

চাউনি (গল্প) শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মজুমদার ৬৪

চিররহস্য সন্ধানে (উপন্যাস) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ৯, ৭৪, ১৪৬, ২৩৯

চির সঙ্গিনী (কবিতা) শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর ২২১

ছ

ছিন্নমালা (গল্প) শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মজুমদার ৩৮৭

জ

জীবনসাথী (কবিতা) শ্রীমতী ভক্তিসুধা রায় ১৬২

জীবনের পথে (কবিতা) সম্পাদিকা ৩৪৯

ত

তটিনী (উপন্যাস) শ্রীযুক্তা নীহারবালা দেবী ১৬৭, ২২২, ৩২১, ৩৫৭

তালবেতাল (গল্প) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, ১৩৮

দ

দেবলীলা (কবিতা) শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ, ৬

দেশীয় রাজ্য— কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর ২০০, ৩০৬

ন

নক্ষত্র (কবিতা) সম্পাদিকা ২৭

নাতির আদর (ঐ) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র ১৭৯

নারী (ঐ) শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, ৫৯

নারীর কথা শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৬৯

নারীর দাবী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, ২৫৫

নেপালে নেওয়ারদিগের ভাইপূজা ঐ ৪৯

(প)

পরাজিতের পরিত্রাণ পন্থা সঃ সঃ ১৫৮

পাশ্চাত্যে নারীসমস্যা ঐ ২০১

শিরোনাম	বিভাগ	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রণাম করি	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	১
প্রার্থনা	(ঐ)	শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা ঘোষ	২৪৮
প্রেম	(ঐ)	সম্পাদিকা	২৩৩
প্রেমের পরিণাম	(গল্প)	শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়	২১৩
(ব)			
বঙ্গমাতার শক্তিমূর্ত্তি		সঃ সঃ	২০৬
বঙ্গের সমস্যা		সঃ সঃ	২০৩
বন্ধ্যা	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ,	৮৩
বলিও না	(ঐ)	শ্রীমতী রেণুকা দাসী	১৫৬
বিচার	(গল্প)	শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল,	১০২
বিরহিণী	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	১৪৫
বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ		'সঞ্জীবনী'	২৪৯
ব্যবধান	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	২৮৫
(ভ)			
ভারতের আমদানী ও রপ্তানী		সঃ সঃ	১১৩
ভিখারী	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত দ্বিজচরণ মিত্র	২৭৮
(ম)			
মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্রে	(নব্যভারত)	শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ,	২৯৭
মিলন	(কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকা দাসী	৫২
মিলনে মালিন্য		সঃ সঃ	৩
মুক্তি	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	৪৮
মূর্ত্তিবদল	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়	১৮৬
(র)			
রঞ্জন	'ভারতবর্ষ'	শ্রীবিশ্বকর্ম্মা	১৯৮
রসিক দাস	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ,	২৬৬
রাখালের গান		শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩১৫

রাঙ্গা ও ভাঙ্গা	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	২৬২

(শ)

শ্যাম-সপ্তক	(গান)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	১৯০
শিক্ষাসমস্যা	সঃ সঃ		৪১১

(স)

সমাধি	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৩৫
সাগরে	(ঐ)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	৭৩
সার্থকতা	(ঐ)	শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	১০৪
সুসন্তান গঠন		'স্বাস্থ্যসমাচার'	১৮০
স্নেহের মূল্য	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৩৮
স্বদেশসেবার আদিতে		সঃ সঃ	৩৪৩
স্বদেশী	'নবসঙ্ঘ'		৫৯৫
স্বধর্ম্ম	সঃ সঃ		২০
স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা		৬৬, ১৯১, ৪০৫
স্বরাজ	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন		৯৭
স্বরাজ-সঙ্গীত	দীনসেবক—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দদাস		৩৯
স্বাস্থ্যের কথা	'স্বাস্থ্যসমাচার'		২৫৬

(হ)

হোরি	কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর	২১২

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৬ষ্ঠ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল। { ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

প্রণাম করি।

—:০:—

করেছি হায় যেথায় খেলা
যে কুঞ্জে মোর কাটলো বেলা,
সেই নিঝরের পীযুষধারা
করলে শীতল তৃষ্ণা হরি,
আজ সবারে প্রণাম করি।

নিবিড় যাদের স্নেহের ছায়ে,
ঝঞ্ঝা ঝলাস পাইনি গায়ে,
বৃষ্টি রোদে রাখলে যারা
যতন করে বক্ষে ধরি।
আজ সবারে প্রণাম করি।

যে সব কাঁটা ফুটলো পায়ে,
যে সব আঁচর লাগলো গায়ে,
নয়ন দিয়ে যে সব শোণিত
দুখের পায়ে পড়লো ঝরি,
আজকে তাদের প্রণাম করি।

যে সব তরু গেলাম রোপি,
জীবন ধরে জীবন সঁপি,
বালির বাঁধে দেবো দেউল
যত্নে যে সব গেলাম গড়ি।
আজকে তাদের প্রণাম করি।

ভরুক তরু কুসুম ফলে
রহুক এ বাঁধ সাগর জলে,
বালির এ শিব প্রেমের বলে
হয় যেন হয় রামেশ্বরই।
আজ সবারে প্রণাম করি।

ভক্তি হউক সর্ব্বজয়া,
মাগছি ক্ষমা, মাগছি দয়া,
কৃতজ্ঞতার অশ্রু ছাপায়
আসলো ঘাটে পারের তরী
আজ সবারে প্রণাম করি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মিলনে মালিন্য।

——:•:

ভারতের আজ এই মহা মিলনের যুগে বাঙ্গলা জাগে নাই,—একথা বালকেও বলিবে না। বাঙ্গলা জাগিয়াছে, আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মহামিলনের মন্দির প্রাঙ্গণে না অন্যত্র, অন্য ভাবে তাহাই ভয়ে ভয়ে ভাবিয়া দেখিবার। বাঙ্গলার বারো-আনার শিক্ষা সমৃদ্ধি জ্ঞানের পরিমাণ যতটুকু তাহাতে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা সমালোচনা হইতে তাহারা যে বহুদূরে অবস্থিত তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও চলে। আপামর সাধারণের বঙ্গব্যাপী এ আন্দোলন আলোড়নের মূলে নাই রাজ ও রাজ্যের চিন্তা, চরম দৈন্যের অসহ্য তাড়নায়, শাসক ও সমাজের অত্যাচারে জর্জ্জরিত নিরুপায় হইয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া লইতে তাহাদের এ অস্থিরতা! মরণোন্মুখ চিররোগী যেমন ভেষজের শক্তি বিবেচনায় না আনিয়া যে যাহা বলে তাহার ব্যবহারে জীবনরক্ষা করিতে ব্যগ্র হয়, বাঙ্গলার জনসাধারণের আজ সেই অবস্থা। আপনার জন্য মন যেখানে অধীর, সেখানে ধীর ভাবে ভাবিবার অবসর নাই, অন্যের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার প্রবৃত্তি সেখানে উদ্বুদ্ধ হইবার নয়। নিজের গন্তব্য পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে যেটা, তাহাকে নির্ব্বিচারে দূরে নিক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে পূর্ণভাবে; যাহা শক্তিহীন করিয়াছে, এমন করিয়া অবনতির অন্ধকারে, দুর্দ্দশায় ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহাদের নিন্দা অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করিয়া পরিশোধে পরিতৃপ্তির প্রয়াসও কম হইতেছে না। উন্নতিপন্থী রক্ষণশীলকে, নির্ধন ধনীকে, শাসিত শাসককে, কৃষক তথাকথিত 'ভদ্রলোক'কে, নারী পুরুষকে বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য দায়ী করিয়া এ মহামিলনের দিনে একটা বিরোধের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। মহামিলনমন্ত্র মুখে মুখে ধ্বনিত হইলেও, অন্তরের অন্তরালে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে একটা মস্ত কিন্তু, একটা দ্বিধা। আত্মরক্ষণপ্রয়াসী নির্য্যাতিতের সমবস্থ দলের প্রতি অনাস্থা, সহানুভূতির অভাব হয় ত স্বাভাবিক কিন্তু ব্যবস্থা যাঁহাদের হস্তে, শিক্ষিত যাঁহারা তাঁহারাও যদি মৌখিক উদারতার সহিত হৃদয়কে বিযুক্ত রাখেন, প্রতিকারের পন্থা নিরূপণে উদাসীন হইয়া, কেবল উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয়ে মূল লক্ষ্য না রাখিয়া সাধারণকে বুঝাইতে চান অন্য, তাহা হইলে পাতিত্যপরায়ণতার স্থান

নাই ! একতা স্থাপন যেখানে উদ্দেশ্য, বিসাদৃশ্যের আলোচনার সেখানে আবশ্যক কি ! অনাবশ্যক হইলেও বক্তৃতায়, সাহিত্যে এ আলোচনার বিরাম নাই। নিত্য দেখিতেছি,—অনুন্নত জাতির উন্নতির ব্যবস্থা না করিয়াই প্রচারিত হইতেছে, উন্নত জাতি তাহাদিগকে খর্ব্ব করিয়াছে কতখানি, সমাজের উন্নত নীতি নবভারতের শক্তি-মূলক মিলন-নীতি সাধারণে সম্প্রসারিত সঞ্জীবিত না হইতেই, সংস্কারগত মূল সত্যের সন্ধান না করিয়াই কুঠার ঘাতের চেষ্টা হইতেছে সমাজ পদ্ধতির মূলে, বর্ত্তমানে অবস্থায় নারীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান, ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য যে শিক্ষা, যে নীতি বিকশিত করিতে সক্ষম; তাহার আয়োজন আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা নারীর কার্য্যক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে, আপন-অস্তিত্বজ্ঞানহীনা, সাধারণ নারীকে। সামর্থ নাই যাহার শরীরে, মনে শক্তিসাধ্য কার্য্যে তাহাকে আহ্বান করিলে ইষ্ট হইতে অনিষ্টেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অনর্থ ও অসন্তোষের হয় সৃষ্টি। অক্ষম নিজকে ধিক্কার দেয় যতটুকু, তাহা অপেক্ষা অন্যকে দায়ী করে অনেক বেশী, বিশেষতঃ যদি তাহার ধারণা থাকে এ দুর্দ্দশার কারণ অন্যে। দুর্দ্দশার মূলে অপরাধ কাহারও থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার আলোচনার বা দোষারোপে শক্তিসঞ্চার করিতে পারে না, কেবল অবসাদ ও অনুশোচনার বৃদ্ধি করে। অতীতের অনুশোচনা প্রায়শ্চিত্তের উপায় হইলেও হইতে পারে নবজীবনের উপকরণ যে উহাতে নাই তাহা নিশ্চিত। নবজীবনের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে বর্ত্তমান হইতে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইবে তাহার ন্যায্যান্যায্য বিচারের পথপ্রদর্শক ! নতুবা অতীতের অত্যাচার, অবিচারের কাহিনী বিবৃত করিয়া ফল ? কেবল বিরোধের বৃদ্ধি; আরও আশঙ্কার কথা এ বিরোধ গৃহের, আপনাআপনির মধ্যে, দেশের ভাইয়ে ভাইয়ে, ভ্রাতা ভগিনীতে, আরও নৈকট্যে দেশের নর ও নারীতে ! এ অসন্তুষ্টি স্থিতি লাভ করিলে সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, উন্নতি নাই কিছুতেই, যতই উন্নত শিক্ষিত হই না কেন আমরা। বাহিরের বিরোধ বিদ্বেষ যতই উৎকট হউক না কেন, গৃহের মিলন সাধিত হয় যদি, তাহার নিরাকরণ অসম্ভব নহে, কিন্তু আত্মীয়ে বিন্দুমাত্র অনাস্থাও যে ভয়ানক,—সহানুভূতির মূলোচ্ছেদী কালকীট,—মিলন-পন্থার, সামঞ্জস্যের, একপ্রাণতার, একতার, জাতীয় দুঃখ-অপনয়ন-সাধনার মহা অন্তরায় ! মুক্তি নহে বিরোধে,—মুক্তি মিলনে,—পরস্পরের সহানুভূতিতে।

কে কবে কাহাকে খর্ব্ব করিয়াছে, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অন্যকে অপদার্থ করিয়াছে, দেবীকে বলিয়াছে নরকের দ্বার সে ইতিহাসের আবৃত্তি করিয়া কৃতার্থ হইবার পূর্ব্বে আপনার জনের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ণ প্রাণে, সহানুভূতি দিয়া আলোচনার আবশ্যক আছে অনেকাংশে! নিজে ছোট বড় না হইলে কে কাহাকে ছোট বড় করিতে পারে! আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আধিপত্য অধিকারের সমস্যা! যে কোন কারণেই হউক শক্তিহীন না হইলে সাধ্য কি অন্যের, তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে,—অত্যাচার অবিচার করিতে পারে শক্তের উপর! সমগ্র নারী যদি নির্জ্জিতা হইয়া থাকেন, তাহা তাহাদের দৌর্ব্বল্যের জন্য; পুরুষ যদি পাশব বলের সহায়তা (Advantage) লইয়া নারী নিগ্রহে তাহাদের জাতীয় অবনতি আনয়ন করিয়া থাকে, সে জন্য তাহাকেও, শক্তির অপব্যবহারে শক্তিহীন হইতে হয় নাই কম! নারীকে হার মানিতে হইয়াছে আপনার জনের নিকট, পুরুষকে হইতে হইয়াছে পরপদলুণ্ঠিত! নারী আজ বদ্ধ অন্তঃপুরে, পুরুষ সুমাতার অভাবে, মনের দাসত্ব-ভাবে, ক্ষুদ্রতায় রেশমকীটের ন্যায় আপনার কর্ম্মসূত্রের অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ! ওগো! বিধাতার বিধানে অত্যাচারীর পরিত্রাণ নাই! ভারতের নরনারী তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী! আমাদের এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী আমরা সকলে—নরনারী! নরনারীর পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আজ যে এত অত্যাচার, নিষ্পেষণের রীতি, বিধবার, বধূর করুণ কাহিনী, কৃষকের প্রতি অবিচার, অনুদারতা, অনুন্নত জাতীর প্রতি উপেক্ষা ইহার মূলে বিদ্যমান উভয় নরনারীই,—সে কাহিনী আজ আর গাহিয়া কি লাভ? আজ বর্ত্তমান দুর্দ্দশাকে সমষ্টির অবনতি, অপরাধ বলিয়া স্মরণ করিয়া অতীতের কলঙ্ক বিস্মৃত হইয়া আনয়ন কর পূর্ণ সহানুভূতি,—সাধনা কর মিলনের মহামন্ত্র! পুরুষের জননী, মমতাময়ী মা আমার জয় হউক তোমাদের, ঘরে বাহিরে—স্থানের গুণে নহে—হৃদয় বলে যত্রতত্র সর্ব্বত্র হও আদর্শ নারীর বাল্যে গৌরী, যৌবনে সতী, বার্দ্ধক্যে কৌশল্যার মূর্ত্তি প্রকট হউক তোমাদের জীবনে, সুমাতার গুণে, তাহার গুণে, সুশিক্ষায় ভারত সন্তান হইবে মার উপযুক্ত সন্তান,—শক্তিময়ীর কল্যাণে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িবে কেবল নর নয়—তোমারই সন্তান—দেব শিশু; ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঘটিবে মহা মিলন,—মা তোমারি গুণে—তোমারি প্রভাবে!

সে দিন আন শক্তি,—মা আমার।

দেবলীলা।

দেবদূত এক আমোদ করিয়া
একদা সাঁঝের বেলা,
কুম্ভ ভরিয়া পীযূষ লইয়া
আসল করিতে খেলা।
ভাবিল কুম্ভ গোপন করিয়া
রাখিয়া যাইব কোথা ?
কোথা দিয়ে যাব স্বরগের শোভা
ধরণীর অমরতা।

প্রথমে প্রবল সম্রাট কাছে
দেখে দেবদূত গিয়া
গড়িছেন তিনি নব রাজধানী
বহু কারিগর নিয়া।
সে নগরী হবে জগতের চেয়ে
সজ্জিত সুশোভন,
হার মেনে যাবে ইন্দ্রপ্রস্থ
রোম গ্রীস ব্যাবিলন।
স্তম্ভ চূড়ায় বিন্ধ্যের মত
স্পর্দ্ধা রোপিতে মন,
আকাশ চুম্বি সুদূর বিস্থি
কনকের নিকেতন।
কালের উপর বসাইবে কর
অমরতা লবে কাড়ি,
প্রতিযোগিতার অতীত সে পুরী
যুগ যুগ মনোহারী।

ভাবে দেবদূত পীযূষ কুম্ভ
হেথা রেখে যাব কিনা
ফিরে চেয়ে দেখে কোথায় নগরী
নাহি যে তাহার চিনা।
দেখে দেবদূত শুধু অরণ্য
ভাঙ্গা গোটা দুই গ্রাম,
আহার খুঁজিছে প্রত্নতত্ত্ব
এই এর পরিণাম।

সেথা হতে ফিরি গেল দেবদূত
প্রমোদ-কানন মাঝে
নিবিড় পুলকে প্রণয় প্রণয়ী
মাধবী দোলায় রাজে।
মরণ দাঁড়ায় বিমোহিত হয়ে
কাল পিছাইয়া যায়,
চাঁদ চুমা দিয়া যেন সে দুটীরে
ছবি করে দিতে চায়।
ভাবে দেবদূত পীযূষ কলসী
দিব উহাদের কাছে
ফিরে চেয়ে দেখে রূপ সম্ভার
কিছু তার নাকি আছে ?

নূতন দলেরা আসিছে যাইছে
একটা বন্দর নাকি
পীযূষ কুম্ভ এত জনতায়
কার কাছে যাই রাখি।

যান দেবদূত তারপর এক
বিজন ভবন কোণে
বসে আছে সেথা কবি উন্মনা
যেন কার কথা শোনে।

মনের মাঝারে গড়িয়া তুলিছে
নূতন অলকাখানা,
সুষমা তাহার অতুল অতুল
স্বরগ হইতে আনা।
আপন প্রাণের মাধুরী মিশায়ে
গড়িছে মধুর ছবি
পলকে তাহারা জীবিত হতেছে
হেরিয়া মোহিত কবি।
তাহাদের পানে চাহি বলে কবি।
স্মরাতে আমারে ভবে,
পুলকের গড়া পলকের ছবি
একটাও কি রে রবে?
পুতুলেরা সবে পরী হয়ে বলে
'জানিনে মরণ জরা
তোমার স্মৃতিকে অমর করিয়া
সাজায়ে রাখিব ধরা।'

কবি কেঁদে বলে শুকাইয়া যাবে
জলে এই দাগ কাটা,
তা'রা বলে মোরা বিজয় পত্র
কালের ললাটে আঁটা।
দেখে দেবদূত কবির স্মৃষ্টি
হরির দৃষ্টি লভি,
অমর জীবন কখন লভেছে
জানিতে পারেনি কবি।
হেতা রেখে যাই পীযুষ কুম্ভ
ভাল ঠাঁই পেনু খুঁজি
যুগ যুগ ধরি হবেনাক শেষ
অফুরান এর পুঁজি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে প্রশ্নের কেহই জবাব দিতে পারে না, সে প্রশ্ন-বিচারের উপযোগীতা কি ? জীবনের যে রহস্য চিরদিনই দুর্জ্ঞেয় থাকিয়া যাইবে, তাহার ব্যর্থ মীমাংসা-চেষ্টায় কি ফল ? বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হয় তো একথা জিজ্ঞাসা করিবেন—এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে চাহিবেন, যে এল র‍্যামির ঐ পরীক্ষা, অনুসন্ধান ও উদ্বেগ, এমন কি স্বয়ং এল র‍্যামি পর্য্যন্ত, আগাগোড়াই ভ্রান্ত-ধারণা-সম্ভূত। কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক, যে আপাত-প্রতীয়মান প্রমাণাতীতকে প্রমাণ করিবার জন্য এল র‍্যামির ঐ আকুল বাসনাটুকুকে কোনোমতেই মানব-প্রকৃতির অসাধারণ বা অস্বাভাবিক অবস্থা বলা চলে না;—প্রকৃতপক্ষে, এ-বাসনা বর্ত্তমান কালের মজ্জাগত। প্রত্যেক জীবিত প্রাণী, যদি সে দুঃখ-দারিদ্র্যভারে চিন্তাকার্য্যে পঙ্গু না হইয়া থাকে, নিঃসংশয়ে জানিতে চায়, যে আত্মা—অবিনশ্বর অহংতত্ত্ব—গল্পকথা না সত্যপদার্থ? অতি-স্বাভাবিক বস্তুর অনুসন্ধানে এমন অদম্য আকুলতা বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বে বুঝিবা প্রকাশ পায় নাই—আর, জুয়াচুরি ও প্রতারণাকে অস্থায়ীভাবেও 'সত্য'-রূপে চলিয়া যাইতে দেখিয়া এত নিরতিশয় যন্ত্রণা ও হতাশাও কখনও দেখা যায় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাকাহিনীই আমাদের পরিচিত; প্রেমের, যুদ্ধের, দুঃসাহসিক কার্য্যাবলীর, ধনসম্পদের আগাগোড়া কাহিনীই আমাদের সুপরিজ্ঞাত; যে সমস্ত জাতি একদিন ছিল অথচ আজ নাই তাহাদের কথা আমরা ইতিহাসে পড়ি, এবং বুঝি যে আমরাও হয় তো কোনোকালে তাহাদেরই ন্যায় বিলুপ্ত হইব—কেন না, অদৃষ্টচক্র চিরদিন একই চক্রপথে ঘুরিয়া চলিয়াছে এবং তাহার নির্দ্দয় একরোখা গতি কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নয়। অধুনালুপ্ত প্রাচীন নগরগুলির ধ্বংসাবশেষ ও ধূলার মধ্যে যখন আমরা বিচরণ করি, তখন বিস্মিত হইয়া ভাবি, যে সমস্ত

মানবাত্মা ইহাদের গড়িয়া তুলিয়াছিল বাস্তবিকই কি তাহারা নাই? ইহা কি সম্ভব, যে সৃষ্টির নিদর্শন সমূহ আজও এখানে পড়িয়া আছে, অথচ সৃষ্টিকর্তা কোনোখানেই নাই? এরকম একটা ব্যবস্থা কি যুক্তিসিদ্ধ বা ন্যায়সঙ্গত? এই জন্যই দেখা যায়, যে শিল্প-কুশলীরা যখন আমাদের যুদ্ধ জাহাজডুবি, প্রেম, রাজনীতি বা সমাজ প্রভৃতির কাহিনী শুনাইতে বসেন, তখন প্রায়ই আমরা একটা ঔদাস্য লইয়া ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্যই সেগুলি পড়িয়া থাকি—কিন্তু যখন তাঁরা এমন কোনো বিষয় স্পর্শ করেন যাহা পার্থিব অভিজ্ঞানের অতীত, তখনই শুধু আমাদের সাগ্রহ মনোযোগ ঘটে ও সানুরাগ গরজ প্রকাশ পায়। বিচক্ষণেরা এই প্রবণতাটীকে রুগ্ন ও অস্বাস্থ্যকর মনে করেন; কিন্তু তা' সত্ত্বেও প্রবণতাটীকে তো অস্বীকার করা যায় না,—"আলো, আরও আলো"র জন্য তাগিদ যে মানবজগতের বুকের রক্তে ও মস্তিষ্কের গঠনেই মিশাইয়া আছে। এই জন্যই, যা-কিছু মানুষের ভিতরকার অতীন্দ্রিয় উপাদানের প্রমাণ দিতে দাঁড়ায়, তাহাকে আমরা যাচাই করিতে চাই বা পরীক্ষা করি,—এবং ধাপ্পাবাজ ও জুয়াচোরকর্তৃক প্রতারিত হইলে আমাদের বিরক্তি ও হতাশা এতই প্রবল হয়, যে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাও খুঁজিয়া পাই না। তাহারাই বুঝিবা সর্বাপেক্ষা সুখী, যাহারা বিচিত্র বিশ্বাস ও যুক্তির পরিচালনায়, খৃষ্টে পরিদৃশ্যমান নর-দেবত্বের বিশুদ্ধ দৃষ্টান্তটী দৃঢ়তারই সহিত আঁকড়িয়া থাকেন। খৃষ্টকে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে, জগতের পরম সুষমা ও সমুন্নতির অদ্বিতীয় নিয়ন্তা 'প্রেম' ও 'বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব'-গাথাও আমাদের অস্বীকৃত থাকিয়া যাইবে।

লিলিথ যে 'সঙ্কেতের' আশা দিয়াছে, অথচ আজও যাহা দেখা দেয় নাই—তাহারই প্রত্যাশায় এল র‍্যামি যখন দিনের পর দিন নিভৃতে অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন উপর্যুক্ত চিন্তাগুলি প্রায়ই তাঁহার মনের মধ্যে আন্দোলিত হইত। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, যে সে তাহার কথা রাখিবে—এবং 'সঙ্কেত,' তা' সে যেমনই হউক না কেন, দেখা দিবে; সুতরাং, তাঁহার প্রকৃতিটী বিশ্বাস-পরায়ণই ছিল; কিন্তু বিশ্বাসের দিকে আপন চিত্তের এই ঝোঁকটীকে যতদিন না তিনি নিঃশেষে জয় করিতে পারিয়াছেন, ততদিন তাহার সহিত যুঝিয়াছেন। যাহাকে অতি-স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত, তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রমাণ করিতে সর্ব্ব ক্ষমতায় সমস্ত জিনিসই আজকাল তিনি দুটী দিক হইতে

দেখিতেন,—সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনাশূন্যতা। আধ্যাত্ম-রহস্য-সম্বন্ধীয় আরবী-কেতাব-কতিপয় ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থই আজকাল তিনি পড়িতেন না। নিজে প্রচুর লিখিতেন—কিন্তু পত্রোত্তর দান, নিমন্ত্রণ গ্রহণ, অল্প সময়ের জন্যও ভ্রমণার্থ গৃহত্যাগ প্রভৃতি আদৌ করিতেন না; মনে হইত, যেন কোনো গোপনীয় বৃহৎ বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার সমস্ত মন পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিতেছে—এবং সুবৃহৎ লণ্ডন মহানগরীর কর্ম্মকোলাহল ও জনতার মধ্যে যোগ-সাধকের মত লিলিথের শয়নপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া এল র‍্যামি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া চলিয়াছেন; কিন্তু বারেকের জন্যও তাহাকে আহ্বান না করিয়া নির্দ্দিষ্ট 'সঙ্কেতের'ই প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার যাবতীয় উচ্চাশা এখন একমাত্র সুমহান্ বস্তুতেই কেন্দ্রীভূত.........আত্মার দর্শন, তাহার যথার্থ স্বরূপে—যদি ব্যক্তিগত চিন্ময় আত্মার বাস্তবিকই অস্তিত্ব থাকে। কারণ, তাঁহার মতে, সে আত্মার আবশ্যকতা কি, যাহার শক্তিমত্তা আমরা বুঝিবার অধিকার পাই না—বিশ্বা যাহা মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীল বুদ্ধি-রূপের অতিরিক্ত কিছুই নহে? মানুষের আধ্যাত্মচেতনার পশ্চাতে সম্ভাব্য-কিছুর প্রধান প্রমাণ, তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, মানুষের অসন্তোষ,—কারণ অসন্তোষ সার্ব্বজনীন। বিপুল বিশ্বপরিধির কোনোখানেই একজনও পাওয়া যাইবে না, যে সন্তুষ্ট। সিংহাসনারূঢ় প্রবল-প্রতাপ সম্রাট হইতে পথপার্শ্বের দীনতম ভিক্ষুক পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই একটা অনির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনের অঙ্কুশ তাড়নায় চঞ্চল—প্রত্যেকেই চাহিতেছে, শ্রেষ্ঠতর কিছু, অধিকতর স্থায়ী কিছু। যদি এই জীবনই চরম হয়, তবে অসন্তোষের আচ্ছাদিত অন্তরণে কি জন্য সমগ্র ব্যাপ্তি নিত্যনিয়ত প্রতিধ্বনিময়? দার্শনিকতাই বল, আর নৈয়ায়িকতাই বল—এই অসন্তোষকে তর্কে উড়াইয়া দিবার শক্তি কিছুরই নাই; এ যেন একটা দৈব অতৃপ্তি, যা' ক্রমাগতই আমাদের অন্তরকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে, নব নব সুখের ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছে—যা' চির-চঞ্চল, কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। এল র‍্যামি কতবার নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছেন—এই অসন্তোষই কি আত্মার বাণী? শুধু সমষ্টির অন্তরাত্মারই নয়, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিগত আত্মার?......

এল র‍্যামির এই স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত নির্জ্জনবাস ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার অবসরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফেরাজ বেশ প্রফুল্লচিত্তেই দিন কাটাইতেছিল। সে বসিয়া বসিয়া আপন মনে একখানি খণ্ডকাব্য-রচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া কল্পনা করিতেছিল যে কোনো গ্রন্থপ্রকাশক সম্ভবতঃ উহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রকাশ করিতে চাহিবেই; এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না, যেহেতু যুবকচিত্তের সুবিধাই এই যে তাহা সকল বিষয়েই অতি-নিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ তাহার মস্তিষ্ক এ সময় গীতিকলার বিবিধ সৌন্দর্য্য-উদ্ভাবনেও নিযুক্ত ছিল—কতই না সান্ধ্য-মুহূর্ত্ত সে পিয়ানোর নূতন নূতন সুর ঝঙ্কারিত করিয়া অথবা ম্যাণ্ডোলীন-যোগে গীতিঃ মাধুর্য্য বিকীরণ করিয়া পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছে। এল র‍্যামি যেটুকু সময় লিলিথের কক্ষে উৎকণ্ঠায় কালযাপন পরিহার করিয়া নীচে আসিতেন সে সময় নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বসিয়া কনিষ্ঠের গীতিসুধা পান করিতেন এবং নিজেই বুঝিতে পারিতেন যে ফেরাজ যখন বিশেষভাবে প্রেমেরই গান গায় তখন তাঁহার চিত্ত যেন একটু অধিকই আকৃষ্ট হয়। এক রাত্রে ফেরাজ 'প্রেম-মঙ্গল' শীর্ষক একটী গান নির্ব্বাচন করিল; 'ওয়েন মেরিডিথের' ছদ্মনামে লর্ড লিটন যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে আসন লাভে অগ্রসর, গানটী সেই সময় লিখিত। বীণাতন্ত্রীগুলি ফেরাজের ছড়ির আঘাতে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল এবং সে গাহিল :—

একদা এক দেবদূতেরে যামিনী-যোগে গগনে,
শুনিয়াছিনু গাহিতে গীতি স্বর্ণতারের সেতারে;
সপ্তঋষি ধ্রুবতারা ও আমি সে মধু-লগনে
সে গান শুনি অবাক্ মানি চাহিয়াছিনু সে ধারে;
এতই সরস, এতই মিঠে তার গাওয়া সে গানটী গো,
বীণার কনকতন্ত্রীগুলির এতই মধুর মূর্চ্ছনা—
চরণে তার হাজার পরী লুটিয়ে দিলে প্রাণটী গো,
পক্ষপুটে লুটায়ে মাথা করিল তারে বন্দনা;

সে মধুরাতে পরীর সভা মাতায়েছিল যে গীতি,
শুনেছি যেন অপর কোথা,......নামটী তাহার 'পীরিতি'!
ছিলাম যবে নিরয়-বাসে এই জীবনের প্রাক্কালে
তরঙ্গিত গন্ধকেরি সাগরশায়ী পর্ব্বতে—
এক উদাসীর শাঁখের বাঁশী ঐ গীতিটাই এককালে
গিয়েছিল মিশায়ে আহা কাতর সুরের সরবতে!
এতই করুণ ছিল সে গীতি, সারাটী নিরয় আক্ষেপে
ভাসিয়াছিল নয়নজলে বেদনাহত অন্তরে—
বিষাদ-ঘন সুরের টানে কৃষ্ণ-পাখা-বিক্ষেপে
উড়িয়া আসি, পিশাচ-দলও থমকিল কোন্ মন্তরে;
হারানো-হিয়ার সভাতে সেদিন উদ্গীত হ'ল যে-ভাষা
'পীরিতি' তাহার নামটী! এবং·····গাহিল সে গান···'হতাশা'!

গানের ভাবটুকুর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বীণার তারগুলিও যেন বেদনায় কাঁদিয়া উঠিল, এবং এল র‍্যামির ওষ্ঠপথে একটী গভীর ও কাতর দীর্ঘশ্বাস বুঝিবা তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বাহির হইয়া আসিল।

গান থামাইয়া ফেরাজ ভ্রাতার দিকে চাহিল এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল তোমার?"

"কিছুই না!"—প্রশান্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"হবে আর কি? শুধু···গানটী খুব সুন্দর, তা' ছাড়া নেহাৎ মামুলিও নয়—তবে, অন্ততঃ আমার কাছে, ওতে যেন সৃষ্টির কোনোখানে কোনো একটা ভুলই সূচিত কচ্ছে। প্রেম লাভ করা—প্রেম হারানো!—স্বভাবতঃই এতে প্রকারভেদ আছে—কিন্তু এটা বিধি বিরুদ্ধ—কারণ, নামের ধর্ম্ম অনুসারেও প্রেমের ইতিহাসে কোনো 'হারানো হিয়া' অসঙ্গত।"

ফেরাজ চুপ করিয়া রহিল।

"তুমি কি বিশ্বাস কর"—এল র‍্যামি বলিলেন—"যে একটা 'নিরয়-বাস' কোনোখানে আছে?—কোনো জায়গা বা মনের কোনো অবস্থা, যা' তোমার ঐ 'গন্ধক-সমুদ্রশায়ী পর্ব্বতের' রূপক হ'তে পারে?"

"আমার মনে হয়,"—কতকটা বিনীতভাবেই ফেরাজ উত্তর করিল—"এমন একটা অবস্থা অবশ্যই আছে যাতে অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে আমরা বাধ্য হই এবং নিজেদের ত্রুটী স্মরণ করি—একটা অবস্থা যা' আমাদের অনুতপ্ত হবার অবকাশ দেয়।"

"অসুন্দর ও অসঙ্গত!"—উষ্মার সহিত এল র‍্যামি বাধা দিলেন—"কারণ, ধর, আমাদের ত্রুটী আমাদের অজ্ঞাত? আমরা এই পৃথিবীতে কোনোরকম অনুশাসন-বাধ্য না হয়েই আপন খুসী মাফিক চলবার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।"

"আমার ধারণা, এমন কথা নিশ্চয় করে' তুমি বলতে পারো না"—মৃদু ভর্ৎসনার সুরে ফেরাজ বলিল—"সাধারণতঃ, ত্রুটী করবামাত্রই আমরা তা' জান্‌তে পারি,—আমাদের ভেতর থেকেই একটা প্রেরণা তা' বলে দেয়; তা' ছাড়া প্রাকৃতিক গ্রন্থ যখন আমাদের সাম্‌নে খোলা রয়েছে তখন অনুশাসনেরও অসদ্ভাব নেই। অতীত জীবনের পূর্ব্ব-ত্রুটী-স্মরণ সম্বন্ধে আমার মতে কোনো প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না কারণ, যতই আমার বয়স বাড়্‌ছে ততই বুঝ্‌তে পারছি, কোথায় কোথায় আগে সাফল্য-লাভ করতে পারিনি, এবং কি জন্যেই বা তারকারাজ্য থেকে আমার পতন অনিবার্য্য হয়েছিল।"

এল র‍্যামির মুখভাবে একটা অধীরতা প্রকাশ পাইল।

"তুমি স্বপ্নজীবী"—দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আর, তোমার ঐ তারকারাজ্যও স্বপ্নমাত্র। সত্যের অপলাপ না করে' নিশ্চয়ই তুমি বল্‌তে পারো না যে গত জন্মের কোনো ব্যাপার তোমার স্মরণে আছে।"

"কিন্তু এখন ক্রমেই আমার স্মরণ হচ্ছে"—প্রশান্ত দৃঢ়তার সহিত ফেরাজ জানাইল।

"দেখ ফেরাজ, আমি ছাড়া আর কেউ যদি একথা শোনে, তা' হ'লে মনে করবে যে তুমি পাগল—একেবারে বদ্ধ পাগল!"

"মনে করবার স্বাধীনতা অবশ্যই তাদের আছে"—ঈষৎ হাসিয়া ফেরাজ বলিল—"প্রত্যেকেই মত-গঠন-সম্বন্ধে স্বাধীন, আমারও নিজের মত আছে। আমার ধারণাটা নির্ভুল; এককালে আমি সেখানে ছিলুম—তুমিও ছিলে।"

"বেশ, তা' হ'লে আমি সে-বিষয়ের কিছুই জানিনে" এল র‍্যামি জানাইলেন। "একেবারেই তা' ভুলে গিয়েছি।"

"না, না!...তুমি ভাবছো যে ভুলে গিয়েছো" কোমলকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"কিন্তু সত্য কথা এই যে, তোমার ঐ বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো বিষয়ের জ্ঞানই 'স্মৃতির' সমষ্টিফল।"

এল র‍্যামি স্পষ্টই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

"যাক্—আর তর্কে কাজ নেই: আমাদের মতের মিল কস্মিন্‌কালেও হবে না। আর একটা গান শোনাও!"

ফেরাজ মুহূর্তকাল ভাবিল; পরে বীণা রাখিয়া পিয়ানোর নিকট উঠিয়া গেল এবং কঠোর আঘাতে ঝড়-ঝঞ্ঝার অনুরূপ কোনো একটা ছন্দ স্বর-কম্পন উত্থিত করিয়া নিম্নোক্ত গানটী সুরু করিল:—

*   *   *

"পাহাড়-দেশের পাগল হাওয়া, সঙ্গীতে মোর জড়িয়ে ওঠ,
ও ঝোড়োমেঘ, ঝঞ্ঝাবেগে আমার মতন উধাও ছোট্,
মেঘ-প্রদেশের দেবতা, তা' সে, ইন্দ্র বরুণ যিনিই হোন্
আজ,   পশ্চাতে মোর শরণ ল'ন!

*   *

"উপত্যকার মধ্যপথে, লঙ্ঘি' তুঙ্গ গিরির শির,
পতিত জমীর উপর দিয়া, অতিক্রমি' নির্ঝর-নীর,
প্রার্থনাহীন, লক্ষ্যবিহীন, বিরামহারা, অবিশ্রাম,—
আমার,   ছুটছে ঘোড়া, ঝরছে ঘাম!

"টঙ্কৃত ও ঝঙ্কারিত কতই বৃত্তি আমায় ঘিরে,
দুঃখ দেছে আলিঙ্গন, ও নিঠুরতা— মুকুট শিরে,
মৃত্যু আছে প্রতীক্ষাতে, শোক সে বলে 'তোমায় চাই'—
সেথা, ব্যস্ত-চরণ ছুটছি তাই।

* * *

ঘনঘটায়-আকাশ-ছাওয়া ঝোড়ো-মেঘের দেবতাগুলো,
ব্যঙ্গ করে' যাচ্ছে আমায় বিছাতে ঐ বাড়িয়ে মুলো,
অরণ্য-দেব আমার পথের মৃদু আলোও নিচ্ছে কেড়ে—
ওরে, পালা সবাই আমায় ছেড়ে।

* * *

"দেবতা ?—করুক অনুসরণ ! তুচ্ছ তা'রা, অনুগামী !
ব্যঙ্গভরে ডাকুক পিছু,—টপ্‌কে তাদের চলছি আমি ;
নাগাল যদি ধর্‌বে আমার, কর্‌বে পরশ, সমান হবে—
এখন পেছন পেছন আসুক তবে !......"

এল র‍্যামির দিক হইতে একটা চাপা চীৎকার-শব্দে চমকিত ফেরাজের গান অৰ্দ্ধপথে বাধা পাইল ; ঘাড় ফিরাইতেই সে দেখিতে পাইল যে তাহার ভ্রাতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কেমন যেন একটা শঙ্কিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। সে একেবারেই গান থামাইয়া দিল।

"চলুক—চলুক !"—আরক্ত উত্তেজনায় এল র‍্যামি গৰ্জ্জিয়া উঠিলেন—"কি প্রচণ্ড দেব-মানব-সংগ্রামের গান ! এ কি তোমার নিজের রচনা ?"

"নিজের !"—বিস্মিত ফেরাজ বলিল—"নিশ্চয়ই না ! কিন্তু কেন বল তো ? তোমার ভাল লাগ্‌ছে না ?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয় ভাল লাগ্‌ছে"—উত্তেজিত হওয়ায় নিজেরই উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন—"আরও পদ বাকী আছে এ গানের ?"

"আছে, কিন্তু আমি শেষ করতে চাইনে"—ফেরাজ যেন অপ্রতিভ-ভাবেই পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিল।

এল রামি সহসা হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

"থেম না ফেরাজ, চালাও"—তিনি বলিলেন—"তোমার গানের কথায় আর সুরে এমন একটা উন্মাদনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে যে তাতে মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসবারই কথা, কিন্তু অনুভূতিটা আদৌ অতৃপ্তিজনক নয়,—বিশেষতঃ, শোনবার জন্যে যদি প্রস্তুত হওয়া যায়,... আরম্ভ কর···শেষটা আমি শুন্‌তে চাই এর···এই—প্রত্যাখ্যানের।"

ফেরাজ বিশেষ করিয়া দেখিল, তাহার ভ্রাতার উক্তি আন্তরিক কি না; যখন নিঃসংশয়ে বুঝিল যে সঙ্গীতের শেষাংশ শুনিতে বাস্তবিকই তিনি উদ্‌গ্রীব, তখন পুনরায় স্বর হিল্লোলে কক্ষ প্লাবিত করিয়া আরম্ভ করিল:—

দ্রুত, দ্রুত, আরও দ্রুত! পথের আঁধার ক্রমেই বাড়ে,
শ্রান্ত তবু নইকো মোটে, চলার নেশা কই রে ছাড়ে?
দেব্‌তা?—আমি থোড়াই ডড়ি; নিজেই ভাঙি, নিজেই গড়ি!
দ্রুত চল্ রে তাদের তুচ্ছ করি।"

তেজস্বী মোর শুভ্র ঘোটক, বজ্র পায়ে চল্ রে ছুটে,
মাড়িয়ে তাদের নিবাস ভূমি, পূজারীদের দেমাক টুটে,
পশ্চাতে তোর ছুট্‌লে যত, সিন্নি-খেগো দেব্‌তাগুলো,
তাদের, দিস্ গায়ে ঐ খুরের ধুলো!

"দেব্‌তা আমায় দুঃখ দেবে? হার মানাবে পটের ছবি?
কখ্‌খনো নয়!—জাগ্রত হও, চিত্তগুহার চরম কবি!—
হোন্ না তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ কিম্বা অন্য-ধরণ,
এখন, করুন আমার অনু-সরণ!

টক্কৃত ও ঝঙ্কারিত কতই বৃত্তি আমার ঘিরে,
দুঃখ দেছে আলিঙ্গন, ও নিষ্ঠুরতা—মুকুট শিরে,
মৃত্যু আছে প্রতীক্ষাতে, শোক সে বলে 'তোমায় চাই'—
সেথা, ব্যস্ত-চরণ ছুট্‌ছি তাই !"

ঘণ্টার তীক্ষ্ণ ধ্বনির মত একটা ক্ষিপ্র আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গানটী সহসা থামিয়া গেল-- এবং ফেরাজ পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এল র‍্যামি প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন।

"একটা উন্মাদ ঝঙ্কার!"—কনিষ্ঠকে অভিমত-প্রার্থী মনে করিয়া তিনি বলিলেন—"এটা তুমি বিশ্বাস কর?"

"কোন্‌টা?"—ঈষৎ বিস্মিত হইয়া ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

"ঐ যে"—বলিয়া এল র‍্যামি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন—

দেব্‌তা আমায় দুঃখ দেবে? হার মানাবে পটের ছবি?
হোন্ না তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ কিম্বা অন্য ধরণ
করুন আমার অনু-সরণ!"

"তোমার ধারণায় কি এই বলে যে জীবনের পরিচালন-ব্যাপারে দেবতার কার্য্য অনুসরণ করা? না আমরাই দেবতা?"

ফেরাজ বিস্মিত-কৌতূহলে ভ্রাতার দিকে চাহিল।

"আশ্চর্য্য প্রশ্ন!"—সে বলিল—"এটা শুধু একটা গান, একটা বড় কবিতার ভগ্নাংশমাত্র। কবিতাকে নিশ্চয়ই আমরা ধর্ম্মমত বলে' ভুল করি নে। তা' ছাড়া, জীবনের পরিচালনার কথা যদি বল, তা হ'লে এ আশা অবশ্যই আমি রাখি যে ভগবান শুধু চালনাই করেন না, কিন্তু আমাদের সকলেরই ওপর রাজত্ব করেন।"

"এতে তুমি আশা পাও কি জন্যে?"—বিষন্নকণ্ঠে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি তো ওরকম সম্ভাবনায় ভয়ই পাই!"

ফেরাজ অগ্রসর হইয়া পরম স্নেহে জ্যেষ্ঠের স্কন্ধে তাহার হাতখানি রাখিল; পরে নম্রকোমল-কণ্ঠে বলিল—"তোমার মন অবসন্ন ভাই! ক্রমাগত নিজেকে ঘরে আবদ্ধ না রেখে একটু-আধটু বেড়াও না কেন? গৃহকর্ম্মে এদিক্-ওদিক্ ঘোরবার যে সুযোগটুকু আমি পাই, তোমার তাও নেই। আমি রোজই মুক্ত বায়ু সেবন করি,—তোমার জন্যেও এটা নিশ্চয়ই দরকার?"

"প্রিয়তম আমার, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ"—কনিষ্ঠকে একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বিষণ্ণ কোমল-কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"এতে কেন তোমার সন্দেহ হয়? শুধু—একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; অপূর্ণ মানব-স্বভাব শ্রান্তির হাত এড়াতে সব সময়ে পারে না।"

ফেরাজ আর কিছুই বলিল না,—কিন্তু ভ্রাতার ইদানীন্তন আচরণ তাহাকে কেমন যেন শঙ্কিত করিয়াই তুলিতেছিল। আপনার দিক হইতে যতদূর সম্ভব, এল র‍্যামির চিত্তকে নানাদিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা সে প্রায়ই করিত এবং উভয়ে একত্র হইলেই নানাবিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বাহ্য-ব্যাপারে ভ্রাতার আগ্রহ জাগাইতে চাহিত। স্বপ্ন-কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও, ফেরাজ চিন্তা বা গ্রন্থপাঠ নিতান্ত কম করিত না এবং প্রয়োজনের সময় আলাপ-আলোচনাতেও 'মজলিসি' হইয়া উঠিতে পারিত;—তথাপি সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে তাহার সস্নেহ চেষ্টাগুলি বড় বেশী ফলপ্রসূ হইতেছিল না। সত্য, এল র‍্যামির ভাব দেখিয়া মনে হইত যে সকল কথাই তিনি মন দিয়া শুনিতেছেন, কিন্তু ফেরাজ স্পষ্টই দেখিতে পাইত যে বহির্জগতের কোনো ব্যাপারই তাঁহার চিত্তকে আদৌ স্পর্শ করিত না। সেই জন্য একদিন প্রভাতে ফেরাজ যখন খবরের কাগজ হইতে জ্যাবেজ চেষ্টারের একমাত্র দুহিতা আইডিনার সহিত সার ফ্রেডারিক ভ্যাগানের পরিণয়-বিবরণী পড়িয়া শুনাইল, তখন কোনো কথাই না কহিয়া তিনি একটু নির্ব্বিকার হাস্য করিলেন মাত্র।

"আমরা সে বিবাহে নিমন্ত্রিত ছিলাম"—ফেরাজ মন্তব্য প্রকাশ করিল।

"ছিলাম না কি?"—এল র‍্যামি একটু ঘাড় নাড়িলেন; মনে হইল, ও-বিষয়ের কিছু, তাঁহার মনে নাই।

"সেকি! তোমার মনে নেই ?"—উৎফুল্লকণ্ঠে ফেরাজ বলিতে লাগিল—"সার ফ্রেডারিক তোমাকে যে চিঠি লেখেন, তুমিই তো আমাকে সেখানা পড়ে শোনাতে বলেছিলে। তা'তে ছিল, যেহেতু এ-বিবাহের ভবিষ্যদ্বাণী তুমিই করেছিলে, সে-কারণ ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা দেখবার জন্যে সশরীর তোমার উপস্থিতি তাঁর কাছে খুবই প্রীতিকর বিবেচিত হবে। কিন্তু তুমি নানান্ কাজের অজুহাতে যাবার অক্ষমতা জানিয়ে সরল গদ্যে অস্বীকার-পত্র পাঠিয়েছিলে। তুমি কি মনে কর, সে ব্যবহারটি খুব অমায়িক হয়েছিল ?"

"সৌভাগ্য আমার, যে অমায়িক হবার কোনো দায় আমার ঘাড়ে কেউ চাপায় নি"—কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"সমাজের কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ আমি চাই নে, সুতরাং 'ফরমাসি হাসি' হাসাও আবশ্যক মনে করি নে। সম্পূর্ণ-স্বাধীনতা-লাভের এই একটা প্রধান সুবিধা। সারাজীবন ধরে' কপট হাসি, মিথ্যাচার, লুকোচুরি আর মানুষের মনোরঞ্জন কি ভয়ানক শাস্তি, একবার কল্পনা কর দেখি!—ও-ব্যাপার আমার অসহ্য,—কিন্তু অনেকে পারে,—করেও বটে!"

"তা' ছাড়া"—একটু থামিয়া তিনি বলিলেন—"অন্তঃসারশূন্য নর-নারীর বিবাহ দেখ্‌তে পারবার মত ধৈর্য্যও আমার নেই। ভ্যাগান একটা নির্ব্বোধ,—তার উপাধি কস্মিন্‌কালেও প্রজ্ঞার লক্ষণ বলে' বিবেচিত হবে না,—তারপর ঐ ক্ষুদে চেষ্টার ছুঁড়ীটা, সেও একটা বুদ্ধিহীনা মেয়ে—বছর-কয়েকের মধ্যেই এ বিয়ের পরিণাম যে কি হবে, তা' পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"একটা আগাম বর্ণনাই শুনি না হয়"—হাসিতে হাসিতে ফেরাজ বলিল।

"বেশ,—পুরুষটা 'রেস'-খেলার ক্লাব করবে, আর মেয়েটা ভাল জামা-কাপড়ের সন্ধানে ফিরবে—এই পর্য্যন্ত, আর কিছুই না। তা'রা কারুর উপকারেও লাগবে না, অপকারও করবে না,—তাদের মরাবাঁচায় দুনিয়ার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এই সব লোকগুলোকে দেখেই আত্মার অমরতা-সম্বন্ধে সন্দেহ হয়,—একটা সুশিক্ষিত কুকুর যে-পরিমাণে 'আধ্যাত্মিক' ভ্যাগানও ঠিক তাই; আর ঐ ছুঁড়ীটার মানসিক উন্নতি একটা কায়দা-দুরস্ত ছুঁচোর চেয়েও বেশী নয়।"

"কঠোর!"—হাসিতে হাসিতে ফেরাজ মন্তব্য প্রকাশ করিল—"কিন্তু কুকুরই হোক্ আর ছুঁচোই হোক্, এখন তা'রা সুখী, নিশ্চয়ই?"

"সুখী?"—ব্যঙ্গভরে এল র‍্যামি বলিলেন—"কি আর বল্‌বো ফেরাজ,—তবে, তাদের বুদ্ধি যতটুকু সুখের কল্পনা করতে পারে, সে হিসাবে অবশ্যই তারা সুখী। ছুঁচোটা সুখী, কারণ সে এখন 'লেডি'-পদবাচ্য—কারণ, খুব দামী ঝক্‌ঝকে ল্যাজ-বার-করা গাউন লোটাতে লোটাতে সে এখন ধর্ম্মমন্দিরের বেদীর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে পারে—এমনভাবে, যেন, সে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য সেই ভগবানকে পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য করে' দিতে চায়, যাঁর সাক্ষাতে সে পরিণয়-কালীন শপথ গ্রহণ করেছে! পুরুষটা সুখী, কারণ বিবাহের ফলে আপাততঃ তার দেনাপত্তর শোধ গিয়েছে। বাস্, 'সুখের' সীমা এই পর্য্যন্ত। এ-রকম একটা পরিণয়ের 'জৌলুষ' নিঃশেষে মুছে ফেলবার পক্ষে ছ'মাসই যথেষ্ট।"

"সত্যিই কি তুমি এ বিয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে?"—ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

"ওঃ, সে খুব সোজা"—তাচ্ছিল্যের সহিত এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"দুটো অশিক্ষিত বিভিন্ন জীব যদি পাওয়া যায়; তার মধ্যে পুরুষটার দেনা, স্ত্রীলোকটার টাকা, আর মাঝখানে মেফিষ্টোফিলিসের মতন মতলব-বাজ অথচ মাজ্জিতবুদ্ধি একটা একগুঁয়ে মেয়ে—তা' হলে বাকীটুকু অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায়। লণ্ডনের প্রায় অর্দ্ধেক বিবাহই এই জাতীয়,—আর ঐ সব পরিণয়-বন্ধনের পরবর্ত্তী জীবন-কাহিনী শোনাবার জন্যে কোনো প্রেতাত্মার গোর ছেড়ে উঠে আসবার দরকার হয় না,—'তালাক'সম্পর্কীয় আদালত থেকেই সকল খবর মেলে।"

"তা' সত্যি"—ফেরাজ তাড়াতাড়ি বলিল—"তোমার কথা শুনে মনে পড়ছে যা' তোমার উপভোগ্য হতে পারে!"

"বটে!"—এল র‍্যামি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এ খুবই আশ্চর্য্য বলতে হবে, কারণ সকালেরই হোক আর সন্ধ্যেরই হোক, খবরের কাগজ চিরদিনই আমার কাছে উঁচু সাহিত্য বলে মনে হয়।"

ফেরাজ বলিল—"সাহিত্যের জন্য খবরের কাগজ কেউ পড়ে না, কিন্তু কিছুকাল আগে যে ধর্ম্মযাজকটি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারই সম্বন্ধে ঐ 'তালাক'ঘটিত একটা

খবর দেখলুম। চূড়ান্ত বদমায়েসির জন্যে সে লোকটা যথেষ্ট অপমানিত হয়েছে। স্ত্রীকে আর আটটী ছেলেমেয়েকে ত্যাগ করে'... "

"থাক আর ফিরিস্তিতে কাজ নেই"—ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"আমি তার সম্বন্ধে সবই জানি; এখানে যখন এসেছিল তখনই তাকে সব বলেছিলুম; কিন্তু অপমান সত্ত্বেও, জীবনে সে উন্নতি করবে, এজগতের এমনি চমৎকার শৃঙ্খলা যে যথার্থ ভাল লোকেরই এখানে মন্দ হয়ে থাকে!"

এল র‍্যামির কণ্ঠস্বরে তীব্রতা প্রকাশ পাইল; ফেরাজ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আমি তোমার মতে সায় দিতে পারি নে। ভাল লোকের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী,—যদিও সে পুরস্কার ভাসা-দার্শনিকদের নজরে পড়ে না। অন্ধকার গলিঘুঁজি বা বাঁকা-চোরা পথে রাস্তা-সংক্ষেপ করার চেয়ে সরল সোজা পথে লক্ষ্য-অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই আমার কাছে সহজ মনে হয়।"

"সরল সোজা পথ তুমি কাকে বল?"—এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বিশ্ব-প্রকৃতি"—তৎক্ষণাৎ ফেরাজ উত্তর করিল—"প্রকৃতিই আমাদের ভগবানের কাছে নিয়ে যায়।"

এল র‍্যামি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

"ওগো সহজ-বিশ্বাসী স্বপ্নচারি!"—তিনি বলিতে লাগিলেন—"তুমি কি বল্‌ছো তা' জানো না! প্রকৃতি!...তার কার্য্য-প্রণালীটা স্মরণ কর একবার,—অন্ধ, ধূর্ত্ত, নিষ্ঠুর কার্য্যপ্রণালী! প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই কোনো না কোনো জীবিত প্রাণীর ভক্ষক; কত রকমের, কত আকারের, নিরীহ বা হিংস্র জন্তুগুলো স্পষ্টতঃই একটা ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে; আমাদের পায়ের তলার প্রত্যেক ইঞ্চি জমী কোনো না কোনো মৃত প্রাণীর ধূলিতে পূর্ণ। এই পৃথিবীর ভীষণ তলদেশে, প্রকৃতি—ঐ উদার হৃদয়া করুণাময়ী প্রকৃতি—আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস, লাভার স্রোত, গন্ধক আর গলা শীশার টগ্‌বগে ফোয়ারা এমন সযত্নে লুকিয়ে রেখেছেন যে, কখন্ যে তা' জনতা-বহুল নগরের তলায় ঢু মেরে দেশকে দেশ উজার করে দেবে, তা' জানবার যো নেই। এই তো 'প্রকৃতি',—প্রকৃতিই বটে! সোনা, রূপো, হীরে-মানিকের যা'কিছু তাঁর সম্পদ, তা' এমন বিপদ-সঙ্কুল ভয়ানক জায়গায় লুকানো যে,

কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানে হাজার হাজার প্রাণ নষ্ট করে', তবে তাদের উদ্ধার হয়। মুক্তার সন্ধানে সাগর-চারী অসতর্ক ডুবুরিরা নির্দ্দয় হাঙ্গর-কুমীরের মুখে গিয়ে পড়ে,—এক কথায়, উন্নতি ও আবিষ্ক্রিয়ার পথে সমস্ত চেষ্টাতেই সৃষ্টির মধ্যে স্বভাবতঃ অসহায় প্রাণী এই মানুষকে, সর্ব্বত্রই, হয়, মৃত্যু আর না-হয় নিষ্করুণ নিরাশার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হয়। মানুষ যদি কেবল প্রকৃতির ওপরই নির্ভর করতো, তা'হলে প্রকৃতি তার জন্যে কি করতো ? সে এ জগতে নগ্ন ও অসহায় অবস্থাতেই প্রেরিত হয়েছে,—যদি তাঁকে বাঁচতে হয় তবে তার দেহের ও মস্তিষ্কের সমস্ত সত্ত্বাকেই শিক্ষিত ও কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী হতে হবে ; সিংহ-শিশু বা ভল্লুক-শাবকও বরং তার চেয়ে অনেক বেশী 'প্রাকৃতিক' সুযোগ পায়। তারপর, যদিও বা যথাসাধ্য চেষ্টায় মানুষ তার পারিপার্শ্বিকগুলিকে কাজে লাগাতে শেখে, তা'হলেও, যেমন নগ্ন অসহায় অবস্থায় এসেছিল, ঠিক্ তেমনিভাবেই আবার বিশ্ব-প্রকৃতির কোল থেকে বিতাড়িত হয়,—আর তার ঐ সযত্নে আহরিত জ্ঞানরাশি এমন অকেজো হয়ে যায়, যেন সে তা' একেবারেই শেখে নি। এই তো 'প্রকৃতি'— 'ভগবানের ছায়া' এই প্রকৃতিই যদি এমন প্রলয়ঙ্করী, এমন অন্যায়পর হয়, তবে ভগবান স্বয়ং না জানি কি ভয়ানকই নিষ্ঠুর হবেন।"

ফেরাজের সুন্দরায়ত উজ্জ্বল নয়নদুটী ধীরে ধীরে মলিন হইয়া আসিল।

"ভগবান যদি এরকম হতেন"— সে বলিল—"তা' হ'লে মানুষের মধ্যে অতি-বড় অধমও তাঁর চেয়ে মহত্তর গুণের অহঙ্কার করতে পারতো! কিন্তু ভগবান এ রকম ন'ন, এল র‍্যামি! অবশ্য তুমি নানাভাবে তর্ক করতে পারো, আর আমি তোমার যুক্তিকে হার মানাতেও অক্ষম, হ'তে পারি, কারণ তোমার তর্কের প্রতিষ্ঠাভূমি, নর-বুদ্ধির ক্ষেত্রটুকুমাত্র তোমার তর্কের সমুচিত উত্তর দিতে হ'লে আমাকে আত্মা হয়েই তা' করতে হয়—তোমার ভুল ধরে দেবার জন্যে দেহের বাইরেই যাত্রা করতে হয়।"

"উত্তম!"—কৌতুকভরে তাহার ভ্রাতা বলিলেন—"তা' হ'লে তাই কচ্ছ না কেন? দেহ থেকে বেরিয়ে এসে, তোমার ভগবৎ-জ্ঞানালোকে আমারও কেন চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছ না?

ফেরাজ ক্লিষ্ট হইল।

"তা' আমি পারি নে"—বিষণ্ণকণ্ঠে সে বলিল—"যখন আমি নিদ্রাপথে দূর-দূরান্তে চলে যাই, তখন পার্থিব কিছুই আমার স্মরণে থাকে না,—মনে হয় যেন হাজার হাজার বায়ুস্তর পৃথিবী থেকে আমাকে পৃথক করেছে। তুমি যে পৃথিবীতে আছ এ-অনুভূতি আমার চেতনা থেকে ঝরে যায় না—তবে মনে হয়, যেন সেও অবিলম্বে আমার সঙ্গে যোগ দেবে, কিন্তু আমি যেন তা'র সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য নই। এইটেই হচ্ছে এ-ব্যাপারের আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। এই জন্যেই কোনো ভূতের বা বিদেহীর মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনায় আমার অস্পষ্ট বিশ্বাস হয়,—কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো দেহমুক্ত আত্মা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে থাকে না কিম্বা ফেরে না। গতি বেশ সমসময়েই উর্দ্ধমুখী। যদিই বা ফেরে, তবে সে শুধু এইজন্যে যে কোনো কারণে সে 'আদেশ-বাধ্য' হয়, কিন্তু স্ব-ইচ্ছায় নিশ্চয়ই নয়।"

"কে তা'কে আদেশ-বাধ্য করে বলে' তোমার মনে হয়?"—এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শ্রেষ্ঠতম চিৎ-শক্তি"—শ্রদ্ধাপ্রকাশক স্বরে ফেরাজ বলিল—"যাকে আমরা সকলেই' কি-আত্মা কি শরীরী মন, মান্য করি।"

"আমি মান্য করি নে"—সগর্ব্বে দৃঢ়কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"মান্য আদায় করি।"

"কা'র কাছ থেকে?"—উত্তেজিতকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"কা'র কাছ থেকে, ভাই? নর-ধর্ম্মীদের কাছ থেকে বোধ হয়,—হাঁ,—যতদিনের মেয়াদ তোমাকে দেওয়া আছে,—কিন্তু অমর-লোক থেকে—না! সেখান থেকে বাধ্যতা আদায় করতে তুমি পারো না। দোহাই তোমার,—ওরকম শক্তির গর্ব্ব ক'রো না!"

সমস্ত আন্তরিকতা ঢালিয়া, উদ্বিগ্ন-আশঙ্কায় ফেরাজ কথাগুলি বলিল।

এল র‍্যামি হাসিলেন।

"কেন অনর্থক উত্তেজিত হ'চ্ছ ভাই? আমি গর্ব্ব করি নে, তবে নিজের শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন—এই যা। যদি আমি অবিনশ্বর হই, ভগবান নিজেও আমাকে বিনাশ করতে পারেন না—আর যদি নশ্বর হই, তবে মৃত্যুই আমার সীমা। যে কোনো দিকেই, আমি নির্ব্বিকার। শুধু, কোনো কাল্পনিক ঐশী-ভীতির কাছে ততক্ষণ আমি নতি-স্বীকার করবো

না, রক্ষণা-বেক্ষণ না করতে পারছ, কিসের অধিকারে সে আমার আনুগত্য দাবী করে। যথেষ্ট ! এ বিষয়ে অনেক বাকাব্যয় করা হয়েছে, এখন কাজে লাগা দরকার।"

বাক্যশেষে লিখিবার টেবিলটীর দিকে ঘুরিয়া বসিয়া অবিলম্বেই তিনি কাজে মন দিলেন।

ফেরাজ একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একটা অদ্ভুতপূর্ব্ব ভীতির আতিশয্যে তাহার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠের স্পর্দ্ধা-ব্যঞ্জক উক্তিগুলি তাহাকে যেন দংশন করিতেছিল স্মরণাতীত কাল হইতে, ঐশী-শক্তিপুঞ্জ কি, সকল পাপের সেরা পাপ ঐ অহঙ্কারকেই শাস্তি দিয়া আসিতেছে না ? তাহার চিন্তা ইতিহাসের সেই সুপ্রসারিত ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিল, যেখানে কতই না বিলুপ্ত জাতির প্রেতাত্মা বিবর্ণ-মূর্ত্তিতে আমাদের মানস-চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকেও সম্ভাব্য পরিণামের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেছে ; এবং স্মরণ করিল, সে ধ্বংস কতই না অনিবার্য্য হইয়াছিল, যখন তাহাদের আত্মতান্ত্রিকতা, দম্ভ ও প্রমত্ততা সীমা ছাড়াইয়া এবং ভগবানকে অস্বীকার করিয়াই বাঁচিতে চাহিয়াছিল। জাতির পক্ষে যেমন, ব্যক্তির পক্ষেও সেইরূপ,—শক্তি পূরণ-নীতি ত্রুটীশূন্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের গতিচ্ছন্দের সহিত সুসমঞ্জস। "যতদিন না শিশুর মত হও, ততদিন ভগবানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই"—এই কথা কয়টীও ফেরাজের মানস-কর্ণে বীণাধ্বনিবৎ বাজিয়া উঠিল,—এবং ভারাক্রান্ত অন্তরে সে ভাবিতে লাগিল, তাহার ভ্রাতার ঐ অনুসন্ধান কোথায় শেষ হইবে, কেমন করিয়া হইবে ?

এল র‍্যামি ইতিমধ্যে তাঁহার বন্ধু ক্রেমলীনের 'গোপন খাতা'র শেষ পৃষ্ঠাটী পরীক্ষা করিতেছিলেন। এ একখানি আশ্চর্য্য গ্রন্থ—অতি সন্তর্পণে রক্ষিত এবং অক্ষরগুলিও খুব পরিপাটী করিয়া লিখিত ; উৎসর্গ-পত্রে লেখা "পরলোকবাসিনী প্রিয়তমা মারুসিয়ার উদ্দেশে"—ইহাতেই প্রমাণ, যে বিচ্ছিন্ন একক-জীবন, বৈজ্ঞানিক খেয়ালে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও ক্রেমলীন শুধু যে তাঁহার রাশিয়ার বাগ্দত্তা আত্মনাশিনী কৈশোর-প্রণয়িনীটীকে স্মরণে রাখিয়াছিলেন তাহাই নয়, কিন্তু আত্মার অমরতা ও বিচ্ছিন্ন চিত্তযুগলের মিলনও অবশ্যম্ভাবী এই বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন। শেষ পত্রখানি এইরূপ,—এখানি অসমাপ্ত এবং যে-রাত্রির ভীষণ দুর্য্যোগে তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জীবনটী শেষ হইয়া যায়, তাহার পূর্ব্বরাত্রে লিখিত—

"যে জন্য এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পরিশ্রম করিলাম, আজ বুঝিবা সেই আবিষ্কারের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ওগো অন্তরের অন্তরতম আমার, তুমি জানো, কত আন্তরিক আমার এই স্বপ্নকল্পনা যে এই তীব্রোজ্জ্বল অশ্রান্ত আলোক-স্পন্দন হয় তো বা এ-জগেত কিছু না কিছু সংবাদ বহিয়া আনিতে পারে যাহা জানায় বুঝিবা আমাদের কল্যাণ ও উপকার দুইই আছে। আহা, যদি ঐ 'আলোক', যাহার রহস্য আমার সম্পাদ্য, ঐ-আলোক যদি আমার পার্থিব স্বপ্নে তোমার আবির্ভাবের একটী চকিত-দীপ্তি-কণাও প্রেরণ করিতে পারিত!......কিন্তু, ওগো প্রিয়তমে, তুমি আমাকে অলক্ষ্যে চালনা করিও, যাহাতে বুঝিতে পারি যে আমি নিতান্ত দূরবর্ত্তী নহি—বুঝিতে পারি, যে তুমি আমার নিকটে আছে এবং শেষ-জীবনে আমাকে বঞ্চিত করিবে না। যদি পার্থিব দশমিনিট-কালটুকুর মধ্যে ঐ আশ্চর্য্য আলোক ১১,১৬,০০,০০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে পারে, তবে, 'বিদেহী আত্মার সূক্ষ্মতর জ্যোতি' তুমি নিশ্চয়ই দূরবর্ত্তী হইতে পার না। শুধু যতদিন মানবজগতের জন্য আমার কাজ সমাপ্ত না হয়, ততদিন আমি পৃথক থাকিতে চাই—সেই কালটুকু সংক্ষিপ্তই হোক্ বা দীর্ঘই হোক্—আমাদের সাক্ষাত হইবে......"

এইখানেই পত্রখানি শেষ হইয়াছে।

"সাক্ষাত কি হয়েছে?"—দেরাজের ভিতর খাতাখানি রাখিয়া দিতে দিতে এল র‍্যামি ভাবিলেন—"আর তারা যে একদিন মরজীব ছিল, তা' কি তাদের স্মরণে আছে? এখন তা'রা কি অবস্থায়—কোথায়?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

নক্ষত্র।

—:*:—

একি ঐ আকাশের গান

তারা হয়ে ফুটে আছে চির-জ্যোতিষ্মান্ ?

আগুনের মত এ যে ছন্দ দিয়ে গাঁথা

চির-বিরহীর একি বিরহের গাথা

আলোকের রূপে করে আপনারে দান ?

চির-আঁধারের একি জ্যোতির্ম্ময়ী আশা ?

পিপাসী প্রাণের একি প্রণয়ের ভাষা

গভীর মধুর ?

একি　তাপিত নয়ন-জল বেদনা-বিধুর ?

আঁধার ও আকাশের হৃদয়ের তলে

হীরার মালার মত নিভে আর জ্বলে

চুম্বনের স্মৃতি একি মহা মূল্যবান্ ?

অন্নদা দিদি প্রসঙ্গে অবান্তর কথা।

আমরা 'অন্নদা দিদি ভারতীয় নারীর আদর্শ কি না?' আলোচনায় আমাদের দীন হৃদয়ের অনুভূতি যথাসাধ্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের দিক হইতে বেশী আর কিছু বলিবার নাই, সাধ্যও কম। হিন্দু নারীর আদর্শ হিসাবে অন্নদা দিদি নিখুঁৎ। আমার সৌভাগ্য,— শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু স্বয়ং একখানি চিঠিতে অন্নদা দিদির যথার্থ স্থান ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন,—'আমার নিজের মত বোধ করি ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে জানকী বাবুর মতটাকে শ্রদ্ধা করা, কারণ ভারতীয় নারীর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যের ধারণায় ধারাটি মনে হয় জানকী বাবু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।' এই সূত্রে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—'অন্নদার সহিত অন্যান্য চরিত্রের ভাল ও মন্দ দিকটাও যদি ঐ সঙ্গে তিনি দেখাইতেন তাহা হইলে সাহিত্যে আজকাল Progressive দলের তাঁহারা তাঁহাকে Conservative বলিয়া হাল্কা করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন না।' স্বয়ং গ্রন্থকারের এ উক্তিতে কতখানি আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা Progressive—উদারনীতিক না উন্নতিপন্থী?—না ক্রম-বিবর্দ্ধমান মনগুলিকে একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। Progressive বা Conservative দলের পক্ষ সমর্থন আলোচনার লক্ষ্য হইতে পারে না,—দলাদলির আমরা কেহ নহি; একদল যদি অন্য দলকে বিশেষণ বিশেষে আপ্যায়িত করিয়া আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হন তাহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? তুলা তুলাই, লৌহ কখনই নহে "হাল্কা" যদি তাহার প্রকৃতিগত হয়, আর যদি কেহ তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন তাহাতে ক্ষুব্ধ হইলে, আত্ম দৈন্যেরই প্রকাশ কিন্তু আর দোষ যাহাই থাকুক যে দোষ যাহাতে নাই, তাহা যদি তাহাতে আরোপ করা হয় সেইটিই ক্ষোভের কথা। যে হাল্কা আদৌ নয় তাহাকে মুখের কথায় বিনা বিচারে সে বিশেষণ বিশেষিত করিলে বক্তারই অপবাদ! আলোচনা অর্থে বিরোধের সৃষ্টি নহে। গ্রন্থকার ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়া চরিত্র বিশেষকে যেভাবে যতটা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকারের সেই সেই চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ, তাহাতে তিনি কি পরিমাণে সার্থক বা পঙ্গু, তাঁহার কৃতিত্ব বা বিফলতা কোথায়, যথাযথ ভাবে, আত্মচিন্তা

নিয়োগে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টাই এরূপ আলোচনার প্রাণ! গ্রন্থে অঙ্কিত চিত্র ও চরিত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্য কোন গুণ বা অগুণের কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়া কোন চরিত্র বিশ্লেষণ আলোচনাকারীর অধিকারের বাহিরে—ফলও নাই তাহাতে। করুণরস চিত্রণ যদি কোন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহাতে রুদ্ররসের অভাব এরূপ দোষের আরোপ করিলে বা ঐ করুণরসই রুদ্ররসের রূপান্তর এরূপ কল্পনায় চরিত্র বুঝা হয় না,—রুচী-বিকৃতিরই পরিচয় দেওয়া হয় এবং প্রকৃত রসআস্বাদনপ্রয়াসী যে তাহাকে তাহা বিচলিত করিয়া তুলে নিশ্চয়ই! সুপাচিত ব্যঞ্জনে পায়সের স্বাদ সন্ধান করিয়া, ব্যঞ্জনের ও পাচকের দোষারোপ কাহাকে করিতে দেখিলে মুখ ফুটিয়া না বলিলেও অনুভব করিতে হয়,—কি আপদ! এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদিগকে উক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল,—শ্রীযুক্ত শরৎবাবুও তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলোর তথাকথিত সমালোচনা ও তৎসঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে তাহা উপলক্ষ করিয়া এ দীনকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যথার্থই লিখিয়াছেন—'নিতান্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ না হইলে উহাতে ক্ষোভ আমার হয় না, মাঝে মাঝে কেবল এই কথাটাই বলিতে ইচ্ছা করে ও-গুলা সব চরিত্র মাত্র, আমি নিজে নয়। তাহাদের মুখের কথাগুলাও সুতরাং আমার নয়' (তাহাদের ভাবে তাঁহার কথা।) সুরবালাও আমি নয়, কিরণময়ীর কথাও আমার কথা নয়। রাজলক্ষ্মী, অভয়া, অন্নদা কাহারও জন্য আমি নিজে দায়ী নই, তাহাদের কথাও ব্যবহার উল্টাপাল্টা হয় তো হক্ না।' তিনি যে একেবারে দায় মুক্ত তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি না—বলিলে সেটা অন্ধ ভক্তেরই উক্তি হইয়া চাটুকারেরই চরিত্রের অবতারণা করিবে,—ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অন্তরে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা যাহাই থাকুক না আলোচনার কালে তিনি গ্রন্থকার ব্যতীত কিছুই নন,—তাঁহার চিত্রিত চরিত্রে যদি আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করিয়া থাকে তাহাই আমাদের অবলম্বন। তাঁহার অভয়া, অচলা Conservative দলের চক্ষে অচলা, Progressive দলের নিকট স্বাতন্ত্র্যের, স্বাধীন প্রেমের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা—কিন্তু গ্রন্থকারের চক্ষে তাহারা কি তাহাই আলোচ্য!

উপন্যাস আর প্রবন্ধ এক বস্তু নহে; প্রতিপাদ্য প্রতিপন্নের ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রবন্ধ নিবন্ধে আদি হইতেই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে সুপ্রষ্ঠিত করিবার জন্য সুযৌক্তিক, সুশৃঙ্খল মতবাদের

সংযোজনা, তাহাতেই তাহার সার্থকতা, আর উপন্যাসের ফলাফল বিচার চরিত্রের পরিণাম, শেষফল লইয়া,--যে চরিত্র শিষ্ট তাহার শেষ কিসে, যেটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল, পরিণামে তাহার পুরস্কার কি তিরস্কার--তাহার আলোচনা করিয়া গ্রন্থকারের চরিত্র চিত্রণের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে,--চরিত্রগত কোন ঘটনা বা উক্তি বিশেষকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে বুঝিতে গেলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার ও অন্যায়ই করা হইবে। মারীচ মারীচই, রাবণ রাবণই, রামচন্দ্র রামচন্দ্রই,—তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের চরিত্রগত ভাবে,—মারীচে রামচন্দ্রের উদারতার অভাব বা তাহার আচরণ ও উক্তির অশিষ্টতায় সমালোচক যদি ক্ষুব্ধ হন ও তাহার জন্য গ্রন্থকারকে দায়ী ও দোষী করেন সেটা সঙ্গত ত নহেই, বরং উদারতাপ্রয়াসী সমালোচকের অনুদারতারই পরিচায়ক। মারীচের সার্থকতা মারীচত্বে—গ্রন্থকারের কৃতিত্বও সেইখানে। বীভৎস কদর্যতাই যদি চিত্রকারের প্রতিপাদ্য হয়—তাহাই যদি মূর্ত্ত হইয়া উঠে চিত্রে তাহা হইলেই চিত্রকর সার্থক! জানি, এ যুক্তির সঙ্গতি স্বীকার করিবেন না অনেকেই: আর্টকে আর্ট না বলিয়া নৈতিকনিষ্ঠাকেই যাঁহারা আর্ট বা কলা-কুশলতার চরম উৎকর্ষতা মনে করেন, তাঁহারা এ যুক্তিতে আপত্তির উপকরণ দেখিবেন প্রচুর! প্রধান আপত্তি তাঁহাদের এরূপ নীতিবিরুদ্ধ, সমাজবিরুদ্ধ চিত্র বা চরিত্রের অবতারণাই অতীব দোষের। কেন না অবিরত এরূপ চিত্র দেখিতে দেখিতে মানুষের চক্ষু না মন এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে বীভৎস চিত্রই হয় তাহাদের পিয়ারের,—তাহা আর ঘৃণায় উদ্রেক না করিয়া (উৎকট) আনন্দ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয়। উদাহরণ দেন তাঁহারা—বহু ইংরাজী-নবীশ শিক্ষিত মহাশয়দের ড্রয়িংরুমের চিত্র,—নগ্ন মূর্ত্তি! এ প্রসঙ্গে গ্রন্থসমালোচক তুলিয়া ধরেন—অসম অবাধ স্বাধীন প্রেমের চরিত্রগুলি,—মাসিকের পত্রে ইহার দৃষ্টান্ত আছে বহু,—সেখআব্দুর ললিতার চরিত্র সমালোচনায়, অচলার মুণ্ডপাতে! অচলা যদি জাহান্নমের জীব হয় সেই স্থান তাহার জন্য কেহ নির্দ্দেশ করিলে ক্ষোভ করিবার কি আছে! কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রন্থকারকে তথায় প্রোথিত করিবার চেষ্টা হইলে পরিতাপের পরিসীমা থাকে না! জগত সংসারটাকে যখন সৃষ্টিকর্ত্তা একটানা নৈতিক নিষ্ঠা বা পূণ্যময় চিত্র দিয়া না গড়িয়াও তিনি বেশ আরামেই কাটাইতেছেন, পূজিত হইতেছেনও দেখিতে পাই--তখন গ্রন্থকার একটা বিষম চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়া এমন কি পাপ করিলেন! দোষই বা তাঁহার কোথায়? হাঁ,--যদি কেহ

সেই পাপ চিত্রকে মহনীয় করিয়া অঙ্কিত করেন তবে দোষের বটে,—নিন্দনীয় তিনি! কিন্তু কেহ যদি চরিত্রের পরিণাম ফল বিবেচনায় না আনিয়া, গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য না করিয়া কেবল চরিত্রের উক্তি ও আচরণকে গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বলিয়া ভ্রম করেন সে জন্য গ্রন্থকার দায়ী নহেন একটুকুও! বীভৎস চিত্র দেখিলেই যদি মন কলুষিত হয় চিত্রের সহিত চিত্রকর বীভৎস রসের যে জ্বালাময় ঘৃণিত ভঙ্গিমা যুক্ত করিয়া জগৎকে ও-উৎকট রস হইতে দূরে দাঁড়াইতে স্পষ্ট অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা যদি দর্শকের নয়নে পতিত না হয় সে অপরাধ চিত্রকরের নয়, তাঁহার অন্ধত্বের! এই অন্ধত্বের জন্যই জগতের মূল-ধর্ম্মের উপাসক, ভারতীয় ভাবের মূল আদর্শের সুনিপুন চিত্রকর মহাপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরের' জন্য নিন্দিত, বঙ্গমনীষী শরচ্চন্দ্র 'গৃহদাহে'র দাবানলে জর্জ্জরিত, 'চরিত্রহীনের' সহিত তাঁহার নিতান্ত ব্যক্তিগত চরিত্র বিষম চিত্রে চিত্রিত! তথাকথিত Conservative দলকে জিজ্ঞাসা করি—বাঙ্গালীর মন কি এমনই চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে যে 'কু'—শব্দেই নিরয়গামী হইবে,—এত দিনের সমাজ সংস্কার এক 'কু'তেই বিসর্জ্জন দিতে পারিবে শিথি নদীর নীরে! এরূপ করিয়া যদি বাঙ্গালীকে বঙ্গ সমাজকে, সংস্কারকে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় 'ইহা হতে শতগুণে মরণ মঙ্গল!' যতদূর বুঝিয়াছি—শরৎবাবুর মনটা Conservativeও বটে কিন্তু এরূপ Conservative তিনি নন—তিনি চান ভারতের সনাতন মূলধর্ম্মকে, প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে,—রবীন্দ্রনাথও এ হিসাবে Conservative সংস্কারবাদী (Conventionalists) নন তাঁহারা। বিশ্ব জগতের সহিত মহামানবের সহিত মানবের যথার্থ সংযোগ, মিলন যেখানে ভারতের সেই মহাপ্রাণতার উপাসক তাঁহারা—এই হিসাবে তাঁহারা Progressive. জাতি বিশেষের মানসিক দৈন্য বক্ষে ঢাকিয়া বাহ্যিক স্বাধীনতার উপাসক হইতে পারে না ইঁহারা—তথাকথিত Progressive দল হইতেও সুতরাং তাঁহারা বিচ্ছিন্ন!

আত্মসংস্কার ও অনুভূতি লইয়া বিচার; বিচার প্রথার, ধারার বিভিন্নতায় একই বস্তুর বহু দিক। এই হিসাবে অন্নদা চরিত্রের আর একটা দিক অবশ্য আছে! নারীর আদর্শ প্রসঙ্গে তাহা আমাদের আলোচনার হিসাব বাহিরে,—সেটা নারী চরিত্রের ঠিক সত্য-ধর্ম্ম নহে—সেটা সামাজ-আচরিত ধর্ম্ম—আদর্শের অনেক নিম্নে, অন্নদা-চরিত্র সমাজে কতটুকু সহনীয় তাহার

বিচার! যাহা চরম তাহার মিলমিশ মধ্যপথবর্ত্তীর সহিত সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে কখনই! আদর্শচরিত্রের লক্ষ্য চরমে, সে সাধারণের মধ্যে অবস্থিত হইলেও তার মনন গতিবিধি অতিক্রম করিয়া যায় সাধারণের জীবন যাত্রার ধারাকে! জনসাধারণ সমাজের যে নিয়ম কানুনকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানিয়া লইয়া জীবনটাকে জোড়াতাড়া দিয়া সুখী হইতে চায়, সামঞ্জস্যের চেষ্টা করে আদর্শ চরিত্র তাহা পারে না—সংস্কার তাহার জীবনে সত্যরূপে প্রকাশ পায়,—সে প্রার্থনা করে সংস্কারগত সত্যকে; এই দিক হইতে আদর্শ-চরিত্র সমাজ-বিশেষের জীব হইলেও সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র! হিন্দু সমাজে জন্মিয়া অন্নদা দিদির জন্মগত সংস্কার—স্বামীই ধর্ম্ম!—এ-সংস্কার প্রত্যেক হিন্দুরমণীতেই বর্ত্তমান কিন্তু সত্যরূপে প্রকটিত নহে অধিকাংশ জীবনেই! সাধারণে সংস্কারকে মান্য করে সমাজের ভয়ে,—সত্যরূপে নয়। স্বার্থ সংস্থানের সুবিধা হইলে সংস্কার গোপনে দূরে রাখিয়া সমাজ-বিগর্হিত কার্য্য করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করে না, প্রকাশ্যে ইহারা সামাজিক সংস্কারের ভক্ত, সামাজিক ব্যাপারে দশের সহিত বিরোধের ভয়ে! কিন্তু সংস্কার যাহার চক্ষে সত্যরূপে প্রকাশ—তাহার নাই ভিতর-বাহির—গোপন-প্রকাশ্য, private public সে সর্ব্বকালে সকল সময় সংস্কার-সত্যকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে। দ্বিধা নাই তাহার অন্তরে। শ্রীকান্তের শক্তিশালী গ্রন্থকার সংস্কার-সত্যধর্ম্ম সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন অন্নদাতে—মৃণালে, অন্য ভাবে অথচ বিশেষ স্পষ্টরূপে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে! ইন্দ্র ধার ধারে না ন্যায়ান্যায়ের বিচার, সে জানে আত্ম-সংস্কারকে নিত্যসত্যরূপে—আধখানায় বিশ্বাস, আধখানায় অবিশ্বাস তাহার জীবনে নাই, রাম নাম তাহার ভূত নির্য্যাতনের অমোঘ অস্ত্র,—সাপের মন্ত্র তাহার নিকট জীবন্ত সেই অটুট সংস্কারে সে শক্তিশালী—বীরের অধিক সাহসী—সে বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া তাহার প্রাণের বিশ্বাসে সে সর্ব্বদা নিজকে মনে করে সম্পূর্ণ নিরাপদ! সংস্কার হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারে এ শক্তি নাই কাহারও। অন্নদারও তাহাই, সংস্কার তাহার স্বামীইধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম পালনের পথে বাধা হইবার সাধ্য নাই কাহারও; সমাজের জীবন-যাত্রার অন্য ধারা দৈনন্দিন আচরণীয় অন্য সংস্কার সমস্তই অতল-তলে ডুবিয়া গিয়াছে—তাহার ধ্রুবসংস্কার-সত্যের প্রভাবে। এই স্থানেই সাধারণ ও আদর্শ চরিত্রে বিরোধ, নিন্দা, প্রশংসা, বাক্‌বিতণ্ডা! 'স্বামীই-ধর্ম্মে'র উপাসিকা হিসাবে অন্নদা দিদির গৃহত্যাগ তাঁহার জীবনের অতি বড় মহান্ অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইলেও সামাজিক হিসাবে তাহাই অতীব নিন্দনীয়—হিন্দু

-নারীর কুলত্যাগের কাহিনী ! জাতি, মান, পিতৃপরিবারের মুখে কলঙ্কের কালী ঢালিয়া দিয়া অন্নদা কোন্ প্রাণে গৃহত্যাগ করিলেন, ছি ! জনকের প্রতি কি তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই, তাঁহাকে সমাজের চক্ষে হীন করিয়াই কি অন্নদার কৃতিত্ব ? অন্নদার পরবর্ত্তী জীবনের মহনীয় চিত্র যে গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত, শ্মশানে যিনি সতীর অধিক সতী—তাঁহার সে কলঙ্ক-চন্দন বিলুপ্ত করিবার বৃথা প্রয়াসী না হওয়াই শ্রেয়ঃ—অক্ষয় হউক তাহা তাঁহার ললাটে। মাভৈঃ,—অন্নদার প্রাণ সম্ভবে না ঘটে ঘটে !—'স্বামী-ধর্ম্মের' জন্য অন্নদার অনুসরণে অন্যের গৃহত্যাগ—কুল-ত্যাগের আশঙ্কা আছে কমই ! অথচ অন্নদার আদর্শ হিন্দুনারীর জীবনে জাগ্রত থাকিলে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

অন্নদা চরিত্রের আর একটা অপবাদ—তাঁহার অমন বিকট পশুচরিত্র স্বামীর অনুসরণ, সেইটাই না কি তাঁহার দৌর্ব্বল্য। ঠিক্, নতুবা কি কেহ সাধ করিয়া অশেষ যন্ত্রণায় ঝাঁপ দেয়। যে ক্ষেত্রে আহ্বানও নাই বিসর্জ্জনও নাই সেখানে দেবীর উপস্থিতির আবশ্যক ! কি টানে যে সে প্রাণ টানে তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি অন্নদার আদর্শ প্রসঙ্গে ; আর না ! স্বামীর অন্যায় ব্যবহারের জন্য—স্ত্রীর তর্জ্জন গর্জ্জন, স্বামী পরিত্যাগই যদি সুফলদায়ক হয় তাহার পরীক্ষা করুন সে মতবাদী। অভয়ায় আমরা তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছি আর পরীক্ষার নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুর গভীর মূলনীতির বিশারদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র অন্নদা চরিত্রে সে অংশের সম্ভাবনা আভাসেও অঙ্কিত করিয়া আদর্শকে পঙ্গু করেন নাই। সতীর চরিত্রে তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, আমরাও তাহার কাল্পনিক আলোচনায় অসম্মত। সিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎ বাবু চরিত্র চিত্রণে অতিমাত্রায় সাবধান। কি চরিত্রের দিক হইতে কি সমাজের অন্য দিক হইতে তাঁহার মূল-প্রতিপাদ্য আদর্শের খুঁৎ ধরিবার উপায় নাই, রসগ্রাহীদল তাঁহাকে সমাজ বিগর্হিত কতকগুলি চরিত্র চিত্রণের জন্য দায়ী করিয়াছেন যথা অচলা, অভয়া। কিন্তু গ্রন্থকারকে ছুঁইবার পথ নাই তাঁহার অচলা অভয়া হিন্দু পরিবারের চিত্র নহে—তাদের কার্য্যক্ষেত্র হিন্দুসংসারে নয়। অচলা ব্রাহ্ম কন্যা, অভয়া হিন্দুর ঘরের স্ত্রী হইলেও তাহার পরিচয় আরম্ভ বর্ম্মা যাত্রীর জাহাজে, কার্য্যক্ষেত্র ভারতের বাহিরে বর্ম্মায়, যেখানে ডোমে বামুনে মিলনে বাধা নাই,—হিন্দুর পারিবারিক বন্ধন অতিক্রম করিলে কাহারও নিন্দার ভয় নাই। অভয়ার জন্ম হিন্দুর ঘরে কিন্তু মনটা তাহার, আদর্শ তাহার হিন্দু রমণীর নয়, বিদেশী ভাব বন্যায় ভোগ-

বিলাসের যে মোহনীয় চিন্তাস্রোতের এ দেশের মনকে চমকিত, উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে অভয়া তাহার উদাহরণ! তাহার মন হিন্দুর মূল প্রভৃতির অনুকৃতি নয়—হিন্দুসমাজের বিকৃত মনের চিত্র! অভয়ার মনে স্বামীই ধর্ম্ম নহে,—সঙ্গী—তাহার বাসনা চরিতার্থের সহায়! এই জন্যই অন্নদাদিদির যেখানে স্বামী ত্যাগ অসম্ভব অভয়াতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অভয়ার গৃহত্যাগ ও অন্নদার গৃহত্যাগ একবস্তু নহে! অন্নদাদিদি আপনার সমস্ত প্রার্থিব সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামী সেবায়,—ধর্ম্মের প্রভাবে শ্মশানে সাপুড়িয়ার সঙ্গিনী, আর অভয়া আত্মসুখ পরিতৃপ্তির চেষ্টায় বিদেশে বহির্গত হইয়াছিল স্বামী-সন্ধানে, তাহার মাতৃত্ব-লাভ পিপাসার শান্তি বিধানে। প্রতিবাদ হইবে স্বামীসেবা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না যদি তবে সুদূর বর্ম্মাযাত্রার আবশ্যক ছিল কি?—ছিল; কলঙ্কের ভয় সকলেই রাখে,—দেশে অবৈধ আচারে যে লজ্জা, যে নির্য্যাতন, বর্ম্মায় যে বাধা নাই,— স্বামী যদি তাহাকে গ্রহণ করে—সে ত সুখ্যাতির সহিত' আত্মতৃপ্তি। অদম্য লালসার তাড়নে কলঙ্কের তুলনায় সতীন কাঁটাও অভয়া শ্রেয় ভাবিয়া, প্রথমে স্বামী অবলম্বনে স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টায় ছিল! সে জানিত স্বামী তাহাকে স্নেহ করে না,—স্বামী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে দস্তুর মত। বর্ম্মায় গিয়া প্রথম সে প্রত্যাখ্যাতা হয় নাই, দেশে থাকিতেই স্বামীর স্নেহে সম্পূর্ণ বঞ্চিতা—স্বামী চিঠির উত্তরটা পর্য্যন্ত দেয় নাই—গৃহ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই সে আশঙ্কা করিয়াছিল স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি সে একবারে আশাহত নাই—তাহার 'মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য্য শক্তি' সেটায় সে আস্থাবতী! এইটাকেই Progressive দল গুণের চক্ষে দেখিয়া বিলাস-উন্মত্তা অভয়াকে স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যতার আদর্শ ধরিয়া লইয়া, শরচ্চন্দ্রের মূল প্রতিপাদ্য লক্ষ্যকে দূরে রাখিয়া চরিত্রের বাহ্যিক মূর্ত্তির তারিফ করেন, অভয়া যদি প্রশংসার, স্বাধীনতার মূর্ত্তিই হয়—তবে প্রবলা টগর বৈষ্ণবী দোষ করিল কি? তার প্রাণে তবুও নন্দমিস্ত্রীর জন্য একটু টান আছে—ঝাঁঝ যদিও তার অতি তীব্র! অভয়া সে বিষয়ে সম্পূর্ণ পাষাণ! বিশ্বাস না হয়—রোহিণীকে জিজ্ঞাসা কর! অভয়ার পক্ষে স্বামীত্যাগ তাই এত সহজ,—যতদিন আত্মতৃপ্তির একটু আশা ছিল—যে পর্য্যন্ত তার প্রাণে স্বামী সহবাসের চেষ্টা, পরীক্ষায় অন্য প্রকার প্রতিপন্ন হইবা মাত্র সে বাঁকিয়া বসিল। রোহিণীকে আশ্রয় করিল, তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নহে,—

লালসা তৃপ্তির সহায়রূপে; এ অভয়ার সহিত অন্নদা দিদির তুলনায়ও পাপ বর্ত্তে—এখানেই ইতি!

হিন্দু সমাজের সহিত অভয়ার আদর্শের, ভাবের কোন সংশ্রব নাই, হিন্দুর চক্ষে সে সর্ব্বকালে থাকিবে নিন্দিতা। মনস্বী হিন্দুপ্রাণ শরৎবাবু অভয়াকে তাই হিন্দু পরিবারে স্থান দেন নাই,—এমন কি রাজলক্ষ্মীও এই হিসাবে নিন্দিতা,—তাহার মহনীয় চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—হিন্দু পরিবারের বাহিরে; গ্রন্থকার অতি সাবধানে রাজলক্ষ্মীকে স্থাপিত করিয়াছেন—গৃহের বাহিরে। সামাজিক জীবনে যাহা নিন্দিত,—তাহাই বাহিরে (স্বাধীন) প্রেমের সত্তায় বিরাট, এই স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতার যুগে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র অতুলনীয়। তাহারও তুলনা অন্নদার সহিত চলে না,—অন্নদা হিন্দু নারীর আদত মূর্ত্তি—স্বামীই তাঁহার ধর্ম্ম আর রাজলক্ষ্মী প্রেম-প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিমা। অন্নদা সংস্কার-সত্যের জাগ্রতরূপ আর রাজলক্ষ্মী কুলনাশা প্রেমের শ্রীরাধিকার প্রতিচ্ছবি। সুতরাং সমাজের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি অল্প। অন্নদা বা রাজলক্ষ্মী দলাদলির সম্পূর্ণ বাহিরে, ইহার আলোচনা আমরা রাজলক্ষ্মীর চরিত্র আলোচনায় বারান্তরে করিবার আশা রাখি।

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

সমাধি।

—:০:—

তোমারে ভুলিতে চাহি, সেকি অপরাধ?
সেকি এত সুকঠিন, নিঠুর বিস্ময়?
এই যে নিয়ত প্রাণে সুগোপন সাধ,
দিবানিশি বাসনার স্বপ্ন সমুদয়,—

এ নহে ছলনা শুধু, মিথ্যা আকিঞ্চন,
শুধু স্বপ্ন-বিলাসীর আবেশ-হিন্দোল,
জানি এ অন্তর-পুটে অর্ঘ্য-আয়োজন,
প্রবাহিত জীবনের আনন্দ কল্লোল !
এসেছিলে তুমি তাই ভরেছিল প্রাণ
বিকশিত নব রূপ-ছন্দ-গরিমায়,
অজানিত কত বাণী, অকথিত গান,
তোমারি পরশ লভি' জাগিল লীলায় !
—তুমি যে ভুলেছ আজ, আমি শুধু তাই
নিঠুর !—নিঠুর ! তোমা ভুলিবারে চাই।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

কুমীর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু সত্যি সেটা স্বপ্ন নয়, নিছক খাঁটি ঘটনা। আর খাঁটি না হলে কি আমিই সে গল্প বলতাম ?

আরকেডে পৌছতে পৌছতে রাত ৯টা হ'ল। সেদিন একটু সকাল সকাল দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাযেই আমাকে পিছুকার দরজা দিয়ে ঢুকতে হ'ল। কুমীরওয়ালা তখন গিন্নীর সঙ্গে কথা ক'চ্ছিল; সকাল বেলার চাইতে তাকে তিন গুণ খুসী দেখ্‌লাম—খদ্দের অনেক বেড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আমার দিকে খুব চাওয়াচাওয়ি করে ফুসফাস করে কথা কওয়া হচ্ছিল। দোকান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সিকি রুবল চার্জ্জ করলে।

"প্রত্যেক বারই তোমাকে দিতে হবে; তবে তুমি হচ্ছ তাঁর বন্ধু আর আমি বন্ধুর খাতির করি যখন তখন তোমার সিকিকবল দিলেই চলবে; অন্য সকলের কাছ থেকে এক কবল নিই।..

আমি কুমীরের কাছে যেতে না যেতেই চেঁচিয়ে বল্লাম, "বন্ধু বেঁচে আছ তো?"

তার কাছে দাঁড়িয়েও আমার মনে হ'ল যেন ম্যাটভিচ বহু দূর থেকে বলছে—"শুধু বেঁচে নয়, খুব ভালই আছি।... সেকথা থাক্। ওখানকার খবর কি?"

তার প্রশ্ন যেন শুনতেই পাই নি, এই রকম ভান ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—"কুমীরের ভিতরটা কেমন? সেখানে কি আছে? কেমন লাগছে?"—কিন্তু সে তাতে বিরক্ত হয়ে ফের জিজ্ঞাসা করলে—"খবর কি সব?"

টিমোফি সেমিয়ো নিজের সঙ্গে সে সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল সব বল্লাম—আমার কথায় একটুকু রাগ মেশান ছিল।

যেমন করে ম্যাটেভিচ আমার সঙ্গে আগে কথা কইত তেমনি করে বল্লে—"দেখ, বুড়ো ঠিকই বলেছে। আমি practical লোককে পছন্দ করি, আর sentimental লোক-গুলোকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। তোমার special commissionএর ideaটা একেবারে অসম্ভব নয়। আর এখানে আমার রিপোর্ট করবার অনেক আছে—তা বিজ্ঞানের দিক দিয়েই হো'ক, অথবা নীতির দিক দিয়েই হোক। কিন্তু সম্পূর্ণ একটা অপ্রত্যাশিত জিনিষ এখন ঘটে উঠেছে—মাইনে নিয়ে এখন মাথা না ঘামালেও চলে। খুব মনোযোগ দিয়ে শোন। তুমি কি বসে আছ?"

"না, দাঁড়িয়ে?

"তবে বসে পড় কিছু একটা নিয়ে, আর অবহিত হয়ে শোন।"

রাগে আমার গা গিস্‌গিস্ করছিল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধড়াস্ করে ফেলে, বসে পড়লাম। মহামুনসীয়ানা চালে সে আরম্ভ কল্লে—"শোন। আজ গাদা গাদা লোক জড় হয়েছিল। সন্ধ্যে বেলায় ন স্থানং তিল ধারণং। এমন কি শান্তিরক্ষার জন্যে পুলিশের আমদানিও হয়েছিল। আটটা বাজতেই অন্য দিনের চেয়ে অনেক সকালেই—দোকানী দোকানপাট বন্ধ করে টাকা গুণতে বসে গেল। কাল রীতিমত একটা হাট বসে যাবে, আর

কি! তা' হলে ধরে নিতে পারি, যে রাজধানীর যত সভ্য ভব্য লোক, সম্ভ্রান্ত মহিলারা, বিদেশের মন্ত্রীরা যাঁরা এখানে দৌত্য করতে এসেচেন, হোমরা চোমরা উকীলরা আর এই রকম ধরণের লোক সবাই আসবেন। আর সকলের সেরা, দূর দূর দেশ থেকে লোকে আদানি হ'তে থাকবে। ফলে দাঁড়াল এই যে যদিও আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তবুও সকলের নজর আমারই উপর। আমি এখন একটা মস্ত বড় লোক। এই জড় জনতাকে আমি শিক্ষা দেব। আমি মহত্ত্ব ও নিয়তি বাধ্যতার আদর্শস্থান হয়ে থাকব! এক কথায় সমস্ত মানব জাতির শিক্ষার উপলক্ষ্য হয়ে উঠবো। যে কুমীরটার ভিতরে রয়েছি সেইখানের শুধু bilogical (জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয়) সংবাদই অমূল্য। যা ঘটেছে তাতে আমার দুঃখ তো হয় নি, অনুতাপ করবার তো কিছু নাই-ই, অধিকন্তু আমার আশা হচ্ছে যে আমার ভবিষ্যৎ তারি উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে।"

আমি ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, "এক ঘেয়ে হয়ে উঠবে না তো ?"

সকলের উপর রাগ হচ্ছিল তার কথাগুলোর লম্বাই চওড়াই দেখে। তবুও আমি তার জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠছিলাম, ভাবছিলাম' হতভাগা বোকাটা হঠাৎ এমন চাল-বাজ হয়ে উঠচে কি করে ? আমার কথার উত্তরে তো—খুব সপ্রতিভভাবে বল্‌লো- "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না; আমার মাথায় বড় বড় idea আসছে—এখন আমি চুপচাপ অবকাশ মত সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের কথা ভাবতে থাকবো। এখন এই কুমীরের ভিতর থেকে সত্য ও আলোর প্রকাশ হবে। নিশ্চয়ই এখন আমি অর্থনীতির একটা নূতন theory গড়ে তুলবো—যে থিওরি আমি এতদিন আপিসের কাযের হেঁপায় পড়ে আর অন্যান্য নানা বাধায় খাড়া করে তুলতে পারি নি। আমার মস্ত নাম হবে।...হ্যাঁ, সেমিয়োনিচকে কবল সাতটা দিয়েছিলে তো ?"

"হ্যাঁ, আমারই নিজের পকেট থেকে"—'আমার পকেট' এই দুটো কথার উপর খুব জোর দিয়ে বল্লাম। খুব মুরুব্বিয়ানা করে সে বল্লে—"আচ্ছা সে সব ঠিক হবে এখন। আমি খুব আশা করছি যে আমার মাইনে বাড়বে। আর আমার না বাড়ে তো কার বাড়বে ? আমি এখন সকলের চেয়ে বেশী কাযের হয়েছি। যাক্ এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আমার স্ত্রীর খবর কি ?"

"তুমি বোধ হয় এলেনা ইভানোভ্নার কথা জিজ্ঞাসা করছো ?"

খুব চীৎকার করে বল্লে—'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী'। উপায় ছিল না। নরমভাবে আমি বল্লাম কি অবস্থায় আমি তাকে রেখে এসেছি। সে পুরো আমার কথা শুনলেও না। অস্থির ভাবে বলে উঠ্‌ল—"দেখো তার সম্বন্ধে আমার একটা স্পেশ্যাল প্ল্যান আছে। আমি যেমন এখানে বিখ্যাত হয়েছি, তেমনি সেখানে আমি তাকে বিখ্যাত দেখতে চাই। জ্ঞানী মনীষি, কবি, দার্শনিক, বিদেশীয় খনিজতত্ত্ববিৎ, রাজনীতিবিৎ—এঁরা আমার সঙ্গে সকালে কথা কইবেন, আর সন্ধ্যার সময় আমার স্ত্রীর বৈঠকখানায় গিয়ে জড় হবেন। আমি চাই যেন সে আগামী সপ্তাহ থেকেই রোজ সন্ধ্যে "অ্যাট হোম্" (At home) এর বন্দোবস্ত করে। আমার মাইনে ডবল হচ্ছে যখন, তখন আর মজলিসের খরচের কথা ভাবতে হবে না, বিশেষতঃ চায়ের বেশী যখন উঠছি না ; খালি দু একটা ভাড়াকরা বেয়ারা রাখলেই চলে যাবে ;--এই হ'ল সাব্যস্ত। এখানে, সেখানে, আমারই কথা হতে থাকবে। আমি অনেক দিন ধরে এই যশের তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করেছি—ভেবেছি খালি কি করে লোকে আমারই কথা কইতে থাকবে---কিন্তু সে তৃষ্ণা মেটে নি, আমার ছোট চাকরী আর আমার হীন অবস্থা এই যশোপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়েছিল। কিন্তু আজ একমাত্র কুমীরের গ্রাস তা' সাধন করে দিলে। আজ আমার প্রত্যেক কথাটি শ্রদ্ধার সহিত লোকে শুনবে, ভাববে, পুনরুক্তি করবে, ছাপাবে। আর আমি শেখাব আমার দাম কত ! আজ আমি তাদিকে বোঝাব কি রত্নই তারা হেলায় হারিয়াছে—কি প্রতিভা, কি ক্ষমতা আজ কুমীরের অগ্রে তারা গুপ্ত থাকতে দিয়েছে ! কেউ কেউ বলবে, "লোকটা Foreign minister হতে পারতো, রাজ্য শাসন করতে পারতো।" অপরে বলবে, "তবুও সে রাজ্যশাসন করলে না !" কোন অংশে আমি সার লিয়ার—পাগেশেস্কির চাইতে কম ?—আমার স্ত্রী আমার সহকারী হবে। আমার মাথা আছে—তার সৌন্দর্য্য আছে, মোহিনী শক্তি আছে। কেউ বলবে "সে বড় সুন্দর, আর সেই জন্যেই সে তার স্ত্রী হতে পেরেছে।" অপরে বলবে—"সে সুন্দর বটে ; কেন ? যেহেতু সে তার স্ত্রী।" কালই ইভানোভনা যেন আন্দ্রে ক্রাভেস্কি দ্বারা সম্পাদিত--Encyclopædia কেনে, যাতে করে সে সব বিষয়েই কথাবার্ত্তা কইতে পারে। আর একটা কথা—Petersburg News

এর সম্পাদকীয় স্তম্ভ যেন সে রোজ পড়ে। আর Voice কাগজের সঙ্গে তা মিলিয়ে নেয়। আমি আশা করি যে কুমীরওয়ালাকে বল্লে সে কুমীরটাকে আমার স্ত্রীর মজলিসে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতে রাজী হবে। বৈঠকখানায় সে জন্যে একটা বড় চৌবাচ্চা রাখতে হবে। আর সকাল বেলায় আমি খুব মজাদার রহস্য তৈরী করে রাখবো—সন্ধ্যে বেলায় সেগুলো ঝাড়বো—লোকে চমকদার সে সব কথা শুনে অবাক্ হয়ে থাকবে। রাজনীতিককে আমি আমায় নানারকম কৌশল মতলবের কথা বলব, কবির সঙ্গে ছড়ার কথা কইব, মহিলাদের সঙ্গে অভদ্র না হয়েও রসের কথা আমি কইতে জানি; বিশেষতঃ আমার এ অবস্থাতে, তাঁদের স্বামীরা মনের শান্তি কেউই হারাতে পারেন না। অন্য সকলের কাছে নিয়তির নিকট আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষার আদর্শ হয়ে থাকবো। আমার স্ত্রীকে সেইরূপ সাহিত্যিক ক'রে তুলব; সাধারণের কাছে সে যে কি জিনিষ তা বুঝিয়ে বলব; আমার স্ত্রী—যাবতীয় উচ্চ ও আশ্চর্য্য গুণে বিভূষিত বলে তাকে ধরতে হবে।

সত্যি করে বলতে কি এই ধরণের কথাবার্ত্তা আইভান মাটেভিচের অভ্যাসমত অথবা তার কথাও ধারে মাফিক হলেও আমার যেন বোধ হ'ল যে তার জ্বর টর হয়ে সে প্রলাপ বক্‌ছে। রোজ রোজই যেন তা' বিশগুণ করে বেড়ে উঠছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কি বন্ধু, ভাল আছ তো? দীর্ঘ জীবনের আশা করছো তো? কি করে খাওয়া দাওয়া চলছে, ঘুমোচ্ছই বা কি করে আর নিশ্বাস টিশ্বাস ফেলছোই বা কি করে? আমি তোমার বন্ধু আমার কাছে আর সত্যগোপন কোরো না আমার কাছে সমস্ত ঘটনাটা অস্বাভাবিক বলে বোধ হচ্ছে। কাযেই আমার ঔৎসুক্যটা খুব স্বাভাবিক।"

খুব জোর করে সে বল্লে—"তোমার ঔৎসুক্য মিছামিছি। কিছুই নয়; তবুও তা মিটবে। ভারি মজার কথা—কুমীরের পেটটা আমার কাছে একেবারে খালি বোধ হচ্ছে। যেন গটাপার্চার একটা প্রকাণ্ড থলি—গোরোইবি ষ্ট্রীট, ভজ্‌নেসেনস্কি প্রসপেক্টে যে স্থিতিস্থাপক থলে পাওয়া যায় তারই মতন আর কি?

আমি সবিস্ময়ে বল্লাম—"আরে রামো! তা' কি হয় কখনো?"

"নিশ্চয়ই—স্বভাব এমনি করেই কুমীরের পেটটা তৈরী করেছেন। কুমীরের তীক্ষ্ণ দন্তসমন্বিত একজোড়া চোয়াল, আর একটা লম্বা ল্যাজ ছাড়া—ধরতে গেলে—কিছুই নেই। এই দুয়ের মাঝখানে গাঁটাপার্চার মত একটা জিনিষের তৈয়ারী খানিকটা খালি জায়গা, বাস্—গাঁটাপার্চার মত কেন? বোধ হয় গাটাপার্চচাই হবে।"

আমি রেগে বল্লাম—"তা হ'লে পাঁজরাগুলো, পাকযন্ত্র, অন্ত্র, যকৃৎ, পিলে, হৃদয় এ সব কি উড়ে গেল?"

"না, না, সে সব নেই—একেবারেই নেই, বোধ হয় কখনও ছিল না। ফচকে ভ্রমণকারীদের সেটা কল্পনা মাত্র। এয়ার কুশনকে (air cushion) যেমন ফোলান যায় আমিও তেমনি কুমীরটাকে ফুলিয়ে তুলছি। এটার স্থিতিস্থাপকতা অসম্ভব রকমের। তুমি হচ্ছ আমাদের পারিবারিক বন্ধু—তুমি যদি সেরূপ মহানুভব ও স্বার্থত্যাগী হও, তা হলে তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে আসতে পার। তোমার জায়গা হয়ে ও খানিকটা জায়গা থাকবে। আমার এ খেয়ালও হয়েছে যে শেষ ইভানোভনাকে এখানে আসতে বলব। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আইন কানুন অনুযায়ীই কুমীরের পেটটা ফাঁপা। ধর কেউ নতুন একটা কুমীর গড়তে চায়; তাহলে এই খবরটা তার বিশেষ কাযে লাগবে। কুমীরের প্রাথমিক বিশেষত্বটা কি? উত্তর তো সোজা পড়ে রয়েছে—মানুষ গেলা। যখন কেউ কুমীর গড়তে চাইবে, কি করে সে মানুষ গিলবে তাই না তাকে প্রথম দেখতে হবে? এর উত্তর আরো সোজা, তাকে ফাঁপা করে গড়। অনেক দিন আগেই পদার্থবিদ্যা প্রতিপন্ন করেছে যে Nature abhors vaccuam প্রকৃতি শূন্য অবস্থাকে ঘৃণা করে। অর্থাৎ কোন জিনিষকে শূন্য থাকতে দেয় না। সেই জন্যে কুমীরে ভিতরটা খালি থাকতেই হবে, যাতে করে সে শূন্যকে ঘৃণা করতে পারে'—আর তা হলেই তাকে গিলতে হবে, আর যা সামনে পড়বে তা দিয়েই সে শূন্যটা পোরাতে হবে। আর কেন যে প্রত্যেক কুমীরই মানুষ গেলে এই সমস্যার এটাই হচ্ছে একমাত্র যুক্তিযুক্ত সমাধান। মানুষের কন্ষ্টিটিউশন শারীরিক গঠন ঠিক সে রকম নয়; এই ধর, মানুষের মাথাটা যতই বেশী খালি হতে থাকবে, ততই কম চেষ্টা হবে তার সেটা পূর্ণ করবার; আর এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। দিনের আলোর মত

এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে আমি এখন প্রকৃতির—অন্ত্রেরই ভিতর রয়েছি—এর retortএ রয়েছি—অ'র নাড়ীর স্পন্দন প্রত্যেকটী অনুভব করছি—এই সুযোগ পেয়ে আমার পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন বেশ তীক্ষ্ণ হয়েছে। যে থিওরিটার কথা বল্লাম সেটা তারই বলে আমি আবিষ্কার করেছি। আর শব্দতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেই একই সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হই। কুম্ভীর কথাটা বেশ করে একবার বিবেচনা করে দেখ দেখি—কুম্ভ+ঈর; কুম্ভ বলতে ফাঁক বোঝায়, এ মান্ধাতার আমল থেকে ফাঁক বুঝিয়ে আসছে; আর ঈর মানে যাওয়া।—অর্থ সুস্পষ্ট, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রথম যে দিন আমার স্ত্রীর বৈঠকখানায় নিয়ে যাবে, সেই দিনকার প্রথম বক্তৃতায় আমি এটা বিশদ করে বুঝিয়ে দেব।

আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"তোমার জোলাপ নিলে ভাল হ'ত না।"

নিশ্চয়ই তার ভয়ানক অসুখ হয়ে এ সব প্রলাপ বকছে!

ঘৃণার সুরে সে বল্লে, "ননসেন্স, কি বাজে বকছো? এ অবস্থায় জোলাপ নেওয়া বিশেষ সুবিধের নয়। আমি জানতাম যে তুমি ওষুধ খাবার কথা বলবে!"

"কিন্তু বন্ধু, তুমি, তুমি খাওয়া দাওয়া করছো কি করে? আজ খেয়েছো?"

"না, কিন্তু আমার ক্ষিদেও নেই, আর বোধ হয় আমি আর ভবিষ্যতে খাবার খাবো না। আর সেটা স্বাভাবিকও হবে; কেন না আমি কুমীরটার ভিতরের সমস্তটা পুরো করে আছি, তার ক্ষিদেও পায় না। কয়েক বৎসর ধরে এখন তাকে না খাওয়ালেও চলে। উপরন্তু আমি যখন তার পুষ্টি সাধন করছি তখন সম্ভবতঃ তার জান্তব রস আমাকে পরিপুষ্ট করবে। এই উপায়ে আমি কুমীরের পুষ্টিসাধন করছি, আর সে আমার পুষ্টিসাধন করছে। কিন্তু আমার মতন লোককে হজম করা কুমীরের কর্ম্ম নয়; সেই জন্যে ওর পাকযন্ত্রে আমার ওজন পড়ে কষ্ট হতে পারে, যদিও ওর পাকযন্ত্রই নেই। আর দয়াপ্রবণ হয়ে আমি পাশ ফিরি না, পাছে বেচারী কষ্ট পায়। এই জন্যে সেমিওনিচ যখন বলেছিল যে আমি কাঠের মত পড়ে আছি, রূপকভাবে সে সত্যই বলেছিল। কিন্তু আমি প্রমাণ করবো যে এই কাঠের মত পড়ে

থেকে আমি মানব-জীবনে যুগান্তর আনবো। আমাদের খবর কাগজে আর মাসিকপত্রে যে সব বড় বড় ভাবের স্ফূর্তি দেখতে পাই, সে সব কাজের না, যে সব লোক কাঠের মত নিশ্চেষ্ট পড়ে আছে তাদের। আমি নিজের একটা মত গড়ে তুলছি। তা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তোমাকে নির্জ্জন স্থানে যেতে হবে আর না হয় কুমীরের ভিতর সেধুতে হবে তখন বুঝতে পারবে মানবজাতির কল্যাণকর যুগ তুমি প্রবর্ত্তন করে ফেলেছো। তুমি চলে যাবার পর আমি এমন তিনটি পন্থা আবিস্কার করে ফেলেছি আর চতুর্থটাতে হস্ত দিয়েছি। যে সমস্ত মত আগে থেকে চলে আসচে তাদের খণ্ডন করতে হবে, কিন্তু কুমীরের ভিতর থেকে তা করা খুব সোজা কিন্তু কুমীরের ভিতর সব স্পষ্ট। একটু যা অসুবিধে—বড় স্যাঁতা এখানটা, আর রবারের মত গন্ধ, আমার পুরাণ জুতো জোড়াটার মত।"

"এসব আমার বিশ্বাস হয় না। সত্যিই কি তুমি আর খাবে না।"

"এসব নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন? কি ভালা বিপদেই পড়েছি গা! আমি কচ্ছি বড় বড় আইডিয়ার কথা আর তুমি।.. বেশ করে মনোযোগ দিয়ে শোন—এই অন্ধকারে বড় বড় আইডিয়াতে আমার পুষ্টি হচ্ছে। কুমীরওয়ালা বড় ভদ্দর লোক; কর্ত্তা গিন্নীতে পরামর্শ করে একটা বাঁকা নল কুমীরের মুখ দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে। তার ভিতর দিয়ে আমি কফি, ঝোলে ভিজান রুটী খাচ্ছি। কিন্তু এটা বিলাসিতা মাত্র; এমনি করে আমি হাজার বৎসর বাঁচতে পারি—অবশ্য যদি কুমীর এক হাজার বৎসর বাঁচে। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল, দেখো তো কাল Natural historyর পাতা উল্টিয়ে—কুমীর কত দিন বাঁচে। খালি একটা চিন্তা আমাকে কষ্ট দিচ্চে। সেটা হচ্ছে এই—আমার গায়ে পোষাক রয়েছে, আমার পায়ে বুট রয়েছে; স্পষ্টই বুঝছো, সেই জন্যে কুমীর আমাকে হজম করতে পারছে না। তা ছাড়া আমি বেঁচে রয়েছি ও ইচ্ছা শক্তি দিয়ে তার হজমের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছি; কেন না তুমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করছো যে ভুক্ত দ্রব্য অবশেষে যে দ্রব্যে পরিণত হয় তা' আমি হতে চাচ্ছি না—সেটা আমার পক্ষে বড়ই অপমানজনক হবে। সেই জন্যেই বড় একটা ভয়ে ভয়ে আছি; যে পোষাক আমি পরে আছি তা' রুষিয়ার তৈরী; দুর্ভাগ্য বশতঃ এক হাজার বচ্ছর তা' কখনই টিকবে না; তা হলে আমি যতই রাগ টাগ করি না কেন, ক্রমেই হজম হতে থাকবো। দিনের বেলায় নিজকে হজম হতে দেব না নিশ্চয়ই; কিন্তু রাত্রিতে

যখন ঘুমিয়ে পড়বো, তখন ইচ্ছাশক্তির চালনার অভাবে হয় তো হজম হতে পারবো। তারপর, আলু, পিঠে কিম্বা মাংসের যে মর্য্যাদা হানিকর অবস্থা হয় আমারও হয় তো তাই হবে। উঃ কি ভীষণ! ভাবতেই আমার রাগে গা জলে যাচ্ছে। একমাত্র এই কারণেই টারিফের (tariff) পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে আর বিলাতী কাপড়ের আমদানি বেশী করে হওয়া উচিত, যা পরলে কুরীরের ভিতর উক্ত অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। প্রথম সুযোগেই আমি রাজনীতিবিদ্‌গণকে এ খবর কাগজের সম্পাদকগণকে বলবো। তারা এই আইডিয়া বিদেশে প্রচার করুক। শুই এই আইডিয়াটাই আমি দেব তা নয়। প্রত্যেক সকালে খবর কাগজের লোকেরা টাকা নিয়ে আমার চারিপাশে ভিড় লাগিয়ে দেবে—আমার আইডিয়া পাবার জন্যে, যাতে পরদিনের টেলিগ্রাম স্তম্ভে সেগুলো প্রকাশ করতে পারে। এক কথায় আমার ভবিষ্যৎ গোলাপী রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে।"

"প্রলাপ, প্রলাপ—ঘোর বিকার!" আমি চুপিচুপি বল্লাম।

তার মত সম্পূর্ণভাবে জানবার জন্যে বল্লাম—"বন্ধু, স্বাধীনতার কথাটা কি ভেবে দেখেছো? তুমি তো এখন কয়েদী একরকম, সবাই কেমন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্চে।"

সে উত্তর করলে—"আরে বোকারাম, থামো। অসভ্যেরাই চায় স্বাধীনতা; বিজ্ঞেরা চায় নিয়ম......আর যদি নিয়ম না থাকতো.........."

"রক্ষে কর দাদা, ক্ষ্যামা দাও........."

আমি বাধা দেওয়াতে রাগ দেখে কে তার।

"চুপ করে শোন। আমি যেমন ভাবের পেখম ছড়িয়ে দিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি, এমনটী আর আগে হয় নি। এখানে আমার খালি একটী ভয় আছে—খবরের কাগজের হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ। যত বোকা, পরশ্রী-কাতর আর নিহিংস্টে ব্যাটারা আমায় নিন্দে করবে। কিন্তু আমিও জানি তার প্রতিকার। দেখি না খবরের কাগজে কি লেখে, কাল তুমি আমাকে জানাবে খবরের কাগজের কি মত।"

"আমি তোমার কাছে এক বস্তা কাগজ নিয়ে হাজির হব।"

"কাজেই কিছু খবরের কাগজে মতামত দেখতে পাবে না। কেন না একথা জাহির হ'তে অন্ততঃ চার দিন লাগবে। কিন্তু আজ থেকে প্রতিদিন তুমি পেছনকার দরজা দিয়ে আমার কাছে আসবে। আমি তোমাকে আমার সেক্রেটারী নিযুক্ত কোরবো। তুমি খবরের কাগজ, মাসিকপত্রিকা ইত্যাদি পড়ে শোনাবে, আর আমি তোমাকে আমার আইডিয়াগুলো বলা। বিদেশী টেলিগ্রামগুলো যেন ভুলো না ইয়ুরোপের যত তারের সংবাদ সেগুলো যেন এখানে আসে। যাক্ গে সে সব কথা; আজকের পক্ষ যথেষ্ট হয়েছে; তোমার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে। আজ বাড়ী যাও। আমি যদি সক্রেটীস না হয়ে দাঁড়াই, তা হ'লে ডায়োজিনিস তো হবই—বোধ হয় দুই-ই হয়ে দাঁড়াব—আমার ভবিষ্যৎ এই হয়ে দাঁড়াবে।"

এই রকম গর্ব্ব ভরে, ছেলেমানুষের অধম হয়ে ম্যাটেভিচ বকে যেতে লাগল; দুর্ব্বল চিত্ত মেয়ে মানুষের পেটে যেমন কথা থাকে না। কুমীরের সম্বন্ধে যে সব কথা সে বলল সে সব সন্দেহজনক বলে বোধ হ'ল। কুমীরের ভিতরটা একেবারে ফাঁপা—এও কি কখন হয়? আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে আমাকে হীনবুদ্ধি প্রতিপন্ন করবার জন্যে আর নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে এই সমস্ত আজগুবি কথার পত্তন। সে বরাবরই রোগী; কাজেই তার কথার অনেকই বাদ সাদ দিতে হয়। ছেলেবেলা থেকে আমি চেষ্টা করছি, তার প্রভাব থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করবার। কিন্তু বন্ধুত্ব এমনই জিনিষ যে তা পেরে উঠিনি। যাবার সময় কুমীর ওয়ালার সঙ্গে দেখা হ'তে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম—"যদি তোমার কুমীরটাকে কেউ কিনতে চায়, তবে তুমি কততে ছাড়তে পার?"

ম্যাটেভিচ জবাব শোনবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে বলে মনে হল; তার ইচ্ছে নয় যে জার্ম্মাণটা কম চেয়ে বসে। যাই হোক সে একটু গলা খেঁকারি দিলে।

প্রথমটা জার্ম্মাণটা কোন কথা শুনতেই চায় না—সে ভীষণ রেগে উঠেছিল। ভাজা চিঙড়ী মাছের মতো রাঙা হয়ে সে বলে উঠল—"কি, আমার কুমীর বিক্রী!' কার সাধ্যি হবে কিনতে তা আমি দেখে নেবো। দশ লক্ষ পেলার দিলেও আমি বিক্রী করব না। আজ আমি একশো ত্রিশ পেলার নিয়েছি, কাল নোব হাজার, তার পর রোজ এক লক্ষ করে—বিক্রী করছি না আমি।"

ম্যাটেভিচ আনন্দে চুমকুড়ি দিয়ে উঠলো। রাগ দমন করে আমি কুমীরওয়ালাকে বল্লাম—যে তোমার হিসেবটার অনেক গলতি রয়ে গেছে। রোজ একলক্ষ করে নিলে চারদিনেই পিটার্সবার্গের কুমীর দেখান খতম হয়ে যাবে; কারুরই আর কুমীর দেখার সখ ও সঙ্গতি থাকবে না তারপর মরণ বাঁচন ভগবানের হাতে; তোমার কুমীরটা ফেটে যেতে পারে। ম্যাটেভিচেরও অসুখ হতে পারে, মরে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

তখন জার্ম্মাণটা ভাবতে লাগলো। পরে বল্লে—"আমি রসায়ন কোরবো, যাতে তোমার বন্ধু না মরে।"

রসায়নটা অবশ্য মন্দ জিনিষ নয়; তবে কিনা তোমার খেয়াল রাখা ভাল, যে ব্যাপারটা ক্রমে আদালত পর্য্যন্ত গড়াতে পারে। ম্যাটেভিচের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে তোমার নামে নালিশ করতে পারেন। তুমি তো বড়লোক হতে চাচ্ছ, কিন্তু ইভানোভনাকে কি পেনশন দিতে রাজী আছ?"

খুব জোর করে জার্ম্মাণটা বল্লে—"সে বান্দা আমি নই।" তার গিন্নী সুর আরো চড়িয়ে বল্লে—"আমাদের হতে তা হবে না।"

"তা হলে, ভবিষ্যতের উপর না নির্ভর করে এখনই কি কিছু তোমার নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না? অবশ্য আমি ঔৎসুক্য বশেই একথা জিজ্ঞাসা করছি।"

যেখানে বাঁদরগুলো ছিল সেখানটায়—জার্ম্মাণটা তার গিন্নীকে টেনে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। ইতি মধ্যে ম্যাটেভিচ আমাকে বল্লে—"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

আমার সে সময়ে এত রাগ ধরেছিল যে আমার তীব্র বাসনা হচ্ছিল যে কুমীর ওয়ালা-টাকে বেশ করে উত্তম মধ্যম দি, মাগীটাকে আরো বেশী মাত্রায়, আর সব চাইতে হতচ্ছাড়া ম্যাটেভিচটাকে। কিন্তু লোভী জার্ম্মাণটার উত্তরে সে সব কল্পনা উড়ে গেল।

মাগীর সঙ্গে পরামর্শ করে জার্ম্মাণটা এই জবাব দিলে—"কুমীরটার জন্যে আমি চাই পঞ্চাশ হাজার রুবল, গোরহবি ষ্ট্রীটে এক পাকা বাড়ী, তার সঙ্গে কেমিষ্টের দোকান থাকবে; আর এ ছাড়া রুষ কর্ণেলের পদবী।"

ম্যাটেভিচ মহা উল্লাসে বলে উঠেছে—"কেমন হয়েছে তো, তোমায় না আমি বলেছিলাম। শেষের পদবী ছাড়া সে যা চেয়েছে; কেন না সে তার জিনিষের কদর বোঝে। সকলের ওপর হচ্ছে অর্থনীতির মূলতত্ত্ব!"

রাগে হন্যে হয়ে আমি জার্ম্মাণটাকে বল্লাম—"বটে, এত বড় তোমার আস্পার্দ্ধা, তুমি কিনা কর্ণেল হতে চাও! কিসের লেগে? কি লড়াইটা করেছো শুনি যে নামের গৌরবের দাবী কর? তুমি বদ্ধ পাগল!"

"আমি!—আমি পাগল! না, আমি বুদ্ধিমান, আর তুমি নিরেট বোকা। জীয়ন্ত মানুষ পোরা কুমীর তোমার দেশে কেউ দেখিয়েছে—বল্‌তে পারো? আমার মত বুদ্ধিমান লোকেরই তো কর্ণেল হওয়া উচিত!"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে এ রকম দৌড়েই, ম্যাটেভিচের কাছে বিদায় নিয়ে—আমি বাড়ী এসে হাজির হলাম। এই দুটো নিরেট বোকার কি ভীষণ ঔদ্ধত্য। সবার চাইতে রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। আমি হয়ে গেলাম তার সেক্রেটারী! বন্ধুর কায করতে গিয়ে রোজ সন্ধ্যায় আমার কি নিগ্রহ হবে! আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে নিজকে মারি; আর মারলামও আলো নিবিয়ে দিয়ে, বিছানায় ঢুকে, মাথায় আর সর্ব্বাঙ্গে গোটাকতক ঘুষ চালিয়ে দিলাম। তার ফলে বেশ ঘুম হোলো। তবে রাত্রে বাঁদরের স্বপ্ন দেখ্‌লাম, কিন্তু সকালে ইলানোভনার মুখখানি তন্দ্রালস চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল।

ক্রমশঃ—

শ্রীকালীপদ মিত্র।

মুক্তি।

—:*:—

বাঁধন-হারা হাওয়ার মতন

মুক্ত আজি প্রাণ,

ঝড়ের শেষে কূল পেল মোর

মন্-তরণীখান্।

বিশ্ব আজি নূতন করে

জাগ্‌ছে আমার নয়ন 'পরে,

বুক্ ভরে নাথ্ থর-বিথরে

করলে আলো দান;

ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত হ'ল,

মুক্ত আজি প্রাণ

অম্বরেতে রত্ন তবু

মিথ্যা কিসের আশে—

পাগল হয়ে ঘুর্‌তেছিনু

সুখের অভিলাষে!

এই হাটেতে বিলিয়ে হিয়া—

নীল হ'ল বুক গরল পিয়া,

ছলায় ভুলি সুখ লাগিয়া

পড়্‌নু দুখ-পাশে,

মরুর বুকে ছুট্‌নু মিছে

বারির অভিলাষে!

আজ এসেছে এই জীবনের
সুদিন—সুলগন ;
টুট্‌ল আমার মোহের নেশা,
মায়ার আবরণ।
নাই ব্যথা আর হৃদয় মাঝে,
আনন্দেরি সুর যে বাজে,—
দুখের শেষে জয়ীর সাজে
উঠ্‌ল জেগে মন ;
সাঙ্গ আজি সব ছলনা,
ভুলের সাথে রণ !

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

নেপালে নেওয়ারদিগের ভাই পূজা।

(১)

নেপাল বাংলা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদূরে হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে সুরক্ষিত দেশ ; কিন্তু যখন এদেশের আচার, প্রথা, রীতিনীতি, পূজা পার্ব্বণ, অভিবাদনের রীতি ইত্যাদি দেখি, তখন বাংলার সঙ্গে এর অনেকটা সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। এই ঐক্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন নেপাল ও বাংলার ভাষা তুলনা করা যায়। এ সব তুলনামূলক আলোচনার ফলে নেপালী ও বাঙ্গালী, এই দুই জাতির অতীত ঘনিষ্ট সম্বন্ধের সম্ভাবনা মনে জেগে উঠে। যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলতে পারেন এ সম্ভাবনা কতদূর সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের স্বদেশী সমাজ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এ সব বিষয় নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে

যেন উদাসীন। অবশ্য আমাদের শিক্ষাই আমাদিগকে অনেকটা উদাসীন করে তুলে। আমরা ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আর সমাজ বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানই শিখতে যই না কেন, সবটাতেই পরের দেশের তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব মুখস্থ করে আমাদের নিজের দেশকে বুঝতে যাওয়ার একটা অন্ধ চেষ্টা বর্ত্তমান। কাজেই আমাদের নিজেদের 'কুটীরে' ও 'ভাঙ্গাদেউলে' কি আছে না আছে সে তথ্য সংগ্রহ করবার আগ্রহ মনে জাগবে কি করে? আমরা হয় তো বসে আছি কবে কোন কালে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে কোন্ বিদেশী এসে আমাদের ঘরের রীতিনীতি, পূজা পার্ব্বণের ইতিহাস, আমাদের মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ করবে;—হয়তো সেই-ই তুলনামূলক আলোচনাটাও করে দিয়ে—বলে দিবে আমরা এই ছিলাম বা আমরা এই হয়েছি। আমরা হয়তো তখন চোখ্ রগড়ে আঁখি মেলে চেয়ে তাঁকে তারিফ্ করব। এম্নি আমাদের পরবশতা! যাক্।

(২)

আজ আপনাদের নিকট 'ভাইপূজার' বিবরণ বলব। বাংলাদেশে যে পার্ব্বণকে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বলে, নেপালে তাকেই 'ভাইপূজা' বলে। বাংলার বাইরে নেপাল ছাড়া অন্য দেশে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'র রীতি আছে কিনা জানি না। কিন্তু এই পার্ব্বণের উদ্দেশ্য ও মাধুর্য্যের কথা ভাবলে স্বতই মনে হয় আমাদের এই নব জাগরণ—এই জাতীয় একতা সাধনের দিনে ইহা ভারতের জাতীয় উৎসব বলে গণ্য হওয়া উচিত। ইচ্ছা হয় এম্নি একটা উৎসবের দিনে ভারতের সকল দেশে প্রত্যেক বোন্ জাতী ধর্ম্মের দিকে না তাকিয়ে ভাইদের স্নেহে সিঞ্চিত করে মঙ্গলটীকা পড়িয়ে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ কামনা করুক।

নেপালে সকল জাতই ঠিক একই প্রথানুসারে 'ভাইপূজা' করে না। ব্রাহ্মণ ছত্রি প্রভৃতির নিয়ম একরকম, আর নেওয়ারদের প্রথা ভিন্ন। আমি আজ নেওয়ারদের ভাই-পূজার কথাই বলব।

ভাই পূজা হয় সন্ধ্যার পর রাত্রে। ভাই পূজার দিন প্রথমে ঘরের মেঝেতে প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য এক একটী মণ্ডল আঁকতে হবে। মণ্ডল আঁকবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে জলের

আলপনা দিয়ে তার উপরে তেলের দাগ দিতে হবে। এই তেলের দাগের উপরে আবার শুক্‌না চা'লের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রেখা টানতে হবে। মণ্ডলের বাইরে চার কোণে এবং ভিতরে ঠিক মাঝখানে কিছু কিছু ধান রেখে তার উপরে আস্ত চাল রাখতে হবে। এই চাল তৈরী করতে খুব সাবধান হতে হবে যেন একটুও না ভাঙ্গে। সেই চালের উপরে ফুল* ও ধুনা রাখতে হবে। এই সব রেখে তারপর সকলের উপরে রাখতে হবে 'যজন্‌কা।' আঙ্গুলে তৈরী ছোট দৈপ তার নাম ও দেশের ভাষায় বলে 'যজন্‌কা।'

এর পরে ভাই মণ্ডলের দিকে মুখ করে বসবে। বোন তখন 'সগুন্' বা 'সগোন' এনে একে একে ভাইদের হাতে তুলে দেবে।† মদ, মাংস, ডিম, আদা, রসুন ইত্যাদি মিশিয়ে তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করে 'সগুন্' তৈরি করা হয়। ভাই ভক্তি ভরে তাহা হাতে নিয়ে আপন মাথায় স্পর্শ করাবে, এবং সেই সঙ্গেই (বোন্ বড় হলে) প্রণাম করবে। বোন্ যদি ছোট হয়, তবে বোন্ ভাইকে প্রণাম করবে। তার পর ভাই সেই 'সগুন্' খাবে। খাওয়ার নিয়ম এক একটি জিনিষ নিয়ে—তার সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাবে। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম।‡ যাঁরা দীক্ষিত—তাঁদের প্রত্যেকটী জিনিষ খাবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। কোন্ জিনিষটী আগে খেতে হবে, আর কোনটী পরে খেতে হবে তারও নিয়ম আছে। প্রথমে ডিম ইত্যাদি এবং শেষে আদা ইত্যাদি খাওয়ার নিয়ম। 'সগুন্' দেওয়া হলেই বোন্ ভাইকে 'টীকা বা সিন্' (অর্থাৎ ফোঁটা) দেয়। শ্বেত চন্দন, 'অক্ষতা' (চাল) দই এই তিন জিনিষ দিয়ে ফোঁটা দিতে হয়। আগে চন্দন দিয়ে, তার পর দই ও 'অক্ষতা' দিয়ে কপালে ফোঁটা দিতে হবে। 'সগুন্' খাবার সময় বোন্ খই এবং নানান্ ফলের টুকরা ভাইয়ের মাথায় এমন ভাবে ঢেলে দিবে যেন সেগুলি গড়িয়ে মাটিতে

---

* যে কোন ফুল রাখলে চলবে না। পাহাড়ে যাকে 'শুপরি' ফুল বলে তাই প্রশস্ত। তা না জুটলে 'ছাইপত্রি' বা গেন্ধা ফুল দরকার।

† নেওয়ার ভিন্ন অন্য জাতের ভিতরে 'সগুন্' খাওয়ার নিয়ম নাই।

‡ আজকাল গৃহস্থঘরে কেবল নিয়ম রক্ষা করিবার জন্যে অতি সামান্য পরিমাণে 'সগুন' ব্যবহৃত হয়।

পড়ে যায়। এর পরে মাটিতে যা পড়ল তা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তার পর একটী শালপাতার 'দোনা' অথবা 'টপরা' অথবা ঠাহুরের (ঠোঙ্গাকৃতি) মধ্যে নানান্ রকম ফল (তার মধ্যে আক্রোট্ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিমিরা লেবু থাকা দরকার) একটী গুপারি, পয়সা 'বঙনুকা' (এট ব্যবহারের উপযুক্ত) এবং ফুলের মালা রেখে সেই ঠোঙ্গাটী ভাইকে দিতে হবে। ভাই তাহা গ্রহণ করে রেখে দিবে।

এর পরে কয়েকটী পল্‌তে একত্র করে তার দুই মুখে আগুন ধরিয়ে বোন্ তাহা দু'হাতে ধরে ভাইয়ের নিকট আনবে। ভাই সেই আগুন স্পর্শ করে হাত মাথায় ছোঁয়াবে। বোন্ তারপর সেই পলতেগুলি মণ্ডলের উপর আড়াআড়ি করে এমন ভাবে রাখবে যেন চার জায়গায় ধানের উপর জ্বলতে থাকে। তখন মণ্ডলের উপর ধূপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। এর পরে ঝাড় দিয়ে সব পরিষ্কার করে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু সল্‌তে রাখবার পরে এবং পরিষ্কার করবার মধ্যে বাতি নিভতে পারবে না।

সব পরিষ্কার হলে ভাই নিমন্ত্রণ খাবে। এই খাওয়াটা দিবে বোন্। কিন্তু এ নিমন্ত্রণে ভাত খাওয়া চল্‌বে না। যে সব জিনিষ খাওয়া হয় তার মধ্যে চিঁড়াই প্রধান।

খাওয়ার শেষে ভাই বোন্‌কে টাকা ও শাড়ী ইত্যাদি উপহার দেয়।

ভাই পূজার দিন বোন্ সারাদিন উপবাস করে সব শেষ হলে তারপর খায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

মিলন।

—:০:—

বৃন্তে ফুটিয়া থাক্ তুই ওরে
আকুল গন্ধ বক্ষে ভরি',
ব্যাকুল বেদনা বক্ষে বহিয়া
আমি পড়ে থাকি ধরার 'পরি

ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িবি যখন
মিশিবি যখন মাটীর সনে,
তখন বিশ্ব-বক্ষ মাঝারে
হইবে মিলন শুভক্ষণে।

শ্রীরেণুকা দাসী।

উদাসী।

(১)

সে ছিল উদাসী। জগতে আপনার বলতে তার কেউ ছিল না, তাই সে বড় একা। কিন্তু ভেতরটা ছিল তার পরিপূর্ণ। জগতের এই নিঃসঙ্গতা তাকে কোনও দিন ব্যথা দিতে পারে নি। তার প্রাণভরা ছিল প্রেম আর বুক ভরা ছিল সরলতা। আকাশের মত নীল তার বড় বড় চোখ দুটী সারাদিন উদাস ভাবে তাকিয়ে থাক্‌ত সেই আকাশেরই পানে। হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে সে তার আরাধ্যকে বেঁধে রাখ্‌তে চেষ্টা করেনি,—অনন্ত প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে তা'র বাঞ্ছিতকে খুঁজে বেড়া'ত।—কিন্তু কৈ? এত প্রেম, এত ভক্তি যাঁর উদ্দেশে অর্পিত হ'ত,—সে তো তা' দেখত না। এই নীরব পূজার অর্ঘ সে গ্রহণ কর্‌ছে কি না জান্‌বার জন্যে যখন প্রাণটা বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ত,—সে তখন মন খুলে গানের সুরে দেবতার কাছে হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করত। সে গানের না ছিল কিছু ছন্দ, না ছিল কোনও তাল-মান্। তবু যখন দেবতা তাঁর অমৃতময় পরশ দিয়ে সাধকের ক্লান্তি-টুকু মুছে নিত না, উদাসী তখন বিজন বনের নির্জ্জন কুটীরের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে' কাঁদত। ওরে অভাগা, কান্না কি তোর ঘুচ্‌বে না—দেব্‌তা কি আর আস্‌বে না? শ্রান্ত হ'য়ে শেষে তার অশান্ত হৃদয় অভিমানে ভরে' উঠ্‌ত। 'না, আর না—ওগো আর যে পারিনে, বুক যে

ভেঙে যায়। এস গো—একবার এস। এসে তোমার চিরবাঞ্ছিত ভক্তের প্রাণের জ্বালা যদি জুড়িয়ে না দাও, তবে আর কেন?—কেন তোমার দ্বারে হা হা ক'রে মরি? ওগো সুন্দর, ওগো অসীম! এই অনন্তের মধ্যে যে তোমায় আমি হারিয়ে ফেলেছি। একবার শান্ত হ'য়ে কাছে এস' দেখা দেও।' হায় রে! দেবতা কি ত' শোনে? সে ত আসে না। হতভাগের প্রাণের আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছে কি না তাই বা কে জানে?

(২)

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন নিবিড় হ'য়ে' আসচে, বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে অস্তগামী অরুণ দেবের স্বর্ণরশ্মি তটিনীর নীল জলে ছড়িয়ে পড়েছে,—পাখীগুলি সব কুলায়ে ফিরে মনের সুখে গান ধরেছে;—একটা অসীম শান্তির ছায়া ধরণীর বুকে যখন গাঢ় হ'য়ে নেবে এসেছে,—চির উদাসী তরুণ ভক্ত তখন স্তব্ধ হ'য়ে বসে রয়েছে। সন্ধ্যার মৃদু সমীরণ তা'র কুঞ্চিত কালো চুলের গোছা উড়িয়ে দিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে—অবিন্যস্ত গৈরিক আঁচলখানি শ্যাম দূর্ব্বাদলের ওপর এলিয়ে পড়েছে, সন্ন্যাসীর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দূর—দূরান্তরে তার উদাস দৃষ্টি ভেসে বেড়া'চ্ছে। কি যে চাই, কিসের একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সারা বুকটা যেন ভরে' উঠেছে। 'এত সাধনা, এত প্রতীক্ষা সবই কি ব্যর্থ হবে? ওগো আনন্দময়! চির আনন্দের পরিবর্ত্তে এ হৃদয় কি পূর্ণ হ'বে একটা মর্ম্মন্তুদ তীব্র হাহাকারে? ওগো চিরবাঞ্ছিত! আর কতদিন এ বেদনা সহাবে? এই শান্তিময়ী সন্ধ্যায় সকলেরই'ত প্রতীক্ষা সফল হয়,—প্রিয়জনকে বুকের কাছে পায়। তবে—তবে কেন তরুণ প্রাণের বুকভরা আবেগ ব্যর্থ হ'ল, প্রতীক্ষা তার নিষ্ফল হ'ল। এস, ওগো অন্তর-ভরা! এস এস—এস গো আমার ধ্যানের দেবতা! প্রত্যক্ষ হ'য়ে ভক্তের চোখে দেখা দিতে এস।' ইষ্ট দেবতার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করতে গিয়েও সাধক যখন তাঁরই ভাবে মগ্ন হ'য়ে পড়েছে—তখন রূপের অপরূপ হিল্লোল তুলে এক তরুণী রূপসী এসে তার সাম্নে দাঁড়া'ল। অনিমেষ চোখে সুন্দরী কিছুক্ষণ তার পানে তাকিয়ে থেকে বীণার মোহন সুরের ঝঙ্কারে প্রশ্ন করলে—"ওগো কে তুমি? রোজই আমি তোমার কথা লোকের মুখে শুনি, আর দিনে রেতে কি জানি কিসের টানে তোমায় খুঁজে বেড়াই। অনেক খোঁজার পর আজ তোমায় পেয়েছি। তুমি এস আমার সঙ্গে।"

বিস্মিত দৃষ্টিখানি তার মুখের ওপর তুলে ধরে' উদাসী বল্লে "পেয়েছ? ওগো কে তুমি? কোথায় পেলে? শুধু খুঁজলেই যদি সে খোঁজার ধনকে পাওয়া যায়, তবে কেন—কেন আমার এত কষ্ট?" ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে সে সুন্দরীর কোমল হাত দুটী চেপে ধর্‌লে। উদাসীর বিবশ চিত্ত শুধু সেই কথা কটীই বুঝেছিল। তা'র বিভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি দেখে রাজকুমারী মুঞ্জরা তা'র প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝেছিল, তাই সে সন্ন্যাসীর অশিষ্টতায় রাগ না করে মুগ্ধই হ'য়ে গেল। তারপর মৃদুহেসে মুঞ্জরা বল্লে—"হাঁ গো মন দিয়ে খুঁজলেই খোঁজায় ধনটী ধরা পড়ে। তোমায় আমি দেখিনি কখনও, শুধু শুনেছিলুম তুমি সুন্দর, তুমি উদাসী খুঁজে যখন পেলাম না তখন ঐ টুকুই মূল মন্ত্র করে' মনের কোণে তোমার মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলুম, তারপর সে প্রাণভরা প্রেমের অঞ্জলি দিয়ে তোমার পূজো দিয়েছি—তারই ফলে আজ সেই খোঁজার ধন তোমায় এখন কাছে পেয়েছি। কিন্তু কি চাও তুমি? আমি তোমায় সব দেব। ওগো উদাসি, এস আমার সংগে।"

"আঁা, তাই ত, শুধু বাইরে খুঁজলে তাঁকে মিলে না? ভিতরে তাঁর প্রতিষ্ঠা করতে হয়; তবে তিনি সামনে আসেন। ওগো কে তুমি? এত দিন কোথায় ছিলে,—কেন আমায় এ কথা আগে বল নি? বন্ধু আমার! কেন আমায় আরও আগে জাগিয়ে দাও নি? মন যে আজ ভেঙে গেছে, দেহ যে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে। তবে কি দিয়ে তাঁর আসন গড়ব আর নূতন করে সাধন আরম্ভ করব? এতদিনকার এত আহ্বান যে নিষ্ফল হয়ে গেছে তা ত আগে জান্‌তে পারি নি!" সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলের ওপর মুঞ্জরার পায়ের কাছে সন্ন্যাসী লুটিয়ে পড়ল। শিশির বিন্দুর মত অজস্র অশ্রুকণা ঘাসের পাতার মধ্যে পড়ে সূর্য্যের শেষ আলো টুকু পেয়ে ঝিক্ মিক্ করে উঠল। তার লুণ্ঠিত মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে রেশমী শাড়ীর রাঙা আঁচলে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে রাজকুমারী বল্লে—"আমার কথা শুনগো আমি তোমার দাসী হয়ে রইব। তুমি আমার মন্দিরে চল। ওগো ধ্যানের দেবতা, প্রাণের আলোক! আমি তোমার সব বেদনা জুড়িয়ে দেব।" চকিতে উদাসী উঠে বস্‌লো; বিস্মিত হয়ে বল্লে "কোথায় যাব তোমার সাথে? তুমি কি দেবে আমায়?"

"কি দিব? রাজকুমারী মুঞ্জরা আমি, পিতার ঐশ্বর্য্য তোমার পায়ে ঢেলে দেব, আর আমার—অনন্ত—"

অনজ্ঞার ক্ষীণ হাসি হেসে উদাসী বললে—"রাজপুত্রি, ক্ষমা কর! যা তুমি আমার দিয়েছ তার বেশী আর কিছু দিতে পারবে না। তোমার প্রণাম করি দেবি,—আমায় বিদায় দেও!"

"না গো, সে হবে না, তোমায় আমি নিয়েই যাব। এস।" মুঞ্জরা তার হাত ধরলে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সন্ন্যাসী বললে—"দেবি, যা তোমার কাছ থেকে পেলাম! নিভৃতে বসে তাই আজ ভাল করে বুঝতে চাই;—দেখি পারি কি না!" আবার তার চোখ ছাপিয়ে বন্যা ছুটল, হৃদয় উথলে উঠলো। মুঞ্জরার হাত ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি সে ছুটে চল্লে। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে রাজকুমারী কিছুক্ষণ তার পানে তাকিয়ে রইল। এই উপেক্ষায় তার ভেতরকার গর্ব্বটুকু বুকের মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠল;—কি এত অপমান? আচ্ছা দেখা যাক, রাজকুমারী মুঞ্জরা আমি।' ধীরে ধীরে সে ফিরে গেল। সন্ধ্যা গিয়ে তখন রাত্রি এসে তার কাল আঁচলখানি ধরার বুকে বিছিয়ে দিল।

(৩)

প্রভাতের তরুণ সূর্য্য পূবের আকাশখানি রাঙিয়ে দিয়ে উদয় হলেন আর উষা দেবী তার নানা রঙের ফুলের অর্ঘ্য হাতে নিয়ে লজ্জারক্ত মুখের ঘোমটা ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে তাঁর অভিনন্দন জানালেন। সাড়া পেয়ে পাখীগুলি তাদের নিজ নিজ সুরে গান ধরে দিলে। নিভৃত কুটীরের অঙ্গনে বসে সাধক তার প্রাণের ভাবায় হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে বন্দনা তুললে। উচ্ছ্বসিত অন্তরের আবেগ তার গীতের প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে সুরের মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হতে লাগল। কোন দুঃখ নেই—বেদনা নেই—সফলতার আনন্দে আজ তার তরুণ চিত্তখানি কানায় কানায় ভরা। বড় বড় অশ্রুকণায় সুন্দর আয়ত চোখ দুটি ভরে উঠেছে, কিন্তু এ অশ্রু দুঃখের নয়। প্রাণের মধ্যে প্রেমময়ের অনুভূতি পেয়ে আনন্দাশ্রু আজ উদাসীর চোখ ছাপিয়ে উঠেছে। বন্দনা শেষ করে স্তব্ধ হয়ে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ আকাশের পানে চেয়ে বসে আছেন,—পিছন থেকে বিনয় নম্র কণ্ঠে ডাক এল—"সন্ন্যাসি! রাজার অনুচর আমি রাজ আজ্ঞায় তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। ভাগ্যবান্! দেবতা তোমার প্রসন্ন হয়েছেন আর কান্না কেন ভাই?" মৃদু হেসে সন্ন্যাসী পূর্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে,—"সত্য বলছো, কে ভাই তুমি?" আবেগের আতিশয্যে সন্ন্যাসী তাকে আলিঙ্গন করলে। আগন্তুক বললে—"চল হে চল, আর দেরী নেই।"

"চল।" কোন বাধা নেই, আপত্তি নেই—পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে সে চল্‌লে। আজ তা'র কিছু বুঝে দেখ্‌বার নেই—ভাবনার বিষয় কিছু নেই, সে যে আজ সিদ্ধ। থেকে থেকে একটা শিহরণ এসে তার সারা শরীরকে অবশ করে ফেল্‌ছিল। কখন যে তারা রাজসভায় এসে পৌঁছেচে, সন্ন্যাসী তা' জান্‌তেও পারেনি।

"সাধক! কি চাও তুমি?" চম্‌কে উঠে সন্ন্যাসী রাজার পানে তাকালে, মৃদুস্বরে উত্তর দিলে "কৈ, কিছু না মহারাজ!"

"কিছু না? দুনিয়ার কিছুই তোমার চাইবার নেই কি?"

"না মহারাজ! যা' চেয়েছিলুম তা'ত পেয়েছি।"

"বটে! আর কিছুই তোমার চাইনে? রাজার ঐশ্বর্য্য, অনিন্দ্যসুন্দরী গুণবতী পত্নী কিছুই তোমার আকাঙ্ক্ষিত নয়?

উদাসীর চোখে মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ভেসে গেল। রাজার ঐশ্বর্য্য, রাজার কন্যা—সে যে বড় তুচ্ছ। আজ যে সে রাজার রাজা। সে উত্তর করলে "না না, আমার কিছু চাইনে রাজা?—কিন্তু কি তুমি দেবে আমায়? আমায় দেবার মত ভাণ্ডারে তোমার কি আছে?"

বিস্মিত রাজা ক্রোধে আরক্ত হ'য়ে কি একটা আদেশ যেন তাঁর অনুচরদের মধ্যে জানিয়ে দিলেন, সন্ন্যাসী তা' বুঝ্‌লে না, বুঝ্‌তে চেষ্টাও করলে না। একটা অজ্ঞাত পুলকে আবার তার সারা দেহমন কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ল, বিহ্বল-আবেশে চোখ বন্ধ হ'য়ে এল। পড়ে' যেতে সেই সঙ্গী রাজদুহিতা তা'কে বুকে জড়িয়ে ধরলে,—তা'র চোখ দুটীতেও অশ্রু ঝলমল করে উঠেছিল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সভা স্তব্ধ হ'য়ে রইল। তারপর কি জানি কেন রাজা সেদিনকার মত কাজ বন্ধ করে উঠে পড়লেন।

(৪)

বিবাহের শত আয়োজনের মধ্যেও যখন রাজকুমারীর মনের অশান্তি কাট্‌ল না, সে তখন নিভৃতে একাকী বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল 'কেন এমন হয়।' মন তা'র ঘুরে বেড়া'তে লাগল

সেই উদাসীর চারপাশে। 'উঃ একি হ'ল! সেই বনের পাখী, ভাবুক সাধক আজ তা'র বন্দী। বর হ'য়ে সে ত পরিণয়ের আনন্দে স্বেচ্ছায় ছুটে আসেনি; সে যে বন্দী হ'য়ে বিবাহের আসরে এসেছে,—রাজকুমারীর অপমানের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড নিতে। তাই ত, একি হ'ল? ওরে একি কর্‌লি তুই? নিজের সুখের আশায় কোন মদিরার মোহে মাতোয়ারা হ'য়ে স্বর্গের দেবতা চিরমুক্ত পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তিকে বন্দী করে নিয়ে এলি, ওরে পাপীয়সী, তোর প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠে বলিদান দিতে। তোর লালসার আগুনে আহুতি দিতে চাস পুণ্য প্রেমের অবতারকে। ওঃ আর না।' মুঞ্জরা উঠে দাঁড়া'ল। শঙ্কিত ব্যাকুল বক্ষে একাকিনী ছুটে চল্‌লে সেই উদাসীর খোঁজে। অসংযত স্বর্ণাঞ্চল মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে, উদ্যানের পথে কাঁকড় লেগে অলক্ত রঞ্জিত পা'দুখানি রক্তের রঙে ভাল করেই রাঙিয়ে দিলে। তবু সে চলেছে, জ্ঞান নেই।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে যখন অভীষ্ট স্থানে এসে পৌঁছল, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। মুঞ্জরার মনে হল আর এক সন্ধ্যার কথা। সে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে উদ্যানের এক কোণে একটা শিউলি ফুলের গাছে মাথা হেলিয়ে উদাসী বসে' রয়েছে। চোখ দুটী মুদিত, দেহ ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে, কিন্তু অধর কোণে উষার আলোকের মত অম্লান হাসিটুকু এখনো তেমনি ফুটে রয়েছে। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তা'র পা'দুখানি চেপে ধরে মুঞ্জরা বলে উঠ্‌ল "ওগো উদাসি! ওঠ, আমি তোমায় মুক্তি দিতে এসেছি। আমায় তুমি ক্ষমা কর।" আর কিছু বলবার আগে কান্না তা'র কণ্ঠ ঠেলে উথ্‌লে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী তা'র পানে চাইলে; আবার যেন তা'র সমস্ত দেহ শিউরে উঠ্‌ল। মৃদু হেসে সজল চোখে বড় বড় আস্তে আস্তে বল্‌লে "মুক্তি আমি পেয়েছি রাজকুমারি! এতক্ষণ শুধু তোমারি প্রতীক্ষা করচি, না বলে যাবনা তুমি যে গুরু। দেবি! তোমার মন্ত্রেই যে আমি দীক্ষিত হয়েছিলাম। কিন্তু ভাব্‌চি কেন তুমি আজ বন্দী করতে চেয়েছিলে?"

"ক্ষমা কর গো ক্ষমা কর। স্বর্গের ঠাকুর! অভাগিনী পাপীয়সীকে ক্ষমা কর।" উন্মাদিনীর মত রাজকুমারী তা'র পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়্‌লে। ধীরে ধীরে একটু সরে' এসে মুঞ্জরার মাথায় সে হাত রাখ্‌লে; তারপর আবার তার দেহ মাটীর প'রে এলিয়ে পড়্‌তে

চম্‌কে উঠে মুঞ্জরা দেখ্‌লে—সে দেহ নিস্পন্দ, অসাড়। স্তব্ধ হ'য়ে সে তার মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লে একটা স্নিগ্ধ হাসির জ্যোতিঃ তা'র ক্ষমা-সুন্দর মুখখানিতে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। ঠিক্‌ এই সময়ে রাজপুরীতে পরিণয়-সূচক মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠ্‌ল।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

নারী।

—:*:—

তুমি করুণার মত এসেছিলে প্রাণে
শান্তি অমিয়া ঢালি,
লয়ে মানব দুয়ারে প্রীতির পাবনী
শুভ্র হৃদয় ডালি।
হেরিনু তোমারে পুণ্য-লগনে
অরুণ আলোকে ভুবনে-ভবনে,
সরম-জড়িত নলিনী-নয়নে,
সুনীল-সরসী জলে,
শারদ-প্রভাতে হেরিনু তোমারে
নিভৃত হৃদয়-তলে।

মম হৃদয়-তন্ত্রে ঝঙ্কারে তব সুর,
তব স্নিগ্ধ-আলোকে অন্তর ভরপূর।

নহ তুমি শুধু বাদল-নিশার
অলস কবির বাণী,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে
প্রেমের মানসী-রাণী।
হেরিনু তোমারে করমের পথে,
গরম শোণিত রঞ্জিত রথে,
মন্দার মালা মণ্ডিত মাথে—
সংগ্রাম জয়ী বীর;
চির-প্রশান্ত জলধির মত
নিশ্চল সুগভীর।

মৃত্যু তোমার প্রণত চরণ তলে,
বিশ্বের স্রোত তোমারি আদেশে চলে।

শ্রীনেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্ব-ধর্ম্ম।

সব হতে বড় কথা নিজকে খুঁজে পাওয়া। সহস্র সহস্রের মধ্যে আমি এক জন; আমাতে আবার সহস্র অবস্থিত হয়ে, তাদের চিন্তা, গতি, জীবনের ধারা আমাতে সংক্রামিত করে' জীবনে যে সমস্যা এনে দিয়েছে, তার সমাধান, সাফল্যের মন্ত্র আপন অন্তরে, আপনার ভাবে। আপনাকে খুঁজে নিয়ে আত্মধর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করাই বড় সাধনা। আমাতে সত্য যা তাই সার্থক। পরের বড় কথা, বড় ভাব মহৎ হতে পারে, মোহনীয়ও কম নয়; উপলব্ধি

অনুভূতির ক্ষমতা যদি না থাকে আমাতে আপন শক্তি বিচারে না এনে ক্ষুদ্র পাত্রে যদি অজস্র বন্যার ধারা ধরিতে প্রয়াস পাই, নিমজ্জনই তার পরিণাম! সন্তরণপটু না হয়ে প্রবাহে ঝাঁপ দিলে জীবননাশ অনিবার্য্য। গতির পূর্ব্বে মতির স্থৈর্য্য, আত্ম-চিন্তা নিয়োগে অ আপন ক্ষমতা সামর্থ্যের বিচার, আত্মবোধ জীবনের আদিতে। আপনার সত্তা-স্বভাব জাগ্রত নয় যে জীবনে সে জাতীয়, সঙ্ঘের, সমাজের, সংস্কার-ধর্ম্মের সত্য উপলব্ধি করবে কিরূপে! অন্যকে বুঝবার মূলেই আত্মবুদ্ধির অনুভূতির তুলনা। তুলনায় সমালোচনা করতে হলেই মানদণ্ডের পূর্ণজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। মনের বাজারে ধার করা তৌল অচল কেননা ওর একটার সঙ্গে অন্যটির আকারগত মিল নেই; জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্ভার মজুত রয়েছে মনবাজারে অথচ তারা বিচিত্র, যেন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার; মনের ভাবে আকার তাদের মনে মনে ভিন্ন। প্রকৃতিগত সত্য তাদের এক; মূলকে বিসদৃশ আকার হতে বেছে নিতে হলে চাই জহুরীর নিজের কষ্টি-নিকষ; নৈলেত হয়ে যাবে সব পণ্ড! মহাজনগত পন্থা অবলম্বনীয় হলেও, মহাজনকে চিনতে হলে নিজের যাচাই করার শক্তিকে পরিপুষ্ট করতে হবে সর্ব্ব প্রথমে! বাঁশ বনে ডোম কানা হয়েই না এত গোল! এত বিরোধের সৃষ্টি! মহাজন যে-সত্যকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে' সিদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করে' সমাজের জন-সাধারণ চমৎকৃত হয়ে, তাঁরই সাধনার ফল জীবনে পেয়ে ধন্য হতে মহাজনের অবলম্বিত ধারা অনুকরণ করতে ব্যগ্র হয়েছিল—তাই না অবশেষে দাঁড়িয়েছে সমাজের সংস্কাররূপে! সে আচরণের সত্য যা তা অনুভব করবার শক্তির অভাবে—হয়ে গিয়েছে আচার-আচরণের ধারা—সংস্কার! সংস্কারবশে জনসাধারণ চলেফেরে, চিন্তা করে' দেখতে চায় না—সার্থকতা তার কোথায়! পরের ভাবে নিজকে বিলিয়ে দিতে গিয়ে সে ভাবে না নিজকে! সাধারণে যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে গতানুগতিক আচারনিয়মকে বড় করে স্থাপে সেই শাস্ত্রই মূল ধর্ম্মকে রক্ষা করতে যে উপদেশ দিয়েছেন—সে উক্তির মর্য্যাদা তারা ভুলে গিয়েছে! শাস্ত্র বল্লেন 'সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে কহে? যে ধর্ম্ম সত্যকে প্রকট করে'। আকারগত অনুষ্ঠানে সত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না; একই আচার একই অনুষ্ঠান অবস্থাভেদে সত্যাসত্য বলে বিবেচিত হয়। 'যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেস্থানে আচরিত-সত্যকথা না কহিয়াও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এই রূপে সত্যমিথ্যা বিচারে সমর্থ তিনি

তিনি জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অসচ্চরিত্র হিংস্রস্বভাব ব্যক্তিও অন্ধনামা বালক ব্যাধের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। মূঢ়ব্যক্তিও ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলূকা ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশ নিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল, কারণ তাহার উদ্দেশ্য ছিল সৎ। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মাচারণ। * * শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। সত্যের সন্ধানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই।' (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব) শাস্ত্রই তা হলে জোড় গলায় প্রচার করেছেন—মালা তিলকে রক্ত-চন্দনে, বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে ধর্ম্ম নেই,—শাস্ত্রই বলেছেন—'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, জাতিই পূজ্য নহেন, গুণই কল্যাণকর।' সত্যধর্ম্মই ধর্ম্ম। তার অনুষ্ঠানেই জীবনে সাফল্যের পথ। মানুষকে মনুষ্যত্ব রক্ষা করে' জীবনে সফল হতেই হবে—সেই দিক দিয়েই তার সাধনা,—তার ইচ্ছা-শক্তির যথার্থ প্রেরণা। আত্মাকে পরিত্যাগ করে' অন্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হলে নিজকে পাওয়া হবে না, আগে নিজকে রক্ষা করে, পরে অন্যের সাহচর্য্যে একান্ত সাধনা! গোলে হরিবোল দিলে চল্‌বে না,—হরির মাহাত্ম্য নিজে অনুভব করা চাই মনে প্রাণে! এরূপেই না একের শক্তিতে গঠিত হয়ে উঠবে বহুতে একত্ব,—মানুষের প্রাণধর্ম্মের লক্ষ্য মূলত যে এক! সাধনার সত্যরূপ জীবনে জীবনে উদ্বুদ্ধ হলে—সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বিরাট সত্য—মহামানবের নিত্য ধর্ম্ম। জীবে জীবে জীবন সার্থক হ'ক, জীবনের ধর্ম্ম পরিস্ফুট, পরিপুষ্ট হয়ে অশেষ কল্যান প্রকট হ'ক, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে দেশাত্মার মঙ্গল সুলভ হবে এই আত্মবোধে! স্বধর্ম্মে সার্থক হতে হ'ক আমাদের সাধনা। একেই না লক্ষ্য করে গীতা বলেছেন—স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। সেই সাধনাই আজ বাঙ্গলার ঐকান্তিক লক্ষ্য হ'ক, সর্ব্বদিক রক্ষা হবে। ভারতের ভাব, ভারতের গৌরব—নিজস্ব তার—দেবভূমির ঐশ্বর্য্য—অতুলনীয়; ভারতবাসী তাতে অনুপ্রাণিত হলে এ মহাদশার অবসান হতে বিলম্ব কি।

বন্ধ্যা।

—:o:—

(১)

বারিহীন মেঘ তুমি বরষার হতাশা,
তরুহীন মরুভূমি বুকভরা পিপাসা।
বিকশিত পঙ্কজ নাহি কোন সুরভি,
'সাধনা'র অন্তরে সকরুণ 'পূরবী'।

(২)

মধুহীন ফুল তুমি নিষ্ফল মন্ত্র,
সৃষ্টির বিফলতা, গতিহীন যন্ত্র।
বিশ্বের মাঝে তুমি অতি বড় নিঃস্ব,
সহেনাক আঁখি মোর ও নিঠুর-দৃশ্য।

(৩)

মিটে কিসে ক্ষুধা তব বলনা গো বলনা,
পেয়েছ কি শুধু তুমি নিখিলের ছলনা ?
ক্ষুধিত ও-বুক তব, বাহুপাশ ক্ষুব্ধ,
হিয়া জ্বলে পিপাসায় বাক্ সব রুদ্ধ।

(৬)

পিপাসার আছে বারি আছে তব শান্তি,
মরীচিকা লোভে বৃথা কেন এত শ্রান্তি ?
জগতের যত মাতা তোমারই বংশ—
জগতের সব ছেলে তোমারই অংশ !

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

চাউনি।

—:•:—

সারা জীবনটা ভরেই যে শুধু একটানা ব্যর্থতার গান গেয়ে কাটিয়ে দিতে হবে এমনও কোন কথা নেই। নাইবা হ'ল এ জীবনে আমার সাধনার সার্থকতা!

আঁধার রাতে চাঁদ তারার মত ব্যথা-জড়ান অন্ধকার গোপন অন্তরটার যে দু একটা সুখের দিন, অমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলেও ত দু একটা রাত বেশ সুখেই কেটে যেতে পারে, অবশ্য সে নেশা ছুটে টুটে গেলে যে পাঁজরটা দুঃখে ভেঙ্গে ছিঁড়ে পড়তে চায়, তাও খুবই মানি।

সেই দিনটার পর আরও কতদিন কত মিলনের হাসি, বিরহের ব্যথা বুকে করে বাঁধ-ভাঙ্গা জল-স্রোতের মত ছুটে চলে গেছে, শুধু রেখে গেছে আমার এ দগ্ধ-পোড়া মনের দুয়ারে তাদেরই পায়ের স্পষ্ট-অস্পষ্ট রেখাগুলো। তারই একটা দিনের কথা আজকে আবার মনে প'ড়ে গেল।

সেদিনকার প্রভাতটা কি সুন্দর হয়েই যে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সরম-ভরা নব বধূর রক্তরাঙা গাল দুটীর মতই উষা তরুণীর সলজ্জ মুখখানিতে কে যেন গভীর ক'রে রঙের তুলি বুলিয়ে আলপনা টেনে দিয়েছিল।

তখন আমার বয়েস হ'য়েছে; বাইরে বের হওয়া নিষেধ। কিন্তু কিছুতেই সেদিন ঐ পাকা পোলটার কাছে একবার যাবার লোভ থেকে নিজেকে আটকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। কোন্ প্রেমিক-ভক্তের হাতের পূর্ণ ... লিতে একটা শেফালি গাছের তল ফুলে ফুলে ভর্তি হয়েছিল। নিয়ে এলাম কতকগুলো কুড়িয়ে।

পড়বার ঘরটাতে জানলার কাছে বসে মালা ছড়াটী গাঁথছি--পাশের বাড়ীর নরেনদা এসে বাইরে দাঁড়াল। "কি নরেনদা?" বলে একটীবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, আবার সুতোয় ফুল পরাতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে কোন কথা না বলে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে; তারপর যাবার আগে ছোট্ট একটুখানি ডাক দিয়ে বললে, "রুণা!"—আমি মুখ তুলে তাঁর পানে চাইলাম।

সেই যে চারটী চোখের একটুখানি দৃষ্টির ভেতর দিয়ে কি একটা অস্পষ্ট কথা হোল সেদিন—যার অর্থ আমি আজও খুঁজে পাই নি!

আর আমার নামের ছাঁটকাটবাদে, ঐ যে ছোট্ট দুটো অক্ষর, ত শুনতে লাগতো আমার ভাল অবিশ্যি, সবাই শুনোবার যে সাহস রাখতো তাও নয়। যে একটুখানি অধিকার পেয়েছিল, সে কেবল ঐ নরেনদা। আর একটী লোক সবার চাইতে বেশী দাবী করতো, সে ছিল, বিমল। তার অধিকার সে পুরোপুরি আমাদের হাত থেকেই পেয়েছিল। আর কতকটা নিজের জোরেও এগিয়ে গিয়েছিল।

এমনি চারদিক্ থেকে শক্তি পেয়ে পেয়ে সে নরেনদার শক্তিটুকুকে একেবারে ম্লান, শিথিল ক'রে দিয়েছিল। আর ঐ বিমলের ভয়েই যে সে নিশিদিন একটা অসহ্য অনন্ত পাওয়ার আকাঙ্খাকে, বুকের ভেতর অতিকষ্টে, অতি গোপনে লুকিয়ে রাখতো, তা তার চোখের দিকে তাকালেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যেত কিন্তু তখন যেন কেন তার একটা উচিৎ দাম দেওয়া দরকার মনে করি নি।

খুব চেষ্টা করে, অতিবড় অপরাধীর মত নরেনদা বললে, "মালাটা কা—", কথাটা শেষ করবার পর্য্যন্ত অবসর না দিয়েই আমি বলে উঠলাম, "কাউকে না।"

বাইরে বাইরে এতবড় একটা ফাঁকি চললেও যে ভেতরে ভেতরে তা মোটেই চললো না, সে বুঝেছিলাম তখনই, যখন প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গেই বিমলের নামটা মনে উঠেছিল নরেনদা কিন্তু

বড় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস গোপন করে চলে গেল। কিন্তু সে নিশ্বাসটা যেন আমার চোখের সামনে—একটা বিরাট ব্যর্থতার ঘুর বুকে করে, ঘূর্ণীবায়ুর মত কতক্ষণ ধরে ঘরময় ছুটোছুটি ক'রে ফিরলো।

(৩)

মালাগাঁথা শেষ হ'লো। হঠাৎ কোথা থেকে বিমল এসে ঘরে ঢুকেই আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। একেবারে হাতখানা ধরে বললে, "দাও আমায় পরিয়ে।"

প্রশ্রয় দেওয়া হ'য়েচে ব'লেই অতটা বাড়াবাড়ির অধিকার তার তখনও পাওনা হয় নি সে নিজের জোরেই অতটা এগিয়ে গিয়েছিল মাত্র।

আমি বিরক্ত হ'য়ে বললাম, "না না হাত ছাড়।" -বিমল প্রশ্নটা ভাল করে বুঝতে পারলে না; হাতটা তার মুঠোর ভেতর রেখেই বললে, "না, তুমি আগে দাও।"—আমি জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। তার ওপর সেই আমার প্রথম বিরক্তি দেখে বিমল অবাক্ হ'য়ে গেল।

কিন্তু কি করবো? নরেনদার ঐ দুটী চোখের একটুখানি চাউনিই যে বিমলের অতশত জোর-জবরদস্তিকেও এড়িয়ে, আমার চোখের ওপর, একটা কোন্ অজানা স্বপ্নলোকে ছবিখানার ওপর ঝিলিক্‌মেরে চমকে ওঠা একটা বিদ্যুতের বক্ষকম্পনের ক্ষীণ স্বর্ণরেখাটা আভাসে ফুটিয়ে তুললে—আমি পারলাম না—প্রাণের ইচ্ছে থাকলেও ঐ একটুখানি দৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে বিমলকে সুখী করা কিছুতেই হ'লো না।

শ্রীকামাখ্যাচরণ মজুমদার।

স্বরলিপি।

——:*:——

সিন্ধু—মধ্যমান।

হৃদয়-কমলদল আজিকে বিকাশে,
প্রিয়তম প্রেমঘন চরণ সকাশে।
মধুর সুরভি মধু পেয়েছে কি প্রাণ বঁধু?
আপনা, সঁপিতে শুধু উথলে উল্লাসে॥

কথা ও সুর—কবি শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

0
{সরা মপা ধধা II -পধণা -র্সণা -ধণা -া |
হৃদ য়ক মল ০০০ ০০ দল ০

১ ২´
| মা জ্ঞাঃ রঃ সা I সরা -মজ্ঞা রা -া |
আ জি কে বি কা০ ০০ শে ০

৩ 0 ১
| -া} সরা মা মা | পা পা -া -া | -া মা ণা -ধা I
০ প্রি০ য় ত ম পে ০ ০ ০ ম ঘ ০

২´ ৩
I -া -া -া মা | পধণা -র্সণা -ধণা ধপা I
০ ০ ০ ন চ০০ ০০ ০০ র ণ

0 ১
| -া -া মমপা -ধর্সা | -র্রর্সণা -ধপধা -র্সণধা ণপা I
০ ০ স০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ কা০

২´ ৩
I মজ্ঞা -রা -জ্ঞমজ্ঞা -মজ্ঞরা | -সা সরা মপা ধধা II
শে০ ০ ০০০ ০০০ ০ "হৃদ য়ক মল"

অন্তরা।

0
{মমা পধণা র্সর্সা II র্সর্সা -াঃ র্সঃ র্সা |
মধু র০০ সু০ রভি ০ ম ধু

১ ২´
| -া ণণা ধা ধা I ধণা ধণর্সা -ণধণা -াঃ ধা |
০ পেয়ে ছে কি প্রা০ ণ০০০ ০০০ ০ ০

| পা} -া -া মপা | ণসা র্‍া -া -া |
ধু ০ ০ আপ না০ স ০ ০

১ ২´
| -র্‍জ্ঞর্মর্মা -জ্ঞর্‍জ্ঞা -াঃ র্‍ঃ I র্সা -া -া ণসা |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ পি তে ০ ০ শুধু

৩ ০
| র্সর্সণা -ধধণা -র্সণধ -ণা | -া ধপা -া -া |
উ০০ ০০০ ০০০ ০ ০ খলে ০ ০

১ ২´
| মমপধা -ণর্সর্‍র্সা -ণধধা --ণপা I মজ্ঞা -রা -জ্ঞমজ্ঞা
উ০০০ ০০০০ ০০০ লগা সে০ ০ ০০০

৩
| -মজ্ঞরা | -সা সরা মপা ধধা II II
০০০ ০ "হৃদ য়ক মল"

১ম তান্ :—

১´ ২´
I সরমা পধণা র্সর্‍র্সা ণধপা I মপর্সা ণধপা ধপমা জ্ঞরসা |
আ০০ আ০০ আ০০ আ০০ আ০০ আ০০ আ০০ আ০০

৩
| রা সরা মপা ধধা I
আ "হৃদ্ য়ক মল"

২য় তান্ :—

১ ২´
I র্মজ্ঞর্‍া র্সণর্সা র্‍র্সণা ধপমা I পর্সণা ধপমা রমজ্ঞা
আ০০ আ০০ আ০০ আ০০ আ০০ আ০০ আ০০

মজ্ঞরা | -সা সরা মপা ধধা I
আ০০ ০ "হৃদ য়ক মল

রাগিণীর পরিচয় :—

সিন্ধু রাগিণী সম্পূর্ণজাতি। ইহার রেখাব ও পঞ্চম বাদী; ধৈবত, গান্ধার, মধ্যম ও কোমল নিখাদ সমবাদী। ঠাট্ কোমল গান্ধার ও কোমল নিখাদ। সময় রাত্রি ২য় প্রহর। ইহা করুণারসের রাগিণী।

তালের পরিচয় :—

মধ্যমান, ১৬টি দীর্ঘ কিম্বা ৩২টি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ইহার ছন্দ আড়, অর্থাৎ মধ্যমানের একফেরের মধ্যে আড়াঠেকার দুই ফের হয়। ঠেকা : —

```
                                        ২´
ধা   ধিন্   —া   ধা   ধিন্   —া   II   ধা   —া   ধা   ধিন্
অ    ধীo    ন্    ও    দীo    ন্         যে   o    অ    ধীo

                      ৩
—া   ধা   ধিন   —া   |   ধা   —া   ধা   ধিন্   —া
ন্    ও    দীo   ন্        যে   o    অ    ধীo    ন্

                   o
ধা   ধিন্   —া   |   তা   —া   না   ধিন্   —া
ও    দীo    ন্        যে   o    উ    পাo    য়

                   ১
ধা   ধিন্   —া   |   ধা   —া   II
বি   হীo    ন্        সে   o
```

নারীর কথা।

নারীর কথা—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখা। "সাহিত্যিকার" সাহিত্যিকের কাছে নারীর কথা যে শুধু জমিয়াছে গাঢ় হইয়া তাহা নয়—ব্যক্তও হইয়াছে স্পষ্ট রকম; Reason-এ ও Rhythm এ আমরা Rhyme বলিলাম না—কারণ কথাগুলি বলা হইয়াছে গদ্যে।

নারীর কথা—বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝি—মোটা কাঠামটা ইহার একান্ত একটানা কালিদাসের—"তন্বী-শ্যামা-শিখর-দশনাঃ" উপরেই কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছয়টি প্রচ্ছদে

এ বয়াঙ্গের আদ্যন্ত গড়া। পৃথকভাবে এই প্রবন্ধগুলি অর্থাৎ—"নারীর কথা" "নারীসমস্যা" "নারীস্বাতন্ত্র্য", "বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধ", দাম্পত্য সম্বন্ধের কথা" এবং "পুরুষ ও নারী" এই ছয়টি খণ্ড কথা আবার আপন আপন সসীম অবয়বের মধ্যে সম্পূর্ণ রকম সুগঠিত, সুপেশল, পরিপুষ্ট মানে Complete in themselves. কিন্তু সংস্কারকের চিন্তার ধারাটা, সৃষ্টি ও সংস্কারের যে সূত্র ধরিয়া তাঁহার মানসী-চিত্রলেখার ধারি ভরিয়া রূপ ও রঙ ফলাইয়া তুলিয়াছে লেখাগুলির মধ্যে আমরা তাহারই প্রচুর সন্ধান পাই।

দেশের প্রথা ও নিয়ম তাহার সমাজ এবং সেখানকার নীতির আদর্শ— সমাজরূপ সমষ্টি সংহতির ব্যষ্টি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব— এগুলি চিরন্তন শাশ্বত নহে—সকল দিনে একই আকারে পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন বিহীন অবস্থায় স্থাণুর মত অচল হইয়া এগুলি আবহমান কাল থাকিতে পারে না। সমাজের একটা প্রাণশক্তি আছে—সে শক্তি দ্রুত, অথচ ধীর একটা গতির সৃষ্টি করে এই গতিতেই সমাজ চলে—সমাজের উপরেই সংসার প্রতিষ্ঠিত আর গমন-ধর্ম্ম আছে বলিয়াই জগৎ। এই চলার পথে বাধা বা বৃতি যখনই কিছু আসিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, কাল তখনই তার পরিবর্ত্তনের বাষ্পীয়শকট ইহার উপর দিয়া প্রবল বেগে চালাইয়া দিয়া সে গতিকে স্বচ্ছন্দ অবাধ করিয়া তোলে। এই নৈসর্গিক, নিত্য, সত্য, ধর্ম্মেই যুগে যুগে সমাজ-সংস্কার, সামাজিকগণের আত্মসাধন নীতিশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সমাজ মূলে এক হইলেও বিভিন্ন বর্ণ ও বৈচিত্র্যে বিলোলিত লীলায়িত হইয়া উঠে; আবার সমাজের কেন্দ্রে চিহ্ন বা বস্তুর সন্ধান করিলেই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে মানুষ—নর ও নারী এই দুইএর একাত্ম সামঞ্জস্য সংগঠিত একটা বিরাট অস্তিত্ব। একের সঙ্গে অন্যের সংস্থিতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত; একটাকে ছাড়িয়া ভুলিয়া আর একটাকে টানিয়া, তুলিয়া চলা যায় না—তাহা হইলে মূলের মৌলিক সত্তাই একেবারে নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। নলিনীকান্তের চিন্তার মূল দৃষ্টিটা এই দিক দিয়াই ছুটিয়াছে।

নলিনীকান্ত পণ্ডিত, দূরদর্শী এবং মনীষী। তাঁহার জ্ঞান বস্তুতন্ত্রের শুধু বাহিরের রেখাটাকে (Contour) মাপিয়া জুখিয়া দেখেও দেখে না; স্থূলকে এড়াইয়া, ছাড়িয়া অন্তরের গভীরতম প্রদেশে - সূক্ষ্মই যেখানে স্থূলতর হইয়া পরিমূর্ত্ত সেইখানে গিয়া তত্ত্বের মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার দৃষ্টি সাধারণ, ব্যক্ত, নগ্ন ও স্পষ্ট রূপের নিছনী ছাঁকিয়া

লইয়া বরাবর ছুটিয়া যায়—কোনো অসীম, অগোচর রাজ্যের রূপ-সায়রের পানে যার স্থির, স্বচ্ছ টলটল, লীলা ঝরঝর নির্ঝরের উপরে এই রূপের স্থিতি প্রতিষ্ঠা আত্মগঠন। আভাস সেখানে বাস্তব,—অনুভবই মাত্র হয়তো বস্তু-সত্তা, ইঙ্গিতে কথা অর্দ্ধেকখানি হয়তো বলা হইয়াছে নলিনীকান্ত চান সেইখান হইতে সেই আধ বাক্ত বাণী লইয়া আসিয়া তাহাকে অক্ষরিত উচ্চারিত করিয়া প্রকাশের মধ্যে স্পষ্ট ও বিচারের জোরে সত্য, সুন্দর ও শিব রূপে প্রতিষ্ঠা করিবেন—সকলের সুলভ জ্ঞানের সম্মুখে। সেই জন্যই তাঁর নারীর কথা—নারী হইলেও কঠিন তন্বী কিন্তু মহিমময়—লালস রভসে লীলায়িত প্রগল্‌ভ নয়।

সমাজকে নলিনীকান্ত ভালবাসেন তাই ইহার প্রতি অঙ্গের রূপ-সুষমা, ভাব-দ্যোতনা, প্রণয়ীর চোখে প্রাণ ভরিয়া দেখেন। কিন্তু তাঁর এই দৃষ্টির মূল যেটা সেখানে আছে একটা ঋষি জ্ঞানের দিব্য শুদ্ধি, পরিণত পরিমার্জ্জিত অন্তরাত্মার শান্ত সৌম্য জ্ঞান তাই মৌলিক জ্যোতি ঐ দর্শনের অতি তীক্ষ্ণ অতি বিস্তৃত, জোয়ারের বন্যা বিস্তারের মত বিতত। ভুল করিয়া তিনি ভালবাসেন না বিবেচনা না করিয়া অভিব্যক্তকে সত্য বলিয়া প্রচার করেন না। সমাজের মর্ম্মগ্রন্থি যেখানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ভাঙন ধরিয়া পঞ্জর যেখানে ব্যথায় ভরিয়া টনটন করিয়া উঠিয়াছে তিনি সেইখানে ঔষধ ও অমৃতের প্রলেপ দিবার জন্য চিকিৎসকের জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া গিয়া বসিয়াছেন। আমরা এই ছয়টী নারীর কথার মধ্যেই এ সত্যের, এই দৃষ্টির পরিচয় পাই।

আগে বলিয়াছি সমাজ যুগে যুগে দিনের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে সুতরাং নীতি আদর্শও সেখানকার সেদিন ভিন্ন রূপ লইয়া নূতন আকারে সত্য হইয়া উঠিবে।

আজ বাঙ্গলার সমাজে সেই দিন আসিয়াছে। প্রাচীনের, অতীতের যে বিধান ও বাণী সমাজের জন্য যে নিয়মের যে বাঁধাবাঁধির সৃষ্টি করিয়াছিল চলিবার পথে সমাজ দেখিল আজ তাহাই বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর কথাটা, অর্থাৎ প্রশ্নটা সমস্যার মতই শক্ত হইয়া উঠিয়াছে নারীকে লইয়া। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"র আদর্শ মানিয়া চলিলে আর আজ চলে না আজ পথে নারীকে সঙ্গিনী করিয়া লইবারই আবশ্যক হইয়াছে।

যেদিন যোগী ও ত্যাগী কামিনীকে কাঞ্চনেরও তুলনায় হেয় ও হীন মনে করিয়া নারীকে শুধু লালসার বিলাসের সামগ্রী, পদস্খলনের সহায়ক পিচ্ছিল তীর্থ শিলা মনে করিয়া নারীকে এড়াইয়া চলিতে চাহিলেন সে তখন আত্মশুদ্ধির নবযুগ নূতন সাধক সিদ্ধির প্রথম জ্যোতি-স্পর্শে আপনার প্রতি এত অধিক মনোযোগী হইয়া উঠিলেন যে হারাইবার ক্ষুদ্র আশঙ্কাও তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল আত্মশুদ্ধির হয়তো স্থান তাঁর মধ্যে ছিল কিন্তু সেখানে ছিল আত্মবিশ্বাসের অভাব সুতরাং সিদ্ধি তার সম্পূর্ণ হইয়াছিল না ঐখানেই ছিল একটা ত্রুটি—ব্রহ্মচর্য্যের তৃপ্তি ছিল কিন্তু গার্হস্থ্যের মহান্ পরিপূর্ণতা তাঁর জীবনে সেদিন ও আসিয়াছিল না;

তিনি বুঝিলেন না যে নারীও তার সকল দুর্ব্বলতা ভুলিয়া স্থির, স্থিত মন লইয়া বলিতে পারে :—

"কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা.
অমৃত সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

আধ্যাত্মিক জীবন লাভ, তাহাকে সকল শ্রী ও ধী এ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে নারীকেও সঙ্গে লইয়া আপনার আত্মার স্পর্শে তার অন্তরের মালিন্য, অভাব অবসাদ দূর করিয়া দিতে হইবে আর নারীর আত্মার স্বচ্ছ দর্পণে দেখিয়া লইয়া আপন মর্ম্মের গঠন সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

মোটামুটি নলিনীকান্ত এই সূত্রের উপরেই তাঁর কথা আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর এই সম্পর্কে বাদ বিসম্বাদ যাহা কিছু আসিতে পারে এক এক করিয়া সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, বিচার করিয়া স্থূল যাহা, মূল যাহা, নিতান্ত যে কথা তাই সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজকার সমাজের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিতেছেন নারীকে তোমরা অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া না দিয়া তাহার আপন অস্তিত্বের উপর তাহাকে জোরে দাঁড়াইতে দাও। তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেও আর না দেও প্রচুর সুযোগ ও অবকাশ দাও যেন সে নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে তা চাহিতে পারে। নারীকে সে-কি তাহা তুমি বুঝাইয়া না দিয়া তাহাকেই বুঝিতে ধরিতে দেও যে সে কি আর তোমার কাছে তার কতটা পাওনা সমাজের মধ্যে তার স্থান কোথায়।

এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ দার্শনিক আদর্শে তিনি সমাজের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধের মধ্যেও নারীর সংস্পর্শ কতটা কি ভাবে ঘনিষ্ঠ তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আজকার এই বিপ্লবের দিনের সমাজকে সুগঠিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই নলিনীকান্তের এ প্রবন্ধগুলির মূল উদ্দেশ্য। তার বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেকটা প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জ্ঞানও আমার নাই সময়েরও অভাব। তাই মোটের উপর মূল কথাটা লেখকের কোন প্রতিভা কি ভাবে দেখাইয়াছে—তাই সংক্ষেপে বলিবারই অক্ষম প্রয়াস পাইলাম। বাঙ্গলার নর ও নারী প্রত্যেকেরই এ পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সমাজের জন্য, দেশের জন্য—এ দিনের জন্য যাহা প্রকৃত কল্যাণ তাহারই চর্চ্চা করা উচিত ও কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই। নারীর জন্য এখানি পাঠ্য পুস্তক হওয়া উচিত। এবং পড়িয়া বুঝিয়া তেমনি করিয়া চলিতে চেষ্টা করিলেই আমরা সবাই বুঝিতে পারিব যে পুরুষ ও নারীর নিত্য-সম্বন্ধ কি—আর কি সূত্রে কিরূপে পূর্ণতা লাভ করিলে [illegible] হইতে পারিবে—"True to the kindred points of Heaven and Home."

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"
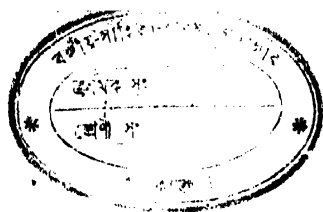
৬ষ্ঠ বর্ষ। পৌষ, ১৩২৮ সাল। ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

সাগরে।

আসমানি-রঙ্‌ গাল্‌চে 'পরে
বানিয়ে মহল সফেদ তাসে,
হা-হা ক'রে ঢেউ-শিশুদল
মেঝের উপর গড়িয়ে হাসে!

দেখ্‌তে গড়া-ভাঙার মেলা
গগনে যে বাড়্‌ল বেলা,
আজকে আমার মন ভুলেচে
সাগরের এই কলোল্লাসে।

যে শোক আমি ভুল্‌ব ব'লে
এসেছিলাম শোভার টানে,
সাগর! তুমি সে শোক আমার
ভুলিয়ে দিলে খেলার ভানে!
হারানো মোর বুকের ধনে,
হারাণমি আজ দেখ্‌চ মনে;—
চেনা-গলার মিষ্টি আওয়াজ
পাচ্ছি ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মেঘ নির্ম্মল গ্রীষ্মরজনী; বায়ুমণ্ডলে একটী সুখদ স্নিগ্ধতা বিছাইয়া পড়িয়াছে; এবং যাবতীয় দৃশ্যমান সৃষ্ট-পদার্থের ভিতরই একটি পরিপূর্ণ শান্তির ভাব অনুপ্রবিষ্ট। আকাশ গাঢ় নীল ও ঘন তারকা-খচিত,—কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সেগুলির দীপ্তি ডুবিয়া গিয়াছে।

এল র‍্যামির সকল কক্ষ-বাতায়নগুলিই উন্মুক্ত; টেবিলের উপর ফুলে ভরা একটি সূর্য্য-মুখীর ডাল শোভা পাইতেছে, এবং তাহার ক্ষীণ গন্ধটুকু মৃদু-কম্পিত নৈশ-সমীরের বুকে বুকে ফিরিতেছে। ফেরাজ একাকী উপবিষ্ট,—তাহার ভ্রাতা এইমাত্র কক্ষান্তরে গিয়াছেন।

অঙ্গুলি শৃঙ্খলিত যুগল-করতলে মস্তক-পৃষ্ঠটি রক্ষা করিয়া ও বাতায়ন-পথে পরিদৃশ্যমান চৌরাস্তা-পার্শ্বের বৃক্ষশ্রেণীগুলির দিকে অন্য মনে চাহিয়া চাহিয়া, সে দিবাভাগের একটি মজার ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। ঘটনাটি এই।—যেদিন হইতে জ্যারোবা তাহাকে কোঠের গোপন-পরীক্ষাগারে লইয়া গিয়া, সেই সুন্দর জীবটির সহিত চাক্ষুষ পরিচয় করিয়া দিয়াছে সেই দিন হইতেই সে-প্রসঙ্গে কথা না কহিলেও তাহার স্মৃতি সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং প্রার্থনায় বা ভক্তি-নিবেদন-কালে বিশেষভাবে এই কামনাটি জানাইয়া আসিতেছে—"ভগবান তাকে রক্ষা করুন!" 'তাকে' এই সর্ব্বনাম পদটিই এ-যাবৎ তাহার নিকট সে-জীবটিকে বিশিষ্ট করিয়াছে, কারণ এল র্যামির ইচ্ছাশক্তিবল সত্যসত্যই তাহার নামটি ফেরাজের স্মৃতি হইতে মুছিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এখন, বিস্ময়ের কথা নামটি তাহার মনে পড়িয়াছে;—অকস্মাৎ মনের গভীরতম তলদেশ হইতে যেন একটি বুদ্বুদের মতন সেটি ভাসিয়া উঠিয়াছে। বসিয়া বসিয়া সে কবিতা লিখিতেছিল, সহসা কেমন-যেন-একটি অজ্ঞাত শক্তির চালনায় উপরদিকে চাহিয়া সে মৃদু গুঞ্জনে বলিল—"ভগবান রক্ষা করুন লিলিথকে!" লিলিথ! কি শ্রুতিমধুর শব্দটি,—কি কাব্য-সুন্দর! সুদীর্ঘ কাল বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া থাকা সত্ত্বেও এক মুহূর্ত্তেই শব্দটি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল—কেমন করিয়া বা কিজন্য এটা সম্ভব হইল, তাহা সে ধারণাই করিতে পারিল না। একমাত্র কারণ যাহা তাহার অনুমানে আসিল, তাহা এই যে, তাহার ভ্রাতার সমগ্র ইচ্ছাবেগ কিছুকাল হইতে কোনো বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকায় কনিষ্ঠ সম্বন্ধে উহার প্রভাব সম্ভবতঃ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এ সম্ভাবনা ফেরাজকে ক্ষুব্ধ করিল না।

"তার নামটি আমার মনে পড়ায় এমনই বা কি ক্ষতি?"—সে ভাবিল—"তার সম্বন্ধে কোনো কথা তো আর আমি কইবো না।—কেননা, এবিষয় শপথ করেছি। কিন্তু মনের সুখে তার কথা একটু ভাবলুমই বা,—সুন্দরী লিলিথ!"

অতঃপর সে প্রাচীন গল্পে বর্ণিত সেই লিলিথের কথা ভাবিতে লাগিল, যাহাকে নাকি লোকে আদমের প্রথমা পত্নী বলিয়া মনে করিত; সে নামটির সহিত ইহুদীদের যে কি ভয়ানক কুসংস্কার জড়িত ছিল এবং ঐ নাম-সম্পর্কিত অশুভ নাশের জন্য কতই না মন্ত্র-তন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা স্মরণ করিয়া তাহার হাসি আসিল—কেননা

তাহার কাছে সে নামটি আর বুঝিবা সুধা মাখা সঙ্গীত অপেক্ষাও মিষ্টতর। পরক্ষণেই, তাহার প্রিয় কবিকুলের মধ্যে দান্তে রসেটীর কাব্য-সম্পদের একটু ভগ্নাংশ মধুর শব্দ-ঝঙ্কারে তাহার মানস-কর্ণে বাজিতে লাগিল :—"লিলিথ, লিলিথ সে যে, আদমের প্রেয়সী,

(গাও তরু-লতিকা !)

ধমনীতে নাহি তার মানবী-রুধির-লেশ,

নারীরূপে তবু তারে নিরমিল পরমেশ !"

"একথা খুবই ঠিক !"—ঈষৎ চকিত হইয়া ফেরাজ আপন মনে বলিল,—"কেননা, এল ম্যামির কথামত যদি সে মৃতই হয়, আর তার ঐ জীবিতবৎ অবস্থা এল ম্যামিরই নৈপুণ্য-ফল হয়, তা হলে বাস্তবিকই এ লিলিথের সম্পর্কে "ধমনীতে নাহি তার মানবী-রুধির-লেশ।"

অতঃপর পরের পংক্তিগুলি সে স্মরণ করিল—

"লিলিথ দাঁড়ায়েছিল নন্দন-তোরণে,

(কুক্ষণে হায় গো !)

প্রথমে তারেই হ'ল ভুলোকে আসিতে নামি'

সে এল নিরয়ে, আর ইভ্ সে স্বরগ-গামী "

"না, এ-লাইনটা আমি বদলে নেবো"—চন্দ্রালোকিত পথের দিকে চাহিয়া ভাবের ঘোরে ফেরাজ বলিল—"আমার মতে, 'সে এল স্বরগে, আর ইভ সে নিরয়গামী' বলাই ঠিক্ হবে। কি আশ্চর্য্য,—এ-কবিতাটার কথা আমার মনে হয়নি তো !—অথচ তাকে দেখবার পরও ঐ রসেটীর কাব্য যে আমি কত বার উল্টেছি তার ঠিক নেই। অবশ্য, ছাপার অক্ষরে 'লিলিথ' কথাটাও নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়ে থাকবে—কিন্তু তবু ও-কথাটা পরিচিত বলে কিম্বা কোনোরকম সূত্র ধরিয়ে দেবার মতন বলেও কি মনে হ'তে নেই !"

ফেরাজ ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। সূর্য্যমুখীর সুবাস তাহার চারিদিকে ভাসিতেছিল এবং বাতায়ন-পথে উজ্জ্বল চন্দ্রালোক কক্ষ-প্রবেশ করিয়া ঘরের আলোটাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছিল। যদিও লিলিথের চিন্তাই এ সময়ে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু সেই সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আধার, জীবন্তবৎ যুবতীটার উপর, তাহার ভ্রাতার পরীক্ষা কি

ভাবে কেমন করিয়া শেষ হইবে, তাহাও কোনোমতে সে আন্দাজ করিতে পারিতেছিল না।—উর্ব্বশী কলা-লক্ষ্মী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার পরিচিত ছন্দ ও পংক্তিগুলি তাহার মনের ভিতর নাচাইতে লাগিলেন।

ঐ ছন্দ-ঝঙ্কারের মাঝখানে, চন্দ্রালোকিত খোলা জানালার ধারে, চেয়ারের উপর শরীর মন পাতিয়া দিয়া পরম আরামে সে চোখ বুজিল, এবং অনতিপরেই তাহার ভাষায়, পৃথিবী ছাড়িয়া দেহের বাহিরে যাত্রা করিল—অর্থাৎ, সহজ লোকের সাদা কথায়, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে স্বপ্ন অভিজ্ঞতা সে লাভ করিল, তাহা এই :—

সে দেখিল, মেঘ-চুম্বিত-চূড়া পরম রমণীয় এক পর্ব্বতের গায়ে গায়ে যেন সে লঘু-পদ-বিক্ষেপে ভ্রমণ করিতেছে, আর সে পর্ব্বত যেন কতকটা প্রমোদোদ্যানেরই অনুরূপ—কেননা তাহার উপরিভাগে আঁকাবাঁকা পথগুলি সমস্তই লতাকুঞ্জময় ও কুসুমাকীর্ণ। পর্ব্বত-স্রোতস্বিনী ও ঝরণাগুলির নৃত্য-নিপুণ গতি-কল্লোল ও ঘন-পল্লবিত বৃক্ষরাজির মৃদু-মর্ম্মর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—এই জায়গাটী সে বেশ চিনিতে পারিল এবং বুঝিল যে তাহার সেই রহস্যময় তারকারাজ্যেই সে আবার উপনীত হইয়াছে। ভ্রমণ-পথে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর সুন্দর কিশোর-কিশোরীকে সে সাগ্রহ-চরণ-পাতে বুঝি-বা কোনো উৎসব বা অধিবেশন উপলক্ষেই বিশেষ একটী দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল। তাহারা ফুল ছড়াইয়া, গান গাহিয়া এবং পরস্পরের সহিত প্রফুল্ল-কণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিল,—কেবল একপাশে দাঁড়াইয়া বুভুক্ষু দৃষ্টিতে সে সমস্ত দেখিতে লাগিল।

"ওগো আনন্দলোক, যেখানে জীবন এমন চিরনবীন ও প্রেম এমন অফুরাণ,"—সে ভাবিল—"এ গৌরব-ক্রোড় থেকে কেন আমি নির্ব্বাসিত? এ আনন্দে কি কারণে আমি বঞ্চিত?"

সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, এই প্রীতি-প্রফুল্ল রমণীয় প্রাণীগুলি কি উদ্দেশে আজ সমবেত হইতে চলিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আকুল হইলেও নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়া এই সামান্য প্রশ্নটীও জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। অবশেষে একটী বালিকাকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল,—সে আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে ও ফুলের

মালা গাঁথিতে গাঁথিতে অগ্রসর হইতেছিল। কাছাকাছি হইবামাত্র যেন বা সম্বোধন-প্রতীক্ষাতেই প্রীতি-স্নিগ্ধ নয়নে ফেরাজের দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইল; এ-ঘটনায় সাহস পাইয়া সে বিষণ্ণ নম্রবদনে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কোথা যাচ্ছেন সকলে মিলে? জানি, অনুসরণে আমার অধিকার নেই—তবু জানতে সাধ হয়, এ আনন্দধামে নতুন কিছু আনন্দের কারণ ঘটেছে কি না?"

বালিকা ঊর্দ্ধে আঙ্গুল-নির্দ্দেশ করিল,—এবং ইঙ্গিত-অনুযায়ী সেদিকে চাহিয়া ফেরাজ দেখিল, শিরোপরি আনত দুগ্ধ-ফেননিভ আকাশের কোলে দক্ষিণ দিক ঘেঁসিয়া লোহিতাভ এক অত্যুজ্জ্বল বর্ণ-গরিমা।

"এক অপ্সরী চ'লছে"—সে বলিল—"ঐ বর্ণ-রেখার নীচে পৃথিবী তার সঙ্কীর্ণ কক্ষে আবর্ত্তিত, আর সেই পৃথিবী থেকেই উনি আসছেন! আমরা চ'লছি তাঁর স্বর্গগমন দেখ্‌তে আর সেই সঙ্গে তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করতে। আকাশে ঐ-যে বর্ণ-হিল্লোল দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওটা আলো নয়, কিন্তু তাঁর পাখা।"

"পাখা!"—স্বপ্ন-জড়িম-কণ্ঠে ফেরাজ বলিল, কিন্তু বালিকার কথায় সন্দেহ করিল না।

"পাখা কিম্বা গৌরব-প্রভা, যাই বল"—সুন্দর নয়ন দু'খানি সেদিকে ফিরাইয়া কুমারী বলিল— তা'রা সেখানে অপেক্ষা করছে,—দূরতম জগত থেকে যারা এসেছে, তা'রা—লিলিথের তা'রা বন্ধু কিনা।"

বালিকা চলিয়া গেল এবং ফেরাজ দক্ষিণ-আকাশে ঐ বর্ণ-গরিমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"লিলিথের বন্ধু!"—আপন মনে সে বলিল—"তা' হ'লে অপ্সরী,—কেন না সে একটী অপ্সরী।"

অপ্সরী!—অপ্সরীরা লিলিথের প্রতীক্ষায় রয়েছে! কতদিন, কতদিন তা'রা এভাবে থাক্‌বে?—লিলিথই বা কবে দেখা দেবে? সমস্ত স্বর্গই কি তা'কে বুকে করে' তুলে নেবে? সে শিহরিয়া উঠিল; সেই কল্পনাতীত দৃশ্যটী ধারণা করিবার চেষ্টা করিল,—পরে... যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিধৃত হইয়া কোনোখানে নীত হইতে লাগিল... যেখানে আলোক ছিল, তাহা অন্ধকার হইয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গে একটা শৈত্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে

পারিল যে পৃথিবীর আবেষ্টন আবার তাহাকে ঘেরিয়া লইতেছে এবং মুহূর্তপরেই জাগরিত হইয়া দেখিল, তাহার ভ্রাতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন।

"এরকমভাবে আগাগোড়া জান্‌লা খুলে রেখে ঘুমোও কেন?"—এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এসে দেখি, একেবারে তুমি চাঁদের আলোয় ডুবে রয়েছো—অথচ সকলে বলে যে চাঁদের আলোতে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তা' ছাড়া ঘুমের মধ্যে এমন তলিয়ে গিয়েছিলে যে অনেক ঠেলাঠেলিতে তবে জাগিয়েছি। যদি ঘুমুতেই হয়, তবে জানালা বন্ধ করে দাও।"

ফেরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল,—তাহার দৃষ্টি তখনও স্বাভাবিক হয় নাই; স্বপ্ন-দৃশ্যের স্মৃতিতে তখনও উদ্‌ভ্রান্ত।

"আমি ঘুমুইনি,"—সে বলিল—"তবে এখানে নিশ্চয়ই ছিলুম না।"

"ও, আবার সেই তারার দেশে নিশ্চয়ই!"—ঈষৎ পরিহাস-ব্যঞ্জক কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন। কিন্তু ফেরাজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না,—সে শুধু এই ভাবিয়াই উদ্বিগ্ন হইতেছিল' পাছে 'লিলিথের' নামটী অসাবধানে তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইয়া পড়ে।

"হ্যাঁ—সেইখানেই ছিলাম"—ধীরে ধীরে সে বলিল—"সেখানকার সমস্ত নরনারী এক অপ্সরার 'স্বর্গ-প্রয়াণ' দেখবার জন্যে সমবেত হচ্ছে তা' কি তুমি জানো?"

সকৌতুক বিস্ময়ে কনিষ্ঠের দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"কি বিদ্‌ঘুটে তোমার স্বপ্ন! যত অনাসৃষ্টি অসম্ভব ব্যাপার; তবে শুন্‌তে খুবই সুন্দর সন্দেহ নেই। এ সমস্ত কথা যদি কাগজে কলমে প্রকাশ কর, তবে দুনিয়ার সমালোচকেরা তাকে কি রকম কালি ছিটায়, তা' দেখ্‌তে পাবে! বিধাতার হাত ফস্‌কে কেন যে তুমি মর্ত্যভূমে ঝরে পড়েছিলে, আমি শুধু তাই ভাব্‌চি!"—

ফেরাজ হাসিল।

"তোমার কথা আমি মান্‌তে পারছিনে"—সে বলিল—"তুমি কল্পনা মনে করতে পার, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কল্পনা একেবারেই নেই,—সে স্বর্গ কোনো লোক কোনোকালেই আমার বিরুদ্ধে রুদ্ধ করে রাখতে পারেন না, তা' তিনি রাজাই হোন, সমালোচকই হোন বা ধর্ম্মাধিকরণই হোন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে চিন্তাকে স্বাধীন করে দিয়েছেন।

"তা' ঠিক, ধন্যবাদ যদি দিতেই হয় তবে বুঝিবা সে শুধু এই জন্যেই"—এল র‍্যামি বলিলেন—"বেশ—ফের আমি তোমাকে স্বপ্ন-অনুকরণের অবসর দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু জানলাগুলো খুলে রেখে ঘুমিও না। গ্রীষ্মকালের রাত্রি বিশ্বাসঘাতক, অতএব বিছানাতে গিয়েই বরং শোও।"

"আর তুমি?" কেবল-যেন-একটা আকস্মিক উদ্বেগ-চালিত হইয়া ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

"আমি আর আজ রাত্রে ঘুমুবো না"—অন্যমনস্কভাবে ভ্রাতা বলিলেন—"একটা কথা, বিশেষ একটা ধারণা, আমার মাথায় এসেছে, যে জন্যে অবিলম্বেই কাজ আরম্ভ করবার জন্যে আমি একটু অধীর হয়েছি। যদি এ-কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তবে কাল তুমি তার ফল জান্‌তে পারবে ফেরাজ।"

এ অঙ্গীকার, আপন পরীক্ষা-সম্বন্ধে এল র‍্যামির অভ্যস্ত মৌন-প্রিয়তার এতই বিরোধী, যে ফেরাজকে প্রীত না করিয়া তাহা ভীতই করিল।

"দোহাই তোমার, একটু সাবধান হও"—উদ্বিগ্ন স্নেহে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া সে বলিল—"তুমি এমন সব কাজ হাতে নাও, এত বেশী চাও যে ন্যায় ধর্ম্মমতে বুঝিবা তা' দেওয়া যেতে পারে না। ভগবানের ওপর কতকটা নির্ভর কর ভাই; নিজে সব পেরে উঠবে না, ও-সাহস ক'রো না!"

"ওগো স্বপ্নলোকবাসি!"—কোমলকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"তুমি অনর্থক ভয় পাচ্ছ। যা' আমার নিজের তা' ছাড়া আর কিছুই আমি চাইনে,—আর ভগবানের জন্যে কিছু রাখার কথা যদি বল, তবে আমার জবাব হচ্ছে, পরিণামে যাতে তিনি আমাকে পরিণত করিবেন তা' তাঁকে অর্পণ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত,—কিঞ্চিৎ ধূলো মাত্র!"

"তোমার গঠন-উপাদানে ধূলো ছাড়া আরও কিছু আছে"—সবেগ উচ্চকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"তোমার মধ্যে দেবত্ব রয়েছে! এই দেবত্বই ভগবৎ-সম্পত্তি, আর এই জিনিসই নির্ম্মল পরিপূর্ণ অবস্থায় তাঁকে অর্পণ করতে হবে। তোমার কাছে এইটেই তিনি দাবী করেন, আর তা' দিতেও তুমি বাধ্য।"

এল র‍্যামির সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ প্রবাহিত হইল এবং একটা পাণ্ডুরতা দেখা দিল।

"তা' যদি সত্য হয় ফেরাজ—" ধীরে ধীরে এবং প্রত্যেকটী কথার উপর জোর দিয়া তিনি বলিলেন—'যদি বাস্তবিকই একথা সত্য হয় যে আমার মধ্যে দেবত্ব আছে,—আমার সন্দেহ হয়!—তবে ভগবানই তাঁর সেই নিজস্ব অগ্নি কণিকা যখন-খুসী বা যেমন-খুসী গ্রহণ করুন! চলুন এখন!"

ফেরাজ পরম শ্রদ্ধাভরে জ্যেষ্ঠের হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল—"এস ভাই, ভগবান কল্যাণময় এবং তাঁরই জিম্মায় আমি তোমাকে সমর্পণ করছি।"

এল রামি কক্ষত্যাগ করিলেন এবং ফেরাজ কেমন যেন একটা অবসাদ ও ভীতিরভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল,—তাহার যেন মনে হইতে লাগিল যে আর তাঁহাকে সে দেখিতে পাইবে না। এই আশঙ্কাকে কোনমতেই সে যুক্তি-তাড়িত করিতে পারিল না, অথচ ভাবিয়াও পাইল না কি জন্য সে শঙ্কিত হইয়েছে। তথাপ সত্যকথা এই যে, তাহার আভ স্তরীণ স্বপ্নানুভূতি তখনও যেন সেই তারকারাজ্যের আলোক-উজ্জ্বলা, সেই 'লিলিথের বন্ধু' সজ্ঞায় পরিচিত অপ্সরা-সভার স্মৃতিতে একটা অজ্ঞাত-আশঙ্কা-পীড়িত হইতেছিল। "কেন তা'রা সেখানে রয়েছে? কিসের প্রতীক্ষায় তা'রা আছে?" আর অধিক ভাবিতে সে সাহস করিল না; অবশেষে, সমস্ত চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, নিজের শয়ন কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেই সিঁড়ির পথে জ্যাবোবার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ মাংস-শিথিল আননে একটা শান্তি ও তৃপ্তির ভাব পরিলক্ষিত হইল,—এবং ফেরাজকে দেখিয়া সে একটু হাসিল।

"আজকের রাতটুকু স্বপ্ন দেখবারই উপযোগী"—কর্কশ কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব কোমল ও মধুর করিয়া সে বলিল—'একদিকে যেমন আকাশের তারাপুঞ্জ, অন্যদিকে তেমনি অগণ্য হৃদয়ের স্পন্দন জ্যোৎস্নার শাসন-দণ্ডের ইঙ্গিতে এখন জগত জুড়ে বিকম্পিত হচ্ছে জগত জুড়ে—সমস্ত জগত জুড়ে!"—তাহার হস্তের উৎক্ষেপে-বিক্ষেপে রূপার চুড়ীগুলো ঝন্-ঝন্-শব্দে বাজিয়া উঠিল। অতঃপর বিষণ্ণ-কোমল দৃষ্টিতে ফেরাজের দিকে চাহিয়া সে বলিল—"অবশ্য তোমার জন্যে নয়। তোমার কপালে লেখা আছে যে তুমি স্বপ্ন দেখ্‌বে, আর তোমার পক্ষে ঐ স্বপ্ন দেখাই ভাল; কিন্তু আমার কথা যদি বল তবে আমি বরং এক ঘণ্টার জন্যেও বাঁচতে চাই, তবু যুগযুগান্তও স্বপ্ন দেখতে চাইনে!"

তাহার কথাগুলি যথারীতি অস্পষ্ট ও অমার্জ্জিত,—তথাপি ফেরাণ্ড কেমন-যেন তাহার নিহিত অর্থে ঈষৎ উত্তেজিত হইল এবং তাহার চোখে মুখে একটা বিরক্তির ভাবও ফুটিয়া উঠিল। জ্যারোবা তাহা লক্ষ্য করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

"আহা,—বেচারা খুব সাহসের সঙ্গেই যুঝ্‌ছে বল্‌তে হবে"—কতকটা যেন আপনাকেই শুনাইয়া শুনাইয়া সে বলিল—"জগতটাকে কোনো কালে না জেনেই তাকে ঘৃণা করছে, আর ভালবাসার কোন স্বাদ না পেয়েই তা' পেছুচ্ছে! চিন্তা, ছন্দ, গান কি একটা শিল্পই এর কাছে মনের প্রবল অনুরাগের চেয়েও দামী!...বেশ কথা, স্বপ্নই দেখ তবে; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রার্থনা কর যেন কখনও জাগতে না হয়। কেননা প্রেমের স্বপ্ন দেখাও সুমধুর হ'তে পারে, কিন্তু তা' থেকে রিক্ত হয়ে জাগা নিতান্তই বিস্বাদ।"

নিঃশব্দ গতিতে যেন বা একটা প্রেতমূর্ত্তিরই মত জ্যারোবা অন্তর্হিত হইল। ফেরাণ্ডের একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে অনুসরণ করে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—না, সে একাই থাক্।

"এ মাগীটা শুধু আমাকে বিরক্তই করে"—আপন ক্ষুদ্র শয়ন কক্ষটীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আপন মনে সে বলিতে লাগিল—"সেই সর্ব্বপ্রথম এল র‍্যামির অবাধ্য হয়, পরে আমাকেও অবাধ্য করে তোলে। অবশ্য আমাকে সে ঐ লিলিথ নামক আশ্চর্য্য জীবটীকে দেখতে নিয়ে যায়, কিন্তু তাতেই বা ফল কি? তার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আমার প্রশংসা, আগ্রহ, শ্রদ্ধা আর বুঝিবা ভালবাসাও আকর্ষণ করেছিল—কিন্তু ঐ লোকান্তরিত অশরীরবৎ জীবকে কে ভালবাসতে সাহস করবে? না, এলর‍্যামি পর্য্যন্ত নয়,—কারণ সেও নিশ্চয় আমারই মতন অনুভব করতে পারে, যে এক ঐশীপ্রেম ছাড়া আর সকল ভালবাসারই সে অতীত।"

প্রাচ্য পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া ফেলিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণের উদ্যোগ করিবামাত্র কর্ণে সুদূরাগত সঙ্গীতের ক্ষীণ শব্দ প্রবেশ করায় সে চমকিয়া উঠিল। স্বর লক্ষ্যে কান পাতিয়া সে অনুভব করিল, শব্দটা যেন বাহির হইতেই আসিতেছে। তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দিতেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া চুম্বন করিল এবং সে মুখ বাড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল। নিশ্চয়,—নিশ্চয়ই কোনোখানে কেহ গান গাহিতেছে, হাঁ।—ঐ যে, সুরের ভিতর হইতে কথাগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে!—

ফিরে এস, ফিরে এস!
যে মহাসাগরে কাতারে কাতারে সাঁতারিছে গ্রহতারা,
অরুণ গরিমা যে মহিমা-তলে হয়ে আসে প্রভাহারা,
এস সেথা ফিরে এস!
অগ্নি-অনিল-আলোকের দেশ চির-নব নির্ম্মল,
প্রাণের জোয়ারে যে মহাদেশের চারিদিক ঝলমল,
এস সেথা, ফিরে এস!

রোমাঞ্চিত-কলেবরে ফেরাজ গানটীর প্রতি পংক্তি পরিষ্কার শুনিল, এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস হইল।

ফিরে এস, ফিরে এস!
তব আশা-পথ চেয়ে আছি মোরা যুগযুগান্ত ধরি',
আবাহন-গীতি গাহিয়া তোমারে এসেছি লইতে বরি'—
ফিরে এস, ফিরে এস!
স্বপন-মগন মৃত ভুবনের পরশ-মুক্ত তুমি,
চারিদিকে তব খুলে পড়ে, হের, উজল স্বরগ ভূমি—
ফিরে এস, ফিরে এস!"

*　　*　　*

ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গানের সুরটী যেন বাতাসের বুকে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

"আমারই মনের ভুল"—জানালাটী বন্ধ করিয়া দিতে দিতে ফেরাজ বলিল—"বোধ হয়, এটা আমারই কল্পনার খেলা, কিম্বা গোস্বামীর ইচ্ছার ক্রিয়া হওয়াও অসম্ভব নয়। এরকম গান তাঁর নির্দ্দেশমত আরও দু'একবার আমি শুনেছি,—না, ঠিক এরকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া, সে প্রার্থনা করিবার জন্য নতজানু হইল—কিন্তু সেদিন যেন কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইল না। "ভগবান লিলিথকে রক্ষা করুন" এই কথাটাই শুধু তাহার ওষ্ঠ হইতে নির্গত হইল।

কথাটা বেশ একটু জোরেই উচ্চারিত হইয়া পড়িয়াছিল,—ফলে ঐ নাটী কক্ষ-গাত্রে এতই স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত হইল যে, তাহা কতকটা আহ্বান বা আদেশের মতই মনে হওয়ায়, ফেরাজ যেন একটা বিহ্বল আশঙ্কায় লাফাইয়া উঠিল।

পরে, প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া আপনাআপনিই বলিল—"উত্তম,—যদি বলেই। থাকি তা'তে ক্ষতিটা কি? 'ভগবান তাকে রক্ষা করুন' একথায় মারাত্মক কিছুই নেই যদি এল র‍্যামির বিশ্বাসমতে সে মৃতই হয়, তবে রক্ষক তার পক্ষে অনাবশ্যক, কেননা সে ক্ষেত্রে তার আত্মা আগে থেকেই ভগবানের অধিকারে এসে গিয়েছে।"

আবার খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল,—চতুর্দ্দিকে এখন প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা বিরাজ-মান,—যে সমস্ত কূটচিন্তা তাহার মনখানিকে অকারণে পীড়িত করিতেছিল তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে শয়ন করিল এবং অনতিপরেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লিলিথ যে সঙ্কেতের আশা দিয়াছিল, তাহা কৈ? সে সঙ্কেত কি পাওয়া গিয়াছে? না; কিন্তু এল র‍্যামির অধীরতা আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিবে না,—প্রয়োজন বোধ করিলে বল প্রয়োগ করিয়াও তিনি সকল সমস্যা নিরাকরণের সঙ্কল্প করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরিণাম যাহাই ঘটুক। অপেক্ষা করিতে তিনি পারিতেন, যদি ফল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকিত,—কিন্তু যেখানে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা মাত্র আছে, সেখানে আশায় আশায় কাল-যাপন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। "প্রার্থনা" সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল এই যে, নিজের ইচ্ছাশক্তিবলে যাহা নিশ্চয়ই পাওয়া যায় তাহার জন্য প্রার্থী হওয়া অধিকন্তু তো বটেই উপরন্তু তাহা চিত্তদৌর্ব্বল্যেরই পরিচায়ক। মনের এইরূপ স্বাধিকার দৃঢ় ও আত্মশক্তি-দৃপ্ত অবস্থায় সেইরাত্রে তিনি লিলিথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং জ্যারোবাকে বিনম্র

ব্যবহারে বিদায় দিয় পার্শ্বপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল বিষণ্ণ, তথাপি অনন্ত পল্লব-তলে কেমন যেন একটা ভয়াবহ দীপ্তি আবৃত রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল; আর অধিককাল তিনি প্রতারিত হইবেন না,—এল র‍্যামি ভাবিতেছিলেন,—রাত্রির পর রাত্রি, বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও বিশ্বাস করিয়া, আশা ছাড়িয়াও আশা করিয়া তিনি অনিদ্রায় কাটাইয়া চলিয়াছেন, তথাপি কৈ আকাঙ্ক্ষিত সঙ্কেতের কোন চিহ্নও তো কোনো দিকে দেখা যাইতেছে না! আবার সেই সব পুরাতন সংশয় জাগিয়া উঠিয়া এল র‍্যামিকে পীড়িত করিতে লাগিল—সংশয় যে, ঐ সঙ্কেতের আশায় থাকিয়া বৃথাসময়ক্ষেপণে তিনি আপনাকে প্রতারিত করিতেছেন কি না; অথবা, লিলিথের কথাবার্ত্তা তাঁহারই মস্তিষ্কের এলোমেলো চিন্তাগুলোর প্রতিধ্বনি-মাত্র কি না? সাধারণ বন্ধুত্ব-সূত্রেও যাহারা আবদ্ধ নহে এমন সমস্ত নরনারীর মধ্যেও এ ধরণের ব্যাপার ঘটে যে সম্ভব তাহা তিনি নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন—তাহাও যদি অসম্ভব না হয়, তবে লিলিথ-ঘটিত একটা ব্যাপারে, যেখানে ছয় বৎসর কাল ধরিয়া সে তাঁহার ইচ্ছাকর্তৃত্ব-তলে শায়িতা, ওরূপ ঘটনা আরও অধিক সম্ভব হওয়াই যে সঙ্গত! কিন্তু তাহার বাক্যভঙ্গীর অলৌকিকতা অথবা তৎপ্রদত্ত বিবরণীগুলির বিস্ময়কর ও অতিলোকচেতম প্রকৃত সম্বন্ধে কি বলা যায়? বুধগ্রহের যে সমস্ত দৃশ্যাবলীর বর্ণনা তাহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা তো তাঁহার নিজ মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয়! ঐশী ব্যক্তিত্বে তাহার বিশ্বাস, অথচ এল র‍্যামির দিকে ও জাতীয় ধারণার একান্ত অভাব,—এই দুটী বিরুদ্ধ ব্যাপারকে তো কোনো যুক্তিবলেই সঙ্গত করা যায় না! এই সমস্ত যুক্তিতর্কের অতীত ব্যাপারগুলিই তাঁহাকে এতখানি অসহিষ্ণু ও বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল, যে অবশেষে তাহা এমন একটী সঙ্কল্পের কিনারায় তাঁহাকে লইয়া আসিল, যাহা কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বুঝিবা অসম্ভবই মনে হইত।

জীবন্ত লিলিথ—সে যে কি ধরণের প্রাণী দাঁড়াইবে, তাহা এল র‍্যামি কল্পনাও করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন যে শিশু অবস্থায় সে তাঁহার হাতের উপরই মারা গিয়াছিল, এবং তাহার এখনকার এই প্রতীয়মান জীবন ও নারীত্বের অপরিসীম সৌন্দর্য্যে বিকাশ, রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্যে উদ্ভূত কৃত্রিম প্রণালীরই ফল,—তথাপি তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন

যে তাহার অস্তিত্বের মূলে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া বলবৎ হইলেও স্বাভাবিক জীবন অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্টতর, এমন কি অধিকতর স্থায়ীও হইতে পারে। আপন নৈপুণ্যপ্রভাবে পার্থিব নিবাসের সহিত রক্ষিত-যোগ ঐ মুক্ত চেতনার সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে নারীত্বের পূর্ণ মহিমায় জাগাইয়া তোলাই এখন তাহার অদ্বিতীয় সঙ্কল্প দাঁড়াইয়াছে, কারণ, তিনি তাহাকে ভালবাসেন। এ সত্য আর নিজের নিকট তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না, যে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর আননখানির স্বর্গীয় হাস্য প্রতিমুহূর্ত্তই এখন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করে,—তাঁহার প্রত্যেকটী অঙ্গ ঐ অলোক-সামান্য সুন্দরীর প্রত্যেক অঙ্গটীকে প্রণয়ীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার আকুল বাসনায় কাঁদিতে থাকে। কিন্তু ঐ 'লিলিথের আত্মার রহস্য-সন্ধান' অপেক্ষা, এই আসক্তি যে কবে কি উপায়ে তাঁহার মধ্যে প্রথম প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, তাহার মূল-রহস্য বুঝিবা গভীরতরই হইবে। আপনাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করিলেন তাঁহার অস্পষ্ট আরম্ভ ধরিতে পারা যায়, তাহা করা তাঁহার সাধ্যাতীত। সম্ভবতঃ জ্যারোবার অসংলগ্ন উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়াই উহা তাঁহার ভিতর সংক্রামিত হইয়াছে,—সম্ভবতঃ, তাঁহার কনিষ্ঠ ফেরাজের উপস্থিতিতে লিলিথের হাস্য সম্পর্কিত সংবাদ তাঁহার মনের মধ্যে একটা অযৌক্তিক ঈর্ষা-নিষেকের ভিতর দিয়াই উহা ঘটাইয়াছে,—সম্ভবতঃ সেই আগন্তুক—সাইপ্রস দ্বীপের সন্ন্যাসী—লিলিথ সম্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষা অধিক জানার অহঙ্কার রাখেন, এই ধারণা-জাত বিরক্তির ফলেই এটী ঘটিয়াছে। মোট কথা, কারণ যাহাই হোক্, লিলিথের বাহ্য-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল নির্ব্বিকার এমন কি তাহার বিরুদ্ধে কঠিন থাকিলেও, সম্প্রতি সেই বাহ্য-সৌন্দর্য্যই তাঁহার প্রেম ও প্রশংসাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে।

লিলিথকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার উপযোগী আয়োজন সমস্তই একপ্রকার ঠিক হইয়া গিয়াছিল, কেবল একটীমাত্র সামান্য কারণে, সহরে আইরিণের অনুপস্থিতির দরুণই, তাহা পিছাইয়া দেওয়া হয়। যতগুলি নারীর সহিত এল র‍্যামির পরিচয় ঘটিয়াছে তন্মধ্যে একমাত্র ঐ আইরিণের তিনি তাঁহার গোপনীয়তাটীর সম্পর্কে বিশ্বাস করিতে পারিতেন; কারণ তাঁহার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে ঐ জীবনখানি মর্ত্তালোকে যাপিত হইলেও স্বর্গনিবাসিনীর মতই নির্ম্মল। লিলিথকে ঐ মহিলাটীর তত্ত্বাবধানে রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, কারণ তাঁহার

সূক্ষ্ম অনুভূতি, উন্নত আদর্শ ও অনাবিল সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি সেক্ষেত্রে, স্বপ্ন-সৌন্দর্য্য হইতে ঘটনা-কঠিন জগতে জাগরিতা ঐ বালিকাকে সর্ব্বপ্রকার অভাব বোধের বিরুদ্ধেই নিঃশ্চিন্ত রাখিতে পারিবে। জারোবা ও ফেরাজ, এতদুভয়ের সংসর্গ হইতে বিশেষভাবে তাহাকে পৃথক রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, অথচ আইরিণ ব্যতীত দ্বিতীয় এমন কোনো মহিলাও তিনি দেখিতে পাইলেন না যাহাকে ঐ কার্য্যভার দেওয়া যায়; এইজন্যই তাঁহার অনুপস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়া অগত্যা তিনি লিলিথের জাগরণ-পরবর্ত্তী পরিণাম চিন্তা ইচ্ছাপূর্ব্বকই স্থগিত রাখেন।

যে মূর্ত্ত-সৌন্দর্য্যটীকে তিনি সমস্তই নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন, লিলিথের সেই শুভ্র সৌন্দর্য্যের দিকে যুগপৎ কঠোর ও কোমল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া এল র‍্যামি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইতেই, পালঙ্ক-পাত্রের রজত-টাইমপিসটী বুঝিবা একটু জোরেই টিক্-টিক্-শব্দে বাজিতে লাগিল। শায়িতার বাহুলতাযুগল তাহার বক্ষসম্বদ্ধ,—তনুখানি পাণ্ডুর এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্ষীণ। চন্দ্রাতপ-সদৃশ গৃহ-ছাদ হইতে স্বর্ণতারে বিলম্বিত কারুকার্য্য-বিচিত্র আলোকাধারটী মৃদু আলোক বিকীরণ করিতেছে—ফুলদানিগুলি হইতে তাজা গোলাপের মধুর গন্ধ কক্ষ-বায়ুতে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে—এবং অবরুদ্ধ-বাতায়ন-রন্ধ্রপথে একটু শুভ্রকান্ত চন্দ্রকিরণ ঘরে ঢুকিয়া আলোকাধারের লোহিত আভাটুকুর সহিত মিলিত হইবার আনন্দে কার্পেট-আচ্ছাদনীখানির উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে।

"এ দায়িত্ব আমি স্বীকার করবো"—কক্ষব্যাপী স্তব্ধতাকে আলোড়িত করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"নিশ্চয়ই স্বীকার করবো, কিসের ভয়? জীবন বা আত্মাকে এখান থেকে শূন্যে পলায়নের বিরুদ্ধে ধরে রাখবার শক্তি আমি দেখিয়েছি,—আর ঐ জীবনই তো আত্মা,—এখন তাকে, যে-কোনো আকারে আমার খুসী, সুদীর্ঘকাল এখানে রেখে দেবার শক্তিও আমাকে আয়ত্ত করতে হবে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের পুরস্কার,—এ পুরস্কার দাবী করবার অধিকার আমার আছে—তা' ছাড়া, যা' করেছি তা' আবার করবার অধিকারও আমি রাখি। এখন, একটীমাত্র প্রশ্ন নিজের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার;—অতি-স্বাভাবিকে কি আমি বিশ্বাস করি?"

তিনি থামিলেন, এবং লিলিথের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন।

"না, তা' করিনে। তার কোনো প্রমাণ আমি পাইনি। একথা ঠিক, যে লিলিথের ভায়া আমাকে হতবুদ্ধি করে,—কিন্তু যখন তাকে যথার্থরূপে জানতে পারি যে সে একটী নারী, আমার উপ স্মৃতি-সম্বন্ধে সজ্ঞান ও অনুভূতি সম্পন্ন, তখন এই প্রতীয়মান রহস্য আমার কাছে সরল হয়ে আছে। ফেরাজের যা'-কিছু স্বপ্ন তা' স্বপ্নমাত্র—আমি যেমন একবার দেখেছিলুম"—এই সময়, সন্ন্যাসী ও তাঁহার মাঝখানে দণ্ডায়মান সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানির গম্ভীর-মধুর দৃষ্টিটী মনে পড়িয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—"সে স্বপ্ন অবশ্য তাঁরই সৃষ্টি। না,—অতি-স্বাভাবিকের কোনো প্রমাণ আমি পাইনি, সুতরাং নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবো না। লিলিথের অঙ্গীকারও মূল্যহীন। আহা বেচারী! 'ফেরাস'-ডনয়ারই মতন আজ সে নিদ্রামগ্না—কিন্তু যথাসময়ে আমি যখন বলবো—'কুমারি! আদেশ করছি আমি, জাগো'—সে আদেশ পালন করবে,—জেগে উঠবে এবং অবশ্যই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে।"

"জেগে উঠবে এবং অবশ্যই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে!"

তিনি থামিতেই কথাগুলি দ্বিতীয়বার স্পষ্ট উচ্চারিত হইল,—কিন্তু কে উচ্চারণ করিল? চমকিয়া উঠিয়া এল র‍্যামি চারিদিকে চাহিলেন,-ঘরে জনপ্রাণীও নাই,—এবং লিলিথ মৃতবৎ অসাড়। ঘরের চতুর্দ্দিক আলোক ও বর্ণের সামঞ্জস্যে অত্যুজ্জ্বল, তথাপি সমস্তই যেন তাঁহার নিকট সহসা শুষ্ক, শীর্ণ ও শীতল বোধ হইতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন,—ভাল করিয়া চোখদুটী রগড়াইলেন,—রগদুটো যেন টনটন করিতে লাগিল, মনে হইল যেন তাঁহার ভিতরটা গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

পরক্ষণেই, দ্বিতীয়বার পর্য্যবেক্ষণে তাঁহার নজরে পড়িল যে "খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যবর্গের" ছবিখানির আবরণ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এ-ঘটনা পূর্ব্বে তিনি লক্ষ্যই করেন নাই। জ্যারোবা কি অসাবধানে ঐ আবরণখানা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে? অল্পে অল্পে তাঁহার দৃষ্টি ছবিখানির দিকে আকৃষ্ট হইল,—অল্পে অল্পে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত অক্ষরগুলির উপর তাহা নিবদ্ধ হইল—

"বল দেখি, আমি কে?"

সে মুহূর্ত্তের জন্য ঐ প্রশ্নটীই যেন আর সমস্তকেই ছাপাইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল, এবং উহার একরোখা দাবী ঝাড়িয়া ফেলাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

"একজন সৎ লোক",—চিত্রমূর্ত্তিটীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"সৎ লোক, দরিদ্রের উপকার করবার নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি আর মহৎ আগ্রহে পথভ্রান্ত। একটা লোক,—সম্মোহনবিদ্যায় সুপণ্ডিত, তা'র সাহায্যে মানবদেহের ও সমাজদেহের বিবিধ ব্যাধি প্রতীকারে পারদর্শী,—তা' ছাড়া দৃষ্টি-বিভ্রম-নৈপুণ্যও কিছু কিছু দক্ষ। তবু, এ সব মানলেও, এমন সৎ লোক, জ্ঞানী ও পবিত্রচেতা, যে জগতের শাসক-সম্প্রদায় তা'তে শান্তিতে থাকতে পারে না—এত সৎ ও দিব্য-দর্শী, যে মৃত্যু ছাড়া অন্য পুরস্কার পাবার যোগ্য নয়। ঐশী?—না!—অর্থাৎ আমরা সকলেই আমাদের উচ্চতম লগ্নে যে ভাবে ঐশী, তা'র অতিরিক্ত নয়। এখনও বিরাজিত? স্বর্গের যুবরাজ, অত্যাচারের বিরুদ্ধবাদী? না, না!—তার বেশী নয় যেমন বিরাজিত এই লিলিথের আত্মা যাকে আমি খুঁজে ফিরি, কিন্তু যা' বুঝি বা কোনোকালেই পাবো না।"

অতঃপর, যে দ্বিরদ-নির্ম্মিত পালঙ্কোপরি সাটিন-শয়নে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তাঁর উচ্চাভিলাষ-স্বপ্নের অদ্বিতীয় রহস্য সেই নিদ্রিত বিস্ময়টুকু পড়িয়া আছে, সেই দিকে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন; ঝুঁকিয়া পড়িয়া শায়িতার হাতদু'খানি স্পর্শ করিলেন,—অত্যন্ত শীতল বোধ হইল,—কিন্তু আপন হাতদু'টীর উপর তুলিয়া লইবার পর তাহা কতকটা উষ্ণ হইয়া উঠিল এবং একটু কাঁপিল। আরও ঝুঁকিয়া পরিয়া তিনি বুভুক্ষু, প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক ও গর্ব্বিত দৃষ্টিতে তাহার অবয়বখানির প্রতিস্থানের সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিলেন।

"লিলিথ! লিলিথ আমার!" অনুচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"কি জন্যে আমি চিরস্থায়ীত্বের আশায় ভোগ-সুখকে পেছিয়ে রাখি, যখন অন্ততঃ বছরকতকের জন্যেও ভোগসুখ পাওয়া যেতে পারে। একজন শুধু জন্মাতে আর মরতে পারে—এই তার শেষ। আর প্রেম, সে একবার মাত্র আসে,..... প্রেম!—ও জিনিসকে আমি কতবার উপহাস করেছি, অবজ্ঞা করেছি, যেন সে একটা খেল্‌না মাত্র! আজও, যখন আমার সমস্ত চিত্ত তা'র জন্যে উন্মুখ, তখনও এই কথাটাই শুধু মনে জাগছে যে তা'র বিশেষ কোনো মর্য্যাদা আছে কি না! বেচারী লিলিথ!—নারী মাত্র,—নারী, যার রূপ দু'দিনেই ঝরে যাবে, দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরিয়ে আসবে—যা' অমর আত্মা নয়;—না, না, অমর আত্মা বলে' কিছু নেই, থাকতে পারে না।"

ক্ষণকাল কি ভাবিয়া এল র‍্যামি তাহার ক্ষীণ মণিবন্ধটী আপন মুষ্টি মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং আদেশ-সূচক কণ্ঠে ডাকিলেন—"লিলিথ! লিলিথ!"

অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না,—পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অকস্মাৎ কাঁপিতে আরম্ভ করিল, এবং যথারীতি তাহার উদ্ভিন্ন ওষ্ঠ হইতে বাহির হইল—"আছি এখানে।"

"এতক্ষণে? কিন্তু অনেকদিন অনুপস্থিত ছিলে তুমি"—কতকটা তিরস্কারের স্বরেই এল র‍্যামি বলিলেন—"অনেকদিন। তারপর তোমার অঙ্গীকারও তুমি ভুলে গিয়েছো।"

"ভুলে গিয়েছি!"—সে উত্তর করিল—"হায় রে সংশয়ি! আমার মতন অবস্থাতেও কি ভুলে যাওয়া সম্ভব?"

তাহার তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ এল র‍্যামিকে যেন একটু ভীত করিল, তথাপি না দমিয়া তিনি কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

"তবে তা' রক্ষা করনি কেন?"—তিনি বলিলেন—"খুব বেশী ধৈর্য্যশীলের পক্ষেও ক্লান্তি দেখা দেয়। তোমার অভিপ্রায়-মত অনেকদিন আমি অপেক্ষা করেছি—কিন্তু এখন—এখনও অপেক্ষা করা আমার পক্ষে কষ্টকর দাঁড়িয়েছে।"

শায়িতার উদ্ভিন্ন ওষ্ঠপথে একটী বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

"আমিও ক্লান্ত"—সে বলিল—"ভগবানও ক্লান্ত; সমস্ত সৃষ্টিই ক্লান্ত—সংশয়ের বিষে।"

মুহূর্ত্তের জন্য এল র‍্যামি লজ্জা বোধ করিলেন,—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র; এই সংশয়ই তাঁহার স্বভাবের প্রবলতম অংশ,—সম্ভাব্য ভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচ।

"তুমি অপেক্ষা করতে পার না,"—বিষণ্ণ ধীরকণ্ঠে লিলিথ বলিতে লাগিল—"আমরাও পারিনে। আমরা আশা করেছি—কিন্তু বৃথা! অপেক্ষা করেছি—তাও বৃথা! মদগর্ব্বী মানুষের অহঙ্কার নত হবে না, কিম্বা একগুঁয়ে চিত্তও স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে প্রস্তুত হবে না। এই জন্যেই যা' নোয়াবে না, তাকে ভাঙতেই হবে, এবং যা' স্বেচ্ছায় আলোক প্রত্যাখ্যান করবে, তাঁকে অন্ধকারই বরণ করতে হবে। হ্যাঁ, আমার স্ব-রূপেই তোমার কাছে আসবার আদেশ আমি পেয়েছি—আমি আসবো—কিন্তু কেমন করে' তুমি আমাকে গ্রহণ করবে প্রিয়তম?"

"উৎফুল্লচিত্তে, ভালবেসে, চিন্তাতীত ও বাক্যাতীত অভিনন্দন নিয়ে!"—সানুরাগ উত্তেজনা-ভরে এল র‍্যামি বলিয়া উঠিলেন—"লিলিথ! লিলিথ! নক্ষত্র-লিপি পাঠ করতে পার তুমি, আর আমার হৃদয়ের লিপি পাঠ করতে পার না? তুমি কি লক্ষ্য করছো না যে, যে-আমি এতকাল ভালবাসার চিন্তাটাতে পর্য্যন্ত শিউরে উঠেছি, রক্তমাংসের পরিবর্ত্তে বুঝিবা লৌহ-প্রস্তরেই নিজেকে গঠিত করবার চেষ্টা করেছি—সেই আমি, ওগো বিস্ময়িনি, সেই আমি—তোমার মন্ত্রে হার মান্‌তে বাধ্য হয়েছি। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি লিলিথ, তোমাকে ভালবাসি!"

অনুরাগ-আরক্ত-মুখে, আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে, বিধৃত হাতখানি তিনি বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু লিলিথ হাতখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

"তুমি ভালবাসো আমার ছায়াকে"—বিষন্নকণ্ঠে সে বলিল—"আমাকে নয়।"

কিন্তু এল র‍্যামির উচ্ছ্বাস সে কথায় বাধা মানিল না। তিনি তাহার তরঙ্গায়িত কেশের একটী গুচ্ছ উপাধান হইতে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

"এ কি ছায়া, লিলিথ?"—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই স্বর্ণ-জাল, যা'তে আমার হৃদয় স্বেচ্ছাজড়িত পাখীর মতন বন্দী হয়ে পড়েছে, এবং সমস্ত জ্ঞানের অহঙ্কার অতল জলে ভাসিয়ে দিয়েছে? এই মধুময় অধরপুটে, এই সুন্দর আকৃতি, এই কুসুম-পেলব অঙ্গ—সমস্তই ছায়া? তা' যদি হয়, তবে যে আলোক থেকে এমন সুন্দর প্রতিবিম্ব-পাত ঘট্‌তে পারে, সে আলোকের জয় হোক্! আমাকে ভুল বুঝো না সুন্দরি,—কারণ বাস্তবিকই যদি তুমি দেবী হও, আর যে-সৌন্দর্য্য আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি তা' সেই দেবীত্বেরই প্রতিফলন-মাত্র হয়, তবে একবার—একটীবারমাত্র সে রূপ আমাকে দেখাও! যে-লিলিথকে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি এর চেয়েও সুন্দরতর লিলিথ যদি সম্ভব হয়, তবে সে স্বপ্ন-গৌরব থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না!......আমি প্রস্তুত!—আমি নির্ভয়,—আজকের রাতে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গেও চোখোচোখি দাঁড়াতে আমি পেছপাও নই!"

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন,—কিন্তু কেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। লিলিথের মুখভাবের আকস্মিক রূপান্তরই সম্ভবতঃ তাঁহার বাক্যস্রোত রুদ্ধ করিয়া থাকিবে।

"লিলিথ—লিলিথ!"—অনুচ্চ আকুলকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আমি কি খুব বেশী চ'ইছি? নিশ্চয়ই না,—না, যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে! কিন্তু আছে সে ভালবাসা—আমি বুঝতে পারি যে তুমি আমাকে ভালবাসো!"

বহুক্ষণ নীরবে কাটিল,—লিলিথকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন সে মূর্ত্তি প্রস্তর-গঠিত। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস এত ক্ষীণ যে তাহা বহিতেছে না বলিয়াই বোধ হয়; অবশেষে যখন সে উত্তর করিল, মনে হইল যেন সে স্বর কোন্ দূরদূরান্তর হইতেই আসিতেছে। "হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি"—সে বলিল—"ভালবাসি, যুগযুগান্তর থেকে যেমন ভালবেসে আস্‌ছি তেমনই ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমাকে কখনও ভালবাসো নি। তোমার ভালবাসা আকর্ষণ করাই আমার ব্রত,—আর তোমার ব্রত আমার ভালবাসা ঠেকিয়ে রাখা।"

এল র‍্যামি শুনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন অনুতাপ ও অনুশোচনার দংশনও অনুভব করিলেন।

"কিন্তু তুমি আমাকে জয় করেছো লিলিথ"—তিনি বলিলেন—"জিত তোমারই। আমিও কি স্বেচ্ছায় সানন্দে আত্মসমর্পণ করিনি? ওগো স্বপ্নচারিণি, আর কি আমাকে হারাতে চাও?"

"প্রার্থনা কর!"—কণ্ঠস্বরের আকস্মিক রৌপ্য-নিক্কণে উত্তর আসিল—"প্রার্থনা কর! অনুতপ্ত হও!"

"অনুতাপ!"—এল র‍্যামি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"অনুতাপ কিসের? এমন কি আমি করেছি যার জন্যে অনুতাপ দরকার? কোন্ অপরাধে আমি অপরাধী! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' মানুষের প্রার্থনা ও গীতাঞ্জলির বিরুদ্ধেও যিনি আত্মপ্রকাশ করেন না, এমন ভগবানে সন্দেহ করায়? যে নিষ্ঠুর অন্ধকার আমাদের ঘিরে রেখেছে, তা' অপসারিত করে' তাঁকে দেখবার চেষ্টা করায়? এর মধ্যে অপরাধ কোথায়? জগতে দুঃখের সীমা নেই, মানবের অসন্তোষ অপরিসীম,—এ দ্বন্দ্বর মাঝখানে যারা প্রমাণের ভিত্তির ওপর থেকে গতের অতীতকে' দৃঢ়বলেই আঁকড়ে ধরতে চায়, তাদের সন্তোষ-বিধানের চেষ্টা করা কি ন্যায্য নয়? না, না!—আকাশ দীর্ণ হয়ে আমার মস্তকে তার প্রচণ্ড বজ্র নিক্ষেপ করলেও 'অনুতাপ' আমি করবো না! অবশ্য, আমার সংশয় যেমন প্রবল, বিশ্বাসও বুঝি বা তেমনিই

প্রবল হবে, যদি একটিবার মাত্র ভগবান তাঁ'র সৃষ্টিকে শুনিয়ে বলেন—'এই দেখ আমি আছি!' নরক-যন্ত্রণাও আমি গ্রাহ্য করিনে, যদি পরিণামে তাঁর স্পষ্ট প্রকাশ দেখি,—দুঃখের তরঙ্গ আমি তুচ্ছ করেই চলবো, যদি শেষে তাঁকে কাছে পাই, যদি জগতের দৃষ্টিতে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারি যদি এই অবসন্ন ভীতি-কম্পিত আশাহত মানুষের কাছে প্রমাণ করতে পারি যে তিনি আছেন, তাদের দুঃখের কথা জানেন বা তাদের কল্যাণের জন্যেও ভাবেন। এই কোটী-নক্ষত্র সমুজ্জ্বল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কোনোখানে অফুরন্ত আনন্দ-উৎস যে নিশ্চয়ই আছে,—আমরা যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন-সাগরে অন্ধশক্তিতাড়িত পরিত্যক্ত অণুকণামাত্র নই, এ-সত্যের আমি প্রমাণ চাই বলে' অনুতপ্ত হব? নিশ্চয়ই না! ...এরকম অসহ্য-নির্ব্বাক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো? নিশ্চয়ই না!...না, তা' করবো না লিলিথ! ...আমার যে লিলিথকে বুভুক্ষু মৃত্যুর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি, সেই তুমিও] প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পার—প্রতিশ্রুতি যে, চর্ম্মচক্ষেই আমি তোমার অমর আত্মাকে দেখতে পাবো; ...এজন্যে তোমাকে কেউ দোষ দেবে না। কিন্তু যে ভগবানের প্রমাণ নেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করবো না, কিম্বা যা' অপরাধ বলে সাব্যস্ত হয় নি তার জন্যে অনুতাপও করবো না!"

এল র‍্যামি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বীণাধ্বনিবৎ মধুর কণ্ঠে লিলিথ বলিল;—

"জগতের দুঃখের জন্যে তুমি ভগবানকে তিরস্কার করতে চাও? এ অভিযোগ অসঙ্গত। একটী নিয়ম আছে—তা' বিশ্ব-নিয়মও বটে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও নিয়ম; আর ভগবান, নিজেকে কিম্বা তাঁর ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংশ না করে' সে নিয়মের একচুলও বদল করতে পারেন না। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষ ইচ্ছা করেই দুঃখ পায় বলে', সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত শৃঙ্খলা সমস্ত সৃষ্টি কি ধ্বংশ হয়ে যাবে? তোমার জগত তা'র প্রত্যেক কাজেই এই নিয়মের ইঙ্গিত অস্বীকার করেছে—তাই এই দুঃখ। যে সমস্ত জগত এই নিয়মকে স্বীকার করে ও সার্থক করে তোলে, তা' চিরদিনই কল্যাণ-সুন্দর।"

"এ নিয়ম জানবে কে?"—অধীরকণ্ঠে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"যা' প্রকাশ করা হয় নি তা'র বিরুদ্ধতাই বা কেমন করে' হতে পারে?"

"হয়েছে প্রকাশ করা"—লিলিথ বলিল—"প্রত্যেক প্রাণীর গভীরতম বোধিমূলে তা' স্বতঃপ্রকাশিত। নিয়ম তোমরা সকলেই জান এবং অনুভবও কর,—কিন্তু জেনেও তা' অগ্রাহ্য কর। ভগবৎ-বিধি চায় যে মানুষ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে বাস করুক; কিন্তু তোমাদের জগত পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত,—ফল অকল্যাণ! স্বাস্থ্যের একটী নিয়ম আছে যা' জোর করে কাউকে পালন করানো যায় না—বেশী ভাগ লোকই তা' অমান্য করে—ফল দুঃখ। প্রয়োজনের একটী নিয়ম আছে—কিন্তু মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্তও আত্মসাৎ করে' তা'র ভাইগুলির ভাগ কম পড়িয়ে দেয়—ফল, অশান্তি। প্রেমের একটী নিয়ম আছে—কিন্তু মানুষ তাকে কামে পরিণত করে—ফল, অবসাদ। সমস্ত পাপ, সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত দুঃখ ঐ নীতি-বিরুদ্ধতারই ফল,—ভগবান এ নিয়ম বদ্‌লাতে পারেন না, কেননা তিনি স্বয়ং ঐ রীতির ও তা'র চরিতার্থতা'রই অঙ্গ।"

"আর মৃত্যু—তাও কি ঐ নিয়ম?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃত্যু, যা' সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাবতীয় বস্তুতে উপসংহার নিয়ে আসে?"

মৃত্যু বলে' কিছু নেই"—লিলিথ উত্তর করিল—"বারংবার এ কথা তোমাকে বলেছি। ও-নাম যাকে তুমি দিতে চাও, প্রকৃতপক্ষে তা' জীবন।"

"প্রমাণ কর!" উত্তেজিতকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"প্রমাণ কর লিলিথ! নিজেকে প্রকাশ কর। এই তোমার সুন্দর দৃশ্যমান মূর্ত্তির অতিরিক্ত কোনো রূপ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবে তা' আমাকে দেখ্‌তে দাও। সংশয়ের জন্যে অনুতাপ কিম্বা করুণার জন্যে প্রার্থনার কথা তার পরে!"

"অনুতাপ অবশ্যই তুমি করবে"—বিষন্নকণ্ঠে লিলিথ বলিল—"তা' ছাড়া, শিশু যেমন করে' প্রার্থনা করে, তুমিও ঠিক তেমনিই করবে। হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখা দেবো; অপেক্ষা কর! ভ্রান্ত প্রিয়তম আমার! অপেক্ষা কর! কি প্রেম, কি অঙ্গীকার, কিছুই ব্যর্থ হবার নয়। কিন্তু মনে রেখো, এখনও তুমি প্রস্তুত হওনি,—তোমার ইচ্ছা, তোমার আকুলতা, তোমার আবেগ, সময় হবার আগেই জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে আস্‌ছে,—

মনে রেখো, যদি আমি আসি, তবে তা' চলে যাবারই জন্যে, আর সে-যাওয়া চিরকালেরই মত !”

“না, না !”—ক্ষুব্ধ উত্তেজনায় এল র‍্যামি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“চলে যাবার জন্যে নয়, থাকবারই জন্যে !—আমার সঙ্গে, ওগো দেহে-মনে আমার লিলিথ, আমার সঙ্গেই অনন্তকাল থাকবার জন্যে !”

তাঁহার শেষ কথাগুলি যেন কোনো অদৃশ্য আততায়ীর বিরুদ্ধেই সজোরে নিক্ষিপ্ত হইল। কম্পিত-হৃদয়ে তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—কারণ, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অরণ্যের আর্ত্তধ্বনির মত একটা গুরুগম্ভীর আশ্চর্য্য শব্দ-তরঙ্গ কক্ষমধ্যে শ্রুত হইতেছিল। ঈষৎ-ভীতি-স্পন্দিত-বক্ষে, সমগ্র প্রাণশক্তি চক্ষে কেন্দ্রীভূত করিয়া লিলিথের সুন্দর অবয়বখানির দিকে তিনি একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে দেহখানি পাণ্ডুর হইতে পাণ্ডুরতর হইয়া যাইতেছিল,—তথাপি......অনিমেষ পর্য্যবেক্ষণে নিমগ্ন থাকায় তিনি নড়িতে বা কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল,—মনে হইতেছিল, যেন নশ্বরতা ও অপরিসীমার মধ্যে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে, একবিন্দু বিকম্পিত আলোকের মত একটী মাহেন্দ্রক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবনটা শূন্যে দুলিতেছে, আর তিনি—বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটী অণুকণা—প্রধানতম ভগবৎ-রহস্যের প্রকাশ-প্রতীক্ষায় বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সত্যই কি তাহা প্রকাশ পাইবে ?—না এখনও চাপিয়া রাখা হইবে ?

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

কালের খেয়াল।

—:•:—

বুঝতে নারি কাল যে রাখে কো'টাকে
ফুলটী রেখে দগ্ধ করে বনটাকে।
উড়ায় গিরি শোষণ করে সিন্ধুকে.
অমর করে ক্ষুদ্র নীহার বিন্দুকে।
এক ঘটী জল কোথায় দিলে কে কারে
যুগ ধরিয়া খপর দিতে সেই পারে।
কোথায় রাজার কুমার গেল ঘর ছেড়ে,
তাহার লাগি অশ্রু ঝরে ঝর্ ঝরে।
রইলো পতির পতিত দেহ আগলে কে,
কালের বুকে রইলো তাহার দাগ লেগে।
কোনটা থাকে বৃহত্ব না বহুত্ব,
কাল বলিছে' কেবল থাকে মহত্ব।
রাখতে পারি সত্য শিবে সুন্দরে
আর যা' দেখি সবেই এসে ঘুণ ধরে।
মহত্ব যে পারেই দিতে স্থায়িত্ব,
সরস করে, গড়ে অমর সাহিত্য।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

স্বরাজ।

—:*:—

কবি বলিয়াছেন :—

বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই রণে পটু নই।
ইচ্ছা হয় মনে মনে ধরাপতি হই॥

রাজত্ব করিতে হইলে যে যে গুণের প্রয়োজন এই দুই পংক্তি কবিতায় নিঃশেষে সেই গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে :—জ্ঞান, বুদ্ধি ও রণ পটুত্ব। যখনই শুনিতে পাই যে আমাদের দেশের লোক স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চীৎকার করিতেছে তখনই আমার মনে এই দুই পংক্তি কবিতার উদয় হয়। আমাদের জ্ঞানের পরিণাম কি? তাহার বিস্তার এবং গভীরতা কিরূপ? সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন, নৌ-নির্ম্মাণ, নৌ-পরিচালন, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি শত সহস্র বিষয়ের জ্ঞান আমরা কি পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছি যে আমরা জ্ঞানসম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি? আমাদের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত? ভারতবর্ষে ত্রিশ কোটী লোকের বাস; তাহার মধ্যে যদি একলক্ষ লোকও এমন শিক্ষা পাইয়া থাকেন যে তাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন তাহা হইলেও তিন শত লোকের মধ্যে একজন মাত্র সুশিক্ষিত। কোন একটা গ্রামে যদি অধিবাসীর সংখ্যা তিন শত হয় এবং তন্মধ্যে যদি একজন মাত্র সুশিক্ষিত থাকেন তাহা হইলে কি সেই গ্রামবাসীগণ বিদ্যালোক সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত? কিন্তু আমার বোধহয় সমস্ত ভারতবর্ষে এমন এক সহস্র লোকও নাই যাহাদিগকে সুশিক্ষিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অধিবাসী ও সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যার অনুপাত ৩,০০,০০০ : ১। এই ত আমাদের বিদ্যা বা জ্ঞানের দৌড়। ইহা লইয়াই আমরা দেশোদ্ধার ও স্বরাজ স্থাপন করিবার প্রয়াস করি।

তাহার পর বুদ্ধির কথা। বাঙ্গালীরা বিশেষরূপে বুদ্ধির জন্য গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কখন কখন বুদ্ধিমান বলিয়া তাঁহাদের আস্ফালনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি দ্বারা সংসারে সুখে থাকিবার কি উপায় আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা কি আমরা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি? টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে বিদ্যুদ্‌ব্যজন, গ্যাসের আলো, জলের কল, এবং আরও জনসুখ বর্দ্ধনের নানারূপ উদ্ভাবন ইহার কোন্‌টা আমাদের বুদ্ধিবলে সাধিত হইয়াছে? দেশের সুখবর্দ্ধন বুদ্ধি দূরে থাকুক আমাদের বুদ্ধি যেরূপ কলুষিত হইয়াছে তাহার ফলে দেশে দুঃখেরই বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সকলেই জানি এবং মুখে বলি যে দশজনে মিলিয়া কাজ করাই ভাল। কিন্তু আমরা, বাঙ্গালীরা, কি দুইজনে মিলিয়াও একটা কাজ করিতে পারি? আমাদের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পৃষ্ঠদংশন প্রভৃতির জন্য একটা যৌথ ব্যবসায়েও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বঙ্গলক্ষ্মী মিলের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত কিভাবে তাহা পরিচালিত হইতেছে তাহা সঞ্জীবনীর পাঠকগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাহা লইয়া দেশের গণ্যমান্য কয়েক ব্যক্তি কিল্‌কেনি (Kilkenny) সার্জ্জারের মত কিরূপ বিবাদ করিতেছেন তাহাও অংশীদারগণ উত্তমরূপে দেখিতেছেন। পরশ্রীকাতরতা যদি একটা দোষ হয় তাহা হইলে পরশ্রীকাতরতা অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা নহে। আমরা এমনই পরশ্রীকাতর যে দেশের কোন লোক গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেই আমরা একেবারে হিংসায় জ্বলিয়া মরি। লর্ড সিংহ একটা প্রদেশের গবর্ণর হইলেন ইহাতে আমরা কোথায় গর্ব্ব অনুভব করিব তা না আমরা তাঁহার নিন্দা ও কুৎসা এবং তাঁহাকে অপমানিত করিবার চেষ্টা এমনভাবেই করিয়াছি যে তাহাতে আমাদের সভ্য সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া দেশের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন অথচ প্রথম হইতেই দুইখানা সংবাদপত্র কেবল তাঁহার কুৎসা করিয়াছে। বয়স, জাতি, বংশ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, উদ্যম, বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত গুণ একত্র করিয়া ধরিলে সুরেন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ সে বিষয়ে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি দেশের জন্য যে সকল অধিকার চাহিয়াছেন সেই সকল অধিকার তাঁহারই হাত দিয়া দেওয়াইবার জন্যই পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে মন্ত্রীরূপে বরণ করিয়াছেন এবং তিনিও সেই চেষ্টাই করিতেছেন। অথচ পূর্ব্বে কেবল দুইখানা কাগজ তাঁহার বিপক্ষ ছিল এখন দেশের সমস্ত লোক তাঁহার বিপক্ষতাচরণ

করিতেছে তিনি যেখানে যাইতেছেন সেখানেই তাঁহাকে অপমানিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। দেশ কি বলিতে পারে যে সুরেন্দ্রনাথকে অপসারিত করিয়া অমুক ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগ করিলে ভাল হয়? কেহ কি বলিতে পারেন যে দেশের কোন অনিষ্ট তাঁহাদ্বারা সাধিত হইয়াছে? তিনি এখন গবর্ণমেণ্টের অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন এই কথা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুগত হইয়া যদি দেশের হিত সাধন করা যায় তাহা হইলে সেরূপ করায় দোষ কি? দেশের যত প্রধান লোক সকলেরই ত এক মত যে গবর্ণমেণ্টের অনুগত হইয়াই দেশের হিতসাধন করিবার চেষ্টা করা উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহাই বলিতেন—কেশবচন্দ্র সেনও তাহাই বলিতেন। কেশবচন্দ্র সেন একাধিক স্থলে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্য ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে (by special providence) এদেশে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উচ্ছেদ করিয়া স্বরাজ স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে তাঁহাদের রণ-পটুত্ব লইয়া ইংরেজের কামান, রণতরী বিমান প্রভৃতির সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্যও প্রতিযোগিতা করিতে পারেন কি না। স্বর্গগত গোখলে বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট পাঁচ মিনিটে আমাদিগকে নিষ্পেষিত করিতে পারেন (The Government can crush us in five minutes). আর যদি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াই আমাদের দেশ আমাদিগকে দিয়া আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান তাহা হইলেই বা আমাদের দশা কি হইবে তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। তাহা হইলে সম্রাট হইবেন মহম্মদ আলি এবং রাজত্ব করিবেন মুসলমানেরা। তখন যে মোপলা কাণ্ড পুনরভিনীত হইবে তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেরূপই হউক ইংরেজ ইচ্ছা করিয়া চলিয়া গেলে অথবা ইংরেজের সহিত বিরুদ্ধতা করিলে—দেশে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। সুতরাং সেরূপ চিন্তা করাও নির্ব্বোধের কার্য্য। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা আমাদিগকে সম্পূর্ণ বিনাশের পথে লইয়া যাইবে। লাটিন ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যে Quos Deus vult perdere, prius dementat অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন অগ্রে তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দেন। ৺লালমোহন ঘোষ যে মহা বুদ্ধিমান এবং তেজস্বী ছিলেন তাহা এখনকার বাঙ্গালীরাও অনেকেই ভুলিয়া যান নাই। একবার একজন ইংরেজ, বাঙ্গালীদিগকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া ঢাকার এক সভায় ঘোষ মহাশয়

তাহার যে তীব্র উত্তর দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীর মনে বহু দিন থাকিবে। সেই লাল-মোহন ঘোষও বলিতেন যে ইংরেজের সাহায্য ভিন্ন আমাদের কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এখানে একটা সত্য গল্প বলিতেছি। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যিনি এক্ষণে মানসী ও মর্ম্মবাণীর সম্পাদক তিনি ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরে থাকিয়া ব্যারিস্টরি করিবার সময়ে প্রবাসী পত্রিকায় Spiritualism (প্রেততত্ত্ব) বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া বহুলোক ত্রিপদ-মঞ্চ বা টেবিল প্রস্তুত করিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে স্পিরিট আনাইতেন। (এই স্থলে অবান্তরভাবে একটা কথা বলি। ইংরেজী Tableকে বাঙ্গলায় টেবিল বলা হয়। কিন্তু টেবিলের লাটিন নাম Menja। ইহা যে সংস্কৃত মঞ্চ শব্দেরই রূপান্তর সে বিষয়ে সন্দেহ হয় না। সুতরাং টেবিলের সাহিত্যিক বাঙ্গলা মঞ্চ কি চলে না?) এই ত্রিপদ মঞ্চের সাহায্যে নানা স্থানে নানা ব্যক্তির প্রেতাত্মা আসিয়া নানা লোকের নানা প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। সেই সকল প্রশ্নের অনেক উত্তরে যে ভবিষ্যদ্ বাণী সূচিত হইত তাহা পরে সমস্তই সফল হইয়াছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তখন মাণিকতলার বোমার মকদ্দমা চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পিতার প্রেতাত্মা এক সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে বড়ই বিষণ্ণ বোধ হইল। বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইলেন যে অরবিন্দের বিরুদ্ধে মকদ্দমা হইয়াছে বলিয়াই তিনি বিষণ্ণ। প্রশ্ন হইল "অরবিন্দ কি দোষী?" স্পিরিট্ জানাইলেন "না।" অরবিন্দের কি শাস্তি হইবে? উত্তর হইল "না।" "বারীন্দ্র কি দোষী" পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করায় ও স্পিরিট্ উত্তর দিলেন না। বারীন্দ্রের কি ফাঁসী হইবে? তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল না। যখন এইরূপ নানা স্থানে প্রেতাত্মারা অবতারিত হইতেছিলেন তখন রঙ্গপুর শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, দিন মহম্মদ গাঙ্গুলী প্রভৃতির একদল আন্দোলনকারী রঙ্গপুরে পঁহুছিলেন। সেই সময়ে এক ব্যক্তি একটী স্পিরিট্কে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইংরেজ রাজত্ব আর কতদিন স্থায়ী হইবে?" উত্তরে পাঁচটা শব্দ হইল। সকলেই মনে করিলেন যে সেই পাঁচটা শব্দের অর্থ পাঁচ বৎসর। ইহাতে রঙ্গপুর ময় মহা উত্তেজনার সঞ্চার হইল। নানা স্থানে প্রেতাত্মা সভা বসিতে লাগিল এবং প্রত্যেক স্থানেই পূর্ব্বের মত পাঁচটা শব্দ হইতে লাগিল। অবশেষে

এক সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেতাত্মা আহূত হইয়া তিনি ও সেই প্রশ্নের উত্তরে পাঁচটা শব্দ ক'রলেন। তখন প্রশ্ন হইল "পাঁচটা শব্দের অর্থ কি পাঁচ দিন?" উত্তর "না?" "তবে কি পাঁচ সপ্তাহ?" উত্তর "না।" প্রশ্ন "তবে কি পাঁচ মাস?" উত্তর "না।" প্রশ্ন "তবে কি পাঁচ বৎসর?" এবার ও উত্তর হইল "না।" "তাহা হইলে পাঁচ শত বৎসর?" তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল "হাঁ।"

আমার নিজের ও বিশ্বাস যে পাঁচ শত বৎসরের কমে আমাদের জাতীয় জড়তা, মূর্খতা, জাতিভেদ প্রভৃতি দোষ ও অন্তরায়ের মূলোৎপাটন হইবে না। তাহাও যদি আমরা ইংরেজের অন্তবাসী থাকি তবেই হইবে নতুবা নহে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ রাজ্যভার আমাদের উপর থাকিলে আমরা কেবল পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিব। একদল আর এক দলকে হয় মুসলমান, না হয় বৈষ্ণব না হয় শাক্ত করিতে চাহিবে, প্রত্যেক দলই অপরদলকে নিজের মত ও আদেশ মানাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং পদে পদে শান্তিভঙ্গ হইবে, পদে পদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হয় হারাইতে হইবে না-হয় তাহা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। যাহারা ইংরেজ রাজত্বের কেবল দোষই দেখেন তাঁহারা একটু চিন্তাকরিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে ইংরেজ রাজত্বে আমরা যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে নিরুপদ্রবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি তেমন আমরা কখনও ছিলাম না। ইংরেজ রাজত্বের বা ইংরেজদের কোন দোষই নাই এরূপ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে তুলনায় সমালোচনা করিলে সেই দোষ অতি ক্ষুদ্র। আমরা যেখানে যখন ইচ্ছা যাইতে পারি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দেন না। আমরা বিলাসভবন নির্ম্মাণ করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দেন না। পূর্ব্বের কথা দূরে থাকুক এখনও অনেক জমীদার নিজের প্রজাদিগকে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিতে দেন না। আমরা ছাগ মাংস, বরাহ মাংস, কুক্কুট মাংস যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে পারি গবর্ণমেণ্ট বাধা দেন না। কেবল যখন মানুষের প্রতি অত্যাচার হয় তাহাই নিবারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ, চড়ক, গঙ্গাসাগরে শিশু হত্যা, রাজপুতানায় বালিকাদিগকে জীবিত অবস্থায় প্রোথিত করা প্রভৃতি নিষেধ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি যে শিক্ষা গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দিতেছেন তাহার কি কখন ও তুলনা ছিল? এরূপ সার্ব্বভৌম শিক্ষাদানের,

ব্যাধি নিবারণের, চৌর দস্যু ভয় দমনের আয়োজন ভারতবর্ষে কি আর কখনই হইয়াছিল ?

জনসাধারণের অন্ন বস্ত্রাভাবে বড় কষ্ট হইতেছে স্বীকার করি ? কিন্তু সে জন্য কি গবর্ণমেণ্ট দায়ী ? আমরা যদি শ্রমবিমুখ ও অনাগত বিধাতা হইয়া অপব্যয় করি, নিজের ক্ষেত্রে ব্রীহি উৎপাদন না করি, রাতারাতি ধনী হইবার আশায় আমাদের সঞ্চিত শস্য বিদেশী লোককে বিক্রয় করিয়া পরে আহারাভাবে কষ্ট পাই সে জন্য কি গবর্ণমেণ্ট দায়ী ? আমরা সকলেই নিজ নিজ ভূমিতে শস্য উৎপাদন, নিজ গৃহে খাদ্য পশু পক্ষী পালন, পুষ্করিণীতে মৎস্য সঞ্চয় করি, মহাত্মা গন্ধীর উপদেশ মত চরখা করিয়া বস্ত্র বয়ন করি তাহা হইলে কখনই আমাদের অন্ন ও বস্ত্রাভাব জনিত কষ্ট হয় না। প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেক সুস্থকায় নর নারী যদি প্রত্যহ পাঁচখানা করিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া রাখে তাহা হইলে দশ বৎসরে প্রত্যেক গৃহস্থই ইষ্টকালয় ও ইষ্টক কূপ নির্ম্মাণ করিতে পারে। তাহা হইলে সমস্ত দেশের লোকের স্বাস্থ্যের ও উন্নতি হয়। এরূপ করিলে স্বাবলম্বী হইলে কি গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দিবেন ? কখনই না। অন্যপক্ষে স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চেঁচামেচি করিয়া পরস্পর মারামারি করিলে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে শান্তি রক্ষার জন্য নিগ্রহ করিতে বাধ্য। আমরা যদি সেরূপ করি তাহা হইলে কেবল আমাদের নিজের নহে, আমাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা সকলেই অশেষ কষ্ট ভোগ করিবেন। আর একটা কথা এই যে সমাজ যে রূপেই গঠিত হউক না কেন, দুঃখ ও দারিদ্র্য সংসার হইতে কখনই একেবারে যাইবে না। দ্রোণাচার্য্য এমন দরিদ্র ছিলেন যে পুত্র অশ্বত্থমাকে দুগ্ধ দিতে পারিতেন না। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যেমন দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা করিয়া থাকেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে যেমন খাদ্য বিতরণ করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, ব্যাধিপীড়িত দিগকে যেমন ঔষধ বিতরণ করেন এমন পূর্ব্বে কোন গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন ? প্লেগ নিবারণকল্পে পীড়িত লোকদিগকে পৃথক্ স্থানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বড়ই অপ্রিয় হইয়াছিলেন। হিন্দু রাজত্বের সময়ে কি করা হইত তাহা যাঁহারা জানে তাঁহারা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দিবেন। এক গ্রামে প্লেগ হইয়াছিল। রাজা সেই গ্রাম প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া আগম-নির্গম বন্ধ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য গ্রামবাসী অচিরাৎ সকলেই মরিয়া গেল। সত্য না হইলে দশকুমার চরিতে এরূপ গল্প স্থান পাইত না।

এই সকল স্মরণ করিয়া এবং গবর্ণমেণ্ট এমন কি স্বয়ং সম্রাট্ সম্প্রতি যে আশ্বাস বাণী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন তাহা ভাবিয়া আমাদের উচিত ছিল যে আত্মকলহ পরিত্যাগ করিয়া আমরা কায়মনোবাক্যে গবর্ণমেণ্টের সংযোগিতা করি। কিন্তু ঠিক এই সময়েই যে আমরা শয়তান প্রণোদিত হইয়া অসহযোগিতা অবলম্বন করিলাম এবং নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলাম ইহাতে আমার বোধহয় যে আমাদের ভাগ্যে আরও অনেক দুঃখভোগ আছে। ইহার সমান্তরাল একটা গল্প আছে। একদিন মহাদেব ও পার্ব্বতী যদৃচ্ছা ভ্রমণকালে দেখিতে পাইলেন যে একটী অতি দরিদ্র ক্ষুৎক্ষাম লোক শিব পূজা করিতেছে। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে-ব্যক্তি এমন শিবভক্ত তাহার এমন দুর্দ্দশা কেন? মহাদেব বলিলেন যে এখনও তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার ভাগ্যে এখনও দুঃখভোগ আছে। পার্ব্বতী বলিলেন তুমি আমি যাহার প্রতি প্রসন্ন তাহার দুর্ভাগ্য কতক্ষণ থাকিতে পারে? মহাদেব বলিলেন তুমি চেষ্টা করিয়া দেখ তাহার দুর্ভাগ্য ঘুচাইতে পার কিনা। পার্ব্বতী তখন সেই দরিদ্রের গৃহে ফিরিবার পথ-পার্শ্বে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়াইয়া রাখিলেন ইচ্ছা যে লোকটী যখন সেই পথ দিয়া যাইবে তখন সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই তাহার দারিদ্র্য মোচন হইবে। লোকটীর পূজা সমাপন হইলে সে গৃহের দিকে চলিতে লাগিল। যেখানে মুদ্রাগুলি বিক্ষিপ্ত ছিল সেখানে আসিয়া তাহার মনে হইল ভাল, চোক্ বুজিয়া চেনা পথে হাঁটা যায় কিনা? এই ভাবিয়াই সে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিল এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতে লাগিল। যখন মুদ্রা ছাড়াইয়া গেল তখন সে চক্ষু খুলিল সুতরাং একটা পয়সাও সে পাইল না। তখন মহাদেব ভগবতীকে বলিলেন "দেখিলে, তোমার অনুগ্রহ হইলে কি হয় লোকটার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই এখনও তাহার ভাগ্যে দুঃখভোগ আছে।" আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ নহে কি? সম্রাট্ প্রমুখ গবর্ণমেণ্ট আমাদের অবস্থা ভাল করিয়া দিবেন বলিলেন আর আমরা ঠিক সেই সময়েই তাঁহাদের বিরুদ্ধে চীৎকার আরম্ভ করিলাম।•

অসহযোগিতা মানুষকে ক্ষুদ্রচেতা করিয়া থাকে। এই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল বলিয়া এ বিষয়ে সংক্ষেপে দুই একটা মাত্র কথা বলি। যাহারা বাল্যকাল হইতে স্কুলের প্রাসাদ তুল্য গৃহে অধ্যয়ন করে এবং তদনুরূপ অন্য বড় বড় বাড়ীতে কখন কখন গিয়া থাকে তাহাদের

মনে অবশ্যই এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয় যে তাহারাও বড় হইয়া এইরূপ বাড়ী তৈয়ার করিবে এবং তাহাতে বাস করিবে। এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে হিতকর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বালক সহযোগিতা ত্যাগের মাঝে গাছতলায় স্কুলে ঘাসের উপর অথবা ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া পাঠাভ্যাস করে তাহার হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মিবে কিরূপে? বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের মনে যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদয় না হয় তাহা হইলে সেই জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সার্থকতা।

-:০:-

হে সুন্দরী সৌন্দর্য্য কোথায়?
রূপ কি ঘুমায়ে তব কায়ার ছায়ায়?
বর্ণে বর্ণে রেখা-চিত্রে যার অন্বেষণে—
ব্যস্ত চারু চিত্রকর তুলি-সঞ্চালনে।
হে রমণী রমণীয় সে রূপ প্রভায়
ভুলায়েছ বিশ্বে বুঝি চটুল খেলায়।
কিন্তু কোথা সার্থকতা তার
নিদ্রিত বালিকা বুকে যৌবন-প্রভার?
অথবা চঞ্চল লাস্য তারুণ্যের খেলা
উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা মাঝে দু'দিনের মেলা?
কিম্বা শেষ জীবনের অন্তিম শয়নে
ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদা রূপের কারণে?

হায় এত মাদকতা যার
তাহারে ধরিতে নাহি ক্ষমতা কি কার ?
আছে বটে ভাস্করের মর্ম্মর ফলকে
সযত্ন খোদিত শিল্পী-মানস-পুলকে।
কিন্তু বল তবু হায় প্রাণ কোথা তার
সে যেন রূপের স্বপ্ন মূর্ত্ত হাহাকার।
অয়ি নারি ! ছন্দে ছন্দে চঞ্চল গমনে—
সার্থক তোমার রূপ কবির কলমে।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

বিচার।

—:০:—

নরেশ আসিয়া কহিল তোকে এর মধ্যে থাকতেই হবে।

আমি কহিলাম নিশ্চয়ই থাকব। তবে তোদের সঙ্গে আমি যেতে পারব না।

নরেশ চটিয়া উঠিয়া কহিল ওরকম নবাবী থাকা আমরা চাই না। তুই একটা Coward তাই আমাদের সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছিস্।

আমি কহিলাম গায়ের জোরে সবই বলতে পারিস। আমার গায় তেমন শক্তি না থাকলেও আমি Coward নই। আমি গেলে সবারই মুস্কিল হবে বলে দিচ্ছি।

এমন সময় থার্ড মাষ্টার আসিয়া ডাকিলেন কেষ্ট ! তোর বাবা কোথায় রে ?

চেয়ারটা হইতে বই সরাইয়া আমি তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বাবাকে ডাকিয়া দিলাম নরেশ সুবিধা না পাইয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টা বাজার মিনিট দশেক পূর্ব্বে ক্লাসে গিয়া বসিতেই দেখিলাম নরেশ টরেশ সকলেই আসিয়াছে। আর তাহারা সকলে মিলিয়া আমার বিষয় লইয়া আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে।

উমেশ কহিল তোর ভাই ভারী অন্যায়। আমাদের ক্লাসের সবাই যদি এতে না থাকে তবে অন্য ক্লাসের ছেলেরা কেন আসবে বল দেখিন্।

নরেশ চেঁচাইয়া কহিল, আরে ওর কথা ছেড়ে দে। ও একটা Proud, হেড্ মাষ্টারের ছেলে কিনা! উনি কেন আমাদের সঙ্গে যাবেন!

আমি সবাইকে কহিলাম তোরা যখন বুঝবি না কিছু তখন আমার কথা বলাই অন্যায়। বাবাকে আমি কিছুই গোপন করতে পারি না তা জানিস ত!

এমন সময় মাষ্টার মশাই আসিলেন। আমাদের আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল। আমাদের আলোচনা আর উঠিল না। টিফনের সময় আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম। অপ্রীতিকর আলোচনা হইতে দূরে থাকাই ভাল মনে করিলাম। টিফিনের পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ক্লাসের মধ্যে পূর্ব্বের মতই কোলাহল চলিতেছে। আমি ক্লাসে প্রবেশ করিতেই সকলে চুপ করিয়া যার যার যায়গায় বসিয়া পড়িল আর একবার করিয়া আমার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি উমেশের নিকট পেন্সিল বাড়াইবার জন্য ছুরিটা চাইলাম। সে একটু হাসিয়া ঘাড় বেকাইয়া বসিল। এমন সময় নরেশচন্দ্র আসিয়া আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়া গেল। কোনও কথা কহিল না। দেখিলাম কাগজখানিতে লেখা রহিয়াছে কেষ্ট বয়কটেড্। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পণ্ডিত মশাই ক্লাসে ঢুকিয়া পড়ান সুরু করিয়া দিলেন।

বৈকালে ফুটবলের মাঠে গিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। নরেশেরা দলে পার্টি করিয়া খেলার উদ্যোগ করিল। এমন সময় নগেন আসিয়া কহিল, কেষ্ট, তুই খেলবি না? আমি একটু হাসিয়া কহিলাম, না ভাই আমাকে সবাই বয়কট্ করেচে। এমন সময় নরেশ আসিয়া কহিল, করবে না বয়কট! এমন Coward আর Proud যে তাকে বয়কট করবে না?

নরেশ অগ্রসর হইয়া কহিল, নে বক্তৃতা রাখ। তোর মত ঢের সত্যবাদী দেখা গেছে। আমরাও মিছে কথা বলতে শিখিনি জানিস। তোর বাবা যখন জিজ্ঞাস করবেন তখন আমরাও মিথ্যা বলব না।

নরেশ ছিল ক্লাসের সর্দ্দার। তার গলার স্বর সকল সময়েই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত। আর আর সকলে তাহার কথা শুনিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় যোগেশ বাবু আসিয়া কহিলেন, নরেশ, তুই থাম দেখিন্। কি চাষার মত কথা বলচিস্।

যোগেশ বাবু ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তাহাকে স্কুলের সকলেই মান্য করিত। সুতরাং নরেশকেও আসিতে হইল।

খেলা সাঙ্গ হইলে মাঠের মধ্যখানে সকলকে ডাকিয়া যোগেশ বাবু বসিলেন। নরেশকে কহিলেন—কি হয়েচে তোদের বল দেখিন্। ওকেই অপমান করেচে। ওর আপনার মুখেই শোনা ভাল।

উমেশ কহিল, "আমি কাপড় কিনে ইনাম দর্জ্জীকে সার্ট করতে দিয়েছিলাম। কথা ছিল সে ছয় আনা আজুরা নেবে আর সাতদিনের মধ্যে সার্টটা তৈরী করে দিবে। সাতদিন পর দর্জ্জীর কাছে গিয়া সার্ট চাইলাম। সে বোল্‌ল, হয় নাই। তারপর আমিও দিনের পর দিন তাগিদ দিতে লাগিলাম সেও আমাকে কাল দেবে, দুইদিন পর আসবেন বলিয়া ঘুরাইতে লাগিল। এইরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল তবুও আমার সার্ট তৈরী হইল না। আমি তখন দর্জ্জীকে গিয়া কহিলাম কথা ঠিক রাখতে পার না, দর্জ্জীগিরি করতে আস কোন মুখে। দর্জ্জী তখন চেঁচাইয়া কহিল তোর মত ছোট লোকের সার্ট আমি তৈরী করি না। এই নে তোর কাপড়। আমি অপমানিত হইয়া চলিয়া আসিলাম।

যোগেশ বাবু উমেশের কথা শুনিয়া কহিলেন, বেশ করেচিস। এর জন্য কেষ্টকে তোরা জ্বালাচ্ছিস্ কেন? তোরা সব চুপ করে থাক। যা করতে হয় আমরা করব এখন। আর কেষ্টকে ত নেওয়াই হবে না। দর্জ্জীটা ওকে চেনে। উমেশ! তোরও গিয়ে কাজ নাই। বুঝলি ত তোরা হাঁ, হুঁ, কিছু করিস না। যা করতে হয়, যাকে নিতে হয় আমরাই ঠিক করব এখন।

সুতরাং আমাদের কলহ মিটিয়া গেল। আমরা সকলে যার যার ঘরে চলিয়া গেলাম।

শনিবার দিন স্কুলের ছুটির পর যোগেশ বাবু বড় বড় পাণ্ডা ছেলে লইয়া সভা করিলেন। আমরা এক কোণে বসিয়া সকল পরামর্শ শুনিতে লাগিলাম। সে সভায় ঠিক হইল বাজারের উপর মারপিট করা হইবে না। কাল রবিবার। মাষ্টার মশাইরা সকলেই প্রায় আজ বাড়ী যাবেন। হেড্ মাষ্টার বাবুও কাল দুপুরে থানায় পাশা খেলিতে যাবেন। সুতরাং খুব সুবিধাই হবে। দর্জ্জীটাকে সেক্রেটারীর নাম করে ডেকে এনে খুব করে উত্তম মধ্যম কালই দেওয়া যাবে। উমেশ আসিয়া খবর দিবে দর্জ্জীটা আছে কিনা। আমি খবর দিব বাবা কখন থানায় চলিয়া যান। তারপর ললিত যাইয়া দর্জ্জীকে সেক্রেটারীর নাম করিয়া ডাকিয়া আনিবে। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে যোগেশ বাবু সকলকে বলিয়া দিলেন কাল যেন তারা একটার সময় বোর্ডিংএ আসিয়া জড় হয়।

পরের দিন সাড়ে বারটার সময় বোর্ডিং এ যাইয়া আমি যখন যোগেশবাবুকে কহিলাম বাবা থানায় চলিয়া গেছেন। তখনও উমেশ সেখানে আসে নাই। প্রায় দুইটা যখন বাজে বাজে তখন উমেশ আসিয়া কহিল দর্জ্জী আসিয়া দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। ইতি মধ্যেই বাহিরের ছেলেরা আসিয়া বোর্ডিংএ একত্র হইয়াছিল। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া সকলে বাহির হইয়া পড়িল। আমিও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইলাম।

আমাদের স্কুলের পশ্চিমে ছোট নীচু একটা মাঠ ছিল। তাহার দুইদিকে ছিল জঙ্গল আর পশ্চিমে ছিল একটা কাচারী বাড়ী। সে বাড়ীটায় লোকজন কেউ ছিল না। যোগেশবাবু সকলকে লইয়া কাচারী ঘরের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিলেন আর বলিলেন আমি যখন হুকুম দিব তখন যেন সকলে মিলিয়া আক্রমণ করে। আর নগেনকে কহিলেন যা, এখন দর্জ্জীকে সেক্রেটারীর নাম করে ডেকে নিয়ে আয়।

নগেন চলিয়া গেল। আমিও সেই সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ঘরের দরজা জানালাগুলা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া সদর দরজাটাতে তালা লাগাইয়া একখানি পুস্তক হাতে করিয়া আবার বোর্ডিং ফিরিয়া আসিলাম। যে ঘরে মাষ্টার মশাইরা থাকিতেন সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ড্রইং মাষ্টার, সার্ চাটার্জ্জি] মাষ্টার [কতকগুলি নূতন ড্রইং

পুস্তক মিলাইতেছেন। আমি যাইয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলাম। আর নূতন ড্রইং পুস্তকগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বাইরের লোকের ঘোড়া আসিয়া প্রায়ই স্কুলে উৎপাত করিত আর ছেলেরা লম্বা বাঁশ দিয়া সেই ঘোড়াগুলাকে পিটাইত। লাঠির শব্দ শুনিয়া ড্রইং মাষ্টার মহাশয় কহিলেন আজ আর ঘোড়াটা আস্ত থাকবে না।

চাটার্জ্জি মাষ্টার জানালা খুলিয়া দেখিতে গেলেন ঘোড়াটার অবস্থা কি দাঁড়ায়। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

জানালা খুলিয়া আবার তখনই বন্ধ করিয়া চাটার্জ্জি মাষ্টার কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! পালান শিগ্‌গির। কাকে যেন মারচে ছেলেরা। তখন পুস্তকগুলি সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া মাষ্টার মহাশয়রা পলায়ন করিলেন। আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া যে ঘরটায় সরস্বতী প্রতিমাখানি বন্ধ ছিল সেই ঘরটায় প্রবেশ করিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিলাম।

দেখিলাম হেম বাবু দর্জ্জীকে চটিজুতা দিয়া বেদম প্রহার করিতেছে আর দর্জ্জী বেচারী ছট্‌ফট্ করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। যে যেমন পারিতেছে দর্জ্জীকে কীল চড় লাগাইতেছে। মিনিট খানেক পর অবসর পাইয়া দর্জ্জী একটা দৌড় দিল, ঠিক আমাদের বাসার দিকে। ছেলেরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রথমতঃ সে আমাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দরজাটা বন্ধ থাকায় পারিল না। তাই অন্যোপায় হইয়া সে গিয়া লাউ গাছের মাচার নীচে আশ্রয় লইল। কিন্তু সেখানেও সে রক্ষা পাইল না। প্রথম গিয়া তাহার দাঁড়ি ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিঠের উপর নানাবিধ অস্ত্র আসিয়া পড়িতে লাগিল। মলেম গো বলিয়া চীৎকার করিয়া দর্জ্জী বেচারা মাটীতে পড়িয়া গেল। এমন সময় যোগেশ বাবু হুকুম দিলেন Stop সকলে সেই মুহূর্ত্তেই থামিয়া বাজারের দিকে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ঘরে বসিয়া থাকিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বরাবর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাবা তখনও আসেন নাই।

পরের দিন পড়িতেছি এমন সময় দরজায় গোড়ায় দর্জ্জী আসিয়া ডাকিল 'বাবু'। বাবা হুঁকাটা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দর্জ্জী বেচারী স্কুলের ছেলেরা যে তাহাকে বেদম প্রহার দিয়াছে তাহা বলিয়া ফেলিল।

বাবা বলিলেন, "কেন ছেলেরা এমন কল্লে বলতে পার ?"

দর্জ্জী কহিল, তাত বলতে পারি না। তবে হতে পারে উমেশবাবুর সার্টটা কাল ফিরিয়ে দিয়েচি। আর তার সাথে চটা চটা কথা হয়েছিল। তার জন্য হতে পারে।

বাবা তামাকে কয়েক টান দিয়া কহিলেন, তোমার সাক্ষী আছে কেউ ?

দর্জ্জী কহিল, না বাবু, কেউ সাক্ষী নাই। একটা লোকও ছিল না বাবু। আমি কয়েকজনকে চিনে রেখেছি। আমি তাদিগকে দেখিয়ে দিতে পারি।

বাবা কহিলেন, আমাদের কেষ্টা ওর মধ্যে ছিল ?

দর্জ্জী কহিল, আমি মিছে বলব না। কেষ্টবাবু ছিলেন না।

বাবা তখন দর্জ্জীকে কহিলেন, দেখ তুমি গিয়ে সেক্রেটারীর কাছে একবারে নালিশ কর। তিনিই এর বিচার করবেন।

দর্জ্জী সেলাম দিয়া সেক্রেটারীর নিকট নালিশ করিতে চলিয়া গেল।

আমরা দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম কোন দিন যেন শাসন দণ্ড ছেলেদের পিঠে আসিয়া পড়ে। এইরূপে একমাস কাটিয়া গেল সে বিচারের খোঁজ খবর আর পাইলাম না।

প্রায় দুইমাস পরে আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া দর্জ্জী চলিয়া যাইতেছিল। বাবা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি দর্জ্জীকে ডাকিয়া কহিলেন, কিহে, সেক্রেটারী তোমার বিচার করলেন না ?

দর্জ্জী কহিল, এ দেশে কি বিচার আছে বাবু ? সেক্রেটারীবাবু বোললেন সাক্ষী সাবুদ না থাকলে কি আবার বিচার হয় ? আর উমেশবাবু ত ছিলেন না তার নাম আমি কি করে দেই বলুন দেখি ? আর তাঁর জনাই যদি বাবুরা আমাকে মেরে থাকেন তবে ত সে বিচার

সেক্রেটারী করতে পারবেন না। তখন আমি থানায় গিয়া এক টাকা সাড়ে নয় আনা খরচ করিয়া দারোগাবাবুর কাছে দরখাস্ত লিখাইয়া দিলাম। তিনি বোল্‌লেন, বেশ ভালই হয়েচে। এইবার তুমি সদরে গিয়া ফৌজদারীতে নালিশ রুজু করিয়া ফেল। তখন আর কি কোরব বাবু। সদরেই যেতে হ'ল। সেখানে মোক্তার বাবুকে তিন টাকা চৌদ্দ আনা দিয়া দরখাস্ত লিখাইলাম। সাহেবের কাছে আমার ডাক পড়িলে আমি কহিলাম—হুজুর আমাকে বড়ই মেরেছে। সাহেব একটু হাসিয়াছিলেন। তারপর মোক্তারবাবুর কথা শুনিয়া কহিলেন আমার নালিশ একদম ঝুটমুট। সত্যি হলে আমি নাকি তিন দিনের মধ্যেই নালিশ রুজু করিতাম। হাকিম কি আর সাচামিছা বোঝে বাবু। আপনি যদি বিচার করতেন তবেই বাবু ঠিক হ'ত।

বাবা কহিলেন, ইনামদি! তুই এক কাজ কর। এই ছেলেগুলাকে ক্ষমা করে ফেল। তোর ঘরেও ত ছেলেপিলে আছে। তারাও ত সময় অসময়ে কত অন্যায় করে বল দেখি? এরাও তোর ঘরের ছেলে মনে করে ক্ষমা দে। মনে আর রাগ রাখিস না।

দর্জ্জী তখন উচু গলায় কহিল, ক্ষমা! ওটি হবে না বাবু। আমি যেদিন বাগে পাব সেদিন একজনের ঘাড় না ভেঙ্গে ছাড়ব না। আমি মুসলমান বাবু। আমি ক্ষমা করতে পারব না।

দর্জ্জী রাগের মাথায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

দু'দিন পর দেখিলাম সে দোকান উঠাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। সে কহিল এ খারাপ দেশটায় আর থাকবে না।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

গান।

(সিন্ধু কাফি—যৎ)

হল নাহে তোমায় আমার
এবার জানাশোনা।
তুমি মিছে কেবল বারে-বারে
করলে আনাগোনা।
দুখের ছদ্ম বেশে যবে
এলে আমার দ্বারে,
মুখ ঢেকে হায়, পালিয়ে গেনু
লুকাতে আঁধারে ;
বুঝিনি যে দুখের মাঝে
অভয় তোমার সদা বাজে,
তোমার—বজ্ররবে ভয় পেনু তাই
প্রসাদ মিলিল না !
যা হবার তা হল এবার,
ওহে জীবন স্বামি,
ভুলে তোমায় না থাকি হে,
আবার যেন আমি ;
পাইনি তোমায় এ জীবনে
জপি যদি সদা মনে,
তুমি—আবার দেখা দিবে যবে
ছেড়ে পালাব না !

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

ভারতের আমদানী রপ্তানী।

১৯২০-২১ সনের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের একটা সরকারী হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় ভারত বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতবাসীর নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর তালিকা হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃই দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সাধারণের নিকট যে সকল বস্তু বিলাসের সামগ্রী ছিল, বর্ত্তমানে এ স্বদেশীর যুগেও তাহা অতি আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাবান, কাচের দ্রব্য, লণ্ঠনাদি, কালাইকরা বাসন, সিগারেট প্রভৃতির ব্যবহার এখন পল্লীতে পর্য্যন্ত পৌছাইয়াছে; পূর্ব্বে যে সকল দেশজ বস্তুর দ্বারা এই সকল কার্য্য চালান হইত, তাহার কোনটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, কোনটির ব্যবহার আছে অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীতে দেখিয়াছি কাপড় কাচা হইত কলারবাসন, অশথ, খয়ের প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারে, গো চোনা ও ছাগ বিষ্ঠা ইত্যাদিতে এখন সোডা ও সাবান তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে; গাত্র পরিষ্কার করা হইত ভিজান সর্ষপ খইলে, এখন তাহার কল্পনা করাও হইয়াছে ন্যাক্কারজনক। আমরা কিন্তু জানি, জনৈক ব্যারিষ্টার গাত্রমার্জ্জনে এই খইলের ভক্ত, তিনি ইহার স্নিগ্ধতার প্রশংসা করেন অথচ সভাসমাজে ইহার প্রচার রুচিবিরুদ্ধ! রুচি যাহাই হ'ক, আমারা যে রুচিবিকারে এ দরিদ্র দেশকে আরও কত দরিদ্রতায় আনয়ন করিতেছি, তাহা ভাবিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়, এখন সময় থাকিতে সাবধান না হইলে আমাদের এ রুচিবিকার চরম বিকারে পরিণত হইয়া জীবন নাশ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা এই বিলাসসজ্জার ক্রয় করিতে বৎসর বৎসর বিদেশীর পায় কোটি কোটি টাকা অঞ্জলি দান করিয়া চরিতার্থ হইতেছি, তাহার মাত্রা দিন দিন বৰ্দ্ধিতই হইতেছে, দেশের দারুণ দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রকষ্ট ইহাকে বাধা দিতে পারে নাই। আমরা ১৯১৯-২০ সনে বিদেশী সাবান ১,২২,২৩ ০০, টাকার ক্রয় করিয়াছিলাম, ১৯২০-২১ সনে ১,৪০,৯৫,০০০৲ টাকার ক্রয় করিয়াছি; টাকাটার পরিমাণ একবার ভাবিয়া দেখুন। তথাপি আমাদের সৌভাগ্য আলোচ্য বর্ষে ভারতের টাকার মূল্য অন্য দেশের মুদ্রার তুলনায়

বেশী ছিল; শিলিং ৸৹ আনার স্থলে ছিল ॥৹ আনা, সুতরাং আমাদিগকে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে ভারতীয় মুদ্রায় কম দিতে হইয়াছে, নতুবা আরও বেশী টাকা বিদেশীকে দিতে হইত। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়েই আমাদের অর্থের অপব্যয়। এ দেশে তামাকের অভাব নাই। মাথা তামাক সিগার বা সিগারেটের তুলনায় অপকৃষ্ট না হইলেও, এক ব্যবহারের হাঙ্গামা ও বাবুগিরিসুলভ নয় বলিয়া, আমরা বিদেশী সিগারেট ক্রয় করিয়াছি ২,৫৬,৩০,০০০৲ টাকার,—দুই কোটী টাকার উপর! সিগার ৫৫৭৫২৭৲ টাকার, মদ ৪,৯০,০২,০০০৲ টাকার, কাচের দ্রব্য ১৯১৯-২০ সনে ক্রয় করিয়াছিলাম ১,৯৯,৮১০০০ টাকার আর ১৯২০-২১ সনে ক্রয় করিয়াছি, ৩৩১৬২০০০ টাকার, ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে; বিদেশী ধুতি, শাড়ী, ক্রয়ে আমরা কতক সাবধান হইয়াছি বটে, পূর্ব্ব বৎসর হইতে আলোচ্যবর্ষে ২·২ কম আমদানী হইয়াছে কিন্তু লংক্লথ, ছিট, সাটের কাপড়, ড্রিল জিন ইত্যাদির আমদানী পূর্ব্ব বৎসর হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ধুতির আয় ডুবাইয়া দিয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবে দেখুন আমাদের স্বদেশী কাপড় বিদেশীর চাকচিক্যময় ছিট প্রভৃতিকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

	১৯১৯-২০	১৯২০-২১
রঙিন কাপড় (ধুসর)	২২,৫১,৭৮,০০০,	২৬,৪৫,২০,০০০,
ঐ (সাদা)	১৫,৯৬,৩১,০০০,	২১,৪৯,৫০,০০০,
ঐ (নানা রঙের)	১২,৭৫,০১০০০,	৩৪৫৬৮৪০০০,
গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি	১৪৫০৫০০০,	১৯০৮৮০০০
রুমাল ও শাল আলোয়ান ইত্যাদি	১৭০০০০০	৪৭২২০০০
ফেল্ট্	৫৩৭৪০০০	৮৬২১০০০
সেলাইয়ের সুতা	৪৯৫৫০০০	৯১২০০০০
অন্যান্য ঐ	৮৩৯১০০০	১৪৭১২০০০
পাকানো ও কাপড় বুনিবার সুতা	৪৩৫৯৫ ০০	১৫৭৬৩০০০

উপরের লিখিত সংখ্যা হইতে প্রতীয়মান হয় যে আমরা স্বদেশী বস্ত্র বলিয়া যাহা ব্যবহার করিতেছি তাহার উপাদান যোগাইতেছে বিদেশ। ইহার শতকরা ৪৯ যোগাইয়াছে ইংরেজ, আর শতকরা ৪৩ অংশ যোগাইয়াছে জাপান, বক্রি অন্যান্য দেশ।

আমাদের দেশের মিলে কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে (১৯১৩-১৪ সনে) যে পরিমাণে সূতা উৎপন্ন হইতে এখন তাহার কমই সুতা প্রস্তুত করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে মিলে ৬৮৭৭৭০০০ পাউণ্ড কাপড় বুনিবার সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল, আর ১৯১৯-২০ সনে উৎপন্ন করিয়াছে ৬৩৫৭৬০০০০ পাউণ্ড, ১৯২০-২১ সনে ৬৬০০০৩০০০ পাউণ্ড, সুতরাং যুদ্ধের পূর্ব্বকালের অপেক্ষা বর্ত্তমানে ২২৭৭৪০০০০ পাউণ্ড কম সুতা উৎপন্ন করিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা আমার বিদেশীর মুখাপেক্ষী এখনই বেশী। তবে পূর্ব্বে কেবল এদেশে মোটা সুতাই উৎপন্ন হইত এখন সরু সুতাও উৎপন্ন হইতেছে,—পূর্ব্বাপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অবশ্য অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—তাহার সুতার উৎকর্ষতায় যত নয়—মূল্য বৃদ্ধির ফলে। পূর্ব্বে (১৯১৩-১৪) সনে যে অপরিস্কৃত সুতার মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৵৮ হিসাবে বিক্রয় হইত এখন তাহার মূল্য ।৶৪ পাই, ধোলাই সুতার পাউণ্ড ছিল ৵১১ পাই এখন ॥৪ পাই, রঙিন সুতা ছিল পাউণ্ড ৶৩ পাই এখন ॥৶৪ পাই। আলোচ্য বর্ষে (১৯২০-২১ সনে)

১ হইতে ২০ নম্বরের সুতা উৎপন্ন হইয়াছে	৪৯২৬৯৩০০০	মূল্য	৪৪৩৪৭১০০০\
২১ হইতে ২৫ „ „	১২৩৯৯৫০০০	মূল্য	১৪৮৪৭৩০০০\
২৬ হইতে ৩০ „ „	৪২৯৯৯০০০	মূল্য	৫০৬১৩০০০\
৩১ হইতে ৪০ „ „	১৯৭১২০০০	মূল্য	২ ৬৭০০০\
৪০ শের উর্দ্ধে	২৬৯৯০০০	মূল্য	২০৬৭০০০\
রঙিণ——	শূন্য		শূন্য
অন্য প্রকার——	৬৭৯০০০	মূল্য	৩৫৫০০০\

ভারতবাসীর আবশ্যক ইহা হইতে অনেক বেশী; বর্ত্তমানে স্বদেশী কাপড় লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে ভারতের জন প্রতি ১ গজ কাপড়েরও সংস্থান নাই। বিগত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের স্বদেশী ও বিদেশী কাপড়ের নিম্ন উদ্ধৃত রপ্তানীর তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় তারা চিহ্নিত ৪টী স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্রই বিদেশী

কাপড়ের আমদানী বেশী। স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের প্রতি ঔদাসীন্য ইহার একমাত্র কারণ বলা চলে না, স্বদেশী বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতাও ইহার অন্যতম কারণ।

	বিদেশী বস্ত্র	স্বদেশী বস্ত্র
বর্দ্ধমান—	৯,২৬,৫৫৯	১,৫১,৮৫৩
বীরভূম—	৯,৬৩,৬৭৪	২,১৮,৫৪০
বাঁকুড়া—	৫২,৯৪৩	৪ ৯৫৭
মেদিনীপুর—	১৫,৯৬,৯১০	১,৩৫,৫৪৪
হুগলী—	১১,৫১,৬৩০	৩,৩৯০,৩৭
চব্বিশ পরগণা—	৭,১৯,৮৬০	৬,৩১,৫৭০
নদীয়া—	১৩,৬৫,৫২১	৩,৪৩,০০১
মুর্শিদাবাদ—	১৪,৬৬,২৬৬	২,২৮,১১৬
যশোর—	৭,৭২,৯০৬	৪,২৯,৪০৯
খুলনা—	৩,৬০,৭৩৬	৩,২৮,৬৮৬
রাজসাহী—	১১,২০,৯২২	১,৮৩,৬৯৫
দিনাজপুর—	১২,০১,৬০১	১,৯২,০৭২
জলপাইগুড়ি—	১৩,৭৮,০৪৮	৩,৬৪, ৫১
দার্জ্জিলিং—	১৬,০৩,২ ৩	১,৭১,৫৪৫
রংপুর—	২৫,৩১,৭৭৮	৪,৪৮,১৫৩
বগুড়া—	২৩,৫০,৮৮৫	১৫,৫৫,৩৪১
পাবনা—	১৮,৬১,৩৮৯	৫,৩৯,১৭৩
মালদহ—	৮,২৮,৯২০	২,২৩,৬২৪
কুচবেহার—	৫,৪৩,৯৮২	৫৮,৫ ৮
ঢাকা—	২৮,৩৬,৪০৬	১০,০২,১৮১
* ময়মনসিং—	৯,০১,৮৯৩	১৭,১৯,৫৪৫
ফরিদপুর—	৬,১১,৭৩৪	৫,৮৩,৫১৩

• বাখরগঞ্জ—	৭,৪৯,৮৩৬	১৭,৫১,৮০৭
ত্রিপুরা—	১৮,০৬,৮৮৯	৬৫,০৪৭
• নোয়াখালি—	৫৭,৯৫৫	১,২৮,০৭৭
• চট্টগ্রাম—	১,৪০,৫২৫	২,০২,২৯২
ঐ বন্দর—	২, ৭,৬১০	১২,১৮৯

অর্থনীতির হিসাবে কলের সাহায্য ব্যতীত ভারতের এই অভাব পূরণ হওয়া কঠিন তবে চরকার চলনের জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে ভগবানের কৃপায় তাহা সুফল প্রসব করিলে ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে তাহা আগামী বৎসরে লক্ষ্য করিবার। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিবার প্রবৃত্তি ভারতে পূর্ণভাবে জাগ্রত করিতে না পারিলে ও বিদেশী ছিটের চাকচিক্যের মোহ না কাটিলে আমাদের যে আর রক্ষা নাই তাহার প্রমাণ উপরোক্ত সংখ্যাই। আমেরিকা তুলার রাজা, তাহার দরেই জগতের তুলার বাজার শাসিত। ভারত তাহার নিজ ব্যবহারোপযোগী তুলা উৎপন্ন করিতে সমর্থ না হইলে,—ভারতে সুতার দর কমিবার নয়।

ধনীগণও আমাদের এ দরিদ্র দেশকে সখের খাতিরে কম পরবশ করিয়া তুলিতেছেন না। মোটরকার, মোটর-সাইকেল ইত্যাদির ব্যবহার আজকাল একটা মস্ত ব্যাধি। ইহাদের আবশ্যকতা একেবারে নাই এ কথা বলা যায় না কিন্তু যে হিসাবে আমাদের দেশের ধনীগণ ইহাদের ব্যবহার করেন তাহা নিছক ফ্যাসনের খাতিরে। সান্ধ্য ভ্রমণসুখ অবশ্য তাঁহাদের জীবনের উপভোগ্য ও তাহাতে কটাক্ষ করিবার কিছু নাই কিন্তু সেটার জন্য দরিদ্র দেশে দরিদ্রের জীবনরক্ষার পথ কণ্টকিত করিয়া বিদেশীকে পুষ্ট করা যে সর্ব্বনীতীর সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত একথা না বলিয়া পারা যায় না। ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদিতে এ বিলাস সুখ পরিতৃপ্ত করিলে দেশের লোকের তদ্দ্বারা বরং জীবন রক্ষার একটা উপায় ছিল, কিন্তু মোটরে মোটের উপর বিদেশেরই মোটা উদর পূর্ণ করা হইতেছে। নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যা হইতে প্রতীয়মান হইবে মোটর প্রসঙ্গে কত টাকা আমরা বিদেশীকে দিয়াছি—

	১৯১৮—১৯	১৯১৯—২০	১৯২০-২১
মোটর গাড়ী	১০৪১০০০	২৬২৬১০০০	৭৮২২৪০০০
মোটর সাইকেল	১০০০০০	১৬৮৬০০০	৫০৫০০০০

মোটর ওয়াগন	৬৬০০০	৪৮৩৫০০০	২,২৩,৪৩০০০
ঐ অংশ ও সরঞ্জাম	২৬৮২০০০	৬১০২০০০	১৭৫১৬০০০
সাইকেল	১৯১০০০০	৩২১৫০০০	৯১৫৩০০০

আমাদের মহিলাগণের অলঙ্কারের জন্যও আমাদিগকে কম দিতে হয় নাই—আমরা মূল্যবান পাথর, মুক্তার জন্য দিয়াছি—

	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০-২১
	৩৭৮৫০০০	৫২৯৯০০০	৬৫৯৭০০০
জুয়েলারী (সোনা রূপার প্লেট সহ)	৫৯৯০০০	১২২৬০০০	২৬৬১০০
কাচের চুড়ি	২৯১৩০০০	৫১১৪০০০	৯৬২৫০০০

যে দেশের লক্ষ্মীরা এক সময়ে শাঁখা ও সিঁদূরে, গালার চুড়িতে সন্তুষ্টা ছিলেন, সেই দেশে বিদেশী কাচের চুড়ির প্রসাদে বিদেশে ঢালিতেছি প্রায় কোটী টাকা! কি ভয়ানক অবস্থা! এ সংখ্যা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহা হইতে কেবল মাত্র আইতির লক্ষণ লোহা পরিতে হয় যদি তাহাও শতগুণে শ্রেয়ঃ। পুরুষ ও স্ত্রী, ধনী ও নির্ধন, এমন করিয়া দেশের ধন লুটাইয়া দিলে এ সোনার দেশ দরিদ্র হইবে না কেন! যত দিন আমরা আমাদের নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে সমর্থ না হইব, ততদিন হউক অসঙ্কোচিত স্বল্প অঙ্গাচ্ছাদন-বস্ত্র, আভরণহীন দরিদ্রবেশ, তাহাই হউক আমাদের পরিধেয় অলঙ্কার! আপামর সাধারণ নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে প্রকৃত দীনদরিদ্র হইয়া দরিদ্র বেশ গ্রহণ করিলে কিসের লজ্জা, কিসের অপমান। একটা বৎসরের জন্য অবহিত হইলে এ দশা আমাদের থাকিবে না। হায় রে, অঙ্গ-প্রসাধন!—ইহার জন্য আমরা ১৯১৮ সনে বিদেশীকে দিয়াছি—৩৯৫৬ ০০, আর ১৯ সনে ৪০২১০০০, কুড়ি সনে ৫৪৫০০০০, ক্রমেই সংখ্যার বৃদ্ধির দিকে দ্রুত দৌড়াইতেছে—এরূপভাবে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে অন্নাভাবে আমাদের প্রসাধনের সাধ মিটিতে আর কত দেরী?

আমরা আমাদের বালকবালিকার সন্তোষবিধানার্থ কম টাকা বিদেশীকে দেই নাই। ১৯২০ সনে আমরা খেলনা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম ৫২,১০,০০০ টাকার ক্রয় করিয়াছিলাম, আলোচ্য বর্ষে ৩৯,৭০,০০০ টাকায় উঠিয়াছে। খেলনা সম্বন্ধে ছেলেদের নিজেদের বড় বাছ-

বিচার নাই, রংচংয়ে হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কারিগরি হিসাবে আমাদের দেশের প্রস্তুত খেলনা হয় ত জাপানী খেলনা হইতে নিকৃষ্ট কিন্তু দেশের ধন দেশে রাখিতে হইলে এ নিকৃষ্টে আকৃষ্ট হইতেই হইবে। এদেশে দুস্থ ও অনাথার অভাব নাই, তাহাদিগের মন যদি এদিকে আকৃষ্ট করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহাদিগেরও একটা জীবন রক্ষার উপায় হয় ও দেশের ধন দেশেই থাকিয়া যায়। বিদেশী ন্যাকরার পুতুল আজকাল এদেশে খুব প্রচলিত, এটা কি এদেশে প্রস্তুত হওয়া এমনি অসম্ভব ব্যাপার? আমাদের দেশের শিক্ষা পাশের দিকে না ঝুঁকিয়া যদি হাতেকলমে এসকল কাজশিক্ষার দিকে দেওয়া হয়, তাহা হইলেই সুফল প্রসবের সম্ভাবনা। এদেশের দুরবস্থার ত অন্ত নাই, তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টাও আমাদের কম। ছেলেদের ত আমরা বিদেশী খেলনা দিতে ব্যস্ত কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি আমাদের অতি কম। শিশু-খাদ্যও এদেশে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, খাঁটি দুধ বলিয়া জিনিষ মফঃস্বলেও দুষ্প্রাপ্য। শিশুর শরীর যত দিন ভাল থাকে তত দিন আমাদিগকে এই সব ছাইমাটী সাহায্যে তাহাদের জীবন রক্ষার উপায় করিতে হয়। অসুখের সময় ডাক্তার-বাবুদের উপদেশে ছেলের স্বাস্থ্যের জন্য অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া বিদেশী কৃত্রিম খাদ্যে ছেলের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি। বিপদে পড়িয়া যে টাকাটা এই সকল খাদ্যের কৃপায় বিদেশীর পায় ঢালিয়া দিতেছি, সম্পদের সময় তাহা ব্যয় করিয়া দেশে কি খাঁটী খাদ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে না? ১৯২০ সনে আমরা জমান দুগ্ধ বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়াছিলাম ৪০,১৯,০০০ টাকার, বর্ত্তমান বর্ষে তাহা ৪৩,৮২,০০০ হাজারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, পেটেণ্ট খাদ্য ২০ সনে ৬৩,৩৩,০০০ টাকার বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে ৭০,৯২,০০০ টাকার আমদানী হইয়াছে। বিস্কুট ও পিষ্টক ৩৯,৭৮,০০০ টাকার, ১৯—২০ সনে ক্রয় করিয়াছিলাম এবৎসর তাহা ৪৬,৯৫,০০০ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়েই এইরূপ বৃদ্ধি!

এদিকে ভারতের রপ্তানীসম্ভারের অবস্থাও শোচনীয়। আমরা ভারত হইতে বিদেশে কেবল কাঁচা মালেরই চালান দিয়া আসিতেছি, সেই মালকেই বিদেশী নানা প্রকার মূল্যবান্ দ্রব্যে পরিণত করিয়া আমাদের নিকট হইতেই বিশগুণ লাভ আদায় করিতেছে। সে কাঁচা মাল সরবরাহেও আমরা ক্রমেই উন্নত না হইয়া অবনতির দিকেই চলিয়াছি।

পাট, তুলা, শস্য, তৈলবীজ, চা, চামড়া ও লাক্ষা ভারতের প্রধান রপ্তানী-সম্ভার। তন্মধ্যে পাট ভারতের একচেটিয়া পণ্য, সুতরাং ইহার উন্নতি অবনতিতে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের ধন-সম্পত্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমরা যদি ইহাকে মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত করিবার উপায় জানিতাম তাহা হইলে পাট আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিত; আমরা কেবল ইহা কাঁচামাল রূপে ও চট ও ছালায় (গানি ব্যাগ) পরিণত করিয়া রপ্তানী করি তাহাতেই ইহা আমাদের অর্থাগমের একটা বড় পথ ছিল, কিন্তু নানা কারণে আমরা সে লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পাটে আমাদের কৃষকগণ বিশেষ লাভবান হইতেছিল না, মহাজনের উদর পূর্ণ হইতেছিল, এখন দেশী ব্যবসায়ীরও অবস্থা শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। মহাসমরের সময় জাহাজাদির গোলমালে পাট রপ্তানীর অসুবিধা সত্ত্বেও পাটের বাজার না পড়িয়া সামরিক প্রয়োজনে ও কতিপয় দেশে পাটের টান পড়ায় পাটের দর দস্তুরমত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহার ফলে পাটের রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গেলেও মূল্য হিসাবে ভারত প্রাপ্ত হইয়াছিল বেশী টাকা কিন্তু বাজারে পাট জমিয়া গেল। জার্ম্মাণী ছিল নং ১ পাটের প্রধান ক্রেতা; নং ১ পাট উচ্চ দরে ক্রয় করিয়া তাহাকে রংয়ের চাকচিক্যের জোরে কৃত্রিম রেশম পশমে পরিণত করিয়া জার্ম্মাণ বণিক এই ভারতেই উহা বিক্রয় করিত ৫০ গুণ দরে। সে পথ রুদ্ধ হওয়ায় নং ১ পাট হইল মাটী! দর কমিতে লাগিল, ২৫ টাকা মণের পাট গত বৎসর বিক্রয় হইতে লাগিল ১০ টাকায়, তাহারও ক্রেতার অভাব। তাহা হইতে নিকৃষ্ট পাটের গ্রাহক রহিলেন ভারতেই,—প্রধানতঃ পাটের কলের মালিকগণ। তাঁহারা প্রয়োজনমত মালের কাটতির পরিমাণে কল চালাইয়া চট ও গানি ব্যাগের দর পূর্ব্ববৎ রাখিলেন—লাভও করিলেন বহু গুণে, অংশীদারকে ডিভিডেণ্ট দিলেন শতকরা শতমুদ্রারও অধিক! কিন্তু ভারতের বহির্ভাগে পাটের রপ্তানী কমিয়া যাওয়ায় দর ক্রমেই কমিতে লাগিল, সাধারণ পাটের মূল্য (মার্চ্চ ২১) দাঁড়াইল মণ প্রতি ৫।০ টাকা! ১৯২০—২১ শে পাটের চাষ ভাল হয় নাই বাজারের অবস্থা দেখিয়া পাট বপন হইয়াছে অনেক কম, তথাপি মাল মজুত! সন্ধির পর আবার নানা দেশে পাটের রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে, জার্ম্মাণী পাট কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাজারদর ক্রমেই উঠিলেও উঠিতে পারে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারত পাটের ব্যবহার নিজে করিতে শিক্ষা না করিলে, ভারতের

এই নিজস্ব পণ্য প্রকৃত লাভের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে না। আলোচ্য বর্ষের রপ্তানীর হিসাব হইতে পাটের বাজার অনুমেয়।

৪০০ পাউণ্ড বেল ওজনে পাটের হিসাব।

	১৯১৯—২০	১৯২০—২১	
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—	১,৭৩৯,৮০০	৭,৬১,৭০০	—
আমেরিকা—	৪,৩৪,৮০৮	৫,১৬,১০০	+
জার্ম্মেণী—	২০,০০০	৪৩,৬০০	+
ফ্রান্স—	৪,১২,১০০	২৮০১০০	—
জাপান—	৫৯২০০	৪১১০০	—

ইহার উপর অন্যান্য দেশেও পাট রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর হইতে কম।

কাঁচা মালের রপ্তানী আশাপ্রদ না হইলেও চট ও ছালার রপ্তানী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিজ ভারতেও উহার কাট্‌তি বাড়িয়াছে; চটের কলের কর্ত্তারা প্রায়ই বিদেশী, লাভের মধ্যে দেশীয় কুলীমজুরের অন্নসংস্থান হইতেছে। দেশের ধনীরা কি এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না?

১৯১৯—২০ সনে ছালা (ব্যাগ) রপ্তানী হইয়াছে ৩৪৩ টন মূল্য—১৮৫৮ লক্ষ, ১৯২০—২১ হইয়াছে ৫৩৭ টন, মূল্য—২৩৯১ লক্ষ। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ইহার প্রধান ক্রেতা। গম ও সোরার রপ্তানীর বৃদ্ধির কল্যাণে ছালারও বিক্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতীয় তুলার আমদানী পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ৪০০ পাউণ্ড বেলের ২৯৮৬০০ বেল—এ বৎসর ২০৫৩১০০ বেল। কমিয়াছে। বাজারে আমেরিকার তুলার কদর বাড়িয়াছে। জাপান এবার ভারতীয় তুলা এক পাউণ্ড লয় নাই। ভাল কথা,—মোটা কাপড়ের সংস্থান হ'ক।

চামড়ার কাট্‌তিও এবৎসর কম, বিগত বৎসর বিকাইাছিল ২২৮৬ লক্ষ টাকার এবারে ৫৯ লক্ষ টাকার। এটা ছিল মাদ্রাসের প্রধান ব্যবসা। লাক্ষারও সেই দশা; মাল হিসাবে

রপ্তানী কমিয়াছে মূল্য চড়া থাকায় সওয়া সাত ক্রোড় হইতে সাড়ে সাত ক্রোড়ে উঠিয়াছে। গমের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে, ১৯১৯শে ছিল বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার, আলোচ্য বর্ষে চার কোটী দশ লক্ষ নতুবা স্বর্ণপ্রসূ ভারত হাহাকার করিবে কেন!

গান।

ধন্য জীবন, ধন্য জীবন মোর,
আঁধার রজনী আজিকে হয়েছে ভোর।
হিরণ বরণ তোমার কিরণ—
মন হতে মেঘ করিল হরণ,
ঘুচিল বেদন—টুটিল নয়ন-লোর;
ধন্য জীবন, ধন্য জীবন মোর।

আকাশের পানে নয়ন তুলিয়া চাই,
মিলনের গীতি আপনা হারায়ে গাই।
নয়ন-মোহন বাঞ্ছিত ধন,
আজি এ আলোয় করিব বরণ,
সেই আশে মন বাঁধিল মিলন-ডোর;
ধন্য জীবন, ধন্য জীবন মোর।

বেলা গুহ।

কুমীর।

(৪)

ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখে মনটা খুব প্রফুল্লই ছিল। তারপর যখন সকালে চা পান করলাম তখন পূর্ব্ব দিনের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক মনে উদয় হল। তখনই স্থির করে ফেল্লাম যে এখনই আপিস যাবার পথে এলেনা ইভানোভনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে—আমি হচ্ছি যখন তাদের পারিবারিক বন্ধু, এটা তো আমাকে করতেই হবে।

শয্যাগৃহের বাইরেই একটী ছোট্ট ঘর—সেটাকে ওরা 'ছোট্ট-বসবার-ঘর' বলতো (ওদের বড় বসবার ঘর, সত্যি কথা বলতে কি ছোটই ছিল)। সেখানে দেখলাম ছোট্ট একটী চমৎকার সোফায় ইভানোভনা বসে আছেন। অর্দ্ধ-স্বচ্ছ একটা প্রাতঃকালীন আবরণে গা ঢেকে; সামনে তেমনি ছোট একটা চায়ের টেবিল, তার ওপরে একটা ছোট পেয়ালা কাফিটাতে ছোট্ট এতটুকু বিসকুট ডোবানো। কি মনমোহিনী মূর্ত্তি; কিন্তু তবুও মনে হল যেন মুখখানি একটু চিন্তাক্লিন্ন।

স্মিত হাস্যে আমাকে তিনি অভিবাদন করলেন—হাসিটী যেন বলে দিচ্ছিল, মন তাঁর সেখানে নেই।

"এই যে তুমি! ভারি দুষ্টু তুমি, কিন্তু। বসো, একটু কাফি ইচ্ছে কর। ভাল কথা, কাল সারা দিনটে কাটালে কোথায়? মুখোস-নাচে গিয়েছিলে বুঝি?"

"কেন, আপনি গিয়েছিলেন বুঝি? জানেনই তো, আমার ও সব বাতিক নেই। অ ছাড়া, কাল আমাদের বন্দীর কাছে গিয়েছিলাম.. ..." এই বলে কাফি পান করতে করতে মুখখানাকে যতদূর সম্ভব গম্ভীর কর্ল্লাম।

"কে বন্দী?......কার কথা বলছো?......ও, হাঁ হাঁ......আহা বেচারী! আচ্ছা, কেমন আছে সে?......ভারি বিরক্ত বোধ করছে, নয়?......জান তুমি......এই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি......আচ্ছা, আমি বোধ হয় এখন ডাইভোর্সের

জন্যে দরখাস্ত করতে পারি ?"

এই কথায় আমার এমন রাগ হ'ল যে চমকে উঠে আমি কাফিটা ফেলেছিলাম আর কি ? "কি ? ডাইভোর্স !" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। তারপর মনে মনে ভাবলাম—"সেই কেলে ছোঁড়াটা !" মনটা তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো।

শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক প্রায়ই এদের এখানে আসতো, তক্ষণ-শিল্প তার পেশা ছিল, ছোট ছোট গোঁফ উঠেছে ; এলেনাকে খুব হাসাতে পারতো। নিশ্চয়ই সে কাল নাচে, কিংবা হয়তো এইখানেই এলেনার সঙ্গে দেখা করেছিল, আর যত ছাই পাঁশ আইডিয়া তাঁর মগজের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল।

এলেনা গল্ গল্, ঝর্ ঝর্ করে বকে যেতে লাগলেন, যেন সদ্য পড়ান পাঠ আবৃত্তি করছেন—"কেন, সে যদি এখন কুমীরের ভিতর কায়েমী বন্দোবস্ত ক'রে বসবাস করতে থাকে—হয় তো সারা জীবনেই আর না ফিরে আসে, তবে কি আমি এখানে তার প্রতীক্ষাই করতে থাকবো ! স্বামী স্বামী, তার ঘরেই থাকা উচিত, কুমীরের ভিতর নয়..."

আমার গা তখন কাঁপছিল। আমি সবে বলতে যাচ্ছি, "কিন্তু এ ঘটনাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত—অদৃষ্টের খেলা !"

হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে উঠে, রেগে ক্ষেপে চীৎকার করে এলেনা বলে উঠলেন—"হতভাগা, কোথাকার ! খালিই তুমি আমার বিরুদ্ধে থাকবে। পারা যায় না আর তোমার সঙ্গে, ভুলেও যদি কখনও একটা সদুপদেশ দিলে ! অন্য স-বা-ই বলছে যে ম্যাটভিচ এখন মাইনে পাবে না, কাজেই আমি ডাইভোর্স পেতে পারি।"

তখন আমি করুণরসে কণ্ঠ আর্দ্র করে বল্লাম—"এলেনা, এই কি আপনি ? আপনারই কণ্ঠস্বর আপনারই বাক্য কি আমি শুনছি ? কোন্ পাপিষ্ঠ এই পাপ বুদ্ধি আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে ? আর তা ছাড়া স্বামী মাইনে পায় না, এই তুচ্ছ অছিলায় ডাইভোর্স হতেই পারে না। আর ওধারে দুর্ভাগ্য ম্যাটভিচ, হতভাগ্য ম্যাটভিচ,—সেই ভীষণ রাক্ষসটার অন্ত্রের ভিতরে রয়েছে ও আপনাকে সে কি প্রগাঢ় ভালবাসে তারই কথা বলছিল ! এক ডেলা চিনি যেমন গলে যায়, প্রণয়ে সে তেমনি যেন গ'লে যাচ্ছে। কাল যখন আপনি খোস মেজাজে নাচ উপভোগ করছিলেন, তখন সে জল্পনা কল্পনা করছিল, যে ধর্ম্মপত্নী

আপনি—আপনাকে সে কুমীরের ভিতরে তার সঙ্গে বাস করতে অনুরোধ করবে ; বিশেষতঃ কুমীরের ভিতরটায় অনেক জায়গা আছে, দুজন মানুষের জায়গা তো—হবেই, চাই কি তিনজন মানুষেও........" তারপর ম্যাটভিচের সঙ্গে যে সব মজার কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা সবই বল্লাম।

আশ্চর্য্য হয়ে তিনি বল্লেন—"বটে, বটে! মাটভিচের সঙ্গে থাকবার জন্যে আমাকে সেই ভীষণ জানোয়ারটার পেটের ভিতর ঢুকতে হবে—এইটে তুমি চাও, তোমার মনোগত বাসনা? উঃ, কি ভীষণ আইডিয়া! আমার কাপড় চোপড়, হ্যাট নিয়ে আমি সেঁধোব কি করে সেথায়? হা ভগবান, কি প্রচণ্ড বোকামি! আচ্ছা আমি যখন তার ভিতর ঢুকছি, তখন কিসের মতন দেখাবে আমাকে? হয়তো কেউ তখন থাকবে সেখানে আমার দশা দেখতে। নাঃ, তা হতেই পারে না, আবসার্ড্ (Absurd)! আর আমি খাব কি সেখানে? আর...আর...আর কি কোরবো যখন...ওরে বাসরে, এর পরে লোকে ভাববে কি?......আর সেখানে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাটা কি শুনি? কি করে কাটবে?...... আর তুমিই না বলছিলে সেখানটায় গটা-পার্চের গন্ধ? আর যদিই বা আমাদের ভিতর ঝগড়া বাধে তবে যাবো কোথা—পাশাপাশি থাকতে হবে, থেকে থেকে কাল কাটাতে হবে? ফুঃ-উঃ, কি ভয়ানক!"

মানুষ যখন বুঝতে পারে যে সত্য তারই দিকে, তখন স্বভাবতঃই তার একটা উৎসাহ হয় ; সেই উৎসাহের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আমি বল্লাম—"আমি আপনার সঙ্গে একমত হচ্ছি—যে কথা সব বল্লেন তাতে—;—কিন্তু একটা বিষয় আপনি দেখেও দেখলেন না ; সে আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, এইটাই আপনি হৃদয়ঙ্গম কচ্ছেন না—সেখানে আপনাকে বাস করবার জন্যে তার যে নিমন্ত্রণ, তাতে কি বোঝাচ্ছে?—বোঝাচ্ছে ভালবাসা—ভালবাসা সমস্ত অন্তরের, যে ভালবাসায় ফাঁকি নেই, প্রবঞ্চনা নেই—যে ভালবাসা অনন্ত।...এলেনা ইভানোভনা, সে ভালোবাসা আপনি খুব ছোট করেই দেখেছেন।"

ইভানোভনার নখকটী সযত্নে কাটা হয়েছিল, আর পালিশও করা হয়েছিল। এমন সুন্দর হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে দিয়ে তিনি বল্লেন—"আমি শুনবো না, শুনবো না, শুনবো না, এ সব কথা কিছু। উঃ কি ভয়ানক লোক তুমি! কাঁদাবে না কি আমাকে? তোমার

যদি ভাল লাগে, তুমি সেঁধোও গে না সেখানে? তুমি হচ্ছ তার বন্ধু, সেখানে ঢুকে তাকে তোমার সঙ্গ দাওগে, আর কতগুলো হাড় জ্বালানো বিজ্ঞানের আলোচনায় সারা জীবনটা কাটিয়ে দাওগে।"

আমি সেই তরল মতি স্ত্রীলোকটীকে গম্ভীর হয়ে বাধা দিয়ে বল্লাম—"এই কথাটায় হাসা আপনার শোভা পায় না। অবশ্য সে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু সেটা রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য নয়। আপনি তার ধর্ম্মপত্নী; কর্ত্তব্যের হিসাবে আপনাকে যেতে হবে; আমার যাওয়া কর্ত্তব্যের ভিতর নয়। তবে যদি যাই, তাতে আমার ঔদার্যাই প্রকাশ করা হবে। কিন্তু গত রাত্রে আইভ্যান ম্যাটভিচ কুমীরের স্থিতিস্থাপকতায় উল্লেখ করে বলছিল যে আপনাদের দুজনের কেন, তিন জনেরও জায়গা হতে পারে; আর আপনি সেখানে গেলে, পারিবারিক বন্ধু বলে আমিও যদি যেতে চাই—

"কেমন করে? তিনজনই? আশ্চর্য্য তো! তুমি যে অবাক কল্লে? কেন, কি করে...আমরা তিন জনেই তবে আবার এক যোট হচ্চি? হা—হা—হা! দুজনেই তোমরা গাঁড় বোকা। হা—হা—হা! পাপিষ্ঠ তোমাকে আমি সর্ব্বক্ষণই তবে চিমটি কাটবো। হা—হা—হা। হা—হা—হা!"

তারপর সোফার উপর পড়ে হাসতে লাগলেন, যতক্ষণ না পেটে খিল ধরে চোখে জল এল। এই হাসি ও অশ্রুর সম্মিলনে এমনই মনোহারিণী তাঁকে দেখাচ্ছিল যে তাঁর হাতখানি চুম্বন করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। তাতে তিনি বাধা দিলেন না; তবে আমাদের মধ্যে যে ভাব হয়ে গেছে তার চিহ্ন স্বরূপ আমার কান দুটোতে চিমটী কাটলেন।

তারপর আমরা দুজনেই বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলাম; আর আমি ম্যাট ভিচ যে সব মতলব এঁটেছিল তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করলাম। সান্ধ্যসম্মিলনের ব্যবস্থাটা এলেনার বেশ রুচিকর হয়েছিল।

তিনি বল্লেন—"খালি এখন আমার অনেক করে নতুন পোষাক চাই সাজসজ্জার জন্যে; সেই জন্যে ম্যাটভিচ তার মাইনের থেকে যত বেশী সম্ভব আমাকে দিতে পারে তা যেন দেয়।" তারপর একটু ভেবে বল্লে—"খালি...খালি, সেইটে কি করে হবে, তা' আমি ঠাউরে উঠতে

পাচ্ছি না। চৌবাচ্ছায় করে কি রকমে তাকে নিয়ে আসা হবে? আমি চাই না যে আমার স্বামীকে একটা চৌবাচ্ছায় নিয়ে এখান সেখান করা হয়। আর এই ব্যাপারটা সবাই দেখবে—উঃ সে বড় লজ্জাজনক হবে আমার পক্ষে। এ একেবারে হতেই পারে না, অ্যাবসার্ড্! আমি এ চাইনা, চাইনা—।”

“হ্যাঁ ভাল কথা, টিমোফি সেমিওনিচ কাল এখানে এসেছিলেন?”

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছিলেন বই কি? এসেছিলেন তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে; আর শুনবে, সমস্ত ক্ষণটি আমার সঙ্গে তাস খেলিয়ে কাটিয়ে গেছেন। তিনি মিষ্টির জন্যে তাস খেলছিলেন; আমি হারলে আমার হস্তচুম্বন করবেন তিনি, এই কথা ছিল। কি হতচ্ছাড়া লোকটা! বিশ্বাস করবে তুমি, সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে মুখোস নাচ পর্য্যন্ত প্রায় আসা হয়েছিল!”

আমি বল্লাম—“ভাব লেগে গিয়েছিল নিশ্চয় তাঁর! আপনি যাদুকরী, আপনার সঙ্গ কে ছাড়তে চায়?”

“ওঃ, বাহবা, খুব সাবাস দেওয়া হচ্ছে! দাঁড়াও, বিদায়ের উপহার স্বরূপ তোমাকে একটা চিমটী কেটে নিই। আজ কাল ভারি চিমটী কাট্‌তে শিখেছি আমি। কি, কি বল তাতে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি না বলছিলে যে কাকে ম্যাটভিচ আমারই কথা অনেকবার বলেছিল?”

হ্যাঁ, না—তা, ঠিক বলে কি……অবশ্য আমাকে বলতে যে সে এখন মানবজাতির নিয়তির কথাই বেশী ভাবছে, আর চায় …..”

“ওঃ, তার কথা ছেড়ে দাও। যা ইচ্ছে সে ভাবুক গে···তোমাকে আর বলতে হবে না···শুনে শুনে বিরক্ত ধরে গেছে। আমি গিয়ে তাকে দেখব’খন একবার। কালই আমি যাব। খালি আজই পারবো না; আমার ভারি মাথা ধরেছে, আর তা’ ছাড়া সেখানে গাদাও লোক জড় হবে···তারা সব বলবে ‘ওই দেখ, সেই লোকটার স্ত্রী এসেছে,’ তাতে আমার ভারি সরম লাগবে…আচ্ছা বিদায় নমস্কার···তুমি তুমি বোধ হয় আজকে সন্ধ্যেবেলায় সেখানে যাবে, না?”

"তাকে দেখতে ? হ্যাঁ, যাব বই কি ? সে আমাকে আজকে কতকগুলো খবরের কাগজ নিয়ে হাজির হতে বলেছে।"

"বাহবা, ক্যাপিট্যাল! যাও, যাও, গিয়ে পড়বো। আজ যেন কিন্তু আর এস না আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার শরীরটা ভাল নেই, হয় তো বা আমি বেরুতে পারি কারু সঙ্গে দেখা করতে। নমস্কার, দুষ্টু।"

আমি ভাবলাম—"নিশ্চয়ই সে কালমাণিকের টান! তা ছাড়া কার সঙ্গেই বা সন্ধ্যায় অভিসারে বেরুবেন তিনি ?"

আপিসে গিয়ে অবশ্য, আমার ভাবনা কিংবা ব্যস্ততার চিহ্নমাত্রও দেখালাম না। কিন্তু আমি দেখলাম যে সহকর্ম্মচারীদের হাত থেকে হাতে কতকগুলো উন্নত ধরণের খবরের কাগজ চালাচালি হচ্ছে—বেশ একটু তাড়াতাড়িই। আর যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মুখগুলো ভীষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার হাতে প্রথম যে কাগজখানা এলো তার নাম সংবাদ। এই কাগজখানা কোনও দলের নয়, তবে সাধারণ বিষয় নিয়ে থাকতো; কাজেই সকলে কাগজখানাকে ঘৃণা করতো; তবুও পড়া বাদ যেত না। নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফটী প'ড়ে বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না—

গত কল্য আমাদের এই বিশাল রাজধানীর সুপ্রশস্ত বর্ত্মে বর্ত্মে, আর রাজপ্রাসাদতুল্য হর্ম্ম্যে হর্ম্ম্যে একটা আজগুবি গুজবের রটনা হয়ে গেছে। সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রখ্যাত কোনও এক বংশের একজন যুবক, সেরেল নামক হোটেল—ক্লাবের একঘেয়ে রান্না খেয়ে বিরক্ত হয়ে আরকেডে গিয়েছিলেন;—এখানে একটা অতিকায় কুমীর সম্প্রতি নিয়ে আসা হয়েছিল, আর তাই দেখান হচ্ছিল। সে যুবকটী এসে মহা জিদ ধরে বলেন, যে কুমীরটাকে তাঁর ডিনারের জন্যে দিতে হবে। কুমীরওয়ালার সঙ্গে দরদস্তর ঠিক হয়ে যাওয়া মাত্রই তিনি তাকে (অর্থাৎ তার মালিককে নয়—আহা, সে ব্যক্তি বড়ই গোবেচারা, ধীরপ্রকৃতির একজন জার্ম্মাণ--পরন্তু কুমীরটাকে) গিলতে সুরু ক'রে দিলেন--পকেট থেকে কলম কাটবার ছুরিখানি বের করে সেই জীয়ন্ত জানোয়ারটার গা থেকে সেই রসাল রসাল মাংসের টুকরো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাটা, আর রসগোল্লার মত টপাটপ্ গিলে ফেলা! ক্রমে ক্রমে সেই গোটা কুমীরটা তার প্রকাণ্ড উদরের মধ্যে অন্তর্ধান হ'ল। এমন কি কুমীরের সঙ্গে সঙ্গে বরাবরই

গোসাপ থাকে। ছোকরা ভেবেছিলেন যে কুমীরটা যেমন রসাল, বুঝি বা গোসাপও তেমনি রসাল হবে, এই না ভেবে তাকে ও আক্রমণ করেন আর কি! বিদেশের পেটুকরা যে এমনতর খাদ্যের পক্ষপাতী, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, কেন না এসব খাদ্য বহুদিন থেকে তাদের পরিচিত। এমন কি আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছি যে কালে এমনি খাবারই ফ্যাশন হবে। ইংরেজ লর্ড ও ভবঘুরেরা রীতিমত দল বেঁধে ইজিপ্টে যায় কুমীর ধরতে, আর ঐ জানোয়ারের পেটটা রেঁধে, মাষ্টার্ড (সরষে) পেঁয়াজ আর আলুর সঙ্গে খায়। যে সমস্ত ফরাসীরা মুশিয়ে লেসেপেড়ি সঙ্গে গিয়েছিল তারা কুমীরের থাবা—পোড়া খেতে ভালবাসে—যদিও এমন করাতে ইংরেজরা বড় হাসাহাসি করে। আর তারা এর বড় বিরোধী। বোধ হয় দুরকম খানাই ক্রমে আমাদের পছন্দ হয়ে আসবে। আমাদের এই বিস্তৃত ও বিচিত্র জন্মভূমির কল্যাণ হিসাবে এই নূতন ধরণের ব্যবসার পত্তন দেখে বাস্তবিকই বড় খুসী হয়েছি। আর এই রকম ব্যবসাই আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। পিটার্সবার্গের পেটুকের পেটে যে কুমীর স্বর্গলাভ করেছে, তার বদলে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে শত শত কুমীরের আমদানি হবে। আর কুমীরকে আমাদের দেশের জলবায়ু সহ্য করিয়ে নিয়ে এখানের খাস বাসিন্দা করে তোলা কি বড়ই শক্ত হবে? নেভা নদীর জল যদি এই চমৎকার জীবটার পক্ষে একান্তই শীতল বোধ হয়, তা'হলে রাজধানীর ভিতর অনেক পুকুর তো আছে। এই ধরুন না কেন, পারগোলোভো, অথবা পাব্লোভোস্কে যে প্রেসনেন্স্কি পুকুরগুলি আছে তাতে, কিংবা মস্কোতে সামোটেকায় কুমীর পুষলেই তো হয়? এতে দুটো কাজ হবে। প্রথমতঃ ফ্যাশন-পছন্দ পেটুকের উপাদেয় সুরসাল ভোজ্য তো হবেই। দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ তা'দিকে দেখে মহিলারা আনন্দ উপভোগ করবেন, আর ছেলেরা প্রাণিবিজ্ঞান শিখবে। আর কুমীরের চামড়াতে, জুয়েল-কেস, বাক্স, সিগার-কেস, পকেট-বই, এবং বণিক্ সম্প্রদায়ের নিতান্ত প্রেমের নোট রাখবার থলি হতে পারে। আমাদের আশা আছে যে মনোহারি এই বিষয়টা নিয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করবে।"

আমার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বৃথা হয় নি, এই রকম ধরণের খবর বেরুবে; কিন্তু এ কাগজখানার কাণ্ডাকাণ্ডহীন ঘটনা-বিকৃতি দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার এই ভাবেই

কোন ও অংশীদারকে কাছে না দেখতে পেয়ে আমি প্রোহর স্যাভিচের দিকে তাকালাম। ইনি আমারই সম্মুখে বসেছিলেন আর আমার মুখের ভাবান্তর অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর হাতে ধ্বনি ব'লে একখানা কাগজ এমনভাবে ধরেছিলেন, যেন আমাকে সেখানা দেবার জন্যেই হাতখানা উদ্যত হয়েছিল। একটী কথা পর্য্যন্ত না ক'রে তিনি আমার কাছ থেকে সংবাদ কাগজখানা নিয়ে ধ্বনিখানা গুঁজে দিলেন। আর আমার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে একটা প্রবন্ধ নখ দিয়ে আঁচড়ে দিলেন। এই প্রোহর স্যাভিচ এক বড় মজার ধরণের লোক; বুড়ো হয়েছে, বিয়ে করে নি. সর্ব্বদাই চুপ, আমাদের কারুরই সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল না, আপিসে কারুরই সঙ্গে কথা কইত না; সব বিষয়েই নিজের একটা মত পোষণ করতো, কিন্তু প্রাণ গেলে কাউকেই সে মত জানাতো না। একলাই থাকতো। আমাদের মধ্যে কেউই তার বাসাখানা কি রকম তা চোখে দেখেনি।

ধ্বনি এই রকম লিখেছিল—

"সকলেই জানে আমরা ক্রমশই উন্নতির ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছি, আর মানবিকতারও অগ্রসর হচ্ছি; এক কথায় এ বিষয়ে ইয়ুরোপের সঙ্গে সকালে পা ফেলে চ'লতে চাইছি। কিন্তু আমাদের এত চেষ্টা চরিত্র, আর বিশেষ করে আমাদের কাগজের এত উদ্যম সত্বেও আমরা এখনও পরিপক্কতার অনেক দূরেই আছি। এ কথা যে ঠিক তা' আপনারা বিচার করবেন যখন শুনবেন কাল আরকেডে যে ঘটনা ঘটেছিল এবং যার সম্বন্ধে আমরা বহু পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। একজন বিদেশী একটী কুমীর নিয়ে রাজধানীতে আসে আর আরকেডে দেখাতে থাকে। আমাদের প্রভাব সম্পন্ন ও বিচিত্র জন্মভূমিতে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের শাখা পল্লবিত হওয়াতে আমরা বড়ই খুসী হয়ে তাকে বরণ করে নিলাম। হঠাৎ কাল বিকেল বেলা চারটার সময় অসম্ভব রকমের মোটা এক ভদ্রলোক মাতাল অবস্থায় বিদেশীর দোকানে এসে দর্শনী দিয়ে প্রবেশ করে; আর বলা নেই কওয়া নেই সোজাসুজি কুমীরটার চোয়ালের ভিতর লাফিয়ে পড়ে। বেচারী আর করে কি? সকল জীবেরই আত্মরক্ষার একটা সহজ সংস্কার আছে; সেই সংস্কারেরই বশে তাকে গিলে ফেলতে বাধ্য হতে হ'ল, নইলে লাফানির চোটে গুড়ো হয়ে যেত।

কুমীরের ভিতর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে ভদ্রলোকটা একেবারে ঘুমিয়ে গেল। কি বিদেশী কুমীরওয়ালা চেঁচামেচি, কি ভীত সন্ত্রস্ত তার পরিবারবর্গের আকুল বিলাপ ধ্বনি, কি পুলিসে খবর দেওয়ার ভয় দেখান, কিছুতেই আর তার চৈতন্য হ'ল না। কুমীরের ভিতর থেকে উচ্চহাসি ও তার খালখেঁচার প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা গেল না। বেচারী কুমীর ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ ক'রতে লাগল—বাধ্য হ'য়েই না তাকে গিলতে হ'য়েছে, তার আর দোষ কি? অনিমন্ত্রিত লোক ডাক্তারীর চাইতেও নৃশংস। এই বর্ব্বরোচিত ঘটনাটা আমাদের দেশের সভ্যতার অভাবই সূচিত করছে, এই বিশ্রী ব্যাপারে বিদেশীর চক্ষে আমরা কতটা না হীন হ'য়ে পড়েছি। এর যে কি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আছে তা' আমাদের বুদ্ধিতে আসছে না। রুষ জাতির স্বভাবে যে একটা গোঁয়ারতমির ছিট আছে তা' নূতন রকমে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। প্রশ্ন হতে পারে, সে অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিটার উদ্দেশ্য কি ছিল? গরম ও আরামদায়ী বাসস্থানের কি? কিন্তু এই রাজধানীতে সস্তাদরে অনেক ভাল ভাল বাসা পাওয়া যায়, যেখানে নেভা নদীর জল পাওয়া যায়, সিঁড়িতে গ্যাসের আলো জ্বলে, যার বাড়ীওয়ালার খরচে দরোয়ান পর্য্যন্ত হাজির থাকে। গৃহপালিত জন্তুর প্রতি বর্ব্বরোচিত আচরণের বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করছি। নিশ্চয়ই সেই কুমীরের পক্ষে এত বড় একটা জিনিষকে তক্ষণি তক্ষণি হজম করা বিষম দায়; বেচারী একেবারে ফুলে ফেঁপে পাহাড়ের সমান হয়েছে আর অসহ্য যন্ত্রণা ছটফট করতে করতে মরণের প্রতীক্ষা করছে। ইয়োরোপের সভ্যতা আলো আমরা পেলেও, ইয়োরোপের ধরণে আমাদের রাস্তা পাকা হলেও, ইয়োরোপের গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতির আমরা অনুকরণ করলেও, আমাদের চিরানুচরিত ট্রাডিশনকে ঝেড়ে ফেলে উঠতে—আমাদের এখনও অনেক দেরী।

আর, আমাদের ঘরগুলো নূতন হলেও, সিঁড়িগুলি সেই পুরাতন। আর আমাদের এই কাগজে বহুবার আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে পিটার্সবার্গে লুকিয়ানও নামক এক বণিকের বাড়ীতে কাঠের সিঁড়ির ধাপগুলি ক্ষয়ে গেছে; আর সেই বাড়ীতে বেচারী অফিসিয়া কালি ডারডের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। সে একটী সৈনিকের স্ত্রী, আর তাকে দিনে দশবার খাবার আর না হয়ত কাঠের বোঝা নিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে; কাল সন্ধ্যা আটটার সময় বেচারী ঝোলের

বাড়ী নিয়ে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে বসেছে। আমরা জানি না এখন লুকিয়ানও সিঁড়িটা সেরে দেবেন কিনা? ঘটনার পর কবিয়েরা চালাক হয়ে দাঁড়ায়; যদিও তাদের অসর্কতার অত্যাচারে বেচারী এখনি হাঁসপাতালে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রোহর সাভিচের দিকে চেয়ে আমি মুগ্ধভাবে চেয়ে বল্লাম—"একি? এর মানে কি?"

"কি বলছো তুমি?"

"সত্য কথা বলতে, আইভান ম্যাটভিচের উপর দয়া না করে এরা যে কুমীরের পক্ষ অবলম্বন করেচে।"

"তাতে হয়েছে কি? স্তন্যপায়ী জীবের উপরও তাদের দয়া আছে। আমাদিগকে ইয়ুরোপের সঙ্গে চলতে হবে, হবে না কি? সেখানে তারা কুমীরদের জন্যও বড় টান দেখায়। হি—হি—হি!"

এই বলেই সেই দেশছাড়া বুড়ো প্রোহর সাভিচ কাগজের ভিতর ডুবে গেল; আর একটা কথাও কইলে না। দুখানা কাগজই আমি পকেটে পুরে ফেল্লাম; আর যতগুলো পুরোনো কাগজ পেলাম সংগ্রহ করে ফেল্লাম। সন্ধ্যে বেলায় মাটভিচকে সেগুলো শোনাবার অভিপ্রায়ে। সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী থাকলেও আমি অপিস হতে বেড়িয়ে পড়লাম। আরকেডে যাবার জন্যে, আর দূর থেকে শুনতে সেখানে কি ব্যাপার চলছে, আর কে কি মন্তব্য প্রকাশ করছে। দিব্যচক্ষে দেখতে পেলাম যে ভারী ভিড় হবে। একটু কেমন কেমন বোধ হ'লেও যেতে হ'ল। কি করা যায়?

(সমাপ্ত।)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠা।

বাণিজ্যজগত হইতে ওলন্দাজজাতি যখন ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতেছিল তখন হইতেই বাণিজ্যলক্ষ্মী ইংরাজজাতিকে আশ্রয় করিলেন। ইংলণ্ডের ভৌগলিক সংস্থান এবং ইংরাজের স্বভাব ও চরিত্রের জন্যই ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠা প্রথম হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল। ধনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক মার্শাল্ (Marshall) বলেন "উত্তর য়ুরোপের দুর্দ্ধর্ষ জাতিসমূহের বলবান লোকগুলি যে পর পর আসিয়া ইংলণ্ডে বসবাস করিয়াছিল, ইংলণ্ডের ভৌগলিক সংস্থানই উহার প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলেই যেন আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী লোকগুলি একে একে আসিয়া ইংলণ্ডের তীরে ঘর বাঁধিল। তথাকার আব-হাওয়াও শক্তিশালী লোকের প্রতিকূল নহে। তাহার কোনো অংশেই হিমালয়ের মতো সুউচ্চ পাহাড় মাথা গজাইয়া দেশকে ভাগ করিয়া রাখে নাই; এবং তাহার কোনো স্থানই জলযান গমনোপযোগী নদী হইতে ২০ মাইলের চেয়ে বেশী দূরে অবস্থিত নহে। এই সব কারণেই তাহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবাধভাবে আদানপ্রদান চলিতে পারিয়াছে।"...

লুথার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসংস্কারও ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠার উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। ইংলণ্ডে যে সব জাতি বসবাস করিয়াছিল তাহারা সকলেই ছিল স্বভাবতঃ গম্ভীর ও নির্ভীক, কাজেই লুথার অনুষ্ঠিত সংস্কৃত ধর্ম্মের নূতন মতবাদ গ্রহণ করিতে তাহারা একটুও দ্বিধা করিল না। ইহাতে তাহাদের প্রকৃতি ও অভ্যাস ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল।

এই নূতন ধর্ম্মানুসারে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মধ্যস্থ করিবার কেহ না থাকায় তাহাদের মনে হইল তাহারা যেন একেবারে সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। এই নূতন ভাবের প্রভাবে আসিয়া তাহাদের জীবনে ভক্তিযুক্ত ভয় এবং গভীরতা আসিল। লুথারের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসংস্কার আরেকভাবে ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিল। অন্যান্য দেশে যাঁহারা এই নববিধান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা উৎপীড়নের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সকল নবাগত জাতি কোন্ এক অদৃশ্য

শক্তির টানে ইংলণ্ডে আসিয়া দেখিল ইংরাজের স্বভাব চরিত্রের সহিত তাহাদের অপূর্ব্ব মিল। শান্তিতে থাকিয়া তাহারা ক্রমশঃ তাহাদের শক্তি ও স্বভাবের উপযুক্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর গভর্ণমেণ্টের কড়া শাসন অনেকটা কমিয়া আসাতে ইংলণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রম ও মূলধনের সদ্ব্যবহার করিয়া পণ্য উৎপাদন এবং উহা দেশ বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিবার স্বাধীনতা পাইল। তখন হইতে প্রতি কাজেই চিন্তা ও যুক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে বহিঃশত্রুর ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা ছিল কম, আর দেশের ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল ভালভাবেই। কাজেই দেশবাসী বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। এইরূপে মূলধনের যোগান্ খুব বাড়িল। এদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী পণ্যের বাজারও জুটিল অনেক। এই সব কারণে ইংলণ্ডে ক্রমশঃ বৃহদাকারে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে উৎপাদন-প্রণালীর উন্নতির জন্য ইংলণ্ডে কেহ কেহ নব নব যন্ত্রাদি আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বৃহদাকারে ধনোৎপাদন যখন সম্ভব হইল, এবং বড় বড় পরীক্ষার জন্য অর্থও যখন সহজে পাওয়া যাইতে লাগিল, তখন কয়েকজন ব্যক্তি অনেকরকম কল আবিষ্কার করিয়া জাতির আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিলেন। এই সব আবিষ্কারের ফলে বিলাতী পণ্যের যোগান বাড়িল; আবার সঙ্গে সঙ্গে উহা বিক্রয়ের জন্য দূর দূরান্তরে বহু ক্রেতাও জুটিতে লাগিল। ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের এক চিন্তা এক ধ্যান হইল কি করিয়া তাঁহারা বিদেশী বাজার দখল করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন বিদেশী বাজারে তাঁহাদের পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে উহা সস্তা অথচ উৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক উৎপাদকই চিন্তা করিতে লাগিলেন তিনি কি উপায়ে শ্রম ও মূলধনের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সব চিন্তা ও চেষ্টার ফলে নিত্য নূতন যন্ত্রাদি আবিষ্কার হইতে লাগিল।

তখন যতরকম যন্ত্র আবিষ্কার হইতেছিল তাহার মধ্যে কাপড়ের কলই শিল্পজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে জন কে অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায়ে এক তাঁত প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে বয়নকার্য্য খুব তাড়াতাড়ি হইতে লাগিল;—আগে দুইজনে যাহা করিত

এখন একজনেই তাহা করিতে সমর্থ হইল। ইহার ফলে কাপড়ের যোগান্ বাড়িয়া গেল। কিন্তু সূতাকাটুনীরা সূতা যোগাইয়া উঠিতে পারিল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য হারগ্রীভ্‌স্ (Hargreaves) অনেক চিন্তা করি। অবশেষে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে একটা সূতাকাটা যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। এই যন্ত্র সাহায্যে একজন লোকে একবারেই অনেকগুলি টেকুয়া চালাইয়া সূতা কাটিতে সমর্থ হইল। পল্লীর গৃহস্থ তাহার ঘরে বসিয়াই এই যন্ত্র সাহায্যে সূতা কাটিতে পারিত ;—কোনো কারখানার প্রয়োজন হয় নাই। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আর্ক্‌রাইট্ (Arkwright) একটী সূতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহা নদী বা জোয়ার জলের স্রোতের বেগে চলিত। এই যন্ত্রে সূতাকাটা আর গৃহস্থ ঘরে বসিয়া চলিল না ;—কারখানার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। হাতে কলমে কাজ করিয়া দেখা গেল যে ইহা বড় সুবিধার হয় নাই। সেই জন্য আর্ক্‌রাইট্ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আর একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহার সাহায্যে সূতাকাটার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কাজেই কলে সম্পন্ন করা সম্ভব হইল। কিন্তু যে সূতা তৈয়ারী হইতে লাগিল তাহা অত্যন্ত মোটা। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ক্রম্প্‌টন্ (Compton) হারক্রীভ্‌স্ ও আর্করাইটের আবিষ্কৃত যন্ত্র দুইটীর সূতা কাটিবার প্রণালী মিলাইয়া আর একটী সূতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে বেশ শক্ত ও সরু সূতা তৈয়ার হইতে লাগিল। এই আবিষ্কারের ফলে সূতাকাটা বেশ দ্রুত চলিল ; কিন্তু তাঁতীরা কাপড় বুনাতে যেন কতকটা পিছাইয়া পড়িল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কার্ট্‌রাইট্ (Cartwright) কলের তাঁত (Powerloom) আবিষ্কার করাতে বয়নের অনেক উন্নতি হইল। এখন হইতে সূতাকাটা ও কাপড় বুনা সমানে সমানেই চলিতে লাগিল। কলের তাঁতের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সূতাকাকা, কাপড়বুনা, রংকরা প্রভৃতিরও অনেক উন্নতি লক্ষিত হইল। এই সমস্ত কার্য্যই বাষ্পীয়কলের সাহায্যে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই সকল আবিষ্কারের ফলে ভাল সূতা ও কাপড় বেশী পরিমাণে এবং অল্প খরচে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এখন তাঁতীর পক্ষে পল্লীগৃহে বসিয়া বস্ত্রবয়ন করা লাভজনক রহিল না। বয়নশিল্পে বাষ্পীয় কলের সাহায্য লওয়াতে বড় বড় কারখানার সৃষ্টি হইল। বাষ্পীয় কলের আবিষ্কার শিল্পজগতে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। কয়লার খনি, লৌহ ব্যবসা ইত্যাদি সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানেই বাষ্পীয়কলের সাহায্য গ্রহণ

করায় দেশে পণ্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে অথচ সস্তায় উৎপন্ন হইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্প ভাঙ্গিয়া বড় বড় কারখানার সৃষ্টি হওয়াতে ইংলণ্ডের সমাজের ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনও হইতে আরম্ভ করিল। এদিকে জল পথে কিম্বা স্থলপথে জিনিষপত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার অথবা যাতায়াতের যানবাহনাদির ও উন্নতি হইতে হইতে শেষে রেলগাড়ী এবং ষ্টীমারের চলন হইল। ধনোৎপাদন উন্নত পন্থা এবং রেল ষ্টীমারের প্রচলন এই দুই ঘটনার মিলনেই মধ্য যুগের ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তিত হইল। অধিক পরিমাণে ধনোৎপাদনের ফলস্বরূপ লোক সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ইতি মধ্যে ইংলণ্ডের নৌবহরেরও উন্নতি হইল এবং তাহার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার উপনিবেশিকদিগের সহিত ইংরাজের মনোমালিন্য আরম্ভ হওয়াতে তাহারও প্রভাব আসিয়া পড়িল ইংরাজের বাণিজ্যের উপর। ইংরাজের পণ্য যুক্তরাজ্যের বাজারে বিকাইবার আর যুক্তরাজ্যের সুবিধা রহিল না। ফরাসীজাতি ইংরাজের উন্নত নৌবহর দেখিয়া ঈর্ষায় মনে মনে জ্বলিতেছিল। আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের বিচ্ছেদ সুরু হওয়াতে তাহারা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ্যে শত্রুতা আরম্ভ করিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজা লুই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইহাতে ফরাসী ও ইংরাজের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। স্প্যানিয়ার্ডগণ ছিল ঘোর ইংরেজবিদ্বেষী, কাজেই সুযোগ বুঝিয়া তাহারাও শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিল। ওলন্দাজগণ উত্তর আমেরিকার তীরে বাণিজ্য বিস্তার করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া তাহারাও উপনিবেশিকদিগের দলে ভিড়িল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষিত হইলে তাহারাই কামান বন্দুক গোলাগুলি দিয়া উপনিবেশিকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। ইংরাজ দেখিল বিপক্ষে যে সকল জাতি দলবদ্ধ হইয়াছে তাহারা বেশ শক্তিশালী, এবং তাহাদের প্রায় সকলেরই উন্নত সমুদ্রযানাদি আছে। বড় আশা করিয়া ইংরাজ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইল। রুষিয়া আত্মরক্ষার জন্য নিরপেক্ষ রহিল। যাহাতে নিরপেক্ষ জাতীয় বাণিজ্যপোত বন্দরে বন্দরে স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করিতে পারে, এবং যুদ্ধেরত জাতীসমূহের দ্রব্যাদি যাহাতে নিরপেক্ষ জাতীয় বাণিজ্যপোতে নিরাপদে থাকিতে পারে তজ্জন্য রুষিয়া দাবী করিতে

লাগিল। এই ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীগুলির পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হওয়াতে, তাহারা এই সুযোগে যা'র যা'র নিজের উন্নতির পথ দেখিল। এই সব বিভিন্ন কারণেই আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ গৌণ ভাবে ইংরাজের ব্যবসা বাণিজ্যের অনিষ্ট সাধন করিল।

অবশেষে ইংরাজ যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সমরাসক্ত জাতিগুলি ভার্সেইতে (Verseilles) যে সন্ধি করিল তাহার সর্ত্তানুসারে ভাল ভাল দ্বীপগুলি এবং বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক স্থান সমূহ পড়িল স্পেন্ ও ফ্রান্সের ভাগে। বখরা ততো সুবিধাজনক হয় নাই। এই ভাগ বাটরাতে ঠকিল ইংরাজ; কিন্তু তাহার ওই ক্ষতির পূরণ হইল অন্য দিক দিয়া। এই যুদ্ধের ফলে তাহার রণতরি সমূহ তাহার নৌবিভাগ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উহার প্রমাণ পাওয়া গেল স্পষ্টভাবে। এই যুদ্ধে ওলন্দাজগণের ক্ষতি হইল ভীষণ, ফ্রান্সের নৌবিভাগের ও যথেষ্ট অধঃপতন হইল; আর আমেরিকা যে শীঘ্র তাহার নৌবিভাগের উন্নতি করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা রহিল কম। কাজেই যুদ্ধের শেষে, বস্ত্রশিল্পের ঐ উন্নতির দিনে পৃথিবীর নানাস্থানে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজের বাণিজ্যপোতই প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া টিকিয়া রহিল। ইহার ফলে যুক্তরাজ্যের বাজারে বিলাতী পণ্যের প্রাধান্য কতকটা থাকিয়া গেল। ফ্রান্স্ অথবা হল্যাণ্ড কেহই এই বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিল না।

ইংরাজ তাহার নৌবহরের বলে বলীয়ান হইয়া এখন ফ্রান্স্ ও হল্যাণ্ডের বাণিজ্যের ও নৌবিভাগের ধ্বংসসাধনে মনোযোগ দিল। তাহারা মিলিত হইয়াও ইংরাজের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। যুক্তরাজ্য, ব্রেজিল, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ইংরাজের হাতে থাকায় তাহারা ক্রমশঃ নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সময়ে ইংরাজ দূর দূরান্তের বাজারগুলির দখল করিয়া আপনাদিগের বাণিজ্য ও শিল্প দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিল। তবে একথা খুবই সত্য, যে নব নব যন্ত্রাদি আবিষ্কার না করিয়া, এবং ধনোৎপাদনের উন্নত প্রণালী অবলম্বন না করিয়া কেবল বিভিন্ন দেশের বাজারগুলি দখল করিয়াই ইংরাজ কোনকালেই "Workshop of the world" বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

তালবেতাল।

:০:-

কান্দাহার প্রদেশে রুস্তম নামে এক জমীদার-পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতার অন্য কোন সন্তান ছিলনা, সুতরাং তিনি অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। তিনি দেখিতেও খুব সুশ্রী ছিলেন। সেই প্রদেশীয়ই অন্য এক জন জমিদারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

শুভ বিবাহের কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কাবুলের মেলা দেখিতে যান। কাবুলের মেলা তখনকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মেলা ছিল। জিনিষপত্র কিনিবার জন্য নানা দেশের রাজা মহারাজা তথায় যাইতেন। কাশ্মীরের রাজাও এই মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটি বহুমূল্য হীরক ও একটী বর্শা চুরি যায়। হীরকের উপর তাঁহার একমাত্র কন্যার মূর্ত্তি খোদিত ছিল এবং ঐ বর্শাটির এমন গুণ ছিল যে, আদেশ করিবামাত্র ইহা লক্ষ্য স্থানে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিত। হয় ত কোন বণিক এই দুইটি অমূল্য জিনিষই মেলায় বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইবে, তজ্জন্য তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে ঐ দুইটি জিনিষের কোনটিই ঠিক হারায় নাই। একজন ফকীর রাজার তোষাখানা হইতে ঐ দুইটি জিনিষ লইয়া রাজকন্যাকে দিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি যেন ঐগুলি যত্ন করিয়া রাখেন, কারণ ঐদুইটির উপরেই রাজকন্যার জীবন নির্ভর করিবে। রাজকন্যা পিতার সহিত মেলায় যাইবার সময় বর্শাটিকে নিজের বাক্সে খুব গোপনে রাখিয়া হীরকখানিকে নিজের সঙ্গে বিশেষ সাবধানে লইয়া গিয়াছিলেন।

কাবুলের মেলায় রাজকন্যার সহিত রুস্তমের সাক্ষাৎ, ও পরে পরিচয় এবং ক্রমে ক্রমে একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ফলে, রাজকন্যা রুস্তমকে গোপনে সেই হীরকখানি দিলেন এবং রুস্তমও কাশ্মীরে যাইয়া রাজকন্যার সহিত দেখা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রুস্তমের দুইটি প্রিয় ভৃত্য ছিল—তাল ও বেতাল। তাল দেখিতে সুন্দর ছিল; তাহার স্বভাবও ভাল ছিল। বেতাল দেখিতে কদাকার এবং দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। কিন্তু উভয়েই রুস্তমকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং কদাচ তাঁহার কথার অমান্য করিত না। মেলা হইতে আসিয়া রুস্তম তাল ও বেতালকে সকল কথা বলিয়া কাশ্মীর যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাল কাশ্মীর যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া তাঁহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিল। পূজনীয় পিতাকে কাঁদাইয়া তিনি কোথায় যাইবেন? তাঁহার ত কোন কোন অভাব নাই

বিশেষতঃ অকস্মাৎ দেশত্যাগ করিয়া গেলে, যে কন্যার সহিত তাঁহার শুভবিবাহের কথা চলিতেছে, তাহারই বা কি হইবে ?

কিন্তু, বেতাল রুস্তমকে কাশ্মীর যাইতে পরামর্শ দিল। রুস্তমের অর্থাভাব ছিল, বেতালই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল। রুস্তমের নিকট রক্ষিত কাশ্মীররাজের সেই অমূল্য হীরকখানি এক জন বণিকের নিকট গোপনে বিক্রয় করিয়া সে প্রচুর অর্থ আনিল। রুস্তম যাহাতে না জানিতে পারেন তজ্জন্য সে একখানি কৃত্রিম হীরক রুস্তমের বাক্সে রাখিয়া দিল। এমনি করিয়া সব ঠিক হইল এবং একটি হস্তীর উপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার রাখিয়া রুস্তম তাল, বেতাল ও অন্যান্য লোকজন সহ গভীর রাত্রে স্নেহময় পিতা ও পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

তাল, রুস্তমকে বলিল,—"আমি কাশ্মীরযাত্রার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলাম, কিন্তু, আপনি যখন যাইতেছেন তখন আমি অবশ্যই সঙ্গে যাইব। তবে, আমি প্রস্তাব করি যে একবার কোন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। দৈবজ্ঞ উত্তর করিলেন—"রুস্তম, তুমি যদি পূর্ব্বাভিমুখী হইতে চাও, তবে তোমাকে পশ্চিমে যাইতে হইবে। "রুস্তম ইহা বুঝিতে পারিলেন না। তাল বলিল,—"দৈবজ্ঞের উক্তি হইতে অমঙ্গল আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু বেতাল উত্তর করিল যে, 'না, ইহা হইতে মঙ্গলই সূচনা করা যাইতে পারে।" কিছু বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে আর একজন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। শেষোক্ত দৈবজ্ঞ উত্তর করিলেন—"রুস্তম, তোমার যাহা আছে তাহা তোমার থাকিবে না; যে জিনিষে তোমার মঙ্গল হইবে, সেই জিনিষেই তোমার অমঙ্গল হইবে; তুমি যদি রুস্তম হও তবে তোমার রুস্তমত্ব ঘুচিয়া যাইবে।" তাল পুনর্ব্বার নিজ প্রভুকে সাবধান হইতে বলিল, কিন্তু বেতাল এবারও বুঝাইয়া দিল যে দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা বিধেয় নহে।

কান্দাহার হইতে তাঁহারা কাবুল পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে অগ্রসর হইবার সময় তাঁহাদের এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইল। রুস্তম অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ভৃত্যবর্গকে ছাউনি ফেলিতে ও আহারের যোগাড় করিতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে দেখা গেল যে, তাল ও বেতাল তাঁহার সঙ্গে নাই; তাহারা যে কোন্ সময়ে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা তিনি বা অন্যান্য কোন ভৃত্যই লক্ষ্য করে নাই। রুস্তম ও অন্যান্য ভৃত্যেরা চাৎকার করিয়া তাল ও বেতালকে ডাকিতে লাগিল। ডাকিতে ডাকিতে তাহারা সেই অরণ্যের নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু, কোথায়ও তাহাদিগের সন্ধান না পাইয়া অবশেষে রুস্তমের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, "তাল ও বেতালকে পাওয়া গেল না কিন্তু দেখিলাম যে এক ঈগলপক্ষী ও শকুনি ভীষণ যুদ্ধ করিতেছে।"

রুস্তম খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতে গেলেন। কিন্তু, সেখানে আর সে

ঈগল বা শকুনি দেখিতে পাইলেন না। তৎপরিবর্ত্তে দেখিলেন যে তাঁহারই হস্তীকে একটী গণ্ডার আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া গণ্ডারটী জঙ্গলে পলায়ন করিলে এবং তাঁহার লোকেরা হাতীটীকে ছাউনিতে ফিরিয়া আনিল। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন যে, ছাউনিতে তাঁহার ঘোড়াটী নাই। রুস্তম অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি যখন এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন তখন দেখিলেন যে একটী কৃষক একটী সুন্দর গর্দ্দভকে মারিতে মারিতে তথায় আনায়ন করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি আর এরূপ তেজস্বী ও সুশ্রী গর্দ্দভ দেখেন নাই। রুস্তমের অশ্বটীকে পাওয়া যাইতেছিলনা; সুতরাং তিনি সাগ্রহে কৃষকের নিকট হইতে গর্দ্দভকে ক্রয় করিলেন কৃষক গর্দ্দভকে "তোকে আরও শিক্ষা দিব," এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। রুস্তমও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়িয়া, অন্যান্য ভৃত্য সহ কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইলেন।

কিন্তু, অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে কি হয়? তিনি যেমন গর্দ্দভের উপরে চড়িলেন। অমনি সে মুখ ঘুরাইয়া কান্দাহারের দিকে যাইতে লাগিল। রুস্তমের বহু চেষ্টাতেও সে কাশ্মীরের দিকে মুখ ফিরাইলনা। তাঁহার ভৃত্যবর্গও বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু গর্দ্দভকে কোন প্রকারেই কান্দাহারের দিকে লইয়া যাইতে পারা গেল না!

হঠাৎ এমন সময়ে অনেকগুলি উষ্ট্র লইয়া একজন উষ্ট্রচালক সেই স্থানে উপনীত হইল। রুস্তমের দুর্দ্দশা দেখিয়া সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল, "মহাশয়ের বড় কষ্ট হইতেছে। আপনার জন্তুটীকে আমাকে দিয়া আপান আপনার ইচ্ছানুসারে চারিটী উষ্ট্র লউন।" অবশ্য, রুস্তম বিশেষ আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তিনি নিজে একটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অন্য তিনটীকে ভৃত্যবর্গের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। মনে করিলেন, "তালেরই ভুল, বেতালই ঠিক। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হইলে একটী গর্দ্দভের পরিবর্ত্তে কি কখনও চারিটী এরূপ সুন্দর উষ্ট্র পাওয়া যায়।"

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরে, এক গভীর নদী তাঁহাদের গতি রোধ করিল। নদীর স্রোতও অত্যন্ত প্রখর। ইহা পার হইবার কোনই উপায় ছিল না। অধিকন্তু, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে উচ্চ পাহাড় দেখা দিল। রুস্তম কি করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার এখন মনে হইতেছে তালের কথাগুলিই ঠিক।" তাঁহাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া ভৃত্যবর্গ আরও শঙ্কিত হইয়া পড়িল। অন্ধকার রাত্রি গভীর অরণ্য, তিন দিকে দুরারোহ পর্ব্বত, সম্মুখে নদী। কি করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে তিনি ও ভৃত্যেরা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন যে নদীর উপরে কে যেন শ্বেত প্রস্তরের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্য! ভগবানের করুণা ব্যতীত আর কিছুতেই এরূপ

হইবার নহে, মনে করিয়া সকলে নতজানু হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রুস্তমও মনে করিতে লাগিলেন, "ভগবান আমার সহায়। তালের একেবারেই বুদ্ধি নাই; বেতালের কথাই ঠিক।" তাঁহারা নদী পার হইয়া অপর তীরে পৌঁছিবামাত্র সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রুস্তম বলিলেন, "বেশ হইল। ভগবানকে ধন্যবাদ দেও। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে আমরা কান্দাহার ফিরিয়া যাই। তাঁহারই ইচ্ছা যে আমার সহিত কাশ্মীরের রাজকুমারীর বিবাহ হয়। তাহা হইলে আমি কাশ্মীরের রাজা হইব। এই জন্যই দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন, "তোমার যাহা আছে তাহা তোমার থাকিবে না।" ঠিকই ত! আমি কান্দাহারের সামান্য জমিদার—তাহা আর থাকিব না। দৈবজ্ঞ আরও বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি রুস্তম হয়, তবে তোমার রুস্তমত্ব ঘুচিয়া যাইবে।" ঠিক্—আমি রুস্তম থাকিব না, আমি কাশ্মীর রাজা হইব। তা নিশ্চয়ই দৈবজ্ঞের কথা সত্য। বেতালের পরামর্শই ঠিক। এ সময়ে বেতাল কোথায়?"

বিশেষ আহ্লাদের সহিত তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু, যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে সুউচ্চ পর্ব্বতমালায় তাঁহাদের গন্তব্যপথ রোধ হইয়াছে। অগ্রসর হইবার কোন আশা নাই, কোন পথ নাই, কোন উপায় নাই। রুস্তমের ভৃত্যবর্গ এ দৃশ্যে অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "এই জন্যই মর্ম্মর প্রস্তরের সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা যাহাতে প্রত্যাগমন না করিতে পারি তজ্জন্যই ভগবান সেই সেতু নষ্ট করিয়াছেন এবং যাহাতে আমরা আর অগ্রসর না হইতে পারি তজ্জন্যই তিনি এই পর্ব্বতমালা সৃজন করিয়াছেন। আমরা কাশ্মীরও দেখিতে পারিব না, কান্দাহারেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব না।"

রুস্তমও কি করিবেন ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার এক্ষণে মনে হইতে লাগিল, "তালের কথাই ঠিক। বেতালই আমার সর্ব্বনাশের মূল। দৈবজ্ঞের কথাই সত্য।" কিন্তু, তাঁহার আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া সুপ্রশস্ত রাজপথ দেখা দিল—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বর্ত্তিকার আলোতে সেই রাজপথ আলোকিত, উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

রুস্তম ও তাঁহার অনুচরবর্গ নতজানু হইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রুস্তম যে কাশ্মীরের রাজা হইবেন সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। রুস্তম এবার উচ্চৈঃস্বরে বেতালের জন্য শোক করিতে লাগিলেন। "বেতালের কথাই ঠিক।" সকলে পর্ব্বতমধ্যস্থ রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া একটী জনপদে পৌঁছিলেন। সুন্দর দেশ—প্রশস্ত সুসজ্জিত রাজপথ, উচ্চ হর্ম্ম্যাবলী—সারি সারি পুষ্পবাটীকা হইতে তানলয় সঙ্গীতধ্বনি উঠিতেছে। রুস্তম তদ্দেশবাসী একজনকে সেই জনপদের নাম ও তাহাদের আহ্লাদের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "মহাশয়! এ প্রদেশের নাম কাশ্মীর। আমাদের রাজকুমারীর শুভবিবাহ, তাই আমরা আমোদ প্রমোদ করিতেছি।"

রুস্তম এ সংবাদে মূর্চ্ছিত হইলেন। কাশ্মীর রাণী ভদ্রলোক রুস্তমকে নিজ আবাসে লইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ও তদ্দেশবাসী দুইজন সুযোগ্য চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। একজন চিকিৎসক নাড়ী দেখিয়া বিশেষ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কান্দাহারবাসী; সুতরাং ইহাকে সত্বর কান্দাহারে প্রেরণ করা হোক।" অপর চিকিৎসকটী বিজ্ঞভাবে বলিলেন, "ইহাকে রাজকুমারীর শুভবিবাহের আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে দিলেই সুস্থ হইবে।" তাহাদের কথোপকথনের সময় রুস্তম জ্ঞান লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কোন্ দেশীয় রাজপুত্রের সহিত কাশ্মীরের রাজকুমারীর শুভবিবাহ হইবে এবং এই অদৃষ্টবান রাজপুত্র কি গুণে ভূষিত?"

তাঁহারা উত্তর করিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কাশ্মীর রাজার একটী মূল্যবান হীরক ও অমূল্য বর্শা চুরি যায়। রাজা মহাশয় বহু চেষ্টায়ও উহাদের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই। অবশেষে, যে হীরক উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকেই রাজকন্যা সমর্পণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা দেন। ইহারই ফলে এক অজ্ঞাতকুশল রাজপুত্র হীরকখানি আনিয়া রাজাকে দিয়াছেন। ফলে, রাজা এই রাজপুত্রের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিতে বাধ্য। কিন্তু রাজকুমারী এ বিবাহে কোন অজ্ঞাত কারণে, সম্পূর্ণই অনিচ্ছুক।"

রুস্তম এই কথা শুনিয়া কাশ্মীর রাজের দর্শন প্রার্থী হইয়া রাজদরবারে গমন করিয়া, অতিকষ্টে রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন যে অজ্ঞাতকুশল ব্যক্তি জুয়াচোর মাত্র; সে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি আরও নিবেদন করিলেন যে সে যদি উপযুক্তই হয় তবে সে যেন তাঁহার সহিত দ্বন্দযুদ্ধে ব্রতী হয়। অধিকন্তু, হীরকখণ্ড তাঁহার নিকটেই আছে। এই বলিয়া তিনি বেতাল প্রদত্ত কৃত্রিম হীরকখানি রাজাকে দিলেন।

রাজা আসল ও নকলের প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন না। রুস্তম বলিতে লাগিলেন, তাঁহার হীরকখানিই আসল; অপরে বলিলেন তাঁহার খানিই আসল। অবশেষে রাজা উভয়কে দ্বন্দযুদ্ধের আদেশ করিলেন। কোথা হইতে একটী ছাতারেপাখী ও একটী কাক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া একটী "যুদ্ধ করিও না," অন্যটী "যুদ্ধ কর" বলিতে লাগিল।

যুদ্ধারম্ভ হইল। রাজা রাজকুমারীকে যুদ্ধ দেখিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু রাজকুমারী নিজ কক্ষত্যাগ করিলেন না। অল্পক্ষণের যুদ্ধেই রুস্তম তাঁহার প্রতিদ্বন্দীকে নিহত করিলেন। জেতা তদ্দেশীয় নিয়মানুযায়ী বিজেতার বর্ম্ম পরিধান করিয়া রাজা ও

অন্যান্য সভাসদবর্গ সহিত রাজকুমারীর কক্ষের নিকটে যাইয়া দ্বার খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী দ্বার মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া বিজেতার বর্ম্ম পরিহিত রুস্তমকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, অপরিচিত রাজপুত্রই তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত। যুদ্ধে জয় লাভ করিলে যে জেতা বিজেতার বর্ম্ম পরিধান করেন, তাহা তাঁহার মনে হয় নাই। বিশেষতঃ কান্দাহার হইতে যে রুস্তম কাশ্মীরে সে সময়ে আসিবেন, তিনি তাহা ভাবিতেও পারেন নাই। সুতরাং তিনি শীঘ্র তাঁহার লুক্কায়িত বর্শাটী লইয়া রুস্তমকে আঘাত করিলেন। ফলে রুস্তম সেই অব্যর্থলক্ষ্যে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সেই চীৎকার শব্দে রাজকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে রুস্তমই আসিয়াছেন। তিনি উন্মাদিনী হইয়া সেই বর্শা আমূল নিজ বক্ষে বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজার ও রাজধানীর লোকের শোকের অবধি রহিল না। কোথায় শুভবিবাহ, আর কোথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

রুস্তমকে একটী কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি তথায় পৌঁছিয়া দেখিলেন যে তাল ও বেতাল তাঁহার অন্তিম শয্যার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়কে তাঁহাকে পরিত্যাগ করার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাল উত্তর করিল, "আমিত এক মিনিটও আপনাকে ত্যাগ করি নাই।" বেতাল বলিল, "আমি অনুক্ষণই আপনার নিকটে আছি।" রুস্তম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি বলিতেছ? অন্তিম সময়ে তোমরা এরূপ ব্যবহার করিতেছ কেন?"

তাল উত্তর করিল, "আপনি বেশ জানেন যে আমি পূর্ব্বাপরই আপনার কান্দাহার পরিত্যাগের বিরোধী। আমিই ঈগল হইয়া শকুনির সহিত যুদ্ধ করিয়াছি; আমিই হস্তীরূপে আপনার রসদ সহ পলায়ন করিয়াছি; আমিই গর্দ্দভরূপে কাশ্মীরে না আসিয়া কান্দাহার যাইতে চেষ্টা করিয়াছি; আমিই সুগভীর নদীরূপে আপনার গতি প্রতিহত করিয়াছি; আমিই দুরারোহ পর্ব্বত এবং আমিই চিকিৎসকরূপে আপনাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে পরামর্শ দিয়াছি, ছাতারে-পক্ষী রূপে যুদ্ধে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছি। বেতাল বলিল, "আমিই শকুনিরূপে ঈগলপক্ষীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি; আমিই গণ্ডাররূপে হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি; আমিই কৃষকরূপে গর্দ্দভকে মারিয়াছি এবং আমি বণিক্ বেশে আপনাকে উষ্ট্র দিয়াছি; সেতু আমিই করিয়াছি এবং পর্ব্বত মধ্যে রাজপথও আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং চিকিৎসকরূপে আপনাকে এখানে থাকিতে উপদেশ ও কাকরূপে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছি।"

তাল বলিল, "দৈবজ্ঞের কথা মনে করুন। পূর্ব্বাভিমুখী হইলে পশ্চিমে যাইতে হইবে।" বেতাল বলিলে, "দৈবজ্ঞ ত ঠিকই বলিয়াছিলেন। আপনি বুঝিয়া দেখেন নাই কেন?

আপনার যাহা ছিল, তাহা থাকিল না। যুদ্ধে আপনি জয়লাভ করিলেন, কিন্তু উহাতেই আপনার মৃত্যু হইল। এদেশে মৃতদেহের মস্তক পশ্চিমে রাখিয়া প্রোথিত করে। মৃত্যুতে আপনার রুস্তমত্ব ঘুচিয়া যাইবে।

তাহাদের কথোপকথনের সময় তালের পৃষ্টদেশে দুইখানা শ্বেতপক্ষ ও বেতালের পৃষ্ঠে দুইখানি কৃষ্ণবর্ণের পাখা দেখা দিল। রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উহার অর্থ কি?' তাল উত্তর করিল, "আমি আপনার সুদেবতা।" বেতাল বলিল, আমি আপনার কুদেবতা।

অকস্মাৎ সব বিলুপ্ত হইল। রুস্তম দেখিলেন যে তিনি তাঁহার পিতৃগৃহে শয্যায় শয়নে রহিয়াছেন। তিনি চীৎকার স্বরে তালকে ডাকিতে লাগিলেন। তাল হাই তুলিতে তুলিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি বাঁচিয়া আছি, না মরিয়া গিয়াছি? কাশ্মীরের রাজকুমারীর কি বাঁচিবার আশাই নাই!"

তাল খুব ধীরভাবে বলিল, "আপনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন?" রুস্তম তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "সেই পাজী বেতালের কি হইয়াছে? তাহার কাল পাখা দুখানি কি আছে? তাহার জন্যই ত আমার এই দুর্দ্দশা!" তাল প্রত্যুত্তর করিল, "আমি এই মাত্র দেখিয়া আসিলাম, সে নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তাহাকে কি ডাকিতে হইবে?"

রুস্তম বলিলেন, "পাজী সেই ত আমাকে এই ছয়মাস জ্বালাতন করিতেছে। তাহারই পরামর্শে আমি কাবুলের মেলায় যাই; সেই আমাকে কাশ্মীরে যাইতে উৎসাহিতকরে; তাহারই জন্য আজ আমি মরিতে বসিয়াছি।"

তাল উত্তর করিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত হউন! আপনি কোন কালেই কাবুলের মেলায় যান নাই। কাশ্মীরের রাজকুমারী বলিয়া কোন লোক নাই; রাজার একটী মাত্র সন্তান সে পুত্র; আপনার কোন দিনই হীরক ছিল না। রাজকুমারীর মৃত্যু হইতে পারেনা, কারণ তাঁহার জন্মই হয় নাই এবং আপনি বেশ সুস্থ আছেন।"

"তবে কি? তুমি কি ঈগল, হস্তী, গর্দ্দভ, চিকিৎসক ও ডাক্তার হও নাই?"

"আপনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। ভগবান আপনাকে শিক্ষা দিবার জন্যই ওরূপ স্বপ্ন দেখাইতেছেন।"

"নিশ্চয়ই তুমি আমাকে পরিহাস করিতেছ। আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি?"

"আপনি মাত্র একঘণ্টা ঘুমাইয়াছেন।"

রুস্তম চুপ করিয়া থাকিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
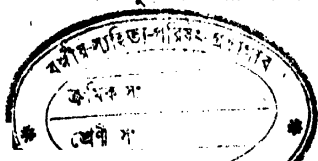
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৬ষ্ঠ বর্ষ। | মাঘ, ১৩২৮ সাল। | ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

বিরহিণী।

—:*:—

মধুভরা মধুনিশি অবসান সই লো,
কই কোথা প্রাণসখা এলো আর কই লো ?
ঘনাইয়া আসে ব্যথা
নুয়ে পড়ে দেহলতা,
জ্যোতিহারা আঁখিতারা
জলে থই থই লো।

(২)

আর কেন দ্বারে সই ও ভ্রমরী গুঞ্জে
কেন পিক ডাকে আর গুমরি এ কুঞ্জে ?
অবসান হাসিরাশি,
সেই ভালবাসাবাসি,
ফুল যা তা চলে গেল
কাঁটা পড়ে রহিলো।
মধুভরা মধুনিশি
অবসান সই লো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সপ্তত্রিংশ—পরিচ্ছেদ।

অকস্মাৎ এল র্যামির ঐ সন্দিগ্ধ চিন্তার অব্যবহিত পরেই একটা প্রচণ্ড চেষ্টায় খাড়া উঠিয়া বসিয়া লিলিথ ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার মূর্ত্তি একইকালে প্রস্তর-কঠিন ও তুষার-শুভ্র; বিশেষতঃ তাহার মুখের বিস্ময়কর বিকৃত ভঙ্গীতে তাঁহার ভয় হইল,—এত ভয় যে চীৎকার করিতে বা কথা কহিতেও তিনি সাহস করিলেন না। শুধু তাঁহার কৃষ্ণাপাঙ্গ চক্ষুদুটী আশার আকুলতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং সর্ব্বাঙ্গের ধমনী ও শিরাগুলি একটা দারুণ উদ্বেগে টন্‌টন্ করিতে লাগিল।

"ভগবানের পবিত্র নাম ও ভক্তোত্তম খৃষ্টের অনুরাগ স্মরণ করে"—লিলিথ যেন বহু-দূরাগত ক্ষীণকণ্ঠের প্রবল গম্ভীর নিশ্বনে বলিয়া উঠিল—"আমার এই ছায়ার দিকে আর চেয়ে থেকো না। ফেরাও তোমার দৃষ্টি, পৃথিবীর এই জমাট ধুলো থেকে যা' শুধু ঐ পৃথিবীরই সম্পত্তি,—আর প্রস্তুত হও সেই অমর আলোকপ্রভার জন্যে যা' অমরলোক থেকেই আসে! ওগো প্রিয়, প্রিয়তম আমার!—যদি তুমি জ্ঞানী হও, সাহসী হও, বলিষ্ঠ হও, তবে ফিরিয়ে নাও তোমার নয়ন আমার এই প্রতিকৃতি থেকে, কেননা ওটা আমি নই,—কিন্তু চাও ঐ গোলাপ-পুষ্পাধারের দিকে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবো!"

শেষ কথাগুলি ওষ্ঠ-বিনির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেহখানি উপাধানের উপর লুটাইয়া পড়িল,—অসাড়, পাণ্ডুর, মরণাহত। এল র‍্যামি, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ হইলেও, তাহার বাক্যার্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিবার মত সংজ্ঞা তখনও অবশ্যই হারান নাই—সুতরাং এটুকু বুঝিলেন যে পালঙ্কের দিকে এতকাল যে-লিলিথকে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন তাহাকে ভুলিতে হইবে, এবং অন্য লিলিথের সন্ধান করিতে হইবে "গোলাপ-পুষ্পাধারের দিকে।" যন্ত্র-চালিতবৎ, যেন বা কোনো অদৃশ্যশক্তির শাসন ও আদেশ-চালিত হইয়াই তিনি পালঙ্কের দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন এবং যেখানে বিলম্বিত আলোক-শিখাটীকে নূতন তপন-ভ্রমে গোলাপগুলি স্ফটিকাধার হইতে মুখ বাহির করিয়া পুলকিত হইতেছিল সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। কৈ—কিছুই তো নাই।

"কোথায় কি!" আবেগ-কম্পিত-বক্ষে, চোখদুটী রগড়াইয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি পুনরায় সেদিকে চাহিলেন......কোথায়—কিছুই তো নয়...শুধু গোলাপগুলি...আর...ঐ যে... তা'র পশ্চাতে একটা আলো!—ফুলের চারিদিকে তরঙ্গিত হইতে হইতে সে আলোক বৃত্তাকার চক্রে চক্রে প্রসারিত হইয়া উপর দিকে উঠিতেছে না?

এল র‍্যামি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—হয় তো উহা ঘরের ভিতরকার আলোকটীরই প্রতিফলন...অথবা জ্যোৎস্নার দীপ্তিও হইতে পারে... কিম্বা এমনও হইতে পারে যে তাঁহারই চোখের ভুল......তথাপি এমনভাবে তিনি সেটী দেখিতে লাগিলেন যেন বা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই সে সময় চক্ষুময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই আশ্চর্য্য

আলোকের ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধি ও-সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপগুলি কাঁপিতে লাগিল ঊর্ম্মি-ভঙ্গ-ফেনিল সমুদ্র-নীলিমার কোল হইতে উদীয়মান প্রভাত-সূর্য্য-কিরণচ্ছটার ন্যায় সে আলোক ক্রমেই যেন ধক্ ধক্ করিয়া বিবিধ বর্ণচ্ছটায় ফুটিয়া উঠিল। ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে—আরও ঊর্দ্ধে সেই গাঢ় বর্ণগরিমা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—কক্ষের দীপালোক তাহার পার্শ্বে এমন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, যেন ক্ষণ-প্রভার প্রতিযোগিতায় ক্ষীণপ্রভ দীপশলাকাই প্রজ্বলিত হইয়াছে—নির্ব্বাক নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুত আগম-নির্গমে এল র‍্যামি যেন হাঁফাইতে লাগিলেন।

সহসা, যেন বা কক্ষতল দীর্ণ করিয়াই, দু'টী স্তম্ভাকার ইন্দ্রধনু বর্ণানুরঞ্জণ সমুত্থিত হইল এবং ঘরের পর্দ্দা ও ঝালরগুলির পার্শ্বে এতই বিচিত্র বর্ণ-বিচ্ছুরণে রেখায় রেখায় ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল যে সে-দীপ্তি মানব-দৃষ্টির পক্ষে অসহ্য,—তথাপি এল র‍্যামি সরিয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং তাহার স্পর্শে অন্ধ হইতেও প্রস্তুত হইলেন। যদি তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে হয়তো প্রাচীন গ্রীক-পুরাণের সেই সুপরিচিত শিক্ষা স্মরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না যে বিশুদ্ধ ঐশী উপাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করায় মানবের শুধু মৃত্যুই ঘটিতে পারে; কিন্তু চিন্তা করিতে তিনি পারিলেন না—তাঁহার সমস্ত চিত্তশক্তিই সে সময় পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার চক্ষে যেন তপ্ত লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইতেছিল—তথাপি, যন্ত্রণা-সম্বন্ধে সচেতন হইলেও, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার সমস্ত চিত্তটাই ঘরের ভিতরকার ঐ আলোক-পক্ষ দীপ্তি-বিস্ময়টীর পর্য্যবেক্ষণেই একাগ্র হইয়া উঠিল—এবং চাহিয়া চাহিয়া এবার তিনি অনুভব করিলেন যে ঐ আলোকচ্ছটার মাঝখানে রেখাচিত্রবৎ একটা আকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তেই এমনভাবে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, যেন বা কোনো দেবশিল্পীই, অলক্ষ্যে থাকিয়া এবং ঊষার আলোকে তুলি ডুবাইয়া ডুবাইয়া, বাতাসের গায়ে সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছেন।......ওগো পরমাশ্চর্য্য, অবর্ণনীয় স্বপ্ন-গরিমা!...ওগো নিবাত নিষ্কম্প শূন্য-সাগর-শায়ী প্রচ্ছন্ন জীবন-কোরকের অত্যদ্ভুত প্রথম-বিকাশ! কোথায়, এই মৃত্যুহীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুকণার বিরাট ঐশ্বর্য্য-সাগর-স্পন্দনের কোন নিভৃতকক্ষে বস্তুর প্রারম্ভ?—কোন্‌খানেই বা তার শেষ?......

পরক্ষণেই নির্ঝর-বিভঙ্গের অনুরূপ কতকগুলি তরঙ্গ-তারল্য গোলাপী আভাযুক্ত বাষ্পশুভ্র আলোক-কণায় পরিবেষ্টিত হইয়া এমনভাবে প্রকাশ পাইল যেন বা পর্ব্বত-শীর্ষ-কুজ্ঝটিকা-পারে কোনোপ্রকার বহ্নিই দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তারপর দেখা দিল একটী তরলোজ্জ্বল কনক-প্রবাহ, যাহা তরঙ্গায়িত চূর্ণকুন্তলজালের মত ছড়াইয়া পড়িয়া ; উর্ম্মিবিভঙ্গে নাচিতে নাচিতে সরিয়া যাইতে লাগিল ; পূর্ব্বদৃষ্ট রেখামূর্ত্তিটী এই সময় চতুর্দ্দিকের আলোক-বেষ্টনীর ভিতর হইতে বর্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। মানবাকৃতির সহিত তাহার কি কোনো মিল আছে ? আছে ;—তবে সে সারূপ্য এতদূরবর্ত্তী, এত উন্নত ও বিশুদ্ধ যে সূর্য্যের যথার্থ রূপের সহিত তাঁহার পটে আঁকা মূর্ত্তির যে প্রভেদ, রক্তমাংসময় দেহের তুলনায় তাহাও সেইরূপ। সে মূর্ত্তিটীর আয়তন, সৌন্দর্য্য ও কান্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল,—পরিশেষে সে যে কি অপরূপ কোটীকন্দর্পবিনিন্দিত কান্তিতে ফুটিয়া উঠিল, তাহা বুঝাইবার বুঝিবা ভাষাই নাই ; · স্তম্ভিত ও বিস্ময়-বিহ্বল এল র‍্যামির মনে হইল যেন সে মূর্ত্তি প্রার্থনার আনন্দে প্রসারিত যুগল-করপল্লব উর্দ্ধে তুলিয়াছে, এবং সেই ভয় ও বিস্ময় অতিক্রম করিবার প্রাণপণ দ্বন্দ্বে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ হইলেও তিনি স্পষ্ট দেখিলেন যে দু'খানি নক্ষত্র-নির্ম্মল আয়ত নয়নের নীলাভ স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি কেমন-যেন-একটি জিজ্ঞাসু মিনতি ও আশ্বাসে, অনুরাগ প্রীতির নীরব বাগ্মীতায় তাঁহার মুখের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে !···কিন্তু তাঁহার শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল ;—বিশ্বাসের অবলম্বন পশ্চাতে না থাকায়, শুধু অসহায় রক্তমাংসের পক্ষে সে অতি-স্বাভাবিক দৃশ্য অধিকক্ষণ সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল,...সহসা এক সময় তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া আসিল, এবং সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি ডুবিয়া যাইতেছেন, সকলের নজর-ছাড়া হইয়া কোন্ এক সুগভীর অবসাদ-সাগরে তলাইয়া যাইতেছেন,—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হতাশ-নেত্রে তিনি সেই পালঙ্কখানির দিকে চাহিলেন, যেখানে লিলিথ, তাঁহার এতকালের পরিচিত লিলিথ পড়িয়া আছে, এবং—

"হা ভগবান" বলিয়া এমন গভীর বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন যাহা তাঁহার সমস্ত জীবনে বুঝিবা সেই প্রথম ;—লিলিথ, তাঁহার লিলিথ তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে শুকাইয়া যাইতেছে ! যে রমণীয় দেহখানি এতকাল চোখে চোখে রাখিয়া তিনি আপনার সাধনযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার

করিয়া আসিতেছেন আজ তাহা কুঞ্চিত শুষ্কপত্রের মত বিবর্ণ,—সে আননখানি আজ অপহৃত-সৌন্দর্য্য, কঙ্কালসার—ঠোঁটদু'খানি চুপসিয়া নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—অন্তিম কম্পনে হৃৎপিণ্ড থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে!

একটা প্রমত্ত মুহূর্ত্তে সমস্তই তিনি ভুলিয়া গেলেন,—ভুলিয়া গেলেন সেই নশ্বর দেহের জন্য অবিনশ্বর আত্মাকে,—ভুলিয়া গেলেন তাঁহার জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও যাবতীয় উচ্চাভিলাষগুলি,—এবং এই চিন্তাটাই শুধু তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল যে, যে-মানব-শিশুকে তিনি মৃত্যুমুখ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, আজ সে সেই মৃত্যুরই দীর্ঘ অবরুদ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পাগলের মত পালঙ্ক-বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া এল র‍্যামি সেই পাণ্ডুর দেহখানিকে নিঃস্বের শেষ সম্বলের মতই আঁকড়িয়া ধরিলেন।

"লিলিথ!—লিলিথ!"—ভীতিবিহ্বল বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"লিলিথ! প্রিয়তমে! সর্ব্বস্ব আমার! ফিরে এস!—ফিরে এস!"—এবং যুগল বাহুর গাঢ় আলিঙ্গনে তাহাকে ঘেরিয়া সেই শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন।

"লিলিথ!—আকুল উদ্বেগে তিনি বলিলেন—"আমি ভালবাসি তোমাকে লিলিথ! ভালবাসার শক্তিও কি তোমাকে ধরে রাখতে পারে না? না লিলিথ, ছেড়ো না আমায়,—তুমি আমার, আমার! তোমাকে আমি মরণের হাত থেকে কেড়ে এনেছি, ভগবানের দাবীকেও ফিরিয়ে দিয়েছি! স্বর্গমর্ত্ত্যের সমস্ত উপদ্রব থেকে তোমায় রক্ষা করেছি!—নিশ্চয়ই তুমি ফিরে আসবে—আমি তোমাকে ভালবাসি!"

আশ্চর্য্য!.........তাঁহার উক্তি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আলিঙ্গন-বদ্ধ দেহখানি উষ্ণ হইয়া উঠিল,—শিথিল মাংসগুলি ভরাট হইয়া পূর্ব্ববৎ কোমল ও সুঠাম আকার ধারণ করিল—সর্ব্বাঙ্গে আবার কান্তি ফুটিয়া উঠিল—অধর দু'খানি আরক্তিম হইল—নয়নপল্লব দুটী কাঁপিল, এবং বাহুদুটী যেন পাখীর ডানার মতই কাঁপিতে কাঁপিতে এল র‍্যামির সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করিয়া এবং সমস্ত দুঃখ অকস্মাৎ ডুবাইয়া দিয়া, তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইল।

কিন্তু দুঃখ দূর করিলেও এ-ঘটনায় তাঁহার দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল। কতবড় ক্ষতি যে এই সময়টুকুর ভিতর ঘটিয়া গেল তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—অধিকন্তু দেহে-মনে নিজেকে নিতান্ত কাপুরুষই মনে করিতেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লইয়া ধীরভাবে ঐ অতি-স্বাভাবিক বা দৃশ্যতঃ অতি-স্বাভাবিক ব্যাপারটীর সম্মুখীন না হইয়া তিনি নিজেকে তাহার প্রভাব মজ্জিত হইতেই দিয়াছেন, এবং প্রেম-মুগ্ধ নির্ব্বোধের প্রমত্ত গতিবেগে একেবারেই জনসাধারণের ধাপে নামিয়া পড়িয়াছেন। তথাপি লিলিথকে, তাঁহার লিলিথকে, ঈর্ষাভরেই বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সন্দিগ্ধ-কৌতূহলে তিনি পুনরায় সেই স্ফটিকাধারটীর দিকে চাহিলেন; সেখানে শুধু গোলাপগুলিই রহিয়াছে—সে জ্যোতির্ম্ময় বিস্ময়টীর চিহ্নমাত্র নাই, চারিদিক যেন অন্ধকার। নিজের দৌর্ব্বল্যে তিনি আত্মাকে হারাইয়াছেন, নিজের শক্তিতে দেহকে পাইয়াছেন—এই কথা স্মরণ করিয়া গর্ব্বে ও আক্ষেপে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"প্রেমই যথেষ্ট!"—বক্ষনিবদ্ধার হিল্লোলিত স্বর্ণকেশজাল চুম্বন করিয়া তিনি অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"জাগো, জাগো লিলিথ আমার! আনন্দের সম্পূর্ণতায় আমরা সমস্ত দেবতাকেই তুচ্ছ করবো!"

তাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে দেহটি নড়িয়া উঠিল এবং উদ্বিগ্ন আগ্রহে তিনি সে দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। লিলিথের দীর্ঘায়ত ভ্রূযুগল একটু কাঁপিল—পরে ধীরে,—অতি ধীরে,—তপনোদয়ে পদ্মকলিকার প্রথম জাগরণের ন্যায়, নেত্রপল্লবযুগল দ্বিধাভিন্ন করিয়া দুখানি স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়ন প্রকাশ পাইল,—নয়ন, যাহা দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া বিশ্ব-ব্যাপারের বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ ছিল, যাহার গাঢ় নীলিমার কোণে শান্তি ও পবিত্রতার বাণী ভরা এক বর্ণনাতীত মৃদু জ্যোতিঃ দেদীপ্যমান,—যাহা সেই অর্দ্ধস্পষ্ট রেখামূর্ত্তির চক্ষে পরিদৃষ্ট, মিনতি ও আশ্বাসের, আশা ও ভালবাসার অবিকল অনুরূপ! আহা, যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন দেহবাতায়নের ভিতর দিয়া প্রকৃতপক্ষে সে আত্মা শেষ দেখাই দেখিতেছে,—কিন্তু না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ভয় ও দুঃখের গহ্বর হইতে এক লম্ফে তৃষিত আনন্দের চূড়ায় আরোহণ করিয়া প্রেমিকের গর্ব্ব, অনুরাগ, কোমলতা ও আশার আলোকে তিনি সেই মৌন বাণীভরা নব-উন্মীলিত পরমাশ্চর্য্য জগতদুটির পানে চাহিলেন।

"কোনো ভয় নেই, লিলিথ !"—তিনি বলিলেন—"আমি। আমি, যার কথার তুমি এত কাল জবাব দিয়ে এসেছো, যার আদেশ পালন করছো,—আমি তোমার প্রেমার্থী ও প্রভু—আমি যার আদেশে তুমি আজ মৃত্যু থেকে জীবনক্ষেত্রে জাগরিত !"

একটা অপার্থিব শান্তের আলোকে তাহার আননখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল !—মনে হইল যেন মেঘাবৃত তপন পরিপূর্ণ গরীমায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার আকস্মিক কিরণছটা ছড়াইতে উদ্যত। হরিণীশাবকের মত নিরীহ দুটী চকিত নয়নে সে এল র‍্যামির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল,—ক্ষুদ্র বাহু দুখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া এল র‍্যামির কণ্ঠে রক্ষা করিল—এবং প্রতি অঙ্গে রোমঞ্চিত হইয়া এল র‍্যামি মনে করিলেন, যেন সপ্ত স্বর্গ একেবারেই তাঁহার সম্মুখে মুক্তদ্বার হইয়া পড়িতেছে ! কোনো বাক্যের প্রত্যাশা তিনি করিলেন না—কি প্রয়োজন তার, যখন নীরবতাই মনের প্রীতি বুঝিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত !—শুধু এই ভয়ই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল, পাছে জয়-গৌরব ও আনন্দের আতিশয্যে লিলিথকে বাঁচাইয়া তিনি নিজেই শেষে মারা পড়েন, ...কিন্তু...চুপ ! চুপ !......আবার সেই সঙ্গীত......অর্‌গ্যানের গম্ভীর গোল আওয়াজের মত আবার সেই শব্দতরঙ্গ ! আশ্চর্য্য—খুবই বিস্ময়কর !—কিন্তু শুনিতে পাইলেও তিনি উহা গ্রাহ্য করিলেন না ; এখন লিলিথ বক্ষে থাকিতে, অলৌকিক ভীতি তাহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গের রেখায় রেখায় তরঙ্গায়িত লাবণ্যধারা তিনি যেন শত শত চক্ষু মেলিয়া পান করিতে লাগিলেন,—ক্রমে যখন শিরায় শিরায় অনলপ্রবাহ ছুটিল এবং ধমনীতে বিদ্যুৎ নাচিতে লাগিল, তখন আনত হইয়া বক্ষ-বিধৃতার অধরপুটে তিনি কয়েকটি দীর্ঘ, মদির ও উত্তপ্ত চুম্বন বর্ষণ না করিয়া আর থাকিতেই পারিলেন না !......

কিন্তু তাহা করিবামাত্র, একটা আকস্মিক ও প্রচণ্ড ঝট্‌কায় সে আলিঙ্গন-বিচ্যুত হইয়া পড়িল,—ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্তের ন্যায় তাহার বক্র-কুঞ্চিত দেহখানি তাঁহার বক্ষ হইতে খসিয়া আসিল,—ক্ষুদ্র হাতদুটী দু'একবার বাতাস হাতড়াইল,.........পরে ঐ অল্পকাল মাত্র যুঝিয়া হাতদুটী আড়ষ্ট হইয়া ঝুলিয়া পড়িল এবং সমস্ত দেহটা যেন তাল পাকাইয়া উপাধানের উপর লুণ্ঠিত হইল—কঠিন, পাণ্ডুর, বিগত প্রাণ !...অপরপক্ষে, এল র‍্যামি বিহ্বল বিস্ফারিত-নয়নে তাহাকে ঐভাবে দেখিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন—একি স্বপ্ন, না তিনি পাগল হইয়া যাইতেছেন ?.........

এ কি…অর্থ কি এ আকস্মিক যন্ত্রণার?…এই…এই হঠাৎ মূর্চ্ছিত হওয়ার? প্রভাত-পদ্মকোরকের ন্যায়, এইমাত্র যে তাহাদের ভিতরকার সমস্ত জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল?……ভগবান!……ভগবান!… …না, না, তিনি বোধ হয়, স্বপ্ন দেখিতেছেন!……বোধ হয় এখনই স্বপ্ন টুটিয়া যাইবে এবং তিনি দেখিবেন যে এই দৃশ্যতঃ দুর্ঘটনাসমূহ একেবারেই অলীক……মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যজনিত কাল্পনিক ভীতিমাত্র,……"টঙ্কৃত ও ঝঙ্কারিত মূর্ত্তিরাশি" অবাস্তব, প্রকৃত নয়। পরক্ষণেই, ভীতি-বিস্মিত এল র‍্যামির বিকৃত কণ্ঠ হইতে একটা চাপা চীৎকার-শব্দে বাহির হইল—

"লিলিথ!…লিলিথ!…"

কিন্তু রোসো, রোসো!…যাহাকে তিনি ডাকিতেছে সে কি বাস্তবিকই লিলিথ?……ঐ……ঐ বিকৃত, শুষ্ক, কঠিন দেহটা—প্রতিমুহূর্ত্তেই যাহা বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে!

বায়ুবক্ষে বিকম্পিত গম্ভীর স্বর-তরঙ্গের ভিতর তাঁহার আহ্বান শব্দ ডুবিয়া গেল, এবং এল র‍্যামির বিক্ষুব্ধ চিত্ত ঐ অপার্থিব স্বরকম্পনের ভীতিকর ইঙ্গিতটাকে একটা অদৃশ্য শক্তির সমর-ঘোষণা-বাণী বলিয়াই গ্রহণ করিল।

"বটে, যমরাজ! শালার যম,…তুমি? শূন্যে মুষ্টি আস্ফালন করিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"এখানেও এসেছো, কোনো জায়গাই কি তোমার আয়ত্তের বাইরে নয়?……না, না,—এর আগে আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী-হিসাবেই পরস্পরের তরবারিকে বাধা দিয়েছি……আর তা'তে আমিই জয়লাভ করেছি……এবারও, আমি জিতবো! হাত গুটোও বন্ধু! লিলিথ আমার!"

কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকপকেট হইতে সেই পরিচিত 'আরোকের' শিশিটা বাহির করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে তিনি তাহার ধমনীতে কয়েক বিন্দু নিষিক্ত করিলেন এবং কয়েক ফোঁটা তাহার মুখেও ঢালিয়া দিলেন…বৃথা…বৃথা! সেই নিথর বক্ষে শ্বাস-লক্ষণ আর দেখা দিল না, বা সজীবতার কোনো চিহ্নই ফিরিয়া আসিল না; শুধু…মুহূর্ত্তকয়েক পরে, একটা আশ্চর্য্য ও ভয়ানক ব্যাপার ঘটিল। ঔষধটা যতই দেহ মধ্যে চারাইয়া পড়িতে লাগিল…ততই সর্ব্বাঙ্গে ফেঁকা উঠিতে লাগিল; দেহচর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল এবং যেন বা কোনো

আভ্যন্তরীণ অগ্নিতাপেই দেহখানা দগ্ধ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে সেই ধ্বংসলীলার দিকে চাহিয়া, অবশেষে তিনি অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার ভীষণতা-সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন! লিলিথের আত্মা চলিয়া গিয়াছে...চিরদিনের মতই গিয়াছে!...সেই সাইপ্রিয়ন সংঘের গুরু-বাক্যই শেষে জয়লাভ করিল! এ-যে ভয়ানক মর্ম্মান্তিক! আর কি কোনো উপায়ই নাই?

হতাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া শিশিটা তিনি মেঝের উপর নিক্ষেপ করিলেন ও রাগে অন্ধ হইয়া জুতার চাপে তাহা গুঁড়াইয়া ফেলিলেন,...প্রবল রক্তবেগাধিক্যে তাঁহার রগের শিরগুলো যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল,...তিনি কিছুই করিতে পারেন না...কিছুই না! বিজ্ঞান আজ অকর্ম্মণ্য,—ইচ্ছাশক্তি, তাঁহার আত্ম ইচ্ছাশক্তি, তাহাও আজ বায়ুবিকম্পিত তৃণেরই অনুরূপ! উঃ, কি বীভৎস ঐ সম্মুখে প্রসারিত শবদেহ!...রাগে, ক্ষোভে, হতাশায়, যন্ত্রণায় কাঁপিতে কাঁপিতে সেদিক হইতে সজোরে তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—এবং ফিরিবামাত্র, দেওয়াল-গাত্রে খৃষ্ট-চিত্রের সেই প্রশান্ত নয়নদুটীর সহিত তাঁহার চোখোচোখি হইয়া গেল,—পাদদেশের অক্ষরগুলি যেন অগ্নিময় হইয়া নাচিতে নাচিতে প্রশ্ন করে।—"বল দেখি আমি কে?"—সমস্ত কক্ষময় কি-যেন-একটা গোলমাল, কেমন-যেন একটা কোলাহল বাধিয়া গেল, এবং সমস্ত জগতখানাই যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল।

"দস্যু,—লিলিথের জীবনহন্তা!"—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"ভগবান বা ভূত যেই হোস্ তুই, আমি তোকে খুঁজে বের করবো,—পরিব্যাপ্তির প্রান্তরতম সীমা পর্যন্ত তোকে অনুসরণ করবো,—তোর হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবো,—কারণ, সে আমার! কি অধিকারে তোর অদৃশ্য অন্ধশক্তি আমার ভালবাসাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়? জবাব দে,—ভগবান যদি তুই, তবে নিজেকে প্রমাণ কর!...লিলিথ! ক্রুরা সুন্দরি!—তুই না বলেছিলে যে প্রেম বড়ই মধুময়?—এই প্রেমও কি এখানে, তোমার এই প্রণয়ীর কাছে, তোমাকে ধরে রাখতে পারলে না লিলিথ?"

আপন অজ্ঞাতসারে তাঁহার চক্ষুদুটী আবার পালঙ্কের দিকে ধাবিত হইল—কিন্তু এখন, এখন...সেই বিনষ্ট-সৌন্দর্য্যের দগ্ধাবশিষ্ট ভীষণ দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না...মর্ম্মে

মর্ম্মে একটা নিদারুণ পীড়া অনুভব করিয়া এবং সর্ব্বব্যাপ্ত হতাশায় হাতদু'খানা ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া যেনবা নিজেকে ও ঐ দারুণ দুর্দ্দশাটাকে গোপন করিবারই জন্য কোনো একটা আচ্ছাদন অন্বেষণ করিতে চাহিলেন।

"পতিত, ব্যর্থকাম, প্রতারিত!"—উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"অজেয় অদৃশ্যের কাছেই শেষে কিনা পরাজিত! পরাজয়! আমার!...এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! শোন স্বর্গ মর্ত্ত্য!—শোন দুঃখদিগ্ধ মানব-জগতের অনাদি প্রেত, শোন আমার কথা!—একটা সত্য আমি প্রমাণ করেছি,—আর তা' এই যে, ঈশ্বর একজন আছে—হিংস্র ঈশ্বর—লিলিথের আত্ম-সম্বন্ধে যে আমার বিরুদ্ধে ঈর্ষাপরায়ণ!.. ওগো ঈশ্বর, জানি আমি তোমাকে!—তোমাকে চিনলুম, দেখলুম! ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ যেমন, আমিও তেমনি তোমার অংশ,—আমাকে তুমি রূপান্তরিত করতে পার, কিন্তু ধ্বংস করতে পার না! তোমার যথাসাধ্য চেষ্টার তুমি ত্রুটী করনি,—আমার মধ্যে তোমার যে বিভূতি বর্ত্তমান, তা'র বিরুদ্ধেও তুমি লড়েছো, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আলোক অন্ধকারে পরিণত হয়েছে বা প্রেম তিক্ততায় ভরে উঠেচে, ততক্ষণ ক্ষান্ত হওনি; কোনো সুখ, কোনো আশা, কোনো সান্ত্বনাই আমার জন্যে তুমি বাকী রাখলে না,—আর কি করবে, ওগো নিষ্ঠুর কোটিব্রহ্মাণ্ডপতি!... আর কি চাও? গেছে—চলে গেছে লিলিথের আত্মা—কিন্তু কোথায়? এই অসীম অজ্ঞাতের কোন্‌খানে আমার সেই প্রেমটুকু আবার ফিরে পাবো?......আমায় শেখাও ভগবান!...একটু সন্ধান দাও ঐ ঘন-নক্ষত্রপুঞ্জ ও কোটী নীহারিকা-জালের আড়াল থেকে, যাতে আমিও এই সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশ্য অকল্যাণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, একটা কাল্পনিক কল্যাণকে অন্ধ প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারি!...আমিও, সমস্ত যুক্তি, গর্ব্ব, জ্ঞান শক্তি, অতল জলে ভাসিয়ে দিয়ে প্রেমের জন্যে নির্ব্বোধ হব!.. আমিও, প্রমাণ না চেয়ে, দেবমূর্ত্তি-মাত্রেরই সামনে ঠিক তেমনি করেই সাষ্টাঙ্গ প্রণত হব, যেমন করে' পাথরের নুড়ির কাছে অসভ্যেরা প্রণত হয়,.. আমি দুর্ব্বল হব, সবল নয়; প্রার্থনা করবো, শিশুরা যেমন প্রার্থনা করে, ঠিক তেমনি করেই প্রার্থনা করবো,...শুধু সেইখানে আমায় নিয়ে চল, যেখানে লিলিথ গিয়েছে...লিলিথকে এনে দাও অপ্সরী, প্রেমময়ী লিলিথ!.. আমার লিলিথ!.. আহা,.. ভগবান! করুণাময়! করুণা! করুণা..."

একটা বিকৃত উন্মাদ অট্টহাস্যে অকস্মাৎ তাঁহার স্বরভঙ্গ হইল,—মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল,—এবং আলোকরেখার সন্ধানে উৎকণ্ঠিত অন্ধকার-নিমজ্জিতের ন্যায় কয়েকবার বাতাস হাতড়াইয়া, বিগতপ্রাণা লিলিথের শবদেহটার উপর তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লুটাইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

"বলিও না।"

--:*:-

"বলিব"—কেমনে এমন নিঠুর বাণী
শুনালে আমারে আজি এ নীরব সাঁঝে,
এ-যেগো কাঁপায়ে ভগ্ন পরাণখানি
বুকের ভিতরে থাকিয়া থাকিয়া বাজে!

তোমার এবাণী অন্ধ করেছে আঁখি
বন্ধ করেছে বিশ্ব-প্রকৃতি দ্বার ;—
প্রলয় যেন এ আকুল বক্ষ ঢাকি'
গুমরি' মরিছে উথলি বেদনাভার।

এর চেয়ে যদি গরল আপন হাতে
ধরিতে অধরে পাত্র পূর্ণ করি,
তা'হলে হাসিয়া নিম্ন নেত্রপাতে
করিতাম পান তৃষিত কণ্ঠ ভরি।

অথবা যদি গো মরণ-পরশখানি
　　বুলাতে বেদনা-মথিত হৃদয় 'পরে,
তা'হলে আজিগে আপনা ধন্য মানি'
　　ঘুমাত অভাগা শান্তিতে চিরতরে।

"বলিব"—একথা কেমনে কহিলে আজ
　　একি সংশয় জাগালে পরাণে মোর!
ভুলেছ কি সেই মান অভিমান লাজ
　　যতনে মুছান' আকুল আঁখির লোর?

বলিও না কিছু—কহিও না কোন কথা—
　　শুধু এ মিনতি তোমার চরণতলে,
সন্ধ্যার মত নিবিড় এ নীরবতা
　　রাখুক ঘিরিয়া আপনারই অঞ্চলে।

নিভাবে প্রদীপ তোমার মুখের বাণী
　　ছিন্ন করিবে ভগ্ন বীণার তার;
এ হেন নিঠুর কঠোর বজ্র হানি'
　　একি কল্যাণ করিতেছ অভাগার!

বলিও না কিছু—শুধু এই প্রার্থনা
　　নিভিছে যে দীপ—নিভায়ে কি হবে তারে?
ভুলি' সব ত্রুটী করি' মোরে মার্জ্জনা
　　হ'য়ো প্রণম্য জয়-গৌরব-হারে।

শ্রীরেণুকা দাসী।

পরাজিতের পরিত্রাণপন্থা

—:*:—

অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে যুদ্ধবিগ্রহের কথা বলছি নে, এজাতির সেটা মুখে আন্‌তে নেই, জেতার ভয়ে নয়, নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই। যার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, তার বন্ধুত্ব, সহায়তাগ্রহণে সুখও নেই, সোয়াস্তিও নেই, পরিত্রাণ ত দূরের কথা! আকাশকুসুম হয়ে দাঁড়িয়েছে যেটা জীবনে তার আলোচনা, তা' নিয়ে আস্ফালনে ফল কি! যেটার বালাই নিয়ে আমাদের এত ভোগান্তি, মড়ার বাড়া হতে হয়েছে আমাদের—দেহ মনের সেই দুরন্ত ব্যাধি বাসা বেঁধেছে যে দৌর্ব্বল্যে, যে স্বাস্থ্যনীতির অবমাননায় যার প্রতীকার না হলেই নয়,—সর্ব্ব আলোচনার মূল হ'ক সেইটী—নইলে জীবন না বাঁচলে বৃথা হয়ে যাবে সমস্তই, মৃতসংকারের সমারোহে আর কি ফল! প্রকৃত ব্যাধি আমাদের মনে, নেশাখোরের নেশার মত সাধ করে সাময়িক উত্তেজনা, স্ফুর্ত্তির খাতিরে আমরা, বল্‌তে গেলে নিজেরাই, তাকে স্বাস্থ্যরূপে বরণ করে নিয়েছি; নেশা দস্তুরমত ক্রমে উঠে আমাদের পরাজয় ঘটিয়ে এখন আমাদেরই স্বাস্থ্যসুখ হরণ ক'রে মরণের পথে আমাদের ঠেলে দিতে বসেছে! তাদের নিজের শক্তিতে নয়—আমাদের দৌর্ব্বল্যে, তা না হয়ে যদি শক্তির লীলাই হ'ত, আমাদের এদশা আস্‌ত কি না সন্দেহ; কারণ শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাকে প্রতিহত করে ব্যর্থ করবার প্রবৃত্তি জীবমাত্রেরই রয়েছে। বাহিক শক্তির প্রভাবে যদি হ'ত আমাদের এই ব্যাধির কারণ, পরাজয়, তা হ'লে মুক্তির চেষ্টাও আমাদের কম হ'ত না। অস্ত্রের তাড়নে আমরা কাহিল হই নাই কখন, হারাই নি আমাদের সুখ স্বাধীনতা। সেভাবে আমাদের পরাজয় ঘটাতে হ'লে আমরা এভাবে পরবশ পরাজিত হতেম কি না সন্দেহ। দৈহিক শক্তির প্রাধান্য দিলে জেতা এদেশে আসতে পার্‌ত কি না কে জানে, বাহিরের স্বাধীনতা রক্ষা করবার মত জাতি সেকালে এদেশে কম ছিল না, সে কথা সুচতুর বিজেতা খুব জান্‌ত,—তাই তারা বাহু হ'তে বুদ্ধির খেলাই সে জয়পরাজয় ব্যাপারে—খেলেছে—চিকিৎসক হয়ে, বন্ধুর বেশে পরিবারে পা বাড়িয়ে, সবল দুর্ব্বল বেশ করে বুঝে, মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, স্নেহের কাঙ্গাল

বন্ধুত্বের ভিখারী, সহজেই মুগ্ধ, ভারতের এই ভাব-প্রবণ অধিবাসীর প্রাণের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে এনে দিয়েছে এই জাতীয় অধীনতা, মনের জড়তা, নিজের শক্তিতে অবিশ্বাস, পরের আশ্রয়ে আরাম বোধ। দৈহিক অধীনতায় একটা তীব্রজ্বালা আছে, মানুষ ত দূরের কথা পশুকে পর্যন্ত দৈহিক পরাধীনতায় অস্থির হতে হয়, মুক্তির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে সে, সে অবস্থা মর্ম্মন্তুদ হ'লেও মারাত্মক নয়, শেষ আশা মিলিয়ে যায় না সেখানে; কিন্তু যেখানে ঘটে মনের অধীনতা মানসিক পরাজয়,—সেখানে সংহারই প্রায় ষোল আনা; পোষা পশুর মত মানুষও সেখানে দাসভাবে আরামে অবাধে অধীনতাকে কাম্যবলে গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হয়। এই পরাজয়টাই সব চাইতে শোচনীয় পরাজয়—মোহের আবেশে কি মহাদুঃখে সুখ বোধ! এই সুখের নেশাতেই ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী মরেছে! সে পরাজিত হয় নি পলাশীতে, পরাজিত হয়েছে দিনে দিনে বিদেশী শিক্ষাদীক্ষায়, তার ঢং-ধরণ অতুল অনুপম বলে মেনে নিয়েছে যেদিন, যেদিন সে বিদেশীর পোষ মেনে, আপনাকে—আপনার শক্তি চেষ্টাকে হারিয়ে পোষা পশুর মত পরের অনুগ্রহকে মেনে নিয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, প্রভুর দান আরাম গ্রহণ করেছে যেদিন, সেদিনই ঘটেছে তার প্রকৃত পরাজয়! যুদ্ধপ্রান্তরে প্রোথিত হয় নাই জেতার এই জয়পতাকা, গৃহের কোণে, বিজেতার প্রাণে ইহা হয়েছে স্থাপিত। গৃহ-বাহিরে বিজেতা বিদেশীর প্রভাব সগৌরবে জাগ্রত থেকে ভারতে জাতীয়তার অভাব আনয়ন ক'রে নিজেদের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেইটাই তাদের অস্ত্র হতেও বড় অস্ত্র, মনের স্বাধীনতা হরণ করবার মধুর ফাঁদ, মিছরীর ছুরি, সোনাপাত মোড়া বিষ, সুখের অনুপানে সংজ্ঞাহারক বটিকা, সভ্যতার নামে জাতীয় আত্মাভিমানের বিনাশ, বিদ্যাদানের ছলে অবিদ্যার প্রসারে পদানত করবার প্রয়াস,—শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরকে দু'বেলা পাত্র-অবশেষ উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত অখাদ্য অন্ন প্রসাদরূপে দিয়ে কৃতার্থ করার ন্যায়, বিজেতা নিজে উত্তম ভোগ্য, সেরার সেরা সমস্ত গ্রহণের পর তুচ্ছ দিয়ে প্রসাদলোলুপকে শান্ত করার চেষ্টাকে অনুগ্রহবলে মনে হয়েছে যে দিন আমাদের, সেটা যে উচ্ছিষ্ট তার ধারণাও হারিয়েছি যেদিন, প্রকৃত অধীনতা এসেছে আমাদের সেইক্ষণে। ক্রীতদাসের অধম হয়ে কেবল কারণে-অকারণে জেতার স্তুতিস্তবই হয়েছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য, জীবনের কাজ, আর তাদের নেক-নজর, কৃপাকটাক্ষলাভই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ।

আমারই রক্তে, আমারই মাংসে আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে যে রক্তমাংস সংগ্রহ করে তারা মিষ্টি কাবাব বাঞ্জনে পরিতুষ্টি ও পুষ্টি লাভ করছে, তারই অখাদ্য অংশ আমাকেই পরিবেশন করলে,—অন্য আর একজন পদলেহী হ'তে বিন্দুপ্রমাণ আমাকে বেশী দিলে নিজকে ধন্য বলে মেনেছি! মোহ আর কাকে বলে! ক্রীতদাসের বিচারক আমি এক ক্রীতদাস,—প্রভুর অনুগ্রহ পুষ্ট! আমি হাকিম আমাকে আর পায় কে! হা ভগবান!

কোন্ পাপে এ আত্মবিস্মৃতি,—এমন দুর্দ্দশা এত আঘাতে আজও সেই ভাঙ্গিতে চায় না,—জাতীয়-জীবনের এ অভিমানের কারণ? ভারতের ভাবপ্রবণতা! এক হিসাবে মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ এটী, মানুষ যদি দেবতার সামীপ্য লাভের অধিকারী হয় সে এই গুণে,—মানুষ যদি মানুষকে কোল দিয়া কৃতার্থ হতে পারে সে ভাবপ্রবাহে প্রেমের বন্যায়—কিন্তু সংসারের ন্যায় জটিল কুটিল পথে ভাবের ফল বিষম! ভাব দেখে জগতকে নিজের ভাবে, পরখ-পরীক্ষার বড় ধার ধারে না, সে চায় পরের প্রাণে অনন্ত অফুরন্ত আনন্দ ঢেলে দিয়ে নিজে আনন্দে ছুটতে,—প্রকৃতই যদি সেটা হয় আনন্দ সাগর—সে নিমজ্জনে অপার্থিব অনাবিল সুখ,—ধন্য হয় জীবন,—আর যদি সেটা হয় কালিয়াদহ দহনে যে প্রাণ যায়,—ভারতের ভাগ্যে সে কালীয়! রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরদেশী মিঠাবিষ প্রবেশ করে করেছে তাকে জর্জ্জরিত—জড়ভরত! ভাবের কার্য্যই অদ্ভুত,—ভাবে সে, অতিন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে সে যেমন মজবুত, যত তৎপর—কর্ম্মে, দেহ পরিচালনে তেমনি বিমুখ! তার এই ধর্ম্মেই যত অবনতির কারণ—এ মানসিক পরাধীনতায় দাসভাবের প্রাবল্য! বন্ধুর, ত্রাতার, আশ্রয় লাভের প্রয়াসে, আগ্রহে, সে অধীনতাকে করেছে আপন! সে ভাব-আতিশয্যে সে বিচার করে নাই—তার পরিণাম শেষ ফল! বিদেশী দিয়েছে আশু অর্থকরী বিদ্যা—ব'সে ব'সে চাকুরী করবার শক্তি, ধন্য হয়েছি আমরা, বাহবা দিয়েছি শিক্ষকের,—ভারতের বুকের ধন,—উৎপন্ন শস্য—ছটাকার স্থলে চার টাকা দিয়ে কিনে অনুগৃহীত করেছে আমাদের—আবার সেই কাঁচা মালই পাকা করে লক্ষগুণ মূল্যে আমাদের সুখের জন্যে কত কষ্ট করে বয়ে এনে বিক্রয় করেছে, তাদের গুণে কেনা হয়ে গিয়েছি আমরা! রাজ্য শাসনের উপলক্ষে, অবশ্যকরণীয় আয়োজন অনুষ্ঠান করেছে তারা, রেল, টেলিগ্রাফ, আইন

আদালত, দুষ্টের দমন, জেলের ঘানি, দেশে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের দুঃখ হরণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার হরণের ব্যবস্থাকে আমরা উন্নতির, সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা—তাঁদের দয়া বলেই ভাবপ্রাবল্যে গ্রহণ করেছি, তলিয়ে ভেবে দেখিনি ও-গুলো আমাদের জন্যে যত নয়—তাদের নিজেদের জন্যেই তত দরকার, গরজ তাই অত। দিয়েছে তারা ইউনিভারসিটী,-পড় আর ভাব, সুযোগ-মত একটা চাকরী-বাকরী নিয়ে অধীত বিদ্যার সমাধি দাও—আর গর্ব্বকর উপাধি নিয়ে,—এই ভাবটাকেই বড় করে ধরবার সুবিধে যথাযথ ভাবে দিয়েছে তারা, তাদের কল, তাদের বল, তাদের অস্ত্র, তাদের শস্ত্র, সেদিকে আমাদের দাবীর কথা—ভাবতেও যেন দোষ! ছুলে যদি কেউ তারা--বলেছে অমনি ছিছি! আমরাই দশে মিলে বলেছি, 'বলো কি,—ও সবে আমাদের কাজ? এমন সুশাসিত রাজ্যে ও কি কথা! খাও দাও, বেড়াও, পড়, চাকুরী কর—শান্ত নগরবাসী হও, প্রভুভক্ত হও—কাঠখোট্টা, গোঁয়ার তুমি ওকি! প্রভুরা ভাববেন কি!' বারো আনা শিক্ষিতের ছিল এই মনের অবস্থা—পাকা খুঁটি. পেন্‌সনটা শেষ কিনা হবে নষ্ট! এমন মুনিব পাবে কোথা—বুড়ো বয়সেও বসে বসে খেতে দেয়—যৌবনের সব লুটে নিয়ে তাড়িয়ে দেয় না--কি দয়া!'

মনুষ্যত্ব যে কি, সেটার খবর মনে জাগবার অবসর আমাদের ছিল না, আমরা প্রভুর স্তুতিবাদে এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেম। কি ভীষণ পরাজয়, আত্মার কি অধোগতি!

ভগবানের রাজ্যে শেষ আছে সকলেরি—কুম্ভকর্ণের নিদ্রা তাও ভাঙ্গে, মোহও টুটে, কাঁটা দিয়ে হয় কাঁটার উদ্ধার! যে ভাবপ্রবণতায় ভারত একদিন বিদেশীতে স্থাপন করেছিল সরল বিশ্বাস, সন্ধান করেছিল তাতে অশেষ প্রকার উন্নতি, মনুষ্যের সত্য প্রাণ-ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ, সেই ভাব-প্রাবল্যেই বহু বিপর্য্যয় অবস্থায় নীত হয়ে, ঠেকে শিখে, অভিজ্ঞতা লাভে সে বুঝতে পেরেছে আজ কি ভ্রমেই না সে ঘুরেছে এত কাল, বিশ্বাস করে পরের শক্তিকে, কত অশক্ত সে নিজে হয়ে পড়েছে!—আজ এসেছে তাই অনুতাপ, প্রার্থনা করছে সে আজ আত্ম-শক্তির উন্মেষ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, পরের প্রসাদ যে কত ঘৃণা, আজ তার নয়নে ফুটে উঠেছে, সে কি আর শৃঙ্খলে বদ্ধ ভৃত্য হয়ে থাকতে পারে! ভগবানের শ্রেষ্ঠতম দান,—জীবন তার—তার কি অপব্যবহার সম্ভব! সে অনুভব করেছে প্রাণে প্রাণে আত্মার স্বাধীন সত্তা, শক্তি,—প্রকৃত জীবন! হৃদয়ঙ্গম করেছে সে তার কর্ত্তব্য, কতদূর শক্তিশালী

হ'তে হবে তাকে—সে যেন বায়ুর মত স্বাধীন, আকাশের মত উন্মুক্ত উদার হয়ে কোল দিতে পারে বন্ধুবর্গকে, মানুষকে, জীবনে, এই মহাভাবে ভারতীয় প্রকৃতিতে জীবন আজ তার অনুপ্রাণিত, ভাব তার আজ সার্থক। ফুটে উঠ্‌তে চাইছে সে আপনাতে, আপন বলে, আপন বৃন্তে! সে চায় নিজে মোহিত হ'তে, নিজকে বিলিয়ে পরকে মোহিত কর্‌তে, পরের বাসে নিজে বিভোর হ'তে, আজ তার আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্তি, ভিতরে-বাহিরে সে প্রার্থনা করে পূর্ণতা, পুষ্টি, বিকাশ,—একমাত্র ইপ্সিত তার মুক্তির পন্থা, আপনাতে সে অনুভব করছে স্বরাজ, ভাবে আজ সে ডগমগ, কর্ম্ম কর্‌তে পাগল—আজ তার ভাবে এসেছে কর্ম্ম, প্রাণে এসেছে পরার্থপরতা, স্বাধীন সত্বায় পরসেবা অতুল আনন্দ অনন্ত প্রীতি! অপ্রীতির উচ্ছেদ আজ তার জীবনের ব্রত—ভয় নেই তাই তার প্রাণে বিন্দুমাত্র,—সে অন্তর হ'তে সুর তুলে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করছে 'ওগো যতই কেন দমাতে চেষ্টা কর না, আমি অধীনতা স্বীকার করবো না! সে যে আমার অপ্রাকৃত, আত্মা যে বন্ধনের অতীত, হিংসার অতীত অহিংস্র, মৃত্যুর অতীত, অমর, অমৃতের পুত্র আমরা—অধীনতার বিষে মৃত্যু দিতে চাও যদি, তা ব্যর্থ হবে নিশ্চয়,—আজ যে ভারত অন্তরে পেয়েছে স্বরাজ! সেখানে হিংসা দ্বেষ অধীনতার নাম-গন্ধ থাক্‌তে পারে কি?'

জীবন সাথী।

—:০:—

কে তুমি অচেনা অজানা নূতন
দেখায়ে চলিছ দীর্ঘ-পথ,
সে কোন সুদূর নন্দন-দেশে
লয়ে যাবে আজি তোমার রথ?

কণ্টক-পথে সঙ্কট ঘোর,
চঞ্চল সারা অন্তর মোর,
বিধুর-অধীর ব্যাকুল-বক্ষে
ঠেলিয়া এসেছি বিঘ্ন শত।

হে মোর অচিন পথের লক্ষ্য,
হে মোর জীবন-মরণ সাথী ;
হের কালো ছায়া ঘিরিল ধরণী,
নামিয়া এসেছে আঁধার রাতি।
সারাদেহ ভরি' উঠে শিহরণ,
কম্পিত-হিয়া শঙ্কিত-মন,—
জ্বালাও বন্ধু জ্বালাও তোমার
উজল অলক-আলোক বাতি।

লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা মত
ফিরিতেছিলাম ভ্রান্ত ঘোর,
সঙ্গী করিলে আপনি আসিয়া
বিজন পথের পান্থ মোর।
নির্ম্মল তব মঙ্গল-করে—
বরিয়া লইলে প্রীতি-স্নেহ ভরে,
মলিন-কণ্ঠে পরালে যতনে
তোমার স্নিগ্ধ কণ্ঠ-ডোর।

দেবতা তোমার মন্দির মাঝে
প্রবেশিব কবে দুয়ার ঠেলি,
সন্ধ্যা কি সেথা নামে নি এখনো
শান্তি-শীতল আঁচল মেলি ?
টলি-টলি যে গো পড়ে বারবার
অবশ-অলস অঙ্গ আমার,
এখনো কি বঁধু হয় নি সময়
ঘুমাতে তোমার বক্ষে হেলি।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

তটিনী।

-:০:-

(১)

বৈশাখ মাস। কালবৈশাখীর নিবিড় ঘন-ঘটায় আকাশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত একেবারে অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ ছোট গ্রামখানির ধূলি-ধূসরতা সজল মেঘের আভাসে স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় চারি দিকেই একটা ব্যস্ততা জাগিয়াছিল। বালুকাময় কাঁচা রাস্তায় আরো খানিক ধূলা উড়াইয়া দিয়া একপাল গরু ঘরে ফিরিয়া গেল।

পথের পাশেই একটী বড় দোতলা বাড়ীর সম্মুখের বকুল গাছের নীচে ঝরা ফুলগুলি পুরু গালিচার মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল। আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে একটী আট নয় বৎসরের বালিকা ক্রত-হস্তে ফুলগুলি কুড়াইয়া লইতেছিল। তার ইচ্ছা, বৃষ্টি নামিবার

পূর্ব্বেই সে সব ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়া তোলে! কিন্তু তার ফুল কুড়ানো শেষ না হইতেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া তার পিতামহী ডাকিলেন।

"তিনু মেঘ করে এল যে রে,—উঠে আয়" তিনু ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল "যাচ্ছি।"

পথে দাঁড়াইয়া একটী শুভ্রবেশ, শুভ্রকেশ ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন "এইযে মা,—একটু দাঁড়ান মা।"

"তাইতো! কেষ্ট যে। কবে এলে বাবা?"

কৃষ্ণবিহারী বারান্দায় উঠিয়া গিয়া তাঁকে প্রণাম করিয়া প্রথমেই বলিলেন "ওই মেয়েটী কার মা, তারিণীর বুঝি? চমৎকার মেয়েটী তো!"

তিনুর ঠাকুমা পুনরায় পথপানে চাহিয়া বলিলেন "এই তিনু, উঠে আয় বাছা,—বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে।"

তার পর বলিলেন "হ্যাঁ বাবা,—ওই একরত্তি অন্ধের নড়ি আছে তার, আরতো বিয়ে-থাওয়া ক'রলো না সে।"

কৃষ্ণবিহারী মুগ্ধ চোখে তিনুর পুষ্টসুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে বলিলেন "এ মেয়েটী বুঝি আপনার কাছে এখানেই থাকে?"

"না বাবা, ও সেই পশ্চিমে ওর বাপের কাছেই থাকে, এখন নাকি সেদেশে বড় প্লেগ হচ্ছে তাই ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে।"

একটু থামিয়া তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন "তুমি কবে এসেচো বাবা?"

কৃষ্ণবিহারী বলিলেন "আমি ওবেলা এসেছি, আবার কাল-পরশুই চলে যাব, পরের চাক্‌রী করি, থাক্‌বার তো উপায় নেই, ছেলেটা এসেছিল মামার বাড়ী, তাই তাকে নিয়ে যেতে আস্‌তে হল।"

তিনু আঁচল ভরা ফুল লইয়া ঠাকুমার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল, কৃষ্ণবিহারী তাকে আদর করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার নাম কি মা?"

"আমার নাম তটিনী দেবী।"

"তটিনী ? বেশ নাম, সুন্দর নাম !"

কৃষ্ণবিহারী তিমুর ঠাকুমার পানে সবিনয় চক্ষে চাহিয়া বলিলেন "মা, গৌরীদান করবেন ! করেন যদি তাহ'লে আমার ঘরেই ক'রবেন আমি ভিক্ষে চেয়ে যাচ্ছি !"

"সে আর হবার উপায় নেই বাবা, তারিণী থাকে সেই খোট্টার দেশে, তার রুচিও তেমনি হয়েছে, সে বলে তার মেয়ের সে বিয়ে দেবেনা, অন্য পথে দিয়ে তার মেয়েকে সে অসাধারণ করে তুল্‌বে, এ সংসারের ধুলোমাটী তার মেয়ের গায়ে লাগতে পারে—এমনি যত সব অদ্ভুত তার কথা !"

কৃষ্ণবিহারী বলিলেন "তা সে যাই বলুক আপনি ইচ্ছে কল্লেই সব কর্‌তে পারেন।"

"আমার তো অনিচ্ছে এটুকুও নেই,—মেয়ের বিয়ে আবার দ্যায় না, তারিণীরই আমার যত অনাছিষ্টি কথা।"

কৃষ্ণবিহারী হাসি মুখে বলিলেন, "আমিও তো তাই বলি মা, তারিণীর তো চিরকালই এক রকম পাগ্‌লামি, তবে আপনি এই লক্ষ্মীটির বিয়ে দেবার সময় আমার ভিক্ষেটুকু মনে রাখবেন মা !"

কৃষ্ণবিহারী যে নাত্‌নীটিকে বারংবার করিয়া যাচিয়া লইতে চায় তাতে ঠাকুমার মন গৌরবে প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "আচ্ছা বাবা, বিয়ে যদি দেই, তা হলে তোমাকে আগে খবর দেব" কৃষ্ণবিহারী তাঁকে আর একটী প্রণাম করিয়া নামিয়া গেলেন।

কৃষ্ণবিহারী সেন ও তারিণী রায় এককালে সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। ভাগ্যেবলে আজ সেন, কলিকাতার এক দোকানে ত্রিশ টাকা বেতনের গোমস্তা ; আর রায়, ভাগল পুরের প্রসিদ্ধ উকীল, তার মাসিক আয় সহস্রাধিক টাকা। বর্ত্তমানে দুই বন্ধুর কোনো সম্বন্ধই ছিল না। ছাত্র অবস্থাতেই উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হইয়া বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ছিল না। কিন্তু বাড়ীতে মাতৃহীন কৃষ্ণবিহারীকে তারিণীর মা অতখানি তফাৎ করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ তারিণীর মা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা উমাকান্ত রায়ের বিশ্বাস ছিল যে, তারিণী অর্থশালী হইয়া এই দরিদ্র বন্ধুকে অকারণ অবজ্ঞা করে। এজন্য তাঁরা তারিণীর অসাক্ষাতে কৃষ্ণবিহারীকে অধিকতর প্রশ্রয় দিতেন।

তারিণীর মাতা গৌরীদানের প্রলোভন দমন করিতে পারিলেন না। বাড়ীর কর্ত্তা উমাকান্তও মায়েরই পক্ষ গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণবিহারীর পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হইলে তারিণীর বিমুখ মন সম্ভবতঃ বন্ধুর প্রতি অনুকূল হইতে পারে, উমাকান্তের ধারণা এই দিকেই দেখিতেছিল। তবে কিনা কৃষ্ণবিহারী দরিদ্র—তা হইলইবা, তারিণীর একমাত্র কন্যার আবার অর্থের অভাব কি? সময় হয় তো কৃষ্ণবিহারীকে বলিলেন "বেশী গোলমাল করো না ভাই, তারিণী খবর পেলে এ বিয়ে হতে দেবে না"

সুচতুর কৃষ্ণবিহারীও বেশ বুঝতেন যে তারিণীর একমাত্র কন্যা কি পদার্থ! তবুও বিবাহের আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ-আয়োজন করিতে করিতেই এ শুভসংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল এবং দূর প্রবাসে বসিয়া এই সংবাদ জনরবে তারিণীচরণেরও কানে গিয়া পৌঁছিল। প্রথমটা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু বিবাহের একদিন মাত্র পূর্ব্বে উমাকান্তের পত্র তাঁর হস্তগত হইল; রোষে, ক্ষোভে, তিনি একেবারে পাগলের মত হইয়া দেশে ছুটিলেন।

বিবাহের পরদিন কৃষ্ণবিহারী যখন উমাকান্তের কাছে দাঁড়াইয়া একান্ত বিনয়পূর্ব্বক তটিনীকে মাত্র তিনদিনের জন্য কলিকাতার বাসায় লইয়া যাইতে চাহিলেন তখন উমাকান্ত সহজে মত দিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে ক্রুদ্ধ তারিণী অগ্নিমূর্ত্তিতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। যাহার জন্য অনাহারে অনিদ্রায় উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তখন নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গিয়াছে? তাঁর চক্ষের উপর দেখিলেন,—তাঁর আদরিণী কন্যার পট্টবস্ত্রের একপ্রান্ত কৃষ্ণবিহারীর কিশোর পুত্র বাদলের উত্তরিয়ে আবদ্ধ, আর তাঁর আট বৎসরের মেয়েকে কৃষ্ণবিহারী কলিকাতায় লইয়া যাইতে চায়! তারিণী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন।

সেই দিনই তারিণী তাঁর মেয়ে লইয়া ভাগলপুরে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণবিহারীর উপর ক্রোধ তাঁর চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। তিনি বাড়ীশুদ্ধ সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া গেলেন,—"আমার মেয়েকে আমি তো সম্প্রদান করি নি, কখনো ক'রবোও না, আমার মেয়ে কোনো কালে কৃষ্ণবিহারীর ঘরে যাবে না, কৃষ্ণবিহারী তার যা ক্ষমতায় হয় করে যেন।"

কৃষ্ণবিহারীরা তখনও সেই বাড়ীতেই ছিলেন, সবই শুনিলেন কিন্তু তাঁর তরফ হইতে কোনও উত্তর আসিল না! একপথে তারিণী মেয়ে লইয়া ভাগলপুরে গেলেন, অন্যপথে অপমানিত কৃষ্ণবিহারী পুত্র বাদলের হাত ধরিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

দেশ শুদ্ধ ইতরভদ্র তারিণীর 'টাকার গরম' দেখিয়া অবাক হইল। সকলেই কৃষ্ণবিহারী সেনের ভদ্রতার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবিহারী মনে মনে বলিয়া গেলেন "আচ্ছা,—মেয়ে বড় হোক্!" তিনিই যে জিতিয়াছেন তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

(২)

মাথার সিন্দূর,—তা বার দুই স্নানের পরই উঠিয়া গেল। অনূঢ়া-কালের মতই তটিনী ভাগলপুরের বাসায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু তার জেঠামশায় বা ঠাকুমার নামও সে আর মুখে আনিতে পারিত না। একবার স্কুলের একটী বড় মেয়ে, একজন নূতন শিক্ষয়িত্রীকে পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিল যে "তটিনীর বিয়ে হয়ে গেছে।"

তিনি তটিনীর আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়াছিলেন "না, সে রকম তো দেখায় না, তুমি জানো না বোধ হয়,—সত্যি তটিনী তুমি কি বিবাহিতা?"

তটিনী রাগে কাঁদিয়া ফেলিয়া ক্রমাগত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল "না, বাবা ব'লেচেন আমার বিয়ে হয় নি।"

এমনি করিয়া আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। তটিনী বড় হইয়াছে বলিয়া তারিণী তাঁর দূরসম্পর্কীয়া একজন বিধবা ভগ্নিকে আনিয়া রাখিলেন, সঙ্গে তাঁর একটী পুত্রকেও আনিতে হইল। তা না হইলে তিনি আসিতে পারেন না, তাঁর ছেলেটি প্রথমে দিন কতক তারিণীর বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত, তারপর তিনি তাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তটিনী বাড়ীতে পিসিমা মহেশ্বরীর কাছেই থাকিত, তারিণীর যখন যেটুকু অবসর হইত তিনি তটিনীকে পড়াইতেন। সন্ধ্যায় কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ডাকিতেন "তিনুমা।"

তটিনী ছুটিয়া গিয়া সুমুখে দাঁড়াইত এই পর্য্যন্ত। নিষ্প্রয়োজনে বাক্য-বাহুল্য তারিণীর একেবারেই ছিল না; পিতার যোগ্য কন্যা তটিনীও আদরে-আবদারে পিতার গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইত না। সে যে আর পাঁচজনকার মত এক শ্রেণীর জীব নয়, আর সকলকার সঙ্গে যে কোনো মিল তার নাই, এ জন্য সে প্রথম প্রথম বড় ক্ষুণ্ণ হইত। সকলের মা আছে তার নাই, সকলে বাপের কাছে আবদার করে, সে করে না, তার পিতা ওসব পছন্দ করেন

না, এ সবতাতে সে প্রথম দিনকতক ক্ষুব্ধ হইলেও পরে সবই সহিয়া গিয়াছে। সে পিতার সেবাশুশ্রূষা করিয়া ও নিজের পড়াশুনা করিয়া দিন কাটাইয়া দিত। চির উদাসীন তারিণীকে সে সেবা দিয়া এমনি বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল যে, মেয়ে বাড়ীতে একটি বেলা না থাকিলেই তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন। নানা রকম অসুবিধায় পড়িয়া ধৈর্য্য হারাইয়া তিনি চাকরদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন, তটিনী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাঁর রাগ পড়িয়া যাইত।

(৩)

বর্ষার অবসানে কর্দ্দমাক্ত মাঠ ঘাট, সবে মাত্র ভিজা মাটীতে অসংখ্য পদচিহ্ন বুকে করিয়া শুকাইয়া উঠিতেছিল। সমাগত শরতের হেমাভ রৌদ্র দিগ্বিদিক হাসাইয়া তুলিয়াছে। নির্ম্মেঘ স্নিগ্ধ নীল আকাশে পেঁজা তুলার মত শুভ্র লঘু মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছিল। বর্ষাস্ফীত খাল বিল সব বিকশিত কমলদলে ভরিয়া গিয়াছে।

বাগানের পত্র-বিরল স্থলপদ্ম গাছটার ফুলে ফুলে আপাদমস্তক ছাইয়া গিয়াছিল। বর্ষা-বধৌত প্রকৃতিবক্ষে বিচিত্র বর্ণ সমাবেশে নবাগত শরতের অভিনন্দন বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছিল। আকাশে বাতাসে জলে-স্থলে সর্ব্বত্র শারদোৎসব!

ভুবন-ভরসা বর্ষার নীপকুঞ্জে যে শিহরণ কাঁটা জাগিয়াছিল, বর্ষার অবসানে সেইগুলি ও তার শুভ্র রেণু পথচারী পথিকের গায়ে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। স্নানান্তে তটিনী খোলা ছাতে বসিয়া একরাশি শেফালী ফুল বোঁটা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া শুকাইতে দিতেছিল। কোথায় কোন্ সুদূরে কে একজন সমস্ত প্রভাতটা মন্দ্রিত করিয়া বাঁশিতে সুর ধরিয়া গাহিতেছিল।—

"অ জি শরত তপনে স্বপনে
কি জানি পরাণ, কি যে চায়!"

ভবিষ্যতে রং করা ছোপানো কাপড় পরিবার আগ্রহই যে তটিনীর খুব রকম ছিল না তার উন্মনা হাতের শিথিল কাজ দেখিলেই তাহা বুঝা যাইতেছিল।

পুকুরের অপর পারে যেখানে চারটী যুবক টেনিস খেলিতেছিল, তটিনীর উন্মনা চোখের দৃষ্টি অকস্মাৎ সেইখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। হাতের কাছে শেফালীর কোমল

পল্লবদলগুলি প্রখর রৌদ্রের তাপে এলাইয়া পড়িল। খোলা ছাতের উপরটা সূর্য্যের কিরণ-শরে তাতিয়া উঠিলেও ছায়াস্নিগ্ধ বাগানে সে ছেলেদের খেলা থামিল না।

তারিণীর খানসামা নিখুণ আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "বাবু স্নান ক'রে উঠেছেন, পিসিমা আপনাকে ডাকছেন দিদিমণি।"

"বাবার স্নান হয়ে গেছে? আচ্ছা বলগে পিসিমাকে আমি যাচ্ছি।"

আর একবার বাগানপানে চাহিয়া দেখিয়া তটিনী নীচে নামিয়া পড়িল। বাগানের মাঝখানকার খেলামত্ত যুবকের মধ্যে তিনটিকে সে চিনিত, তারা তাদের প্রতিবাসী কিন্তু বাকী একটী তার অপরিচিত। সে খেলিতে খেলিতে এক আধবার মুখ ফিরাইতেই তটিনী সাগ্রহে সেই দিকেই চাহিতেছিল। এই লোকটীকে তার পরিচিত মনে হইতেছিল, কিন্তু কবে বা কোথায় যে দেখিয়াছে তা তার মনে ছিল না।

তটিনীর জন্য অপেক্ষা করিয়া তারিণী আসনের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। সে আসিলে তবে তিনি আহারে বসিবেন, ইহাই তাঁর নিত্যকার নিয়ম ছিল। ছয় বৎসর বয়সে তটিনীর মাতৃবিয়োগ হয়, তার পর হইতেই তারিণী নিজে বুকে করিয়া কন্যাকে মানুষ করিয়াছিলেন। একই বৎসরে স্ত্রী ও দুই দুইটী পুত্র সন্তানকে চিতায় তুলিয়া দেওয়ার পর অনেকে বলিত তারিণীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্নাম তাঁর কার্য্যক্ষেত্র ভাগলপুরে রটে নাই, রটিয়াছিল তাঁর নিজের গ্রামে। যে কন্যার পানে তিনি তাঁর স্নেহভরা চোখ তুলিয়া চাহিতেও ভয় পাইতেন, পাছে মা ও ভাইগুলির মত সেও তাঁর দৃষ্টির স্পর্শে গলিয়া যায়! সেই কন্যারই বিবাহসভায় আনন্দ-প্রদীপ তাঁর রুদ্রশ্বাসে ঝঞ্ঝাহত দীপের মত নিভিয়া গিয়াছিল।

প্রথম যৌবনে যখন তারিণী কলেজের ছাত্র ছিলেন, সেই সময়ে যৌবনের মোহময় দৃষ্টিতে একজন স্বজাতীয় বন্ধুর কিশোরী সুন্দরী ভগ্নিকে মুগ্ধচক্ষে দেখিয়াছিলেন। এবং তখন তাঁর পিতা বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া রীতিমত একটী রোমান্স্ গড়িয়া তুলিয়া তবে তার বিবাহ সমাধা হয়। প্রথম যৌবনের ফেনিলোচ্ছ্বাসে তখন তাঁর দৃষ্টিকে মোহিত করিয়া সুখের রঙীণ পর্দাখানি নই দেখা দিল তার আড়ালে পুঞ্জিভূত দুঃখ তখন আড়ালেই ছিল।

কিন্তু বৎসর পূর্ণ না হইতেই স্বপ্ন টুটিল। দেখিলেন কোথা গেল সে কিশোরীর সারা অঙ্গে বিকশিত সৌন্দর্যসম্ভার! অকাল-মাতৃত্বে শীতাহত লতার মত শুকাইয়া কঙ্কাল-সার বুকে সে একটী অপুষ্ট শিশু সন্তানকে জড়াইয়া লইল। অর্দ্ধোন্মোষিত মুকুল অবস্থাতেই তাকে গাছের পদে দাঁড়াইতে হইল, এবং পলে পলে অগ্রসর হইয়া অবশেষে মৃত্যুর বুকে ঢলিয়া পড়িল।

তারিণী দেখিলেন,—কোথা গেল পৃথিবীর সে মোহমধুর বিচিত্রবর্ণ? এ যে সেই চিরন্তন আবহমান অনাদি কালের সেই একঘেয়ে পুরাতন চিত্র! সেই একই স্রোত?

ছয় বৎসরে চারটী সন্তান প্রসব করিয়া যেদিন তাঁর যৌবনের স্বপ্নময়ী স্ত্রী, শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জীবনের বোঝা নামাইয়া বাঁচিল, তখন, অবশিষ্ট একমাত্র সন্তান জীবিত ছিল এই তটিনী! তারিণী নিজেই মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন তটিনী, শোকসন্তপ্ত পিতা বুঝি ভাবিয়াছিলেন যে, এ তটিনীর গতি তিনি ভিন্ন পথে ফিরাইবেন। এই ভাবিয়াই হয় তো কন্যার বিবাহসভায় তিনি সেই বিপ্লব বাধাইয়াছিলেন।

মা ও বড় ভাইয়ের কার্য্যে যদিও তারিণী মানসিক আঘাত খুবই পাইয়াছিলেন তবু কন্যার উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া কৃষ্ণবিহারীকে তিনি সত্যই ভয়ানক ঘৃণা করিতেন। ছাত্র অবস্থাতেই কৃষ্ণবিহারী কুসংসর্গে পড়িয়া তারিণীর বন্ধুতা হারাইয়া ফেলেন। তারপর আবার বিপদে পড়িয়া তিনি গোপনে তারিণীর কাছেই কিছু ঋণ করিতে বাধ্য হন, তারিণীও এ ঋণের কথা আর কাহাকেও বলিতেন না, কিন্তু কৃষ্ণবিহারী এই গোপন ঋণ পরিশোধের চেষ্টা এতটুকুও করিতেন না।

পরিণত বয়সে কৃষ্ণবিহারীর অন্য কোনো হীনতা না থাকিলেও তারিণীর চক্ষে তিনি ঘৃণাস্পদই ছিলেন। তারিণী দারুণ বিতৃষ্ণায় বিকৃত মুখে বলিতেন "আমি দয়া ক'রবো ওকে? গরীব ব'লে? কেন ও আমার হাজার বারকার অনুরোধ ঠেলে ফেলে অলক্ষ্মী মাথায় তুলে নিয়েছিল? আমার একটা উপদেশ, একটা কথার মূল্য বোঝেনি কখনো ওই জানোয়ারের ঘরে যাবে আমার মেয়ে! তার চেয়ে বরং ভাবা ভাল যে, আমারও মেয়েটাও না হয় নেই!"

বাস্তবিক তাঁর মনের এমন উদারতা কোনোদিন ছিল না যে কৃষ্ণবিহারীর ঘরে তিনি তটিনীকে পাঠাইতে পারেন। বরং তিনি প্রাণপণে ভাবিবার চেষ্টা করিতেন যে, তিনি কৃষ্ণ-বিহারীর সঙ্গে কখনও কোনো সম্পর্কে রাখিবেন না বা কৃষ্ণবিহারীর পুত্রবধূ তাঁর কেহ নয়।

কৃষ্ণবিহারী তারিণীকে রীতিমত ভয় করিতেন, কারণ তাঁর হাতে কোনোদিনই একটী কপর্দ্দকেরও সংস্থান থাকিত না; এ অবস্থায় তারিণীকে বেশী ঘাঁটাইলে যদি সেই পূর্ব্বকার ঋণ বাহির হইয়া পড়ে! তবে ইদানিং মধ্যে মধ্যে পুত্রের অন্য বিবাহের জন্যও চেষ্টা করিতেছিলেন।

ছাত হইতে নামিয়া আসিয়া তটিনী দেখিলেন যে তার পিতা আসনের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সে একটু হাসিয়া বলিল "আপনি আসুন বাবা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

তারিণীবাবু আসনে বসিয়া বলিলেন "তোর কাপড়ে হলুদ লাগ্‌লো কি ক'রে মা?"

"হলুদ তো নয় বাবা, এ শিউলী ফুলের রং!"

"ও! অতুলের কাছে দিলেই ত সে কাপড় রঙিয়ে এনে দিতে পারে। তটিনী চুপ করিয়া রইল। সত্যসত্যই ত তার ছোপানো কাপড় পড়িবার সখ হয় নাই! শিউলীফুল ছাড়ানো কেবল ছেলেবেলাকার কতকটা অভ্যাস, কতকটা বা সময় কাটানো। তটিনীর পিসিমা মহেশ্বরী তখন নিরামিষ রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। তটিনী তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "পিসিমা, বাবার যে অর্দ্ধেক খাওয়া হ'য়ে গেল, তুমি কি দেবে দাও।"

মহেশ্বরী তরকারির কড়ায় জল ঢালিয়া দিয়া নিজেই কয়েকখানি কুমড়ো ফুলের বড়া হাতে করিয়া তারিণীর পাতে দিয়া গেলেন। কিন্তু তারিণীর আহার শেষে যখন প্রশ্ন করিলেন "বড়াগুলো তেতো হয়নি তো! তিলগুলো ভাল ঘসা হয়নি, অর্দ্ধেক খোসা ছিল—"

তারিণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'বড়া? কোন্ বড়া?

তটিনী তার পিতাকে চিনিত, সে মুখ নামাইয়া একটু হাসিল। মহেশ্বরী বলিলেন "ওমা কি হবে! এখুনি যে বড়া খেলে!"

"এখুনি খেলাম?"

তারিণীবাবু নিজের শূন্য পাতের দিকে চাহিলেন, বলিলেন "ওঃ —তা হবে খেয়ে ফেলেছি,—তিনু মা খেয়ে ব'লে দেবে যে কেমন হয়েছে।"

মহেশ্বরী বলিলেন "তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাও?"

তারিণীবাবু একটু হাসিয়া তটিনীর হাত হইতে মশলার ডিবাটি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। তটিনী ব্যস্তভাবে আহারটা কোনোরকমে সারিয়া সেই তপ্ত রৌদ্রে ছাতের উপর গিয়া দেখিল খেল-শেষ করিয়া ছেলের দল চলিয়া গিয়াছে, বাগানে কোনোখানে আর কেহ নাই। নিজের এই অকারণ-আগ্রহের জন্য তটিনী আপনার কাছে আপনি হাসিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

(৪)

অপরাহ্ণে বাড়ীর পিছনের বাগানে দেবদারু গাছের নীচে একটা লোহার আসনে তটিনী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সরু সরু পাতাগুলিতে ঝির ঝিরে বাতাস বহিয়া দিনের তপ্ত দাহ জুড়াইয়া দিতেছিল। অস্তোন্মুখ তপনের শেষ রশ্মিচ্ছটায় কোমল লালিমা সারা পশ্চিমাকাশ আরক্ত।

বাগানের পাশের পথে পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তটিনী আসন ছাড়িয়া একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল একটা ভাড়াটে ঘোড়ারগাড়ী হইতে নামিয়া তার পিসতুতো ভাই অতুল ও আর একটী যুবক তারিণীবাবুকে প্রণাম করিতেছে!

তটিনী দ্রুতপায়ে মহেশ্বরীকে খবর দিতে চলিল। সে বাগান হইতে বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়া ডাকিল "পিসিমা!"

মহেশ্বরী তাকে দেখিয়াই বলিলেন "তুই এতক্ষণ বাগানে ছিলি বুঝি?"

"হ্যাঁ কেন?"

"তারিণী যে তোকে খুঁজছিল।"

"আমাকে? আমি যে বাবাকে এইমাত্র রাস্তায় দেখে আসচি,—আচ্ছা পিসিমা আমি তোমাকে একটা মস্ত সুখবর দেব—"

মহেশ্বরী তখন তুলসী-তলায় প্রদীপ দিবার জন্য যাইতেছিলেন বলিলেন "কি সুখবর রে ?"

"তোমার ছেলে আসছেন যে !"

মহেশ্বরীর মুখ আনন্দে ভরিয়া গেল, তিনি বলিলেন "তোকে কে বল্‌লে মা—চিঠি লিখেছে বুঝি ?"

তটিনী হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না না সে যে এসেছে, আমি এইমাত্র দেখে এলাম পথে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে কথা বল্‌চে।" মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন। তটিনী ভাবিতে লাগিল যে লোকটীকে সে বাগানে টেনিস খেলিতে দেখিয়াছে সেই অচেনা লোকটাই অতুলের সঙ্গী হইয়া আসিল কেমন করিয়া ?

অতুলকে সঙ্গে করিয়াই তারিণীবাবু আসিয়া তটিনীকে খবর দিয়া গেলেন যে, একজন মক্কেলের কাজে তিনি ঘণ্টা-কয়েকের ভিতরই অন্য যায়গায় যাইবেন, এ রকম মধ্যে মধ্যে তাঁকে যাইতে হইত। তটিনী জিজ্ঞাসা করিল "সেখানে আপনার ক'দিন দেরী হবে বাবা ?"

"বোধ হয় দিন তিনেক,—নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তাকে বলো যেন যা যা দরকার সব গুছিয়ে ন্যায়।"

"সে বাজারে গিয়েছে, আসুক।"

তারিণী বাইরে যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তিনুমা, আমার বাইরের ঘরের আলমারির বইগুলো সব ঝেড়ে গুছিয়ে রেখো ত মা, বিষুণকে দিয়ে সব করিয়ে নিও।"

"আচ্ছা বাবা।"

তরিণীবাবু তাঁর বেড়াইবার ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তটিনী কিছুক্ষণ অতুলের সঙ্গে গল্প করিল। পূজার ছুটী আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল পূজাও আসিয়া পড়িয়াছে, নিকটের জমিদার বাড়ীতে বোধনের বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

পরদিন খুব ভোরেই তারিণীর রওনা হইবার কথা। রাত্রে শুইবার সময় তটিনী বারংবার এই কথা ভাবিয়া রাখিয়া ও পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল তখনই সে ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল বেলা সাতটা প্রায়!

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িয়া দেখিল, তারিণী গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন তাঁর সঙ্গে যাইবার লোক নিতাই পরিচ্ছন্ন বেশে ব্যাগ হাতে করিয়া প্রস্তুত, অতুল সেখানে দাঁড়াইয়াছিল সে ষ্টেশন অবধি যাইবে, তটিনীকে দেখিয়া তারিণীবাবু বলিলেন "এই যে তিমুম, আমি চল্লাম, বেশ সাবধানে থেক তোমরা!"

তারিণী গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, গাড়ী বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেও তটিনী ক্ষণকাল নিঃশব্দে সেই দিক পানে চাহিয়া থাকিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই দেখিল যে, একখানি পাঁওটে রংয়ের মট্‌কা পরিয়া মহেশ্বরী একমনে মালা ফিরাইতেছেন। তাঁর মনটা সেদিন প্রসন্নই ছিল, তিনি তটিনীকে দেখিয়া বলিলেন। "হ্যাঁ তিমু, তোর বুঝি শরীর ভাল নেই?"

তটিনী একটু হাসিল, কেননা সত্যই তার মত সুস্থ সবল মেয়ে সচরাচর দেখা যাইত না, সে হাসিয়াই বলিল "হঠাৎ এমন কথা কেন পিসিমা? আমি তো বেশ আছি।"

"উঠ্‌তে যে এত দেরী হ'ল কিনা তাই বলচি।"

তটিনী একটু ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিল "তা তুমি তো আর আমায় ডেকে দাওনি? কতবার ক'রে তোমায় বলি যে ভোরে উঠ্‌লে আমাকে একটু ডেকে দিও—তা তুমি দেবে না!"

মহেশ্বরী এক জবাব দিয়া থামিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা তা এবার থেকে দেব।"

"ছাই দেবে!" বলিয়া তটিনী স্নান করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু স্নানের পর যখন ফিরিল তখন তারহাতে আর কোনো কাজ ছিল না। সে পিতার কথামত তাঁর বাইরের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া আলমারীর বইগুলি নামাইয়া ঝাড়িতে বসিল। বইগুলিতে ধূলাও যথেষ্ট জমিয়া ছিল, আর বর্ষার জন্য কোনো কোনো বইতে ছাতা ধরিয়া গিয়াছিল।

এতগুলি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা অল্পক্ষণের কাজ নয়, যদি বাইরের কোনো লোক আসিয়া পড়ে, ভাবিয়া, তটিনী ইতস্ততঃ করিতেছিল, পরক্ষণেই মনে পড়িল "এত সকালে আর কে আস্‌বে, বাবা তো বাড়ীতে নেই !"

কুণ্ঠশূন্য মনে করিতে করিতে হঠাৎ জুতার শব্দ পাইয়া সে চকিতে মুখ তুলিয়া আবার আরক্ত মুখ নামাইয়া ফেলিল। এমুখই সে কোথায় দেখিয়াছে কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না, তবু যে এই স্বপ্নলোকের বাস্তব জীবটী তাকে যেন তাড়া করিয়া বেড়াইতেছিল।

তটিনীর অনাবশ্যক দ্বিধা ছিল না, সে শান্তভাবে মুখ তুলিয়া বলিল "বাবা তো বাড়ীতে নেই।"

যে আসিয়াছিল সেও সঙ্কোচে, কুণ্ঠায়, প্রাণপণে ঘাড় গুঁজিয়া মুখ নামাইয়া ছিল, তটিনীর উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই সে ত্বরিতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বারান্দা ছাড়িয়া গেল। চাকর বিষুণ আসিয়া বলিল "অতুলবাবুকে বলে দেবেন যে, বারীনবাবু এসেছিলেন।"

"বারীনবাবু ? যিনি এসেছিলেন তিনি বল্‌লেন এই কথা ?"

বিষুণ মাথা নাড়িয়া বলিল "জী হাঁ !"

তটিনী আপনা আপনি ভাবিতে লাগিল বারীন্দ্র ? বারীন্দ্র নামের কোনো লোককেই তো সে কখনো চেনে না, তবে কেন একে এত পরিচিত মনে হয় ? সমস্ত মনটা যেন মথিত হইয়া উঠে কেন ? কেমন একটা বিতৃষ্ণায় তটিনী নিজে রাগ করিয়া ক্ষুব্ধ মনে ব্যাথার সঞ্চয় করিতে বসিল।

কুমারীর অম্লান চিত্তবনে যেন কোন্ বসন্তের দখিন হাওয়া প্রাণের জাগরণ স্পর্শ দিয়া দোলাইয়া গেল ! তটিনী নিঃশব্দে এক ঘণ্টার কাজ তিন ঘণ্টা লাগাইয়া বই ঝাড়া শেষ করিয়া মহেশ্বরীর কাছে আসিয়া বসিল।

মহেশ্বরী তখন বঁটি পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিলেন। তটিনী মনের নূতন রকম সঙ্কোচ-টুকু দমন করিয়া বলিল "পিসিমা, তুমি বারীন বলে কাউকে চেনো ?

মহেশ্বরী বলিলেন "কেন রে ?"

"অতুলদার কাছে এসেছিলেন, তুমি চেনো না তাঁকে ?

মহেশ্বরী বলিলেন "না বাপু আমি বীরেন-টীরেন কারুকে চিনিনে। তটিনী হাসিল, বলিল "বীরেন? আমি কি তাই বললাম তোমায়?

"তবে? কি বললি তবে?"

"বারীন"

"তা হবে,—আমি ও-সব আজকালকার উদ্ভট্টি নাম বুঝতেও পারিনে ছাই!"

তটিনী আর কোনো প্রতিবাদ না করিয়া একটু হাসিয়া চুপ করিল। অতুল ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিষুণের কাছে সংবাদ পাইয়া তটিনীকে প্রশ্ন করিল "তিনু, কে এসেছিল বলতো! বিষুণ নাম বলতে পারলে না"

তটিনী বলিল "নাম বললেন বারীন।"

"বারীন? বারীন এসেছিল? একটু বসতে পারলো না?"

তটিনী একটু হাসিয়া বলিল "এ নির্বান্ধব পুরীতে এবার এ বন্ধুটী কোথায় পেলে অতুল দা?"

"ইনি এবার আমার আগেই এসেছিলেন, জমিদার বাড়ী নাকি ওঁর মাসী আছেন।"

"ওঃ—"

অন্যমনস্কভাবে পিঠের উপর এলায়িত একরাশি ভিজা চুল হাত দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে তটিনী উঠিয়া গেল। একটা অব্যক্ত সংশয়ের ব্যথা তাকে বিকল করিয়া তুলিতেছিল!

তারিণীবাবু বাড়ী ছিলেন না বলিয়াই সেদিন দুই প্রহরের আহারাদির ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শেষ হইয়া গিয়াছিল। তটিনী তার সারস্বত-মন্দিরে একখানি বেশ মোটা বই হাতে করিয়া বসিয়াছিল। পিসিমা পাশের ঘরের মেঝের মাদুর পাতিয়া শুইয়া খুব ঘুমাইতেছিলেন, পাশের দিকের একজন প্রতিবাসিনী আসিয়া তাঁকে ডাকিতেছিল, কিন্তু আট দশবারের ডাকেও পিসিমার কোনো সাড়া শব্দ না পাইয়া তটিনী বই রাখিয়া আসিয়া তাঁকে ডাকিয়া তুলিয়া দিল।

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি জানাইলেন যে জমিদার গিন্নি একটু মহেশ্বরীকে ডাকিতেছেন। তাসের আড্ডায় আজ মহেশ্বরীর স্থানটুকু শূন্য পড়িয়া আছে। মহেশ্বরীরও খুবই আগ্রহ ছিল

কিন্তু তিনি যাইতে পারিলেন না, বলিলেন "আজ তারিণী বাড়ী নেই, খালি বাড়ী ফেলে রেখে তো যেতে পারবো না বাছা, গিন্নিকে বলগে আজ আর আমার যাওয়া হবে না"

কিন্তু লোকটিকে বিদায় করিয়া দিয়াই পিসিমা আপন মনে বকিতে সুরু করিলেন, তার সমস্ত ঝালটুকুও ছিল তারিণীর উপর, এত বড় ধাড়ী মেয়ে যে ঘাড়ে করিয়া রাখা কি বিবেচনার কাজ তারই সমালোচনা তাঁর মুখে বাড়িয়া চলিল। তটিনী প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুনিল, কিন্তু অন্য দিন যেমন করিয়া হাসিয়া উড়ায় সেদিন আর তা পারিল না একটু রুক্ষ কণ্ঠে ডাকিল "পিসিমা!"

ঝি চাকরেরা পিসিমার কথা সবই শুনিতেছিল, তা এতক্ষণে একটু দৃষ্টি পড়িয়া পিসিমা চুপ করিলেন। তিনি জানিতেন তটিনী তাঁর এই উচিত কথাগুলিই একটুও পছন্দ করে না। তাই তিনি অপ্রসন্ন মুখে থামিলেন। তটিনী আবার তার সেই ভারী বইখানি চেয়ারের সামনে মেলিয়া ধরিল; কিন্তু তার সমস্ত অক্ষরগুলি তার চোখের সামনে নিরর্থক শূণ্য পদার্থের মত মনে হইল! পিতার কাজের সমালোচনা শুনিতে সে এতটুকুও ভালবাসিত না, কিন্তু তাহাকেই কারণ করিয়া লোকে তার দেবপ্রতিম বাবার সমালোচনা করিয়া তাকে ব্যথা দেয় কেন?

কিছুক্ষণ বইখানা নাড়াচাড়া করিয়াও যখন কোনো আস্বাদ মিলিল না, তখন বিরক্ত মনে তটিনী বলিয়া উঠিল "কি যে করচি ছাই তার ঠিক নেই!"

ক্রমশঃ—

শ্রীনীহারবালা দেবী।

নাতির আদর।

-:*:—

নিঙ্‌ড়ে নি'ছি ধরার মধু
সব যাচি'—
এই জীবনেই সাধ জাগে আজ
ফের বাঁচি।
ব'সে ব'সে ফাঁকা ফাঁকা
গ'ণেই এলাম আসল টাকা,-
স্থদ পেয়েচি আসল থেকে
তাই নাচি।
খণির ভিতর মাণিক থাকে
সংগোপন,
সেই মণি তুই মুঠায় আমার
সার রতন!
জল নেইক দুধটা খাঁটি
চেখেই এলাম পরিপাটি,—
দুধের চেয়ে মিষ্টি যে তার
সর, চাঁচি!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

সুসন্তান গঠন।

—:০:—

সুসন্তান লাভের জন্য কোন্ জননী আকাঙ্ক্ষা না করেন? কোন্ ব্যক্তি সুসন্তানের জনক বলিয়া গৌরব বোধ না করেন? সন্তান বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে খ্যাতি লাভ করিলে, সমাজে উচ্চপদ লাভ করিয়া সম্মান অর্জ্জন করিলে, জননী যখন রত্নগর্ভা বলিয়া আদৃতা হ'ন, তখন তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা রত্নগর্ভা জননীরাই কেবল অনুমান করিতে সমর্থ।

কিন্তু সুসন্তান বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, সুসন্তান শব্দের অর্থ ঠিক তাহা নহে। আমাদের ধারণা এখন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীনকালে সুসন্তান শব্দের অর্থ অধিকতর ব্যাপক ছিল। প্রাচীনকালে শৌর্য্য-বীর্য্যে মণ্ডিত হইলে লোকে সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত। এখন কিন্তু সে ভাবের অভাব হইয়াছে।

শৌর্য্য-বীর্য্য মণ্ডিত হইতে হইলে জন্মকাল হইতে শিশুর স্বাস্থ্য উত্তম থাকা দরকার। জননী-জঠর হইতে স্বাস্থ্যসম্পন্ন সুপুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে পারিলে তবে পরিণত জীবনে শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, বিদ্যা-পাণ্ডিত্য মণ্ডিত হইতে পারা যায়। এইরূপ ব্যক্তিকেই জনক-জননী প্রকৃত পক্ষে সুসন্তান বলিয়া গৌরব করিতে পারেন।

এই সুসন্তান লাভ কয়েকটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে প্রধান ছয়টি এই,—(১) শিশুরা যে খাদ্য খায়; (২) তাহারা যে বায়ু শ্বাসরূপে গ্রহণ করে; (৩) তাহারা যেরূপ শান্তিতে সুনিদ্রা উপভোগ করিতে পারে; (৪) তাহারা অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া যেটুকু ব্যায়াম করিতে পারে; (৫) তাহারা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে; আর, (৬) তাহাদের জনক-জননী নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে দৈনন্দিন জীবনে যেরূপ বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন।

শিশুর বয়স এক বৎসর অতিক্রম করিবার পরও, তাহাকে পূর্ব্বের মত নিয়মিত ভাবে খাদ্য দিতে হইবে। যখন তখন যা তা খাদ্য তাহারা যাহাতে খাইতে না পারে, সে দিকে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই অনিয়মের দরুণই অনেক শিশুর স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া থাকে। শিশুকে কি নিয়মে কিরূপ খাদ্য দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রণালীর নির্দ্দেশ এবং তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মাতা-পিতা যদি এই নিয়ম মানিয়া না চলেন,—যদি, শিশু যাহা খাইতে চাহিবে তাহাই তাহাকে খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে শত শত খাদ্য তালিকা ও সন্তান পালন প্রণালীতেও কোন ফল হইবে না। শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও বয়স বুঝিয়া, বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকের মত লইয়া, শিশুর জন্য উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাই ভক্ষণ করিতে শিশুকে অভ্যাস করাইতে হইবে। সে যে খাদ্য খাইবার জন্য বায়না ধরিবে, সন্তানের প্রতি স্নেহ, বাৎসল্য, মায়া বশতঃ জনকজননী যদি বিনা বিচার বিবেচনায় তাহাই তাহাকে খাইতে দেন, সে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কেমন করিয়া? বয়স্ক লোকেই সকল সময়ে নিজের শরীরের অবস্থা ও সামর্থ বুঝিয়া উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে পারে না,—লোভে পড়িয়া অনুপযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ পূর্ব্বক পীড়িত হয়। অনেক সময় মন যে খাদ্য খাইতে চায়, সেই খাদ্য ঠিক সেই সময়ে শরীরের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় শিশুর যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, তখনই তাহা তাহাকে খাইতে দেওয়া কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। অনেক পিতা মাতা সন্তানবাৎসল্য বশতঃ সন্তানকে খাদ্য প্রদান সম্বন্ধে যথেষ্ট চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া নিজেরাই সন্তানের অনিষ্টই করিয়া থাকেন। এরূপ অভ্যাস ত্যাগ করিতে না পারিলে সুস্থ, সবল সুপুষ্ট সুসন্তান লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা বয়স্ক লোকে খাইয়া হজম করিতে পারে, এমন সকল খাদ্যই শিশুরা হজম করিতে পারে না। মিষ্ট দ্রব্য শিশুদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। তাই বলিয়া খুব বেশী পরিমাণে মিষ্ট খাদ্য শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়। শিশুকে যদি মিষ্টান্ন কম পরিমাণে খাইতে দিয়া, ফল মূল খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বেশী মিষ্টান্ন খাইতে না পাইলেও শিশু কোন অসুবিধা ভোগ করিবে না বা অসন্তুষ্ট হইবে না। বরং ফল মূল শিশুদের বেশ প্রিয় খাদ্য এবং তাহারা তাহা খুব পছন্দও করে। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। জননীরা সাধারণতঃ মনে করেন, ফল মূল শিশুদের ধাতে তেমন সহ্য হয় না। এ ধারণা ঠিক সত্য নয়। ফল যদি খুব কাঁচা বা খুব পাকা না হয়, তাহা হইলে ফল খাইলে শিশুর কোন অনিষ্ট হয় না; হজমের পক্ষেও কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। শিশুর যদি দন্তোদ্গম না

হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ফলের রস, কিম্বা ফল ছেঁচিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম হইতেই শিশু ফলের রস বা ছেঁচা ফল বেশ হজম করিতে পারে।

শিশুকে বিনা বিচারে যা-তা খাইতে দিলে যেমন অনিষ্ট হয়, সেইরূপ অন্য দিকে আর এক রকমেও শিশুর অনিষ্ট হয়। অনেক অতি সাবধানী জননী শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য দিবার জন্য অনেক রকম মতলব করিয়া থাকেন। মনে করুন, কোন জননী ছেলের সহ্য হইবে না মনে করিয়া, সমস্ত দ্বিতীয় বৎসরটা দুগ্ধ ও বার্লি ছাড়া আর কিছুই দেন না। তিনি মনে করেন, কঠিন খাদ্যের অভাবে শিশুর দেহের পুষ্টিলাভে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কারণ প্রথম বৎসরে শিশু পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হইতে যতটা তফাতে থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে ততটা থাকে না,—অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। এখন হইতেই অল্প পরিমাণে কঠিন খাদ্য শিশুকে খাইতে অভ্যস্ত করানো উচিত।

শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে নিদ্রার কথাটাও বিবেচ্য। শিশুর স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তাহার খাওয়া দাওয়ার যদি কোন অনিয়ম না হয়, সে যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য পায়, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ যদি তাহার শিশু দেহের ও তাহার স্বাস্থ্যের উপযোগী হয়, তাহা হইলে, এবং ছেলেকে আদর করিবার লোভে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটাইলে, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় সে নিদ্রায় কাটাইয়া দিতে পারে। ইহা শিশুর পক্ষে খুব ভাল অভ্যাস। প্রথম বৎসর কাটিয়া গেলে শিশু অবিশ্রান্ত ভাবে নিদ্রা যায় না বটে, কিন্তু দিনের বেলা খানিক ক্ষণ, এবং সমস্ত রাত্রি তাহার যাহাতে সুনিদ্রা হয়, দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া হইতেই তাহার এইরূপ অভ্যাস জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিবা ভাগে খানিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস থাকা খুব ভাল। ইহাতে শিশু কোনরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। সেইরূপ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলে সে জাগিয়া থাকিতে চাহিবে না। আর যদিই একটু বেশী রাত পর্য্যন্ত তাহাকে জাগাইয়া রাখা দরকার হয়, তাহা হইলেও সে সকালে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পাইলে, তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। মোটের উপর প্রতিদিন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ১২।১৩ ঘণ্টা তাহার নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। পঞ্চম বর্ষে ছেলেকে স্কুলে দেওয়া

হইলে, তাহাকে সকাল বেলাই জাগানো দরকার হইবে। তখন যাহাতে সে পরিবারের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সমানে বেশী রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক স্থলে পিতা মাতা বা বাড়ীর অন্যান্য লোকে শিশুকে সময়ে ঘুমাইতে দেন না। দিনের বেলা তাঁহাদের সামনে যেখানে যে অসাধারণ ঘটনা ঘটে, তাহার গল্প করিয়া শিশুকে উত্তেজিত করিয়া তুলেন; তাহাদের সঙ্গে খেলা করেন; বাড়ীতে অতিথি, অভ্যাগত, কুটুম্ব আসিলে তাহাদের সামনে ছেলেদের গুণপনার পরিচয় দিবার জন্য শিশুদিগকে অনর্থক বেশী রাত পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখা হয়। এই সকল কারণে শিশুর চিত্ত এমন উত্তেজিত হইয়া থাকে যে, সে শয়ন করিতে গেলেও তাহার সুনিদ্রা হয় না। রাত্রিতে পেট ঠাসিয়া খাইলেও ভাল ঘুম হয় না। শিশুর খাদ্য যদি তাহার উপযুক্ত না হয়, সে যদি তাহা হজম করিতে না পারে, তাহা হইলেও তাহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। এডেনয়েড, টনশিল, বা অন্য পীড়ায় কাতর থাকিলেও শিশু রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে না। শিশুর ঘুম ভাল না হওয়া তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর।

এক একটী শিশুকে এক একটী স্বতন্ত্র বিছানায় একলা শুইয়া ঘুমাইতে অভ্যাস করানো ভাল। তবে বাড়ীতে যথেষ্ট সংখ্যক ঘর না থাকিলে, বা পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী হইলে, যখন ঐরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না, তখন ঘরের জানালাগুলি যাহাতে খোলা থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খুব শীতের সময়েও, ঠিক কাছাকাছি না হউক, শিশুর কাছ হইতে দূরবর্ত্তী কোন জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। শিশুর গায়ে উপযুক্ত গরম আচ্ছাদন যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, জানালা খুলিয়া রাখার দরুণ ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুর কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে অবশ্য গাত্র-বস্ত্র এমন মোটা, এত ভারী ও পরিমাণে এত বেশী হওয়া উচিত নহে, যাহাতে শিশু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে। শিশুর শয়নের ও নিদ্রার এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলে, সুনিদ্রার অভাবে তাহার কোন কষ্ট হইবে না।

শিশুর ব্যায়ামের কথা অনেকের কাণে আশ্চর্য্য ঠেকিতে পারে। কারণ, ব্যায়াম বলিলেই ডাম্বেল, বার, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি কথাগুলি মনে পড়ে। কিন্তু শিশুর ব্যায়াম তা নয়। প্রথম বৎসর শিশু প্রত্যহ খানিকক্ষণ কাঁদিয়া ব্যায়াম করে। সুবিধা পাইলে, কাপড়-

চোপড়ের বোঝা কষ্টকর না হইলে, শিশু আপন মনে শুইয়া শুইয়া হাসে, হাত পা নাড়িয়া খেলা করে। ইহাও তাহার একটা ব্যায়াম। ৬ কি ৮ মাস বয়সে সে যখন উপুড় হইতে ও বুকে হাঁটিতে শিখে, তখন ত তার রীতিমত ব্যায়াম হইয়া যায়। আর যখন এক বৎসর বয়সে সে হাঁটিতে শিখে, তখনকার ত কথাই নাই।

পৌষ — 'স্বাস্থ্য-সমাচার'

ঘরে ও বাইরে।

—:০:—

তোমরা আমায় ডাকছ বটে কেমন করে' যাই ?
হেথায়—অনেক বাঁধন ভাই।
অনেক আশা ভালোবাসা
অনেক কাঁদন অনেক হাসা
অনেক পাকে জড়িয়ে হেথা বেঁধেছে আমায়।
কাজ যে অনেক পড়ে' আছে
অনেক বাহু টান্‌ছে পাছে
অনেক সাধই মিটেনিক যাওয়া কি হায় যায় ?
তোমরা কেবল ডাক্‌ছ বটে কেমন করে' যাই।
যাওয়া সোজাত নয় ভাই।

তোমরা আমায় রাখ্‌ছ ধরে কেমন করে' থাকি
মুদে'—কতই শ্রবণ আঁখি ?
ব্যাকুল করে' প্রাণের প্রাণে
ডাক্‌ছে ওরা বেণুর তানে,

হেথায় যে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠে শতবাধন মাঝে
তৃপ্তি যে চাই প্রাণের ক্ষুধার
চাই যে আমি মুক্তি উদার
মগ্ন করে' রাখ্‌লে আমায় কেবল বাজে কাজে।
তোমরা আমায় রাখ্‌ছ ধরে কেমন করে থাকি
তাদের—কেবল দিয়ে ফাঁকি!

শ্রীকালিদাস রায়।

কৃষি-কথা।

—:*:—

রীতিমত চাষ আবাদ করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক না হইলেও, যে দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে কৃষিকার্য্যে অল্পবিস্তর মন না দিলে আর আমাদের শুভ নাই। নিজের বসত বাটীতে শাকসব্জী, ফলমূলটা উৎপন্ন করিতে না পারিলে অনেকের ভাগ্যেই বহু বস্তুর স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। অথচ অল্প আয়াস স্বীকার করিলে নিত্য ব্যবহার্য্য এমন অনেক বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে যাহাতে অর্থের সাশ্রয় ও আনন্দ উভয়ই লাভ হয়। কোন্ সময়ে কোন্ ফসল বপন করিতে হয় ও তাহার জন্য কিরূপে জমী প্রস্তুত করিতে হয়, কোন্ সার কোন্ বৃক্ষলতার উপযোগী তাহা অবগত হইয়া সময়মত তাহার ব্যবস্থা করিলে ফলমূল উৎপন্ন করা কঠিন ব্যাপার নহে। বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা পরিচারিকায় বিলাতী সব্জী চাষের কথা আলোচিত হইয়াছে। লাউ, শিম, ঝিঙ্গা প্রভৃতির দেশী তরকারীর আবাদের বিষয় সকলেই অবগত আছেন, কেবল আলস্য ও সময়মত ব্যবস্থা না করায় এই সকল দ্রব্যের জন্য আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। জমীতে উপযুক্ত সার না দেওয়ায় বা ভালভাবে জমী পাট না

হওয়ায় বা পশ্বাদির মুখ হইতে ফসল রক্ষার বন্দোবস্তের অভাবে অনেক সময় বপরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থা যিনি আলস্য বশতঃ করিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে ফলমূল শাক সব্জী না বুনাই শ্রেয়; কেবল মনস্তাপ বৈত নয়! অথচ এ সকল কর্ম্মে এত আনন্দের যে যিনি একবার নিজ হাতে কোন কিছু বুনিয়া সুফল পাইয়াছেন, তিনি কিছুতেই উহা ছাড়িতে পারেন না। অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া যিনি বৃক্ষাদিতে জলসেচন, বৃক্ষের গোড়া পরিস্কার ইত্যাদির ব্যবস্থা নিজে নিয়মিত করেন, তাঁহার ক্ষেত্রে ফসল না জন্মিয়া যায় না। প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বাগানের কাজ করিলে, পরিশ্রমও অত্যধিক হয় না, অথচ বাগানটী পরিস্কার পরিপাটী থাকে। জন মজুরেরাও প্রফুল্ল আগ্রহে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

সাময়িক ফসল ব্যতীত বাড়ীতে এমন অনেক বৃক্ষ উৎপন্ন করা যায় যাহাতে আয় ও রসনার পরিতৃপ্তি সহজেই হইতে পারে। যথা আনারস, তরী-তরকারী ওল, মান, কলা প্রভৃতির চাষ। আনারস উৎপন্ন করা মোটেই আয়াসসাধ্য নহে। ইহা যেখানে সেখানে জন্মে; এমন কি ছায়াতেও উহা ফসল প্রদান করে। কোচবিহারে বাঁশঝাড়ের আওতায় যেখানে অন্য ফসল হয় না, সেখানে আনারসের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে ফল ফলিলেও সুফল পাওয়া যায় না। রৌদ্রহীন স্থানের আনারস ক্রমেই ছোট হয় ও উহার মিষ্টত্ব কমিয়া যায়। দো-আঁশ মাটীতে চারি পাঁচ হাত অন্তর অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া তাহাতে খইল বা গোবর মাটীর সার দিয়া আনারসের 'পোয়া' বসাইলে এক বৎসরের মধ্যেই তাহাতে আনারস ফলে। যাহাতে বৃক্ষগুলি রৌদ্র পায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আনারস বৃক্ষে জলসেচনের আবশ্যক নাই। উহার আশে পাশে আগাছা জন্মিতে না দিলেই উহার প্রতি যথেষ্ট যত্ন করা হয়। ফল দেড় বা দুই মাসের হইলে উহার মাথার উপরের গাছ সাবধানে কাটিয়া দিতে হয়; ইহাতে ফলের আকার বড় হয়। ফল পাকিলে পুরাতন বৃক্ষও তুলিয়া ফেলা দরকার; পুরাতন বৃক্ষের স্থলে তাহার মূল হইতে উদ্গত মাত্র একটি নূতন চারা রাখিয়া অপর চারাগুলি ভিন্ন স্থানে বপন করা ঠিক। এ দেশে আনারস বৃক্ষের গোড়া কখনই পরিস্কার করা হয় না; একবার বৃক্ষ পুঁতিয়া কৃষক আজীবন উহার ফল

পাইবার আশা রাখে। তাহার ফলে দুই চার বৎসর ফল হওয়ার পর ক্রমেই ফল সংখ্যা কমিয়া যায় ও ফল ছোট ও টক হয়। পূর্ব্বে ভারতের আনারস অন্যান্য দেশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। মৈমনসিংহে পাহাড়ের নিকটের আনারস মিষ্টত্ব ও বৃহৎ আকারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, (এখনও স্থানে স্থানে উপাদেয় ফল দেখা যায়) কিন্তু যত্নের অভাবে ভারতের আনারস ক্রমেই নিকৃষ্ট হইতেছে। গৌহাটী প্রভৃতি অঞ্চলে পাহাড়ীয়ারা ইহার রীতিমত আবাদ করে, ফসলও ভাল হয়। পূর্ব্বে বিদেশে পর্য্যাপ্ত ভারতীয় আনারসের রপ্তানী হইত; বিলাতে ভারতের ১টী আনারস দশ টাকা মূল্যেও বিক্রিত হইত, এখন সিঙ্গাপুরী আনারস সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিয়াছে। সিঙ্গাপুরী আনারস আকারে ছোট হইলে অতি সুস্বাদু ও মধুর। ব্যবহার কালে চিনির প্রয়োজন হয় না। আফ্রিকাতেও আনারসের চাষ বিধিমতে আরম্ভ হইয়াছে ও বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বৃক্ষ বর্দ্ধিত পুষ্ট, হওয়ায় বৎসর বৎসর ফসলেরও উন্নতি হইতেছে। আমারই কেবল দেশের অনায়াস উৎপন্ন ফসলটীকে হতাদর করিয়া ক্রমেই এমন অবস্থায় ঠেলিয়া দিতেছি যে আর বেশী দিন নয়, এভাবে চলিলে ৩০।৩৫ বৎসর পরে ভারতের আনারস অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অথচ আনারস এমন একটি ফসল যাহার উৎপন্নে আয়াস ও অর্থের আবশ্যক নাম মাত্র; বৃক্ষচ্যুত হইয়াও আনারস এত দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে যে উহা চালান দিবার জন্য কোন বেগ পাইতে হয় না। এমন ফলেরও আদর এদেশে নাই। আনারসের অম্লমধুর আস্বাদটা অনেকেরই প্রিয় কিন্তু উহার উন্নতির কথা মনে হয় কম লোকেরই।

পেঁপে আর একটি সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও হিতকারী ফল; অথচ ইহার আবাদ অতি অল্প আয়াসসাধ্য। আবাসস্থলের এক প্রান্তে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া একটু যত্ন করিলেই অনায়াসে এই উপাদেয় ফল লাভ করা যাইতে পারে। রৌদ্রতাপহীন স্থানে পেঁপে বৃক্ষ জন্মিলেও তাহার ফল প্রচুর পরিমাণে হয় না; ফলের মিষ্টত্বও কম হয়। অতএব অবাধ বায়ু ও 'টনা' রৌদ্র যে স্থানে পাওয়া যায় তেমন জায়গায় পেঁপে বৃক্ষ রোপণ করিলে সুফল প্রাপ্ত হইবার কথা। গোড়ায় জল জমিলে পেঁপের গাছ মরিয়া যায়; উচ্চ শুষ্ক স্থান পেঁপে বৃক্ষের উপযুক্ত। খইল ও গোময় সার পেঁপে বৃক্ষের পরিপোষক; তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে নব বৃক্ষের পরিপুষ্ট বৃহদায়তন ফলটীকে বৃক্ষ হইতে অবসর দিয়া তাহা হইতে বীজ

সংগ্রহ করিতে হইবে। বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে উহা রৌদ্রে দুই তিন দিবস শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক কিন্তু বীজ এরূপভাবে শুষ্ক করিতে হইবে, যে উহার উপরিভাগের স্নেহময় পরদাটী একবারে অন্তর্হিত হইয়া না যায়। বীজটি যেন 'চিমসাইয়া' না যায়। রৌদ্র তাপে বীজের রস মরিয়া আসিলে, উহা বায়ু সাহায্যে শুষ্ক করিলে সকল বিপদ হইতে বীজ রক্ষা পাইবে। বীজ পচিবে না।

পেঁপে বৃক্ষ দুই জাতীয়,—পুং ও স্ত্রী। পুং জাতীয় বৃক্ষে পেঁপে না ফলিয়া পুষ্পোদ্গম হয়। পুং বৃক্ষ ফল প্রদান করে না বলিয়া আমরা ইহা ছেদন করি। ইহা ঠিক নহে। পুং বৃক্ষের পুষ্পের রেণু ব্যতীত স্ত্রী বৃক্ষে ফল হইতে পারে না। সুধীগণ এ তথ্য অবগত আছেন কিন্তু আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করি না। অনেক সময় পুং বৃক্ষের অভাবেই স্ত্রী বৃক্ষে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফল হয় না বা কম হয়। কারণ পুং বৃক্ষ নিকটে না থাকিলে মধুব্রত কীটাদি দ্বারা দূর দূরান্তর হইতে পুং পুষ্প রেণু আনীত হইয়া স্ত্রী পুষ্পে ফল উৎপাদন করে বটে, কিন্তু রেণু আশানুরূপ সরবরাহ না হওয়ায় অনেক স্ত্রী পুষ্প অকালে শুষ্ক হইয়া যায়। ভগবানের রাজ্যে সকল বস্তুই এক একটি বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—যদি তাহা সেই কার্য্য করিবার অবসর না পায়, তবে তাহাকে অচিরে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থিত হইতে হয়। স্ত্রী পুষ্পের বীজাধারের কার্য্য ও ধর্ম্ম পুং পুষ্পের পরাগের সাহায্যে ফল উৎপাদন করা। পরাগ সংযোজিত হয় যদি বীজাধার বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় ও তাহার অভাবে শুষ্ক হইয়া পড়ে। সুতরাং পুং বৃক্ষ একেবারে সবংশে নির্ম্মূল না করিয়া অনেকগুলি স্ত্রী বৃক্ষের মধ্যে দুই একটি রক্ষা করিতে হইবে। উহা বেশী রাখিবার আবশ্যক নাই।

পেঁপে বার মাস ফলে ও সংখ্যায়ও অধিক হয়। একটি পেঁপের মূল্য দুই পয়সা হিসাবে ধরিলেও যদ্যপি একটি বৃক্ষে বাৎসরিক ২০০।২৫০ শত ফল হয় তবে উহার মূল্য ৩৲।৩৷৷০ টাকা ধরা যাইতে পারে। দরিদ্র গৃহীর পক্ষে ইহা উপেক্ষনীয় নহে। কাঁচা পেঁপে উৎকৃষ্ট তরকারী। কোষ্টবদ্ধ রোগে উহা বিশেষ উপকারী। পেঁপে পাচক ও রেচক শক্তি বিশিষ্ট। পাকা পেঁপে সুস্বাদু, স্নিগ্ধ ও যকৃৎ যন্ত্রের পরিপোষক। যকৃত রোগে উহা উৎকৃষ্ট পথ্য।

প্লীহা রোগে পেঁপের আঠা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাঁচা পেঁপের আঠা (Papayacioe) ২০ ফোঁটা অর্দ্ধ ছটাক জলের বা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রশমিত হইতে দেখা গিয়াছে। চর্ম্মরোগেও পেঁপের আঠা উপকারী।

অজীর্ণ রোগে পেঁপের শুষ্ক আঠা দুই তিন রতি পরিমাণ আহারের পর সেবন করিলে নিশ্চিত সুফল পাওয়া যায়। শূকরের যকৃত হইতে প্রস্তুত হিন্দু মুসলমানের অস্পৃশ্য অভক্ষ্য বিলাতী পেপসিন ইহাত বৃক্ষজ এই পেপসিন কোন অংশে হীন নহে; বরং ডাক্তারেরা বলেন; উহা অধিকতর ও ফলপ্রদ। উহা যে ভারতে অনায়াসলভ্য তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল শিখিত ও বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট না হওয়ায় আমরা আজও শূকরের যকৃজাত পেপসিন শিশিতে শিশিতে অজীর্ণ রোগে নিত্য ব্যবহার করিতেছি। অপচ,—পাশ্চত্যদেশেও পেঁপে হইতে পেপসিন বহির্গত করিবার চেষ্টা হইয়াছে ও তাঁহারা পেঁপের পেপসিনকে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মনে পরে বহু বৎসর পূর্ব্বে সাপ্তাহিক বেঙ্গলীতে পেঁপের পেপসিনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। তবে শীত প্রধানদেশে পেঁপের চাষের সুবিধা না থাকায় এ ব্যবসা তথায় উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌গুলি এদিকে দৃষ্টি দিলে ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যরক্ষার একটি পথ হইবে।

মাংসে কয়েক ফোঁটা কাঁচা পেঁপের আঠা দিলে উহা সুসিদ্ধ হয়,—একথা বাংলায় অবিদিত নাই বোধ কাহারও।

ক।

শ্যাম-সপ্তক।

[রচনা—শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ]

জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ !

চঞ্চল শিখী-চূড়া, কুঞ্চিত কেশপাশ,
লম্বিত কটিতট—চুম্বিত পীতবাস,
সুন্দর ভালতল মণ্ডন-ঝলমল,
চন্দন-আলেপন-গন্ধ ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ !

গুঞ্জন-নিনাদিত কুঞ্জ-কানন-ছায়
বঙ্কিম-বেণু-রব-ঝঙ্কার মূরছায়,
রঙ্গিল নীলাকাশে অঙ্গ লাবণি ভাসে,
নন্দিত রুণুঝুনু ছন্দঃ ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ !

সিন্ধু দোদুল দোলে হিন্দোল নীলোপর
কম্পিত নীলদেহ অঙ্কিত মনোহর,
নর্ম্ম মিলন-গীত মর্ম্মর-মুখরিত
ইন্দু-ধবল-রাতে মন্দ ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ !

মন্থন-ননী আজো লুণ্ঠিত অনিবার,
সন্তান-স্নেহ-গলা অন্তর যশোদার,
চঞ্চল চিত্তে অতি বক্ষে মথুরাপতি,
নন্দ যশোদা কেঁদে অন্ধ ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ !

সঙ্গীত-মুখরিত রঙ্গে যমুনা জল,
বিম্বিত বরতনু চুম্বন চলচল,
কুঞ্জে গোপিকা-সথে মঞ্জুল মধুরাতে
সুন্দর বাহু-পাশ-বন্ধ ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ !

লুণ্ঠিত ধূলিতলে কণ্ঠ-মুকুতাহার,
সিঞ্চিত আঁখিজলে অঞ্চল রাধিকার,
শঙ্কিত বারতাগে কম্পিত পদে লাগে
মন্দ নূপুর-রব-ছন্দঃ ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ !

অন্তবিহীন লীলা অন্তরে নিশিদিন,
সুন্দর দেহ হৃদ-মন্দির চিরলীন,
মঞ্জু-মরম-বনে মঞ্জীর-জাগরণে
মন্দার-মনোহর-গন্ধ ;
জয় নন্দ নয়ন-চিরানন্দ ॥

স্বরলিপি

:০:-

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মিশ্রবেহাগ—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

০ ১
সা সা II {সা -রগা গা গা | গা মা গা গমগমা I
জ য় ন ০ন্ দ ন য় ন চি য়া ০০০

২´ ৩ ০
I রা -গা -মা পা | মা -গা -রা -সা} | {গা -া গা গা |
ন ০ ০ ন্ দ ০ ০ চ চ ঞ্চ চ ল

১ ২´ ৩
| ধা ধা পধা ধা I ণা -ধণা ণা ণা | ধা ধা পা -া |
শি খী চু০ ড়া কু ০ঞ্চ চি ত কে শ পা শ্

২´
| ধা -া পা পা | মা মা গা গা I গা -পা মা মা |
ম্ বি ত ক টি ত ট চু ম্ বি ত

১
| গা গা রা -সা} | {সা -া রা রা | সা গা গা গা I
পী ত বা স্ সু ন্ দ র তা ল ত ল

২´ ৩ ০
I রা -া মা মা | রা পা পা পা} | গা -ধা পা ধা |
ম ন্ ড ল ব ল য় ল চ ন্ দ ন

| র্মা পা মা গা I সরা -গমা -পা -া | মা -া র্সা র্সা |
আ লে প ন প০ ০০ ০ ন্ ধ ০ অ র

০ ১ ২´
| ণা -া ধা ণা | পা পা মা গা I রা -গা -মা -পা |
ন ন্ দ ন্ ম ন চি রা ন ০ ০ ন্

৩
| মগা -:সা II
দ০ ০০

অন্তরা।

০ ১ ২´
া া II{পা -া পা না | না না না না I না -র্সা র্সা র্সা |
০ ০ গু ঞ্ জ ন নি না দি ত কু ঞ্ জ কা

৩ ০ ১
| না র্সা র্সা -া | পা -না র্সা র্সা | না না পা ক্ষা I
ন ন ছা য় ব ঙ্ কি ম বে ণু র ব

২´ ০
I পা -না ধা না | র্সা র্সা না -া} | {মা -পা পা পা |
ঝ ঙ্ কা র মূ র ছা য় য় ঙ্ গি ল

১ ২´ ৩
| মা পা পা পা I পা -র্সা ণা ধা | পা ধা মা গা} |
নী লা কা শে অ ঙ্ গ লা ব ণি ভা সে

০ ১ ২´
| মা -ধা রা পা | মা মা গা মগমা I রা -গা -মা -পা |
ন ন্ দি ত ক ণ্ ঠ মু হু০০ হ ০ ০ ন্

| গা -মা -পা পা | মপা -ধা পা মা | গা গা সা রা I
দঃ ০ অ ম ন০ ন্ দ ন য ন চি রা

I গা -া -পা -া | মগা -রসা II
ন ০ ০ ন্ দ০ ০০

১ম সঞ্চারী।

া া II{সরা সা -রগা গা | গা -া রা গা I রা -মা পা পা |
০০ সিন্ ধু ০০ দো দু ল্ দো লে হি ন্ দো ল

| ধা পা মা -গগা | মা -ধা ধা ধা | পা পধণা -ণা ণা I
নী লো প ০র ক ম্ প ত মী দ০০ দে হ

I ধা -র্সা ণা ধা | পা ধা মা -গগা} | {পা -র্সা র্সা ণা |
অ ঙ্ কি ত ম নো হ ০র ন ব্ অ মি

| ণা ণা ধা ণা I ধা -র্সা ণা ণা | ধা ধা পা পা} |
ল ন গী ত ম ন্ দ্র ম দ্র থ রি ত

| মা -ধা পা ধা | পা মা গা মগা I রা -গা -মা -পা |
ই ন্ দু ধ ব ল যা মে০ র ০ ০ ব্

| গা -মা ণা ণা | ধা -র্সা ণা ধা | পা মা গা গমগা I
দ ০ অ য ন ন্ দ ন দ দ চি রা০০

২য় সঞ্চারী।

০ ১ ২´
। । II{ র্সা –া সা –গগা । গা গা রা গা I রগা –মা মা পা ।
স ঙ্ গী০ ০ত মু খ রি ত র০ ঙ্ গে র

৩ ০ ১
। পা পা মা গা । মা –ধা ধা ধা । পা পধণা ণা ণা I
সু না জ ল বি স্ বি ত ব র০০ ত রু

২´ ৩ ০
I ধা –র্সা ণা ধা । পা ধা মা গা } । {পা –র্সা র্সা ণা ।
চু ম্ ব ন চ ল চ ল কু ঞ্ জে গো

১ ২´ ৩
। ণা ণা ধা ণা I ধা –র্সা ণা ণা । ধা ধা পা পা } ।
পি কা সা খে ম ঞ্ জু ল ম ধু রা তে

০ ১ ২´
। মা –ধা পা ধা । পা মা গা মগা I রা –গা –মা –পা ।
সু ন্ দ র বা হু পা শ০০ ব ০ ০ ন্

৩ ০ ১
। পা –মা ণা ণা । ধা –র্সা ণা ধা । পা মা গা গমগা I
ধ ০ জ র ন ন্ দ ন র ম চি রা০০

২´ ৩
I রা –গমা –পধা –পা । মা –া া া া ।
ম ০০ ০০ ন্ দ ০ ০ ০ ০

২য় আভোগ।

| { পা -া পা না | না না না ধনা I র্সা -া সা র্সা |
লু ন্ ঠি ত ধূ লি ত লে০ ক ন্ ঠ মু

| র্সা র্সা নর্সা -া | পা -র্সা র্সা র্সা | না না পা ক্ষা I
কু তা হা০ র্ লি ঞ্ চি ত আঁ খি ব লে

I পা -া না ধা | না র্সা না -া } | { র্সা -া র্গা র্রা |
অ ঞ্ চ ল মা ধি কা র্ শ ঙ্ কি ত

| র্গা র্গা র্মা র্গা র্গা I র্সা -া ণা ণা | ধা পা মা গা } |
ঝা র তা গে ক ম্ পি ত প দে জা গে

| মা -ধা পা পা | মা মা গা মগা I রা -গা -মা -পা |
ম ন্ দ ন্ পূ র র ব০ ছ ০ ০ ন্

| গা -মা র্সা র্সা | ধা -র্সা ণা ধা | পা মা গা মগরা I
দঃ ০ জ য় ন ন্ দ ন য় ন চি রা০০

I রা -পা -মা -পা | গা -মা II
ন ০ ০ ন্ হ ০

অতিরিক্ত আভোগ।

। । II{ ণা --ধা মা গমা | পা না না না | র্সা --া না র্সা |
০ ০ অ নৃ ত বি০ হী ন দী পা অ নৃ ত রে

| র্সা র্সা নর্সা --া | পা --র্সা র্সা র্সা | না না পপা ক্ষা I
নি শি দি০ নৃ স্থ নৃ দ র দে হ হৃ দি

I পা --না ধা র্সা | র্সা র্সা না --া } | { র্গা --র্গা র্গা র্মা |
ম নৃ দি র চি র দা নৃ ম ০এ ছু ম

| র্গা র্গা র্গা গা I র্সা --র্রা র্রা র্রা | র্গা র্সা না মা } |
র ম ব নে ম এ জী র জা গ র ণে

| পা --র্সা ণা ধা | পা মা গা গা I রগা --মপা --ধপা --মপা |
ম নৃ দা র ম নো হ র গ০ ০০ ০০ ০নৃ

| মা --গমা গা গমরগসা | রগা --মপা র্সণা ধা |
ধ ০০ অ র০০০০ ন০ ০নৃ দ০ ম

| পা গপমগা গা মগা I রা --গমা --পপা --পা |
র ন০০০ চি রা০ ন ০০ ০০ নৃ

| মা --গা II II
ন ০

রঞ্জন।

বস্ত্র বা সূত্র রঞ্জনের কার্য্যে হাত দিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম কথা জল। জল যতদূর সাধ্য বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে ফিল্‌টার করিয়া লইবে। দ্বিতীয় কথা পাত্র। রংয়ের কাজে চীনা মাটীর বাসন, কালাই করা বাসন, প্যাথরের বাসন ও মাটীর বাসন প্রশস্ত। ধাতুপাত্রে কোনমতেই ব্যবহার করা চলিবে না। পাত্র উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবে। তৃতীয় কথা। যে বস্ত্র বা সূত্র রঞ্জিত করিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে কাচিয়া লইতে হইবে। কেবল জল কাচা নয় Bleach করিয়া অর্থাৎ বর্ণহীন করিয়া লইতে হইবে। Bleach করিবার পূর্ব্বে ক্ষারজলে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

হরীতকী, বহেড়া, খয়ের, মাজুফল, বাবলাছাল, গরাণেরছাল, প্রভৃতি যে সব জিনিষে ট্যানিক এসিড আছে, সেই সব জিনিষ রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। এইগুলি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে অথবা (আবশ্যক মত) কয়েকটি মসলা একই পাত্রে যথেষ্ট জল দিয়া দুই এক দিন ভিজাইয়া রাখিলে উহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কষায় রস বাহির হইয়া জল দ্রব হইয়া থাকিবে। দুই তিন দিন স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে উপরে কেবল দ্রবীভূত ট্যানিক এসিডযুক্ত পরিস্কার জল থাকিবে আর জিনিষগুলি ও ময়লা তলায় থিতাইয়া পড়িবে। এই জল সাবধানে অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইবে, তলানি যেন না মিশে। অন্য পাত্রে হীরাকষ ভিজাইয়া তাহার জল পূর্ব্বোক্তরূপে অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইবে। পরে ক্ষারজলে ধোওয়া সূত্র বা বস্ত্র প্রথমে কষ জলে ভিজাইয়া লইয়া পরে হীরাকষের জলে ভিজাইয়া ছায়ায় শুকাইবে। ইহাতে বস্ত্রের রং ফিকে হইলে, এই প্রক্রিয়া ২।৩ বার করিলে রং গাঢ় হইবে।

খুব গাঢ় ও আরও বেশী পাকা রংয়ের জন্য হীরাকষ ব্যবহার না করিয়া Acetate of iron ব্যবহার করিতে হইবে।

শুষ্ক পলাশফুল হইতে দুই প্রকার রং বাহির হইতে পারে। ফুলের দলগুলি হইতে বাসন্তীরং এবং কেশরগুলি হইতে লাল রং পাওয়া যায়। কেশর ও দল একসঙ্গে ভিজাইয়া তাহার জল যথাক্রমে সোরা ফিটকিরি, সোডা হীরাকষ ও তুঁতে মর্ড্যান্ট স্বরূপ ব্যবহার করিয়া নিম্ন লিখিত রংগুলি পাওয়া গিয়াছে।—যথা, সোরার জলের সঙ্গে মিশাইয়া ফিকে হলদে রং বাহির হয়। ইহা তত উজ্জল নহে; তবে রেশম অস্থায়ী ভাবে রং করা যায়। ফট্‌কিরির জলে ভিজাইয়া হলদে রং পাওয়া যায়। ইহা প্রথমোক্ত অপেক্ষা কিছু উজ্জল বটে, কিন্তু পাকা নয়। সোডার জলে ভিজাইয়া ঘোর বাসন্তীরং পাওয়া যায় ইহা যেমন দেখিতে উজ্জল, তেমনি কতকটা পাকা; কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। হীরাকষের জলে ভিজাইয়া যে রং বাহির হইল, তাহা কম কালো, এবং তেমন সুবিধাজনক নহে। তুঁতের জলে মিশানোতে হলুদের মত রং বাহির হয়, ইহাও পাকা নয়।

খুব পাকা রং করিতে হইলে সুমাক (Sumach) ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। এই জিনিষটি একটী উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং ইহাতে ট্যানিক এসিডের পরিমাণ যথেষ্ট। ডাক্তারখানায় ইহা পাওয়া যাইতে পারে। এক পোয়া সুমাক দুই গ্যালন জলে আধঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া হইলে গাছগুলির ডাল ও ছাল হইতে নির্য্যাস বাহির হইয়া আসিবে। এই জলে কাপড় ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে উহা হইতে তুলিয়া লইয়া চুণের জলে আধঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেন। পরে সুমাকের জলে দেড় আউন্স তুঁতে মিশাইয়া সেই জলে কাপড়গুলি একঘণ্টা রাখিয়া দিন। তারপর কাপড়গুলি সুমাকের জল হইতে তুলিয়া মিনিট পনেরো আবার চুণের জলে ভিজাইয়া রাখুন। ইতোমধ্যে এক পোয়া লগউড দুই গ্যালন জলে এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কাপড়গুলি তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখুন। তারপর ঐ লগউডের জলে অর্দ্ধ আউন্স বাইক্রোমেট অব পটাশ মিশাইয়া সেই জলে কাপড়গুলি এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর, পরিষ্কার জলে কাচিয়া ছায়ায় শুকাইতে দিন। ইহা বেশ পাকা কালো রং।

খানিকটা জলে কিছু হীরাকষ ভিজাইয়া লউন। একখানি কাপড়ের জন্য দুই কি আড়াই তোলা হীরাকষ লইলেই হইবে। একখানি সাদা ধোপ-দেওয়া কাপড় জলে ভিজাইয়া

নিঙড়াইয়া লইয়া ঐ হীরাকষের জলে ভিজাইয়া লউন, যেন কাপড়খানির সমস্ত জায়গা হীরাকষের জলে ভিজিয়া যায়। তারপর ঐ কাপড়খানিকে চুণের জলে ভিজান দেখি। দেখিবেন চমৎকার শ্যামবর্ণ হইয়াছে। ইহা দূর্ব্বাঘাসের রং। কিন্তু এই রং পাকাও নয়, আসল রংও নয়। ছায়ায় ঐ কাপড়খানিকে শুকাইতে দিলে উহাতে যতই হাওয়া লাগিবে ততই উহার রং বদলাইয়া চাঁপাফুলের রং বাহির হইবে। ইহাই আসল রং। বায়ুর অম্লজান যোগে এই যে বর্ণ পরিবর্ত্তন হইল, ইহা অতি পাকা রং।

একখানি নূতন সাদা গামছা প্রথমে জল-কাচা করিয়া, তারপর বাটা হলুদ-গোলাজলে ভিজাইয়া লউন। তার একখানি গসেজের এম্প্রেস পেল সোপ, বা পূর্ব্বে যে বিলাতী বার সাবান যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, সেই সাবান দিয়া হলুদ-ডোবান গামছাখানি কাচিয়া লউন। সাবানে ক্ষার সংযোগে হলুদের রং বদলাইয়া গিয়া গোলাপী রং দাঁড়াইয়া যাইবে।

আমাদের নিজস্ব নিত্য ব্যবহার্য্য খয়ের একটী উৎকৃষ্ট রঞ্জন উপাদান। কালো খয়ের বা মঘাখয়ের একদিন কি দুইদিন ভিজাইয়া সেই জলে কয়েক টুকরা পরিস্কার কাপড় ভিজাইয়া ছায়ায় শুকাইয়া লউন। সোডা, তুঁতে, হীরাকষ অ-লাদা পাত্রে ভিজাইয়া উহার জল তৈয়ার করিয়া রাখুন। বস্ত্রখণ্ডগুলি শুকাইয়া গেলে এক এক খণ্ড বস্ত্র এক এক প্রকার মর্ডাণ্টের জলে ভিজাইয়া দেখুন একই খয়েরে কত রকম রংএর বাহার খোলে। সোডার জলে ভিজাইলে পাকা বাদামী, তুঁতের জলে পাটকিলে, হীরাকষের জলে ভিজাইয়া লইলে কতকটা গোলাপীর মত রং হইবে। এই সকল রংই পাকা।

ভারতবর্ষ— শ্রীবিশ্বকর্ম্মা।

বিবিধ।

—:•:—

পাশ্চাত্যে নারী সমস্যা।

মহাসমর সর্ব্বাপেক্ষা কৃতার্থ করিয়াছে, পাশ্চাত্য ভূমের নারীকে। তাঁহারা বহু বৎসরের বহু চেষ্টায় যে অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, সমরের সঙ্কট সময়ে, তেমন অনেক কার্য্যেই তাঁহাদের ডাক পড়িয়াছিল ও তাহাতে তাঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এতদিন যে সকল কার্য্যে নারীকে অযোগ্য বলা হইত, প্রকৃত পক্ষে, নারী তাহাতে অপারগ নহেন কিছুতেই বরং সহিষ্ণুতা বলে কোন কোনটিতে পুরুষ অপেক্ষা নারীই সেই সকল কার্য্যের উপযুক্ত। ফলে যুদ্ধ অবসানেও বাহিরের কাজে নারী সমভাবে নিয়োজিত আছেন। নারীর স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হইয়া তাহাদিগকে আরও শক্তিসম্পন্ন ও স্বাধীনতাপ্রয়াসী করিয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্য সমাজ-তত্ত্ব-বিদগণের একদল, (ইহাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই আছেন) উন্নতির আনন্দে অতিশয় উৎফুল্ল হইয়াছেন কিন্তু অপর পক্ষ নারীর এ অবাধ স্বাধীনতায় আতঙ্কিত হন নাই কম। ইংলণ্ডের নারী সম্পাদিত মহিলা-পত্রিকায় নারীর এভাবের তীব্র আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, নারী বাহিরের কার্য্যে মত্ত হইয়া গৃহের কার্য্যে একবারে মন দিতে অবসর পাইতেছেন না, ক্রমে গৃহের দিকে ফিরিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের কমিয়া আসিতেছে, যে মাতৃত্বে নারীর বৈশিষ্ট, তাহা হইতে তাঁহারা ক্রমেই দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন ; স্ত্রীধর্ম্মের উন্মেষের বাধা পড়িয়াছে। বাহিরের জীবন-সংগ্রাম মহা-সমরেরই ন্যায় ; সর্ব্বদা উত্তেজিত, জাগ্রত না থাকিলে তথায় জয় লাভের আশা অতি অল্প ; সেখানে সংসারের বন্ধন যত কম হয় প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ তত বেশী, এই জন্য বাহিরের নারী কোন ক্রমেই গৃহে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নয়। বিবাহ বন্ধনটা পর্য্যন্ত যেন তাঁহাদের নিকট ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য কার্য্য-অবসর-কালে সঙ্গীসহ চিত্তবিনোদনের লালসা রাখেন কিন্তু সেটা স্বামী স্ত্রীরূপে গৃহ সংসার পাতিয়া নহে, স্নেহের চন্দন প্রাণের দুলাল

সন্তানের কোমল স্পর্শের কামনা তথায় নাই, বরং সন্তান কর্ম্মজীবনের অন্তরায়রূপেই বিবেচিত হইতেছে, এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কথা। সমাজতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ পাইয়াছেন, অনেক শ্রমজীবিনারী নিজকে সন্তান লাভের অযোগ্য করিতে প্রয়াসী, ইহার ফল যে কত বিষম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসিয়াছে; সে স্বাধীনতার ফল বিষ না অমৃত তাহার আলোচনায় পাশ্চাত্য ভূমেই আরম্ভ হইয়াছে! ভারতবাসী দেখিয়া শিখুন,—ঘরবাহির, অবাধ স্বাধীনতা, সমস্তই বাহিরের,—এগুলির সকলের উপর মনের স্বাধীনতা। দৈহিক বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির প্রয়াসে নিজের দৈহিক শক্তির অবাধ স্বাধীনতা যথার্থ স্বাধীনতা নহে। আপনার সত্তার বোধ,—তাহার বিকাশ হইলে তবে না ঘরবাহির হইবে এক,—প্রকৃতিতেই যে স্বাধীন তাহাকে কে কবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? সে সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব অবস্থায় নিজের বলে নিজের ভাবে তাহার বিশিষ্টতায় স্বাধীন। তাহার মনের স্বাধীন প্রবৃত্তি আপনি পরিস্ফুট, প্রকাশিত হইবেই হইবে,—সে স্বাধীনতা পাশ্চাত্য শ্রমজীবির বাহিরের কোলাহলময় কার্য্য-বিবরে আবদ্ধ হইবার প্রবাসের নামান্তর নহে, তাহা নিজ উপার্জ্জনে নিজে পুষ্ট হইয়া জগতকে দূরে রাখিবার প্রয়াস নহে, এ ভাব ঘরেই হউক বাহিরেই হউক স্ত্রীর বা পুরুষের যাহারই মনে জাগ্রত থাকিলে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে তাহা সহায় নহে। যে স্বাধীনতায় স্বাধীন আত্মার প্রতিষ্ঠা হয়, আপন ধর্ম্মে নরনারী হয় অটল, বন্ধু হয় আপনার, নারী জননী, মাতৃমূর্ত্তিতে বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী শক্তিরূপে সন্তানের সম্মুখে প্রকট হন, সৎ অসৎ সকল সন্তান তাঁহাকে আরাধ্য জননীরূপে মান্য করিতে বাধ্য হয়, নারীর সেই স্বাধীনতাই হক ভারতের কাম্য,—বিলাসনিষক্তা আত্মসুখপরায়নতার স্বাবলম্বনের ফল লক্ষ্য করিয়া ভারত হ'ক ভীত—ও পথ ভারতের নহে।

ইংলণ্ডে বিবাহবন্ধনচ্ছেদের মোকর্দ্দমা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমর প্রত্যাবৃত অনেক সৈন্যকেই গৃহে ফিরিয়া গৃহশূন্য দেখিতে হইয়াছে। অথচ বিবাহবন্ধন সমূলে উচ্ছেদিত না হইলে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা সভ্যদেশে আইন বিরুদ্ধ! এরূপ মোকদ্দমায় খরচও কম নহে, অনেকেই মহাবিপদে পড়িয়াছে; গবর্ণমেণ্ট নানা দিক চিন্তা করিয়া নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাহাতে বিবাহবন্ধন অল্প ব্যয়ে ছিন্ন হইতে পারে, ফলে একপত্নীতে অনন্য-অনুরক্তি নীতিই এখন পাশ্চাত্যে অনর্থের মূল বিবেচিত হইতেছে ও বন্ধনটা যে কত

পলকা আদালতে বিধিমতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।--অসংখ্য কলকারখানার চিমনী উদ্গারিত ধূমপুঞ্জে আবৃত ইংলণ্ডের অন্ধকার আকাশের ন্যায় তথাকার নৈতিক আকাশও তমসাচ্ছন্ন। তাহাতে এইখানেই শেষ, কলকব্জা জড়বিজ্ঞানের দোশ জড়কে যত বড় করিয়াছে—প্রাণটাকে নৈতিক আদর্শকে তত ছোট করিয়াছে যেন।

নারীর আত্মহত্যার সংখ্যাও ইংলণ্ডে অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯২০ সনে ইংলণ্ডে ১১০৬ জন নারী আত্মহত্যা করিয়াছেন। সমাজতত্ত্ববিদগণ বলিতেছেন—ইহা লোকের আর্থিক দুরবস্থার ফল,—নারী পুরুষের ন্যায় বাহিরে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং অন্য দোষ তাহাদের স্বভাবে অস্তিত্ব লাভ করিয়া তাহাদিগকে পশুর অধম করিয়াছে, শ্রমজীবি নারীর মধ্যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে; সাংসারিক বিচ্ছেদের বৃদ্ধি হইয়াছে, সমাজতত্ত্ববিদ বলিতেছেন, এই সকল অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া নারী অকালে অস্বাভাবিক উপায়ে প্রাণপাত করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন--না নারীর আর্থিক অসচ্ছলতা ইত্যাদি ইহার কারণ নহে, তাঁহাদের মন নানা কারণে বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে সেই বিষের অসহ্য জ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই তাহারা এরূপ ভাবে আত্মহত্যা করিতেছে। কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসই নারীর এ কার্য্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী, মেয়েরা উপন্যাস পাঠে নিজকে উপন্যাসের নায়িকার মতই কল্পনা করিয়া নব ও নভেলী ভাবে নভেলী স্বামী লাভ করিয়া নভেলী সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ব্যগ্র হয়; কিন্তু বাস্তব জীবনে যখন সংসারটা অন্য প্রকারই প্রতিপন্ন হয় ও তাহাদের জল্পনা কল্পনার কোন মূল্য নাই দেখিতে পায়, তখন তাহাদের পরিতাপের পরিসীমা থাকে না,—জীবনটাকে, সংসারকে তাহারা অশেষ যন্ত্রনার আগার বলিয়া মনে করে, তখন তাহারা আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করে।

বঙ্গের সমস্যা।

—:*:—

বাঙ্গলাকেও লক্ষ্য করিয়া 'সঞ্জীবনী' এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"ইংলণ্ডের নারীদের অবস্থা অবগত হইয়া আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। বাঙ্গলা দেশ

এখন উপন্যাসের দেশ হইয়াছে। সে উপন্যাস এমন অস্বাভাবিক, এমন চটুল ও চিত্তবিকারকারী যে তাহা পাঠ করিয়া ভাল লোকেরও মন মলিন হইয়া যায়। এইরূপ উপন্যাস বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া বাংলা দেশময় একটা বিকার উপস্থিত করিতেছে। মাসিক পত্রের উপন্যাসের দ্বারা সমাজে উন্নত আদর্শ, সংযম ও সন্নীতি শিক্ষা হয় না কেবল উদ্দাম লালসার বৃদ্ধি হয়। যে মাসিক পত্রে হালকা তরল উপন্যাস বা প্রবন্ধের দ্বারা মানুষের চিত্ত আকুল করে তাহা বাড়ীর ত্রিসীমায় পঁহুছিতে দেওয়া উচিত নয়। যদি সময়ে আমরা সাবধান না হই তবে বাঙ্গলার নভেল প্রিয়াসী নারীদের মধ্যেও আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে।”

সমাজতত্ত্ববিদের মত অগ্রাহ্য করিয়া বিলাতী গবর্ণমেন্ট বুঝাইলেন যত দোষ উপন্যাস পাঠে; অর্থাৎ একদল নীতিজ্ঞান-হীন অপকৃষ্ট গ্রন্থকার তথাকার নারীগণের এ দশা করিতেছে। ইহাতে কি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে না যে বিলাতের নারীদিগের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার ফলে মেয়েদের মনে নীতিবিদের প্রভাব হইতে অনীতিরই প্রভাব অধিকতর প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? সৎ অপেক্ষা সে স্থলে অসৎই হইয়াছে প্রবল, এ শিক্ষা বা সহবত যাহাই হউক, কোন দেশেরই গৌরবের বিষয় নহে; স্পৃহনীয় নহে কোন অবস্থাতেই কিন্তু এই অবস্থার জন্য কেবল নভেল লেখকগণকে একমাত্র দায়ী করিবার পথ নাই। যতই ঢাকিবার চেষ্টা হউক না কেন এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে সমাজের অন্যান্য অবয়ব কলুষিত, কুভাবে কণ্টকিত না হইলে লোকমজান লেখকলেখিকার সাধ্য কি যে তাহারা কুদ্বারা সুকে এরূপ ভাবে আবৃত আচ্ছন্ন করিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর লেখক কবি, তিনি আত্ম মেধার বলে একটা নব সৃষ্টির অভাব দানে সমর্থ কিন্তু সাধারণের মন-রঞ্জক লেখকগণের পুঁজি কোথা? পাঠক পাঠিকার রুচি,—আর তাঁহাদেরই গতানুগতিক আচরণ! পারিপার্শ্বিক সমাজের নরনারীর চরিত্র, মতিগতি অবলম্বন ব্যতীত সে সকল গ্রন্থকার এমন প্রতিভাবান নয় যে নূতন কিছুর পরিকল্পনা করিতে পারে, কেহ করে যদি তাহা সাধারণের নিকট আদৃত হইবার আশা অতি অল্প। তাহা হইলেই সেই সকল লেখক সমাজকে সৃষ্টি করে না বরং সমাজই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে। তবে ইহা কে না বলিবে—কু চিরকালই অকল্যানকর,—কু গ্রন্থ যাহা,

অস্তিত্ব তাহার যে ভাবে, যে জন্যই হ'ক, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু কুকে পরিত্যাগ করিবার চরম উপায় কেবল মাত্র উপদেশ বা তাহার প্রচার নিষেধ আজ্ঞাই নহে,— যাহা হইতে উহার উৎপত্তি তাহার সংস্কারই প্রকৃত সংস্কার।

সঞ্জীবনী কেন অনেকের মুখেই শুনা যায়,—বাঙ্গলার মেয়েরা নভেল নাটক পড়িয়া অধঃপাতে যাইতেছেন আমরা ইহার সত্যাসত্য স্থির করিতে পারি নাই; কারণ বাঙ্গলার মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯৭টি নিরক্ষর; এই তিনটী পাঠিকার মধ্যে আবার বোধহয় একটীর মাত্র অক্ষর পরিচয়ে শিক্ষিতা নাম,—ইহাদের নভেল পাঠের ফলে কি বাঙ্গলার সমস্ত মেয়েদের আত্মহত্যার ভয় আছে! না—অনেক শিক্ষিত মহাশয় বাঙ্গলার মেয়ে বলিতে সহরের ভদ্রঘরের জমীদার ও চাকুরের কয়টি মেয়েকে বুঝেন? ইহা ব্যতীত যে বাঙ্গলার পল্লীতেপল্লীতে নিম্ন শ্রেণীর শত সহস্র সহস্র মেয়ে আছে, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীশিল্প, স্ত্রীজাতীর উন্নতি সমস্যায় কি সেই সকল নারীর স্থান নাই? অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিয়া ধন্য করিলে বা একত্র ভোজনে ফল হইবে কি, যদি আমরা মনে তাদের কথা না রাখি। বাঙ্গলার নভেল সমস্যা হইবে পরে, এখন এই সমগ্র নারীর শিক্ষা সমস্যা। কোন দেশে কেবল দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করাইয়া সাধারণকে শিক্ষিত বা শিক্ষিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে?...কথা-সাহিত্যই সর্ব্বদেশে সাধারণের সাহিত্য—তাহাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না—তাহাতে শুভ নাই।

জানি না, বাঙ্গলার মাসিকে কোথায় চিত্তবিকারকারী উপন্যাস নিত্য প্রকাশিত হইতেছে। হইলে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রতিবাদ ও প্রচার বন্ধ করা উচিত, ইহাতে অমত নাই কাহারও। সঞ্জীবনীর ন্যায় সুপরিচালিত সুধী-সম্পাদিত পত্রিকা এই দায়িত্বপূর্ণ, এই অবশ্যকরণীয় কার্য্যটি গ্রহণের উপযুক্ত। তিনি, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত যে কোন কু-নীতিপূর্ণ, অচল গল্প উপন্যাসের তীব্র সমালোচনা করুন, তাহাতে রাজনৈতিক আলোচনা হইতে অধিক ফল হইবে। নতুবা ভালমন্দ যদি উপযুক্ত ব্যক্তি প্রদর্শন না করিয়া কেবল উপর উপর সাময়িক উপন্যাসের প্রতি কটাক্ষ পাত করেন তাহাতে কোনই লাভ নাই।

বাঙ্গলার পাঠকপাঠিকা উপন্যাসের ভক্ত ইহা খুব সত্য কিন্তু বাঙ্গলার উপন্যাস পাঠের উপযুক্ত বলিয়াই তাহারা তাহাতে অনুরক্ত। তুলনায় সমালোচনা করিলে কি আদর্শে,

কি রুচিতে বাঙ্গলার উপন্যাস পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস,—এধারণা কতদূর বিচারসহ তাহা সুধীগণের প্রদর্শন করা শ্রেয়। আগাছা প্রত্যেক উদ্যানেই জন্মে—তাহার উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয় ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

শুধু নভেল পাঠ বন্ধ করিয়া নয়, সাবধান হইতে হইবে আমাদিগকে এই বিদেশী ধর্ম্মহীন শিক্ষাকে দেখিয়া; বাঙ্গলার নারীর মন আজও এত উশৃঙ্খল ও এত বিচলিত হয় নাই যে তাহায় নারী-ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান, নিষ্ঠা, ভগবানে নির্ভরতা যে শিক্ষায় অচল অটল থাকে, তাহার সহিত তাহাদের মনে আত্ম শক্তির অনুভূতি আসে, নিজের ভরণ পোষণের উপযুক্ত হইতে পারে—পরের গলগ্রহ—আজীবনের পরাধীনতা হইতে তাহার মুক্ত হইতে পারে সেই শিক্ষাই তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থিত হক। পুরুষ উদার হ'ন, প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদিগকে সহধর্ম্মী, সহকর্ম্মী করিয়া তুলুন, পুরুষ তাহাকে বুঝাইয়া দিন, নিজেও বুঝুন—স্ত্রীর সহায়তা পারিবারিক জীবনে সমাজে, সকল কার্য্যে কতবড় দান, কিরূপ আনন্দের,—নারী উপযুক্ত হইলে স্বামী, পুত্রের কতখানি আয়াসের, আনন্দের, নির্ভরের; নারীও বুঝুন পুরুষ তার কি, কত আত্মীয়, উভয় দুই হইয়াও এক,—এই একত্ব আত্মীয়তা পরিস্ফুট পরিবর্দ্ধিত হয় যে শিক্ষায় তাহারই ব্যবস্থা সুধীজন করুন নতুবা বিএ এম.এ পাশ করিয়া ছেলেও হইয়াছে যাহা মেয়েকেও তাহা করিয়া লাভ কি? বাহিরের সু-কু দৃশ্য, পুস্তকগত ভালমন্দ, চিত্র-চরিত্র আছে চিরকাল, থাকিবে চিরকাল; বিদ্যা যদি ফুটাইতে পারে মনুষত্ব—বাহিরের আবর্জ্জনা দূর হইতে কতক্ষন।

বঙ্গমাতার শক্তিমূর্ত্তি।

বহুকাল পরে বঙ্গের নারী বর্ত্তমানে যেরূপ আত্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের গর্ব্বে বাঙ্গলায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মাতাই মানুষের আদি গুরু, তাঁর শিক্ষাই সর্ব্বশিক্ষার মূলে, তিনি যদি হন পূর্ণ, সন্তানের আর অভাব কি, সেও হবে মার বলে বলীয়ান, মার অনুকরণ করা সন্তানের সহজাত বৃত্তি,—মার আদর্শে মানুষ হইব আমরা।

পশু কেবল নিজ সন্তানের জন্য অধীর হয়, সহস্র গোপালের মধ্যে গাভীকে নিজ বৎসের স্বরে বিচলিত করে। মানুষ ত আর পশু নয়,—মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সময় সময়

পশুবৎ, হয় মাত্র—সন্তান মাত্রেরই স্বরে মার স্নেহ ক্ষরিত হইতেছে, আর কি দ্বিধা থাকে, সু-কু যাই হ'ক আমরা তাঁর স্নেহে, আহ্বানে এখন সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ডাকিব মা,—নারী আজ মা—সন্তানের পূজ্য, তাঁর প্রতাপ প্রশস্ত করিবার কেহ নাই, মা মাতৃস্নেহই সর্ব্বময়ী। বাঙলার মা তার প্রমাণ দিয়াছেন। জননী জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, তাঁহার প্রভাব সর্ব্বোপরি।

দেশীয় রাজ্য।

—:০:—

সেকাল ও একাল।

সেকাল, অর্থাৎ ১৮৯৬ শালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুর গৃহে (অবশ্য Civilian) একদিন আহারের পর, কোন এক দেশীয় রাজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উল্লেখে আলাপ করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছিলেন 'Native States with few honourable exception are the cancer of India. They should be removed from the map of India'. আমি মনে করিয়াছিলাম এরূপ দাম্ভিকতা কোন দিন ভারতবর্ষ হইতে দূর হইবে। তখন আমি বন্ধু গৃহে অর্থাৎ বিদেশী বঁধুয়ার গৃহে অতিথি; কাজেই প্রকৃত উত্তর না দিয়া, আমার সঙ্গের পেটেরা হইতে একখানা কেতাব বহির করিয়া, বঁধুর নিকট ধরিলাম। সেই কেতাবের নাম Ranjit Singh (রণজিৎ সিংহ) (Rulers of India series) 1893 By Sir Lepd Griffin. K.C.S.I. পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা বাহির করিয়া দিলাম,—গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—Should the day ever come, as come it may, for time and chance wait for all, when the English, weary of the burthen of rule, retire from India, the old Hindu principalities will survive the ensuing storm, as the mud-built villages with their mango groves are seen in times of flood high above the inundated country.

স্বজাতীয় উক্ত বিদেশী বঁধুয়া পাঠ করিয়া প্রায় নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। কারণ তিনিও গ্রন্থকার Griffin সাহেবের একজন বন্ধু এবং তাঁহাকে পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক

বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। Sir Lepdকে ভারতবর্ষের দেশীয় বন্ধুগণ চক্ষে দেখিতে পারিত না। তাহার কারণও দেশীয় রাজ্যের ঘটনা ও রটনা লইয়া। তৎকালীক দেশীয় সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়। সে ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

এবার কয়েক মাস কলিকাতায় ছিলাম। কলিকাতায় রাজনৈতিক মহালয়ে Extremist ও Moderateগণের কেমন রেশারেশী চলিতেছে তাহা সর্ব্ব লোকে জানে। লিখক একজন পররাষ্ট্র-বাসী অর্থাৎ স্বাধীন রাজ্যের প্রজা বটি। সব দলের কথা শুনিয়া যাইতাম। মনে করিতাম কোন দলই দেশীয় রাজ্যের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গন্য করে না। আমরা কি ভারত ছাড়া? এক তৃতীয়াংশ ভারতের শাসন করিতেছে, প্রায় এক অষ্টমাংশ প্রজা সেখানে বাস করে। কিন্তু কেহই আমাদিগকে দলে টানিতেছে না। ইহার অর্থ করা অতি সহজ, কারণ কোন দলকেই আমরা হৃদয়ে লইয়া টানিতেছি না। বরং দূরে থাকিয়া উভয় দলের তামাসা দেখিতেছি। বলিতে গেলে 'we are watching the game'. Prince of Wales আসিলেন, এক দল হাসিলেন; বহু তামাসা করিলেন, জয় জয়কার করিয়া জোকাড় দিলেন। অপর দল হরতাল করিয়া করতাল বাজাইলেন। যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন সংবাদ পত্র বলে। পক্ষান্তরে দেশীয় নৃপতি মহলে যুবরাজকে হৃদয় খুলিয়া বন্ধুভাবে বরণ করিলেন ও করিতেছেন। এসব কথা বার্ত্তা ও সংবাদ পত্রে প্রকাশ। কয়েক জন দেশীয় রাজ্যবাসী বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায় দেখা সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম তাঁহাদের রাজ্যে যুবরাজকে বরণডালা লইয়া বরণ করিয়াছিলেন। সেখানে হরতালের করতালি হয় নাই এবং হইতে পারে না। যুবরাজ সেই সব স্থানে গিয়াছিলেন—পিতৃবন্ধু গৃহে। বন্ধু পুত্রকে যেরূপ আরামে ও আমোদে রাখিতে হয় তাহার চূড়ান্ত হইয়াছিল। কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। প্রত্যেক রাজ্যের Press news এ কথাই প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে।

সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম কোন ইংরেজ বন্ধুকে Republican মার্কিন রাজ্যবাসী বন্ধু বলিয়াছেন "বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া 'তোমাদের উচিত হইবে, ভারতবর্ষ দেশীয় রাজ্যের নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে স্বদেশে গিয়া বাস করা।

তাহাতে তোমাদের অর্থনীতির ক্ষতি হইবে না বরং বৃদ্ধি পাইবে।" সে আজ বৎসরাধিকের কথা। কেন আমেরিকা এরূপ উপদেশ দিলেন যাহা নিজ রাজ্যের রাজনীতির বিরুদ্ধ।

বাঙ্গালী মেয়ে আমাদের কুচবিহারের মাতা-মহারাণী শ্রীশ্রীমতি সুনীতি দেবীর, তাঁহার কৃত The Autobiography of an Indian Princess নামক আত্ম-জীবনীখানা পড়িতেছিলাম। তাহাতে তাঁহার জীবনের কথা নানা ভাবে ও নানা ছন্দে লিখিত হইয়াছে। সুখের দুঃখের কথা লইয়া যে মাল্য গাঁথিয়াছেন তাহা সকলের পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এ সুগ্রন্থখানার সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে তাহাতে যে সব দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে আত্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই দুই একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। সেই পুস্তকের Chapter XIV page 215. Viceroys I have known. শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"It is another thing though for the mothers and wives of rulers in India to complain of the Government if they find it interfering with them. There are mothers and wives of rulers in Bengal and the Punjab who know very little or no English and cannot approach the Government direct but have to be represented by Anglo-Indian Commissioners or Political Agents. And I regret to say that the Government Officials now are often of a different type from those in olden days, and this causes trouble in the country. Some of these Englishmen do not know or to write to Indian ladies, neither do they know how to address gentlemen. Most of these Civilians are sent out simply because they have passed the Civil Service Examination; how can any polite manners be expected of them? Yet whoever visits England once wishes to go there again, and the chief reason of this is, that the English are much nicer to Indians in England than they are in India. I always say that as long as the Government respect and consider Indian women the throne is safe; history itself shows that when women are ill-treated no rule is secure.

এই Civilianগণকে লইয়া কত রাজ্যে কত রাজবংশে যে উৎপাত ঘটিয়াছিল, সে কথা সেকালের। তাই মহারাণী সুনীতি দেবী হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই।

Political কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে বিখ্যাত B. M. Malavari ; তাঁহার প্রণীত Native States গ্রন্থের ৭১ পৃঃ লিখিয়াছেন,—

"A masterful Political loves to brush aside the ruler as of little account, practically relieving him of all responsibility. Lord Mayo described him as a dangerous Official. He himself rules through a Prime Minister or a Council who intrigue against their own chief. It is to their advantage to prevent all good understanding between the Rajah and his Political."

সেকালে এরূপ ভাবেই চলিয়াছিল, সে কথাও Malavari বলিয়াছেন।

"Unfortunately, the better educated and more capable a chiefis, the more he feels the anomaly of his position. The more he wishes to make a stand for his rights, the more determined is the opposition he has to face. It is here that the system fails, as it makes no allowances for persons who are anxious to administer their States justly, and to do the best, they can for their people and for the supreme Government."

'Things have changed in recent times, and the Princes are allowed much more freedom, and are encouraged to prove themselves worthy of their high positions, but many a well meaning chief had to leave the administration alone, reserving himself for dress rehearsals and grand Durbare.'

মহারাণী সুনীতি দেবী বলিতেছেন—

'Some of these Officials seem to enjoy calling us untruthful. Well, Mr. H. should feel happy to know that his Official "Confidential box," which, he left in the care of the late Calica Das, containing papers against the Maharajah's family, has been found and is now public property. Mr. L. was once our Supetintendent; he gave the idea to Government that the Cooch Behar Raj family was most extravagant, and unfortunately the members of the family never had the chance to inform the Government what the Superintendents themselves spent. I asked Mr. L. to have a little bamboo shed built at Woodlands, which would have cost

perhaps about £2 ; the Maharajah was away in England at the time. Mr. L. said he must get the sanction of His Highness ; the cablegram would probably have cost him £2 ; and if I remember rightly in the same year Mr. L. expended £8000 on a house in Darrjeeling which though not sanctioned, H. H. had to pay ; such can be the power and folly of a Superintendent.' এ পুস্তকখানা পাঠ করিয়া কেবলই ভাবিতেছি বর্ত্তমান উৎপাত পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের শেষ ফল কি হইতে পারে। আমাদের সেকালের ভারতবর্ষ আর একালের ভারতবর্ষ কত যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং পৃথিবীময় সমুদ্র যে উত্তাল তরঙ্গময় বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; সেকাল ও একালের তাণ্ডব নৃত্য হইতে যেন মহাকালের উপস্থিত হইয়াছে। আমার বোধ হয় Sir Lepel Griffinএর ভবিষ্যবাণী সত্য হইবে না একথা কে বলিতে পারে ?

২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রে Sir Frederick Lugard's এর কথা।

'Sir Frederick Lugard, in a letter to the Times, suggests that, in order to carry out British pledges iu India and at the same time to avert the threatened dangers, oppourtuniy should be taken to extend and recreate Indian native dynasties for example, where a Native State is loyal and orderly it should be en-larged to embrace the widest absorbable area ; also, if possible, we ought to reinstate the native ruler as the titular head of the State with Safegnards for British rights. Apart from such cases, the extension of the dynastic principle will rivet our friendship with the Native States and go far to unify India'.

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাতী সংবাদ পত্র (Retuer's Service) 'Obsarvar' গান্ধী মহাশয়কে সাবহিত করিয়া লিখিয়াছেন—'We must make a decissve arrangewent with the Indian Princes extending largely, if necessar, their present area of rule'.

আজ কেন প্রায় চতুর্দ্দিক হইতে ভারতীয় রাজ্য সমুহের উপর দৃষ্টি পড়িল ? আমার বোধহয় আবহমান কাল হইতে প্রায় অনেক রাজা পুরুষানুক্রমে যাঁহারা শাসন করিয়া

আসিতেছেন তাঁহারা প্রজাশাসনে সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের উপর নির্ভর করা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বর্ত্তমান সময়ে অনুচিত হইবে না বলিয়া মনে করি। মহাত্মা গান্ধীও একজন দেশীয় রাজ্যবাসী এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দেশীয় রাজ্যের প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কাজেই তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। আজ কেন বিদেশী বন্ধুরা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সেই কথা হৃদয় খুলিয়া বলিতেছেন, যে কথা Sir Lepel Griffin বহুপূর্ব্বে ভবিষ্যৎবাণীর মত বলিয়া গিয়াছেন। নিদ্রোত্থিতের প্রলাপবাণী হইতে পারে; সে কথা কি সত্য হইবে? কে বলিতে পারে? সুদিন কুদিন চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই দিন যুবরাজের আগমন দিনে দীপালোকে চৌরঙ্গী মহল ঝলসিয়া ছিল। তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম অকটরলনি মনুমেণ্ট দীপালোকে সুশোভিত হইয়াছে। আলোক-মালার কীরিট পড়িয়াছে। এ মনুমেণ্টের ইতিহাস অনেকে জানেন। নেপাল যুদ্ধ বিজয়ী অকটরলনি সাহেবের গৌরব স্মরণচিহ্ন স্তম্ভ কেমন সাজে সাজিয়াছে। আজ নেপালপতি His Mrjesty নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং আপদ যুদ্ধে বন্ধুর কাজ করিয়া যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছেন। সেই সন্ধ্যাকালে জনৈক নেপালি বন্ধু সমাগমে আমরা দু'জনে সেই অকটরলনি মনুমেণ্টকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম "আজ তোমার দীপালোকের বাহার কেমন সুন্দর দেখাইতেছে।" দেশীয় রাজন্যবর্গের আজ সেকালের কথা স্মরণে নাই, একালের ভাব সে অতীত ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন করিতে বসিয়াছে, প্রবন্ধান্তরে সে সব বিষয় কল্পনা কল্পনা হইলেও করিবার ইচ্ছা রহিল। কারণ দেশীয় রাজাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে, অনেক লোকে অনেক ভাবে। কাজেই প্রশ্ন হইতে পারে এ ভাব ঠিক কিনা। অশিক্ষিত বলিয়া ঘোষিত অথচ প্রাচীন বংশ বলিয়া বিখ্যাত, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ অনেকে রাম রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই উপস্থিত ব্যারামের সময় তাহাদের হাতে চিকিৎসার ভার দিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। তবে কথা এই তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা বর্ত্তমান সময়ে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে তাঁহারা শাসন করিতে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন অথবা করিতে পারেন, সে বিষয়ে আলোচনা করা পাঠকবর্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহাই ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আগরতলা, }
মাঘ, ১৩৩০ ত্রিং। }

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

প্রেমের পরিণাম।

(ক)

তাহার নাম ষ্টিফেন্স গীলবার্ট। নামটা তাহার যেমনি অদ্ভুত, তাহার চরিত্রটা আবার ততোধিক বিচিত্র! এই জনবহুল ম্যাণ্ড্রা নগরের উপকণ্ঠে একখানা পড়োবাড়ীতে সে একা বাস করিত, ভয়ে দিনের বেলায়ও কেহ সে বাড়ীতে যাইত না; সকলের বিশ্বাস বাড়ীটায় ভূত আছে। সে কখনও কাহারও সহিত মিশিত না, মিশিতে ইচ্ছাও করিত না; তাহার নামে সহরে অনেক আজগুবি গল্প প্রচলিত ছিল। কেহ বলিত, ষ্টিফেন্স আকাশের দিকে চাহিয়া কোন অদৃশ্য শক্তির সহিত দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিয়া থাকে, ইহা বক্তা স্বচক্ষে দেখিয়াছে; সে নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মার সহিত পরামর্শ করে। কেহ বলিত, ষ্টিফেন্স একজন মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। এই গল্পগুলির প্রচারক কে তাহা কেহ জানিত না; তবে গল্পগুলি সকলেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে, কাহারও সাহসে কুলায় নাই। ষ্টিফেন্স লোকটি দেখিতে মন্দ ছিল না, অর্থাৎ সরল ভাষায় যাহাকে সুপুরুষ বলে,—সে ছিল তাহাই। কৌতূহল বশে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইতেন, সে কিন্তু আপনার কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিত। পর্ব্বদিনে যখন অন্যান্য সকলের আড়ম্বরের সহিত উপাসনালয়ে যাইত, সে তখন তাহার অভ্যাস মত আধময়লা ওভারকোটটি গায়ে দিয়া কার্য্যালয়ে গিয়া হাজির হইত। তাহার জীবনের এই একটানা স্রোত দেখিয়া অনেকে বিরক্ত হইয়া উঠিত, সে কিন্তু নির্ব্বিকার ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইত। আহার নিদ্রাও যথা নির্দ্দিষ্ট কাজ করা, এ ছাড়া তাহার দৈনিক কার্য্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। ভাবনা চিন্তাও বড় একটা তাহার কাছে ঘেঁসিত না।

কিন্তু একদিন সহসা তাহার জীবনের এই একটানা গতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সে দিন খ্রীষ্টের জন্মতিথি, সকলেই আপনাপন সাধ্যানুযায়ি বেশভূষা করিয়া আনন্দ উৎসবে

যোগ দিতেছে। ইচ্ছায় হৌক বা অনিচ্ছায় হৌক ষ্টিফেন্সও সেদিন একটা সার্জের স্যুটে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া, ব্লুরংয়ের চশমায় চোখদুটা ঢাকিয়া এক উচ্চ দরের হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইল। যে কক্ষটিতে সে গিয়া বসিল, সে কক্ষে আরও কয়েক জন যুবক-যুবতী পান-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন; ষ্টিফেন্স কক্ষে প্রবেশ করিতেই সকলে নীরব-বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ষ্টিফেন্স সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। চশমার ভিতর হইতে তীব্রদৃষ্টিতে ষ্টিফেন্স উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল, একখানি সুন্দর মুখের উপর আসিয়া তাহার দৃষ্টি অচল হইয়া গেল; ব্লুচশমার ভিতর হইতেও সে মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। ষ্টিফেন্স ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে চশমা নামাইয়া, রুমালে চোখ যোড়াটি ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আবার তাঁহার দিকে চাহিল। তরুণী তখনও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ষ্টিফেন্সের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার নৃত্যচঞ্চল নীল চক্ষুদুটি ইহার পূর্ব্বে কখনও কোন বস্তুর উপর এতক্ষণ স্থির থাকে নাই। চশমা নামাইয়া খোলা চোখে ষ্টিফেন্স তরুণীর মুখের দিকে চাহিতেই, তিনি লজ্জিত-সঙ্কোচে তাঁহার কৌতূহলাক্রান্ত চক্ষুদুটি নত করিয়া লইল। চশমাটি কেশের মধ্যে রাখিতে রাখিতে ষ্টিফেন্স চেয়ারে বসিয়া পড়িল, ইতিমধ্যেই আজ্ঞামত খাদ্যদ্রব্য খানসামা তাহার সম্মুখের টেবিলে রাখিয়া গিয়াছিল; সে অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে সেগুলি চিবাইতেছিল, আর এক এক বার আড়চোখে তরুণীকে দেখিয়া লইতেছিল। এই তরুণীর মুখে বার কয়েক নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া, ষ্টিফেন্স বেশ একটা মৃদু আনন্দ অনুভব করিতেছিল, সবটা না বুঝিতে পারিলেও, এইটুকু সে বুঝিল যে তরুণী তাহারই কথা আলোচনা করিতেছেন। কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর এক যুবক তরুণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'চল লিলি, তোমার বাবা বোধ হয় এতক্ষণ উপাসনা মন্দিরে এসে পৌঁচেছেন, আমাদের দেরী হলে তিনি রাগ করতে পারেন।" "চলুন।" বলিয়া লিলি উঠিয়া পড়িলেন, ষ্টিফেন্সের দিকে আর একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে যুবকের সহিত কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন। ষ্টিফেন্স এতক্ষণ খাদ্যদ্রব্যগুলি উদরস্থ করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে ছিল, লিলি চলিয়া গেলে, সহসা যেন তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। ডিসের একপ্রান্তে কিছু মাংস আর একখানা কেক্ তখনও পড়িয়াছিল,

বিরক্ত ভাবে ডিস্ শুদ্ধ সেগুলাকে ঠেলিয়া দিয়া ষ্টিফেন্স উঠিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে সে ভাবিতেছিল, "লিলি!—চমৎকার নামটি। যেমন সুন্দর সে, নামটিও তেমনি মনোরম তার!"

ভাবিতে ভাবিতে ষ্টিফেন্স প্রায় হোটেলের বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে মুখ তুলিয়া দেখিল, দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়া লিলি দাঁড়াইয়া আছেন, আর সঙ্গের যুবকটি ছড়ি ঘুরাইয়া কাহাকে ডাকিতেছে। ষ্টিফেন্স ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। অবিলম্বে একখানি বৃহৎ মোটর আসিয়া হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল; লিলি লঘু পদে গিয়া মোটরে বসিলেন; যুবক তাঁহার অনুগামী হইল; মোটরের ক্ষুদ্র দুয়ারটি সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। ষ্টিফেন্স বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিল, মোটরের দ্বারে লেখা রহিয়াছে,—"মিঃ জে, আইভ্যান।" সে বুঝিল এই তরুণী নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী মিঃ আইভ্যানের একমাত্র কন্যা লিলি আইভ্যান। ইহার রূপের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সে অনেক কথা শুনিয়াছিল, সে তাহাতে তেমন বিশ্বাস স্থাপন করে নাই; কিন্তু আজ সে তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, নিজের চক্ষুকে ত সে অবিশ্বাস করিতে পারে না। সে অস্ফুট-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাঁ দেখবার মত, উপভোগ করবার মত রূপ বটে।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে দ্রুতগামী মোটরের দিকে চাহিয়া দেখিল, মোটর তখন লিলিকে বুকে করিয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় নামিয়া ষ্টিফেন্স ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সেই দিন হইতে ষ্টিফেন্সের জীবনে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কোন কাজই সে আর তেমন মনোযোগের সহিত করিত না, একটা আশা, আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। প্রত্যহ প্রাতে অপরাহ্নে সে রাস্তার মোড়ে উৎসুক হৃদয়ে দাঁড়াইয়া থাকিত, যদি লিলিকে দেখিতে পায়; দিনের মধ্যে দশবার হোটেলে ঘুরিয়া আসিত, যদি তাহার দেখা পায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে মিঃ আইভ্যানের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, যদি কোন রকমে লিলির সুন্দর মুখখানি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। লিলি যখন পিয়ানো বাদনের শেষে উঠিতেন, তখন তিনি শুনিতে পাইতেন, অদূরে কে ক্ল্যারিওনেটে ঠিক সেই গৎটিই বাজাইতেছে।

(খ)

র‍্যান্ডম নগরে হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। সহস্রাধিক যাত্রী লইয়া মিঃ আইভ্যানের যে জাহাজখানি আমেরিকায় যাইতেছিল, এক পর্ব্বতসঙ্কুল দ্বীপের নিকট সে জাহাজখানি ডুবিয়া

গিয়াছে। যাত্রীগণের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া, ক্যাপ্টেন নিজের প্রাণ হারাইয়াছেন। জাহাজে যে সকল বোট ছিল, তাহারই সাহায্যে সমস্ত যাত্রি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ যখন ম্যাল্ডনে মিঃ আইভ্যানের নিকট পৌছিল, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই জাহাজ ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আইভ্যানের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বস্ব, তিনি এতদিনে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই জাহাজের ক্যাপ্টেনের নিকট ছিল, আমেরিকার এক বণিক তাঁহার নিকট ধার চাওয়ায়, ক্যাপ্টেনের সহিত তিনি তাঁহার অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। মিঃ আইভ্যানের সমস্ত আশা উৎসাহ নিমেষের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। তাঁহার সেই বৃহৎ অট্টালিকা, আত্মীয়-স্বজন সকলই তাঁহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। তিনি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন; লিলির প্রেমার্থীগণে মধ্যে যে কেহ জাহাজ এবং ক্যাপ্টেনের ঠিক সংবাদ আনিয়া দিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি লিলিকে অর্পণ করিবেন। সে দিন ম্যাল্ডন-গেজেটের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ষ্টিফেন্স মিঃ আইভ্যানের এই সঙ্কল্পের কথা পাঠ করিল। দরিদ্র অপরিচিত যুবক সে, লিলিকে পাইবার আশা একদিনও করে নাই, লিলিকে যে সে ভালবাসে, একথা সে ভ্রমেও প্রকাশ করে নাই; তাহার প্রাণের কথা কোন দিন কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। মিঃ আইভ্যানের এই সঙ্কল্পের কথা পাঠ করিয়া, অপ্রত্যাশিত আনন্দে ষ্টিফেন্সের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এইবার লিলিকে লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। সে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সকলের অজ্ঞাতে সে একদিন জাহাজে উঠিয়া পড়িল। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল, যেখানে আইভ্যানের জাহাজ ডুবিয়াছে, সে পথে কোন জাহাজ যায় না, যাইতেও পারে না। জাহাজের পথ হইতে সে স্থান প্রায় ছয় মাইল দূর এবং সমুদ্র-পর্ব্বত-সঙ্কুল অগম্য। ষ্টিফেন্স বিনীত ভাবে ক্যাপ্টেনকে বলিল, "দয়া করে ঐ দ্বীপের কাছে আমায় নামিয়ে দেবেন, আর যদি একখানি বোট আমায় দেন,—আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব; তার দামটা অবশ্য আমি আপনাকে দেব।" ক্যাপ্টেন বিস্মিত দৃষ্টিতে ষ্টিফেন্সের দিকে চাহিয়া সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে কহিলেন, "ভুলেও অমন কাজ করবেন না, বড় খারাপ যায়গা সে; কেউ সেখানে যেতে সাহস করে না, আপনি একলা সেখানে যাবেন কি করে। আর একখানা মাত্র বোটের সাহায্যে এই

তরঙ্গাবৃত সমুদ্রের উপর দিয়ে ছ'মাইল পথ অতিক্রম করবেন! আপনি পাগল নাকি?"
"না মশায়, পাগল ছিলাম না, তবে উপস্থিত তাই হয়েছি বোধ হয়।" ষ্টিফেন্সের মুখে দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

(গ)

একখানা ছোট বোট একজন আরোহী লইয়া পালের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছিল। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বোটখানি একবার উপরে ভাসিয়া উঠিতেছিল, আর পরক্ষণেই জল গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। ষ্টিফেন্স অদম্য সাহসে হাল ধরিয়া বসিয়াছিল, সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বোটখানি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে ষ্টিফেন্স চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল,—পারাবারেখা-শূন্য সমুদ্র উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে কোন অজানার উদ্দেশে গর্জিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, আর মাথার উপর ঐ অসীম অনন্ত আকাশ, দূরে অতিদূরে বুঝি পৃথিবীর শেষ সীমায় তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল বিস্তার করিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে; আকাশ সমুদ্রে আর সমুদ্র আকাশে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ষ্টিফেন্স ভাবিল; মরে যাই—ক্ষতি কি! যদি লিলিকে না পেলুম, তাহলে এ নীরস দুর্ব্বহ জীবন বহন করে লাভ কি? তার চেয়ে যে মৃত্যু শতগুণে শ্রেষ্ঠ! তবু লিলিকে পাবার আশায় একটা কাজ করতে গিয়ে মরেছি, এ কথাটা মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমায় আনন্দ দেবে। এই সান্ত্বনা অবলম্বন করে নীরস কঠোর মরণকেও আমি হাসি মুখে বুকে চেপে ধরব।" ষ্টিফেন্স দৃঢ় মুষ্টিতে বোটের হাল চাপিয়া ধরিল।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অনবরত পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন দৃষ্টিতে ষ্টিফেন্স সম্মুখে চাহিল, দূরে পর্ব্বতের মত একটা ধূম্রবর্ণ বস্তু তাহার চোখে পড়িল: অতি সফলতার সম্ভাবনায় ষ্টিফেন্স উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তাহার অবসন্ন ভাবটা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহার প্রাণপণ সাধনা বুঝি আজ সার্থক হইল!—হৃদয় তাহার আনন্দে বলিয়া উঠিল,—'লিলি তোমারি। তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে যখন তাহার বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিল, তখন তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে;—সেদিকে কিন্তু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে দেখিল দ্বীপের উপকূলে মিঃ আইভানের ভগ্ন জাহাজখানি পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণ তাহার আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে বোটখানি তীরে টানিয়া রাখিয়া দ্রুতপদে চূর্ণ-বিচূর্ণ জাহাজে গিয়া উঠিল; কিন্তু জাহাজে কাপ্টেনের কোন চিহ্নই সে পাইল না। জাহাজ হইতে নামিয়া ষ্টিফেন্স পাতি পাতি করিয়া সমস্ত দ্বীপটা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। দিনের শেষে সূর্য্য যখন সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছিল, তখন সে একটা ঝোপের নিকট আসিয়া দেখিল, একটা গলিত মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, আর অদূরে একটি মকমলের থলে পড়িয়া আছে; থলের গায়ে মিঃ আইভানের নাম লেখা।

পুলক-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ট্রিফেন্স সেইখানে বসিয়া পড়িল; এইবার সে নিশ্চয়ই লিলিকে পাইবে—লিলি তাহারই। আবার আনন্দে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। চামড়ার থলি হইতে খানকয়েক বাসী রুটী বাহির করিল, নিমেষের মধ্যে তাহা উদরস্থ করিয়া এক নিঃশ্বাসে সে অনেকখানি জল খাইয়া ফেলিল তারপর ভাবিষ্যত জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত ট্রিফেন্স ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রিত অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল, মিঃ আইভ্যানের কার্পেট মোড় সুসজ্জিত হলে একখানি ইজি চেয়ারে সে বসিয়া আছে, আর লিলি তাহার জানুর উপর ভর দিয়া প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে; লিলি তাহারই!

(ঘ)

মিঃ আইভ্যান তাঁহার নষ্ট সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির আশায় একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, লিলির প্রেমাকাঙ্ক্ষীগণের মধ্যে একজনও সহর ছাড়িয়া যায় নাই। আইভ্যানের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, ক্যাপ্টেন তাঁহার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে। সে এই প্রচুর অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ইচ্ছা করিয়াই জাহাজখানি ডুবাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দিনগুলি ত বেশ সুখেই কাটিয়া গেল, ভাবনা কেবল তাঁহার একমাত্র আদরের কন্যা লিলির জন্য; তাঁহার মৃত্যুর পর এই বালিকার কি হইবে! আইভ্যান যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, ট্রিফেন্স গীলবার্ট তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বিরক্তভাবে আইভ্যান বলিলেন; "ট্রিফেন্স; আমার সঙ্গে তার কি প্রয়োজন!" তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তাঁকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও।" ট্রিফেন্স ধীর পদে আইভ্যানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া ভ্রুকুটিভরে আইভ্যান বলিলেন,—"ট্রিফেন্স, আমার মনের অবস্থা বড় খারাপ, তোমার বক্তব্য খুব শীঘ্র বলে ফেল।" ট্রিফেন্স কোন কথা কহিল না, তাঁহার নামাঙ্কিত সেই থলেটি ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। থলেটি দেখিয়াই আইভ্যান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ!" তারপর সাগ্রহে ট্রিফেন্সের হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন, "ট্রিফেন্স তুমিই আমার ভাবি জামতা; লিলির স্বামী! তারপর ক্যাপ্টেনটার কোন সন্ধান পেলে কি? আগাগোড়া ঘটনাটা আমায় বল দেখি।" ম্যালডন ত্যাগের পর হইতে ট্রিফেন্স তাহার সমুদ্রযাত্রার সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া আইভ্যান বলিলেন; "বেটা কিন্তু আমার ধনেপ্রাণে মারবার চেষ্টা করেছিল, যা হ'ক ঈশ্বর তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। যাক,—তুমি বস্ত্র পরিবর্তন করে এস, আজ এক সঙ্গেই খাওয়া যাবে।" ঠিক এমনি সময়ে রূপের বন্যায় ঘরখানি প্লাবিত করিয়া হাস্যময়ী লিলি হোটেলের সেই যুবকের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিয়া ট্রিফেন্স কদাকার হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লিলির রূপ পূর্ব্বাপেক্ষা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত

হইয়াছে; তন্ময় দৃষ্টিতে ষ্টিফেন্স তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কন্যাকে সম্বোধন করিয়া মিঃ আইভ্যান কহিলেন, "আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আবার ফিরে পেয়েছি, আর সে এই ষ্টিফেন্সের অনুগ্রহে। ইনিই তোমার স্বামী; তোমাদের শুভ বিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।" সেই মুহূর্ত্তে যদি সমগ্র ম্যাল্ডন নগরটা ভূমিকম্পে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত; তাহা হইলে বোধহয় লিলি ও জেমস্ ততটা বিস্মিত ও চমকিত হইত না। মিঃ আইভ্যান বলিলেন, "আজ ষ্টিফেন্স এখানে খাবে, পোষাকটা বদলে তুমি শীঘ্র এস" মাতালের মত স্খলিত পদে লিলি কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন, জেমসও তদ্রূপ অবস্থায় তাহার অনুসরণ করিল। মিঃ আইভ্যান লিলির এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন না,—ষ্টিফেন্স কিন্তু সব বুঝিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ষ্টিফেন্স কহিল, "মিঃ আইভ্যান, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে অপারগ।" বিস্মিত কণ্ঠে আইভ্যান কহিলেন, "তার কারণ?" নিরাশ কণ্ঠে ষ্টিফেন্স কহিল, "উপকারের ইচ্ছায় আমি আপনার নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করেছি, লিলিকে পাবার আশায় করিনি। তাকে আমি ভালবাসি না; আমাদের উভয়ের মধ্যে কখন ভালবাসা হতেও পারে না।" হাসিয়া মিঃ আইভ্যান বলিলেন, "ষ্টিফেন্স, ও ছেলে মানষি খেয়াল ছেড়ে দাও, আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না; তুমিই লিলির স্বামী।"

(৬)

মিঃ আইভ্যানের বৃহৎ উদ্যানের এক প্রান্তে বিমর্ষ চিন্তিতভাবে লিলি ও জেমস বসিয়াছিল। জেমস্ কহিল, "আমার অনুরোধ লিলি, তুমি প্রতিবাদ করনা, বিয়ে কর, সুখী হবে। পিতার অবাধ্য হয়ে সারা জীবনটা কষ্ট ভোগ ক'র না, চেষ্টা ক'রে আমায় ভুলে যেতে পারবে। ক্রন্দনাকুল কণ্ঠে লিলি বলিল, "জেমস্, তুমিও শেষে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে।" কাতরভাবে জেমস কহিল, "উপায় নাই লিলি, তুমি সুখী হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে ক'রব। আমার মত দরিদ্রকে বিয়ে করলে তোমার নারী জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।" "না জেমস, ভালবেসে কারও জীবন কখন ব্যর্থ হয়নি। হও তুমি দরিদ্র, তবু আমি তোমাকে পেয়েই সুখী হব। তোমার ভালবাসা শত দারিদ্র্যের মাঝে আমায় রাণীর আসনে বসিয়ে রাখবে।" "কিন্তু আমি তোমায় পিতার অবাধ্য হতে দিতে পারি না লিলি।" "আমিও তা হ'ব না। কিন্তু প্রাণ থাকতে ষ্টিফেন্সকেও বিয়ে করব না। মৃত্যুর পর ষ্টিফেন্স এ দেহ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এ দেহে তার কোন অধিকারই নেই।" লিলিকে সান্ত্বনা দিয়া জেমস্ কহিল, "ছি লিলি, ঝোঁকের বশে যা করছ, পরিণামে তার কি হবে, সেটা ভেবে দেখা উচিত নয় কি? তুমি ষ্টিফেন্সকে বিয়ে কর, ভুলে যাও আমায়, পরে সুখী হবে।" "নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু তোমায় ছেড়ে ত লিলি সুখী হতে পারবে না জেমস্, তোমাকে যে ওর চাইতে" দুইজনেই বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ষ্টিফেন্স গীসবার্ট। ষ্টিফেন্স ধীর ভাবে

কহিল,—"চল জেমস, আর বিলম্ব ক'র না। আমি সব ঠিক করে রেখেছি, বিয়েটা হয়ে গেলেই তোমরা ক্যাম্ব্রীজে চলে যাবে; পরে এ কথা শুনলে মিঃ আইভ্যান আর রাগ করবেন না।" লিলি তাহার নীল চক্ষু দুটী ষ্টিফেন্সের মুখের উপর স্থাপিত করিল; দেখিল সে মুখখানি স্বর্গীয় দীপ্তিতে পূর্ণ, কিন্তু বিষাদে মলিন। কৃতজ্ঞ কণ্ঠে সে কহিল,—"তুমি এত মহৎ ষ্টিফেন্স!" ষ্টিফেন্সের মনে হইল যেন এক সঙ্গে অনেকগুলি পিয়ানো বাজিয়া উঠিল, তাহার ইচ্ছা হইল লিলির সুকোমল হাত দুখানি ধরিয়া জানাইয়া দেয় যে, সে তাহাকে কত ভালবাসে; তাহার জন্য সে মৃত্যুমুখে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। নিজেকে সামলাইয়া ঘড়ি দেখিতে দেখিতে ষ্টিফেন্স কহিল,—"কৃতজ্ঞতা পরে জানিও লিলি। গাড়ী ছাড়তে আর আড়াই ঘণ্টা দেরী, শীগ্‌গীর চলে এস, মুহূর্ত্তের বিলম্বে সব পণ্ড হয়ে যাবে।" ষ্টিফেন্স অগ্রসর হইল, জেমস ও লিলি অভিভূতের মত তাহার অনুসরণ করিল। চার্চ্চে উপস্থিত হইয়া ষ্টিফেন্স আচার্য্যকে কহিল "দয়া করে বিয়েটা শীঘ্র সম্পন্ন করে দিলে বড় উপকৃত হব।" আচার্য্য বলিলেন, "মিঃ ষ্টিফেন্স, মিস্ আইভ্যান প্রাপ্তবয়স্ক, তিনি তাঁর মনোমত পতি বরণ করে নিতে পারেন, তথাপি মিঃ আইভ্যানের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।—একান্ত পক্ষে তাঁর অনুজ্ঞা পত্র চাই।"

ষ্টিফেন্স একখানি পত্র বাহির করিয়া আচার্য্যের হাতে দিল। আচার্য্য দেখিলেন পত্রখানি মিঃ আইভ্যানেরই লিখিত;—তিনি লিখিয়াছেন, "কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ আমি উপস্থিত হইতে পারিলাম না, বিবাহ যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া দিবেন।" অতঃপর যথারীতি জেমস ও লিলির বিবাহ হইয়া গেল। যতদূর সম্ভব শীঘ্র উভয়কে লইয়া ষ্টিফেন্স ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী ছাড়িতে আর মোটে পাঁচ মিনিট দেরী ষ্টিফেন্স জেমসকে কহিল, "তোমরা গিয়ে গাড়ীতে বস, আমি টিকিট নিয়ে আসছি।" জেমস ও লিলি আসিয়া প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করিল। জানলা দিয়া প্লাটফরমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া লিলি ষ্টিফেন্সের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে প্লাটফরম কম্পিত করিয়া গাড়ী ছাড়িল, ঠিক সেই সময় ষ্টিফেন্স এক প্রকার ছুটিয়া আসিয়া চলন্ত গাড়ীতে লিলির হাতে দুখানি টিকিট গুঁজিয়া দিল। বেচারী লিলি ষ্টিফেন্সকে একটি কথা বলিবারও অবসর পাইল না; কেবল কাতর করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ট্রেণখানি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল যতক্ষণ দেখা যায় বিষণ্ণ-কাতর দৃষ্টিতে ষ্টিফেন্স সেই দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর তাহার চির পুরাতন বাসস্থান, সেই পোড়ো বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া, জীর্ণ দুর্গন্ধ বিছানাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িল, চক্ষের জল আর বাধ মানিল না। সে অশ্রু প্লাবন দুঃখের না সুখের!*

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

---

* বায়স্কোপে An Immortal Lover নামক চিত্র দর্শনে লিখিত।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"
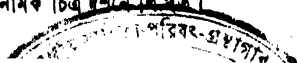
ষষ্ঠ বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল। | ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

চিরসঙ্গিনী।

এ কবি জীবন চিররঞ্জন নন্দন-বন মালিকা,
মম যৌবন-মন্থন-ধন, নয়নমোহন বালিকা।
ব্যথাযন্ত্রণা শোকে সান্ত্বনা
মর্ত্ত্য-জীবনে মূর্ত্ত্য সাধনা
যুগে যুগে আলো করে আছ মম কল্পচিত্রশালিকা।
পুরা জনমের আহৃত সুকৃতি
হলে শরীরিণী লয়ে পূত-স্মৃতি,
অন্তরলোকে অন্নপূর্ণা জীবলোক-প্রতিপালিকা।
চিৎসরোরুহ-বাসিনী কমলা
সরলা অবলা অখলা অমলা,
ভব তটিনীর দুই পারে তুমি প্রান্তর পথচালিকা।

শ্রীকালিদাস রায়।

তটিনী।

—:*:—

(৫)

ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দেবদারু গাছের নীচেকার যে লোহার আসনে তটিনী বসিয়াছিল তখনও বসিয়া আছে। তার কোলের রেশমের বলটা ক্রুশ শুদ্ধ কখন যে একরাশি শুষ্ক পাতার উপর খসিয়া পড়িয়াছিল, সে মর্ম্মর শব্দও সে শুনিতে পায় নাই!

সন্ধ্যার ধূসর আকাশ ক্রমে ঘন কালো হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে নীলাম্বরীর চুমকীর মত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল, তখনো তটিনীর উঠিবার কোনো ত্বরা নাই, মহেশ্বরীর সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিয়া উঠিলে সে বাগান ছাড়িয়া ঘরে উঠিল। ঘরের ভিতরকার ইজি চেয়ারে তারিণী নীরবে শুইয়াছিলেন, তটিনীকে দেখিয়াও তিনি চোখ তুলিয়া চাহিলেন না।

তটিনী আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করিল না। মহেশ্বরীর কাছে বসিয়া অতুল খাবার খাইতেছিল, তটিনী বলিল "বাবা কখন্ এলেন পিসিমা? আমি তো টের পাই নি!"

"এই তো অসচেন, তোমাকে ডেকে দেব কিনা জিজ্ঞেস করা হ'ল, তা বল্লেন থাক্।"

তারিণী বাবুর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের উপরও যে আরো খানিক অন্ধকার তাঁর মুখে লেপিত ছিল তটিনী তা দেখিয়াছিল, তাই বলিল "হয় তো শরীর খারাপ হয়ে থাকবে, নইলে এমন অসময় এসে শুয়ে কেন পড়লেন?"

অতুল তটিনীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল "না, অসুখ হবে কেন, অসুখটসুক কিছু হয় নি।"

মহেশ্বরী বলিলেন "তা কেন, উমা দা আস্‌বেন লিখেছেন তাইতে ওঁর মন হয় তো খারাপ হয়েছে, বারণ তো করতে পারেন না তাই হয় তো ভাবচেন কি করেন।"

"জ্যাঠামশায়? জ্যাঠামশায় আসবেন? কবে পিসিমা?"

সুগভীর বেদনার উপরও তটিনীর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, সেই জ্যেঠামশায়! বাল্যকালে তটিনী জ্যেঠামশায়কে বড় ভাল বাসিত।

গম্ভীর স্বভাব পিতার কাছে সে কখনো কোনো আব্দার করে নাই, কিন্তু বিপরীত স্বভাব জ্যেঠামশায়ের কাছে তার আদর-আব্দারের সীমা ছিল না; এই মা-হারা মেয়েটীর কত অন্যায় আব্দার উমাকান্তও হাসিমুখে সহিতেন।

সেই জ্যেঠামশায় আসিবেন বলিয়া বাড়ীতে এই অপ্রিয় বিষাদের সৃষ্টি ইহা দেখিয়া তটিনী মনটা ব্যথিত হইয়া উঠিল। ঈর্ষাকুল মন ইহাতে যোগ দিতে পারিল না। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে তটিনী যখন শুইতে যাইতেছিল সেই সময়ে তারিণীবাবু ডাকিলেন "তিনু মা শোনো!"

তটিনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বলিলেন "কাল দাদা আস্‌বেন" তটিনী চুপ করিয়াই শুনিল, তারিণী আবার বলিলেন "দেখো তাঁর কি কি দরকার মনে করে সব ঠিক ক'রে রেখো, এসে যেন কষ্ট না পান।"

তটিনী মাথাটি নাড়িয়া বলিল "আচ্ছা বাবা!"

পরদিন উমাকান্ত আসিয়া পৌঁছিলেন। তারিণী প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন "এমন ক'রে হঠাৎ আস্‌বার কারণ কি?"

উমাকান্ত হাসিমুখে বলিলেন "মা পাঠিয়ে দিলেন, তিনুকে দেখ্‌তে" কিন্তু তাঁর মনে বেদনা খোঁচার মত বিঁধিল। এতকাল পরে দেখিয়াও কি তারিণী তাঁকে শত্রুই মনে করিতেছেন?

এই মনোবিরোধের কারণ তটিনী, লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে আসিয়া উমাকান্তকে প্রণাম করিল, তিনি তাঁর চশ্‌মা ঢাকা চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন এ আর সেই আটবছরের ননীর পুতুলের মত শুভ্র সুন্দর সে তিনু এক নয়, আগেকার মত হাসির হিল্লোল তুলিয়া নাচিয়া আসিয়া তাঁর গলা জড়াইয়াও ধরিল না, এ যেন কোন্ একটী ভদ্র নম্রশ্রী তরুণী তাঁকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া গেল!

তটিনীও দেখিল জ্যেঠামশায়ের সেই রেশমের মত আবক্ষ দাড়িগুলি সব পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলিতেও কাশ ফুলের ছোপ ধরিয়াছে, কেবল মুখের সেই উদার সরল হাসিটুকু তেমনি আছে।

কুলীর মাথা হইতে মোট ঘাট সব নামাইয়া নিতাই তাদের বিদায় করিয়া দিলে তারিণী বলিলেন "তিনু মা, দাঁড়াও, এই হাঁড়িটাতে মা আমসত্ব পাঠিয়ে দিয়েছেন, ব'লে দিয়েছেন রোদে দিয়ে রাখতে, দিদিকে ব'লে দিও তো।"

মহেশ্বরী বাড়ীর মধ্যে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তটিনী বলিল "পিসিমাকে ডাক্‌বো কি ?"

"ডাক্‌বে ? আচ্ছা ডাক"

তটিনী মাথা নামাইয়া মহেশ্বরীকে ডাকিতে গেল। এক তো না ডাকিলে তিনি রাগ করিতে পারেন; তা ভিন্ন তটিনীর সরিয়া যাইবার অন্য কারণও ছিল, সে যেন তারিণী ও উমাকান্তর সাম্‌নে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

নির্জ্জন বিশ্রাম সময়ে আর পাঁচটা কথার সঙ্গে উমাকান্ত তারিণীকে বলিলেন "তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি ? কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন ? বলুন কি কথা আছে।"

"না কুণ্ঠিত হওয়ার কথা নয়,—তবে তুমি যে কি ভাবে নেবে সে আলাদা কথা, আমি ব'লতেই এসেচি, বলতেই হবে।"

"বলুন।"

উমাকান্ত তথাপি একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তার পর বলিলেন "তিনু মা বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছে, আমি ওরি কথা বল্‌'চ, কৃষ্ণবিহারীর ছেলেটীকেও বোধ হয় দেখেচ, হীরের টুকরো সে ছেলেটী—"

অসহিষ্ণু হইয়া তারিণী বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁ, তা কি ?"

উমাকান্ত দেখিলেন তারিণীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে, তিনি আরো বেশী রকম নিরাশ হইয়াই বলিলেন "কিন্তু তুমিও একটু বিবেচনা ক'রে দেখো, কৃষ্ণবিহারী তিনুমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বারংবার বল্‌চে, যদি সে এর পর রাগ করে আবার এককাণ্ড ক'রে বসে ?

"তার আমি কি জানি, আপনারা বুঝুন গিয়ে কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে, আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তার রাগে আমার কিছু ক্ষতি নেই।"

"মেয়েটার যথেষ্ট ক্ষতি আছে, তুমি একটু ভেবেই দেখ না, ধর যদি সত্যিই সে ছেলের আবার একটা বিয়ে দেয়—তা হলে ?"

"একটা কেন সে দশটা দিক্ গে, আমি ওসব কেয়ার করি নে, কৃষ্ণবিহারীকে আবার ভয় ক'রে চলতে হবে না কি ?

একান্ত ভগ্নকণ্ঠে উমাকান্ত বলিলেন "তবে কি মেয়েটার সারাজীবনের অভাগ্যের জন্য আমিই দায়ী, তুমি তাকে সুখী করবার চেষ্টা একটুও ক'রবে না এই তোমার প্রতিজ্ঞা দেখছি।"

"সুখী সে হয়েই আছে, তার জন্যে চিন্তা করবেন না, তবে আপনারা যদি এ শত্রুতাটুকু না ক'রতেন তো আরো ভালই হ'ত।"

উমাকান্ত কোনো উত্তর দিলেন না, তারিণী খানিকক্ষণ অপ্রসন্ন মুখে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "এবারে বুঝি কৃষ্ণবিহারীই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে ?"

স্বাভাবিক শান্তস্বভাব উমাকান্ত শান্ত-কণ্ঠেই বলিলেন "সে যা হবার তা হয়েছে তার আর উপায় নেই, আর মেয়েও তো তোমার অপাত্রে পড়ে নি।"

তারিণীবাবু এবারে গলার স্বর উচ্চে চড়াইয়া বলিলেন "ওসব কথা তুলবার কোনো দরকার আমি মনে করি নে, ওসব আলোচনার ফলে তিনুমার কচিমন হয় তো প্রলোভিত হ'তে পারে আমার মেয়েকে আমি সাধারণ থেকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলবার ইচ্ছা চিরকাল ক'রে আসছি, সংসারের মধ্যে ওকে আমি ঢুক্‌তে দেব না।"

"কি সর্ব্বনাশ !"

"এতে আবার সর্ব্বনাশ ?"

"যা ভাল বোঝ তাই কর ভাই, আমাদের আক্ষেপ হয়, ভয় হয় যে, আমাদেরই কর্ম্মফলে তিনুমার কোনো অনিষ্ট না হয়, ওর ভবিষ্যত যেন সুখের হয়—"

তটিনীর চুড়ির শব্দ পাইয়া তারিণী বলিলেন "থাক্ আর ওসব কথায় কাজ নেই।"

স্নান করিয়া পিঠময় ভিজাচুল ছড়াইয়া দিয়া তটিনী আসিয়া দাঁড়াইল, উমাকান্তের হাস্য-বিহীন মলিন মুখ দেখিয়া সে ব্যথা পাইল কিন্তু কারণ বুঝিল না, একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল "সন্ধ্যোআহ্নিকের সব ঠিক করা আছে জ্যাঠামহাশয়।"

উমাকান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "যাই মা—"

মহেশ্বরীর ঘরেই উমাকান্তর পূজাহ্নিকের ঠাঁই ঠিক করা ছিল। তিনি তটিনীর সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া আসনে বসিলেন। তটিনী দুয়ারের চৌকাটের কাছে বসিয়া তাঁর আহ্নিক শেষ হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যে বেদনার ভার এই নিরীহ প্রকৃতি বৃদ্ধের বুকে পাষাণস্তূপের মত চাপিয়া থাকিয়া তাঁর শ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নির্ম্মম ব্যবহারে অতিকষ্টে যাহা তিনি প্রাণপণে দমন করিয়াছিলেন, এই নিরালম্ব মন এতক্ষণে যেন ভাঙিয়া পড়িল।

আচমন শেষ করিয়াই তিনি গায়ের চাদরের কোণে চোখের জল মুছিলেন, তটিনীর বিস্মিত ব্যথিত মুখ পানে চাহিয়া তাঁর চোখের জল আর বাধা মানিল না, অজস্র ধারায় কাঁদিতে কাঁদিতেই সেদিনকার সন্ধ্যাবন্দনা তাঁর শেষ হইল।

তটিনী মনে মনে যতখানি আশ্চর্য্য হইল তার অপেক্ষা অধিকতর আহত হইল, তার মনে হইল হয় তো তারই কথা লইয়া আবারও তারিণীবাবু উমাকান্তকে আঘাত দিয়াছেন, সেই জন্যই বা তিনি এই বয়সেও ছেলে মানুষের মত দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিজেকে তাঁর এই রোদনের হেতু বুঝিয়া তটিনীর আর সেখানে বসিয়া থাকিতে মন চাহিল না, সে উঠিয়া যাইতেছিল, উমাকান্ত মুখ ফিরাইয়া তাকে বসিতে বলিলেন। আহ্নিক শেষে একটু হাসিয়া বলিলেন "তিনুমা এখন এ বুড়ো ছেলেটীকে বুঝি ভুলেই গিয়েছিস্, তাই এড়িয়ে পালাতে চাস্?"

(৬)

প্লে গ্রাউণ্ডে তখনো সব ছেলে আসিয়া জমে নাই। দীঘির পাকা ঘাটের উপর জন দুই যুবক যারা আগে আসিয়া পড়িয়াছিল তারা গল্প করিয়া সময় কাটাইতেছিল। তাদের গল্প যখন পাকিয়া তর্কের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছিল সেই সময় বারীন ও অতুল আসিয়া পৌঁছিল।

বারীন প্রথমটা কাহাকেও না দেখিয়া বলিল "বাঃ! এযে একেবারে আ রাই প্রথম দেখছি।"

ঘাটের উপর হইতে ডাক আসিল "এদিকে, এদিকে।"

নিজের নিজের র‍্যাকেট পাশে রাখিয়া সকলে ঘাটের উপর গিয়া বসিল দু'একজন বলিল "চুপ্ করে বসে থেকে কি হবে?"

অতুল বলিল "কেন, চুপ করে বস্‌বে কেন? লেক্‌চার ঝাড়ো না!"

"খেল্‌তে আসা হয়েছিল না?"

"আকাশের যা-গতিক, আজ আর খেলতে দেবে না বোধ হচ্ছে!"

বলিয়া একজন আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল। দিনান্তের রক্তিম আভায় কালো কালো মেঘখণ্ডগুলি কৃষ্ণসুন্দররূপে ঝলসিতে ছিল। আসন্নপ্রায় বৃষ্টি, তবুও শরতাকাশের তরল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর আলোক তরঙ্গ খেলিতেছিল। দূর আকাশপ্রান্ত নবাঙ্কিত চিত্রের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। এই শরৎ-সায়াহ্নের আলোক-স্নাত শ্যামল প্রকৃতির উছলিত শ্রীমুগ্ধ তরুণ চোখগুলির অধিকারীরা খানিকক্ষণের জন্য খেলার কথাও ভুলিয়া গেল।

ঘাটের ধারেই একটা টগর গাছে এক গাছ শুভ্র-সুন্দর ফুল ফুটিয়া আলো করিয়াছিল, তারি একটা ডালে বসিয়া এক জোড়া দোয়েল পুচ্ছ দোলাইয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত সুরু করিয়াছিল, অতুল বলিল—"আহা রে;—আমি যদি পেণ্টার হতুম?"

"তা হ'লে?"

"Grand একখানি ছবি এঁকে ফেল্তে পারতাম, এই সত্যিকার জিনিষের মত করে আঁকতে পারলে চমৎকার হ'ত।"

আর একজন বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিলেন "যদি চিত্রকর হ'তে তবে তো! এখন অন্য কোনো গুণ থাকে তো বের করে দেখাও, গাইতে পারো?

"না, সে ওই বীরেন পারে, কিন্তু বল্লেই ওঁর এমন দেমাক বেড়ে যায় যে আর গাইতে পারেন না।"

"কি বারীনবাবু, শোনাবেন নাকি একটা?"

বারীন লজ্জিত মুখে হাসিয়া বলিল "মশায়দের অনুমতি হলেই—"

অতুল বলিল "বটে! এত obedient!"

"আরে হাঁ, হাঁ, তুমি থামো, কেবল বচনের বেলায় আছ, কখনো কবি হচ্ছেন, কখনো চিত্রকর হচ্ছেন কিন্তু কাজের বেলায় বা!"

"না উনিই এক জন মস্ত কাজের লোক, কাজের সেরা কাজ তো এক মরা কাটেন।"

বারীন হাসিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল কিন্তু সেই সময়ে নিকটের বাড়ীখানার দিকে চোখ পড়িতেই হঠাৎ মুখ লাল করিয়া সে ফিরিয়া বসিল, তার মুখের হাসির উপর যেন একটা চাবুক পড়িল আর সে অতুলের কথার উত্তর ফিরাইয়া দিল না। পঙ্কিল দীঘির পঙ্কভরা কালো বক্ষের উপর সে তার দৃষ্টি ফিরাইল।

সেদিন মহেশ্বরী বাড়ী ছিলেন না। উপরন্তু কয়েকটা বাড়্‌তী কাজও তটিনীর উপর চাপাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সমস্ত দিনটা আর তটিনী অন্য কোনো দিকে তাকাইবার অবকাশ পায় নাই, মহেশ্বরীকে খুসি করিবার জন্য তাঁর অনেক ছোট খাটো কাজ সে সারিয়া রাখিতেছিল। বৈকালে একটু অবসর পাইয়া সে জানলার কাছে বসিয়া নিজের গায়ের অসমাপ্ত ব্লাউজটা শেষ করিতেছিল। বৈকালে এই পশ্চিম দিকের জানালাটি ছাড়া প্রচুর আলো পাইবার অন্য উপায় ছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু সেলাই তখনো ঢের বাকী, তটিনী বিরক্ত হইয়া সেলাই বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নীচে তখন মহেশ্বরী আসিয়া ঝিচাকরদের সঙ্গে চেঁচামেচি জুড়িয়া দিয়াছেন, উপর হইতে পরিষ্কার শুনা যাইতেছিল।

মাথা তুলিয়াই তটিনীর অসাবধান চোখের দৃষ্টি দীঘির উপর পড়িল এই এক পলকে সে তাহাকেই দেখিল যে দস্যুর মত নীরব বিক্রমে তাহাকে অপহরণ করিতে বসিয়াছে। তীব্র রাগে তটিনী পরদা টানিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু উমাকান্তর সাড়া পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘাটের একটু উপরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে উমাকান্ত ডাকিলেন "বাদল!"

ঘাটের ছেলে কয়টীর মতো পরদার আড়ালে দাঁড়াইয়া তটিনীও বিহ্বলভাবে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিল। তার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। বারীন উঠিয়া দাড়াইল দেখিয়া উমাকান্ত বলিলেন "ব'স বাবা তুমি বসো।"

বারীন আগাইয়া আসিয়া তাঁকে প্রণাম করিল, তিনি নিজেও সেই ঘাটের উপরই বসিয়া পড়িলেন। বারীন একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল "এখানেই বসবেন? সন্ধ্যে হয়ে আসচে যে!"

"তা হ'ক বাবা, বেশীক্ষণ তো ব'সচি নে, তুমিও ব'সো,—তোমার বাবা কেমন আছেন আজকাল?"

"প্রায় এক রকমই আছেন, তবে বাড়াবাড়ি রকম যে সব উপসর্গ ছিল সেগুলো সব কমে গেছে, এখন অফিস যেতে পারেন।"

"আমার সঙ্গে যে তোমার এখানে দেখা হ'ল একথা তাঁকে বলো।"

বারীন তারিণীকে সেই বিবাহের পরদিন একবার মাত্র একটু দেখিয়াছিল কিন্তু চিনিত না, তবে উমাকান্তকে সে চিনিত, কৃষ্ণবিহারীর শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তিও করিত। উমাকান্তর কথার উত্তরে সে মাথা নামাইয়া জানাইল যে বলিবে। উমাকান্ত বলিলেন "তুমি এখানে কোথায় আছ, কোনো বন্ধুর বাড়ীতে? এখানে তোমায় দেখতে পাব তা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

বারীন বলিল "আমাদের একজন আত্মীয় আছেন এখানে, আমি সেখানে আছি, বোধহয় দু একদিনের মধ্যেই চ'লে যাব, বাবার শরীর ভাল নয়, ব'লেই বেশী দিন থাকতে পারছিনে।"

"তা তো সত্যিই, তবে এ মুলুকে তোমাদের আত্মীয় কে আছেন বুঝতে পারলাম না। তাঁর নাম বল্‌লে হয় তো চিনতে পারি; আমাদের ওদিকের তো এক রাজেনবাবুরাই আছেন।"

"হ্যাঁ তাঁরাই।"

"তাঁরাই;—ওই জমিদার রাজেনবাবুর বাড়ীতে তুমি আছ তা হ'লে? এখানে কি বেড়াতে এসেছিলে?"

বারীনের প্রসন্ন মুখখানি মলিন হইয়া গেল সে মুখ নামাইয়া বলিল "বেড়াতে? হ্যাঁ তা একটু কাজও ছিল।"

উমাকান্ত বুঝিলেন রুগ্ন কৃষ্ণবিহারীর পুত্র এতদূরে এই ধনী আত্মীয়ের কাছে কি কাজে আসিয়াছে। আকণ্ঠ ঋণ মজ্জিত কৃষ্ণবিহারী নিরুপায় হইয়া আবার ঋণের চেষ্টাতেই পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। বারীন মেধাবী বুদ্ধিমান ছেলে, আর একটী মাত্র সন্তান বলিয়াও কৃষ্ণবিহারী তাকে মেডিকেল কলেজ হইতে হঠাৎ ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছেন না অথচ ব্যায়ভারও আর বহিতে পারিতেছেন না একথা উমাকান্ত আগেও শুনিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কি যেন ভাবিয়া উমাকান্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। অতুল বলিল "বৃষ্টি এল বড় মামা।"

"বৃষ্টি এলো? তাই তো!" বলিয়া উমাকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বারীনও উঠিল, উমাকান্ত বলিলেন "তুমিও বাসায় যাও বাদল দেরী ক'রলে হয় তো ভিজ্‌তে হবে,—আমি তো এইটুকু যাব মোটে।"

একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও উমাকান্ত বারীনকে তারিণীর বাসাতে লইয়া আসিতে সাহস করিলেন না, পাছে এই সূত্রে তারিণী আবার কিছু কাণ্ড বাধাইয়া বসেন। হয় তো তারিণী মনে করিতে পারেন যে উমাকান্তই বারীনকে পরামর্শ দিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন বা আগে পাঠাইয়াছেন। তাতে আর কিছু না হউক বারীনকে হয় তো আরও কিছু অপমানিত হইতে হইত।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরিতে লাগিল। উমাকান্ত বারীনকে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া নিজে উঠিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অতুলও উঠিল। খুব নিকটেই বাড়ী হইলেও দুইজনেই কিছু কিছু ভিজিয়া গেলেন। ভিজা কাপড় বদলাইতে উমাকান্ত বাড়ীর ভিতর গিয়া নিতাইকে ডাকা ডাকি করিলেন, কিন্তু অতুলের আধ ভিজা কাপড়খানা গায়েই শুকাইল ভিজা পাঞ্জাবীটা একরাশি বইয়ের মধ্যে গুটাইয়া জমা হইয়া রহিল।

পরদিন ভোর বেলায় যখন বাড়ীর উঠানের পুষ্পিত মহুয় গাছের তলে একদল ছেলে মেয়েরা খুব চেঁচামেচি করিয়া মহুয়া কুড়াইতেছিল সেই সময়ে পোষা ময়নার খাঁচার কাছে দাঁড়াইয়া তটিনী পাখীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিল, হঠাৎ মহেশ্বরীর সাড়া পাইয়া চট্ করিয়া অতুলের পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

টেবিলের উপর পাতা খোলা বইয়ের উপর ভিজা জামার জল লাগিয়া কাগজ ভিজিয়া উঠিয়াছে দেখিয়াই সে বুঝিল যে এ কাজ অতুল ছাড়া অন্য কারো নয়! মহেশ্বরী প্রায়ই বলিতেন যে "বাপের আদরে আদরে মেয়ে চিরকাল খুকীই থেকে গেলেন কোনো কালেই আর গোছানো হ'তে শিখবেন না এর পর!"

যদিও মহেশ্বরীর এ মন্তব্য কোনো কারণ হ'তে বাহির হইত না তবু তটিনীকে এ সব কথা অকারণেই শুনিতে হইত! তটিনী টেবিলটার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল "আচ্ছা, এ আদরে ছেলেটী কতই না গোছালো হয়েছেন! আবার আমায় বলেন!"

তারপর ভিজা পাঞ্জাবী হাতে করিয়া আনিয়া বলিল "দ্যাখো পিসিমা তোমার গোছালো ছেলের কাজ! জল লেগে বই ভিজে যায় এ বুদ্ধিও কি জোটে নি?"

মহেশ্বরী বলিলেন "ওমা ঐ দ্যাখ, অতুলটার যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকৃলো, বইটই সব গেচে বুঝি? ভাগ্যে মা, তুই দেখেছিলি!"

"তাই তো! সে কিনা ছেলে, তার বুদ্ধি বুঝি না থাকলেও দোষ নেই? যত দোষ আমার বেলা নয়?

ছুরি দিয়া একটা পেন্সিল মনের মত করিয়া কাটিতে কাটিতে অতুল আসিয়া বলিল "কেন বাপু কি করেছি আমি?"
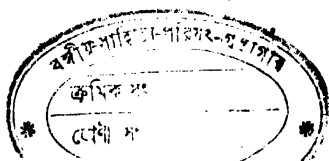
"দেখ গে তোমার টেব্‌লের দশা! যত রাজ্যের ভিজে কাপড়ের বোঝা চাপাবার আর তুমি যায়গা পাও নি তাই বইগুলোর ওপর চাপাতে গিয়েছ?"

"ও! তা ভুল হয়েছে বটে!"

"হ্যাঁ,—ভুল হয়েছে বটে! যাও পাতাখোলা Dictionary খানার কি দুর্গতি হয়েছে দেখ গিয়ে।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো তবু ভদ্ররকম ভিজেছিলাম, বারীনের দশা হ'ল শেষটা,—তাকে যদি তখন বড় মামা দেখ্‌তেন তো আচ্ছা ক'রে ব'কতেন!"

তটিনীর গাল হইতে কান অবধি রাঙিয়া উঠিল। তার অসঙ্কোচ মুখরতা এক নিমেষে থামিয়া গেল, শুষ্ক মুখে সে আঁচলের একপ্রান্ত পাকাইতে সুরু করিল। নিজের এই অশোভন সঙ্কোচে নিজেই বিপন্নভাবে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দোতালার সিঁড়ির উপর নিতাইকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল "হ্যাঁরে নিতাই, বাবা উঠেছেন রে?"

নিতাই বলিল তিনি তো অনেক্ষণ উঠে তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে বসেছেন?

মহেশ্বরী বলিলেন "তা তিনি বেলা আট্‌টা অবধি কোন্ দিন ঘুমোন যে আজ ঘুমুবেন!"

"আট্‌টা বাজ্‌লো বুঝি? আমি বেলা টের পাই নি"

বলিয়া তটিনী পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল। কিন্তু তার মুখের সে স্বাভাবিক আনন্দ দীপ্তি ফুটিল না! তার জীবন-পাত্রের শেষ অমৃতবিন্দু অবধি কোন্ দক্ষিণ বায়ুস্পর্শে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। বাদল! তা হইলই বা সে বাদল, বাদলই বা তার কে? বাদলের নামেই বা তার কুণ্ঠিত হইবার কি আছে?

ক্রমশঃ—

শ্রীনীহারবালা দেবী।

প্রেম।

--:•:--

কি নাম বলিব বঁধু
আগা গোড়া মধু
অণু পরমাণু তার সিক্ত সুধারসে
স্বরগের অমৃতের পবিত্র পরশে
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত
চিরশুদ্ধব্রত
একনিষ্ঠ ভক্তসম
অপূর্ব্ব সুন্দর নিরুপম
নবস্ফুট পদ্ম সুশোভন

যে পূজারী এ পূজায়
দেবতা পূজিতে চায়
পূজারী দেবতা দুই ধন্য আজীবন ?

বলিব কি ভালবাসা ?
বন্ধু এ ত সে নামের যোগ্য নহে ভাষা
তবে ভক্তি কি এ ?
প্রণত প্রাণের চির অনুরক্তি দিয়ে
শুধু এ ত নহে তাই
কেমনে বুঝাই
আরো কি আছে তার মাঝে মিশে মিলে

অনন্ত নিখিলে
খুঁজিলে তা পাওয়া ভার
তবে একি স্নেহ প্রীতি মহৎ উদার ?
হল না হল না, সবে
যারে প্রিয় বলে প্রেম একি তাই তবে ?

থাক্ থাক্ বঁধু
ও যে বিষ, এ যে মধু আগা গোড়া একেবারে মধু
ঊর্দ্ধে তুলে ধরা
বিশ্বহারা নিরজনে
শুধু মনে মনে
এ যে আপনার চিত্ত নিবেদন করা !
ভুলে যাওয়া সুখ দুখ
জাগ্রত উন্মুখ
ভাল হওয়া বন্ধু ভাল চাওয়া
স্বার্থ বলি দিয়ে ফিরে স্বর্গ সুখ পাওয়া

যার কাছে তুচ্ছ ধন
তুচ্ছ যশ মান খ্যাতি সর্ব্ব প্রলোভন
যার কছে দুঃখ চিরপ্রিয়
আয়ু সে ত কোন্ ছার
অর্ঘ্য দিয়ে যে পূজার
মৃত্যু সে যে বন্ধু চির নিত্য বরণীয় !

নারীর দাবী।

—:০:—

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সংস্কার আইন অনুসারে ভারতীয় নারীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিবার ভার ন্যস্ত ছিল ভারতবাসীর উপর। বোম্বাই ও মাদ্রাজ ইতিমধ্যেই তাহাদের কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশবাসী এখনো "যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যগণ বঙ্গনারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বাংলার পুরুষের কলঙ্কমোচনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও বৃথা হইল।

বঙ্গনারীর এই দাবী ও সম্মান রক্ষার জন্য বঙ্গবাসীর জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেশময় তেমন সহানুভূতির সাড়া জাগিয়া উঠে নাই। নারীকে এতকাল জ্ঞানার্জ্জন এবং সমাজ ও দেশ সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া পুরুষ যে এত বড় ভুল—ভুল বলি কেন মহাপাপ করিয়া আসিয়াছে আজ সেই ভুল সংশোধনের প্রায়শ্চিত্তের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতি পুরুষের মনে অনুশোচনা নাই, ভুল সংশোধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। নারীর দাবী রক্ষায় তাহারা উদাসীন। ইহার কারণ কি? অজ্ঞতা না সন্দেহ?

বহু বাকবিতণ্ডার পর আজকাল আমাদের দলের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই স্বীকার করিতেছেন যে, নারীর জ্ঞানার্জ্জনের দাবী স্বাভাবিক এবং সে দাবী পূরণের নিমিত্ত প্রত্যেক পুরুষেরই সাধ্যানুসারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক অধিকারে ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে নারীর দাবী সর্ব্ববাদীসম্মত। আমাদের দেশে পরিবার সমাজের ভিত্তি। যে নারী জ্ঞানার্জ্জন করিয়া পারিবারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তিনি সমাজ সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন কেন? নারী যদি গৃহিনীরূপে সংসার চালাইতে পারেন, জমীদারের পদে বৃতা হইয়া জমিদারী ভাল ভাবে রক্ষা করিতে পারেন, বিরাট রাজ্যের রাণী হইয়া রাজ্য সুশাসন করিতে পারেন, রাজনীতিজ্ঞের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহাকে রাজনীতি সম্বন্ধে

সদুপদেশ প্রদান করিতে পারেন, জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া সহস্র সহস্র মানবকে পরিচালিত করিতে পারেন; কাব্যে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে নারীর প্রতিভা যদি শিক্ষিত পুরুষের খ্যাতিকেও নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে নারীর প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিলেই কি যত ক্ষতি? নূরজাহান, অহল্যা হোলকার, ভোপালের বেগমগণের কৃতিত্বের কথা কি ভারতবাসী ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছেন?

যাঁহারা নারীকে জ্ঞানার্জ্জন ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের দাবী হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা—মনে করেন পুরুষ কর্ত্তা, নারী দাসী, পুরুষ ভোগকর্ত্তা, নারী ভোগ্যা। নারী যে মানুষ এই সহজ সরল কথাটা বোধ হয় তাঁহারা ভুলিয়া যান। মানুষের স্বাভাবিক দাবী যে নারীরও আছে এই কথাটা বোধ হয় তাঁহাদের মতো পুরুষের পৌরুষ-অন্ধ মনে কখনো জাগে না। এই যে জ্ঞানার্জ্জন, এই যে সংসার সমাজ, রাষ্ট্র এইসব কিসের জন্য? মানুষের—মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল হওয়াই ইহাদের প্রয়োজনীয়তা নয় কি? মানুষ এই সংসার ও সমাজ-বন্ধন স্বীকার করিয়াছে কেন? এই বন্ধনে থাকিয়া মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ বিকশিত করিয়া তুলিবার সুবিধা পাইবে, কর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় ও মনের উন্নতি হইবে; জ্ঞানার্জ্জন করিয়া বহু খণ্ড-সত্যের উপলব্ধি করিয়া অবশেষে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে ইহাই তাহার উদ্দেশ্য।

মানবজীবনে যে লক্ষ্য তাহা স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই। তবে পুরুষ যদি জ্ঞানপিপাসু হইতে পারে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারে নারী সেই মানব চিত্তের অধিকারিণী হইয়াও জ্ঞানপিপাসু হইলে অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দাবী করিলে অস্বাভাবিকতা কোথায়? নারী কি মানুষ নহে? তবে তাহাকে জ্ঞানার্জ্জন ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের দাবী হইতে বঞ্চিত রাখা হয় কেন? কোন্ নীতিতে পুরুষকে জ্ঞানের আলো দান করিয়া তাহার মনকে উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা করিতেছ; দিনের পর দিন তাহাকে শুনাইতেছ—তুমি অমর, তুমি স্বাধীন, তুমি অসীমবলে বলিয়ান্; আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে জান, ব্রহ্মলাভ মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। নারীও তো মানুষ, তবে নারীকে কেন অজ্ঞানতিমিরে ডুবাইয়া সর্ব্বদা কথায় ও কাজে আচারব্যবহারে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছ যে, সে দুর্ব্বল, সে নিম্নস্তরে থাকিবার উপযুক্ত তাহার মানসিক উন্নতির দরকার নাই, জ্ঞানার্জ্জনে এবং সমাজসেবার

তাহার প্রয়োজন নাই। ক্ষুদ্র দৈহিক ও বৈষয়িক সুখ ভোগেই (তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে নহে) তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য !

হিন্দুসন্তান, তুমি না "শক্তি"র উপাসক ? তবে এই মূর্ত্তিমতী শক্তি নারীজাতির আত্মোন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াও কোন মুখে ? প্রাচীন ভারতবাসী, নারীকে আত্মোন্নতির সর্ব্ববিধ সুবিধা দিয়াছিলেন বলিয়াই গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষী মহিলার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল; নারী তখন বৈদিক ঋষির আসনে উপবিষ্টা হইতে পারিয়াছিলেন। আর আজ আমরা নারীকে দাসী, ভোগ্যা বলিয়া জ্ঞান করিতেছি বলিয়াই নামে শক্তি উপাসক হইয়া ও কাজে শক্তির অধিকারী হইতে পারি নাই। হিন্দুর নিকট শিল্প বিজ্ঞান, সাহিত্যের প্রতীক দেব নহেন,—দেবী, বাণী।

সৌভাগ্য, সৌন্দর্য্য, সম্পদ ও পবিত্রতার—প্রতীক নারী, লক্ষ্মী। হিন্দুসন্তান ইহার ইঙ্গিতটুকুও কি ভুলিয়া গেলে ? আমরা বিবাহিতা নারীকে পতির সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকি। সহধর্ম্মিণী হইতে হইলে সহমর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হওয়া প্রয়োজন। বাংলার বিবাহিত শিক্ষিত যুবক আপনারা বুকে হাত দিয়া সত্য করিয়া বলিতে পারেন কি, আপনাদের গৃহিণী বাস্তবিকই আপনাদের সহমর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী কি না ? আমি জানি অনেকেই নিরুত্তর হইবেন। যাহাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন তাহার আত্মোন্নতির জন্য কি করিয়াছেন ? জ্ঞানার্জ্জন করিয়া যুবক হয়তো হৃদয় ও মনের যথেষ্ট উন্নতি করিলেন, কিন্তু তাঁহার তথাকথিতা সহধর্ম্মিণীর শিক্ষার গোড়ার কথা যাহা সেই Time ও space সম্বন্ধে ধারণা, তাহাই নাই। শিক্ষিত উদার মনের সহিত অশিক্ষিত অনুদার মনের মিলনে সংসারে শান্তিলাভ এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উন্নতি হইতে পারে কি না সেই বিষয়ে গৃহপতি ও সমাজনেতাদিগকে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

এতদিন সমাজগঠনে, সামাজিক নিয়ম প্রণয়নে, রাষ্ট্রে পুরুষের একাধিপত্য ছিল; তাই—তাঁহারা নারীকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের উপর জুলুম করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কাহারো উপরে জুলুম করা বেশী দিন চলে না। তাই আজকাল য়ুরোপে সমস্ত নারী শক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। তথায় নারী জ্ঞানার্জ্জনে, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালনে, সমাজ সেবায় অধিকারিণী। তাঁহারা তাঁহাদের দাবী বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছেন। অবশ্য এই

প্রথম আন্দোলনে ভুলও যে কিছু না হইতেছে তাহা নহে। কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাহা সংশোধিত হইবেই। য়ুরোপের এ আন্দোলনের ঢেউ ভারতের তীরে ঠেকিয়াছে। ভারতবাসীর য়ুরোপ হইতে ভালটুকু সংগ্রহ করিয়া এই বেলা আপন পরিবার ও সমাজ সংস্কৃত করিয়া লওয়াই শ্রেয়। সমস্ত বিশ্ব উন্নতির পথে হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এই উন্নতির বিরুদ্ধে সকল চেষ্টা, সকল চিন্তা বিফল হইবে ইহা নিশ্চিত। অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মানুষ যাহাই ভাবুক না কেন, ওই গতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

স্নেহের মূল্য

—:*:—

বিষাদ ভরে আসবে যখন
প্রিয় তোমার কোল-পানে,
নামিয়ে নিও বুকের বোঝা
আদর করে' সেই টানে ;
নাই বা হ'ল মিষ্টভাষী,
হ'ক না কেন দুষ্ট সে
'আপন' বলে তোমার মানে
সেই টুকুই বা কম কিসে।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অষ্টাত্রিংশ—পরিচ্ছেদ।

"ওগো, ফেরোজ! আজ স্বপ্নের অবসান, আর জীবনের আরম্ভ।"...কথাকয়টী এতই স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল যে অর্দ্ধজাগ্রত ফেরাজ পাশ ফিরিয়া বক্তাকে ঘরের মধ্যেই দেখিতে পাইবার আশায় চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কে? তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে,—বাহিরের প্রাঙ্গণে পাখীরা কলরব-মুখর, এবং গবাক্ষ পথে বালারুণ রশ্মিজাল বিস্তার করিতেছে। দীর্ঘ নিদ্রায় শরীরে মনে বেশ তাজা হইয়া ফেরাজ উঠিয়া বসিল, এবং আরাম ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে আড়ামোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে ভাবিতে চেষ্টা করিল, কেমন একটা রহস্যময় অশান্তিকর ব্যাপার যেন তাহার সুখনিদ্রার মাঝখানে কতকটা অমঙ্গল আশঙ্কা বহন করিয়া আসিতেছিল। ক্রমে তাহার মনে পড়িল যে বাতাসের কোলে গানের সুর ছাড়া সেটা আর কিছুই নয়—এবং মনে পড়িয়া তাহার মুখে হাসি দেখা দিল।

"বোধ হয় সে আমারই কল্পনা!"—শয্যাত্যাগ করিয়া হাতে মুখে জল দিতে দিতে সে আপন মনে বলিতে লাগিল—"প্রায়ই আমি কোনো না কোনো রকমের গান শুন্‌তে পাই। সম্ভবতঃ গানগুলো বাতাসের গায়ে লেপ্টে থাকে আর সময়ে সময়ে আল্‌গা হ'য়ে বৃষ্টির মতন ঝরে পড়ে। নাই বা হবে কেন? চতুর্দ্দিকের এত গীতি-সম্পদ,—পাখীদের হরেক রকম গান,—লতাপাতার নানা প্রকারের মর্ম্মরধ্বনি,—নদীর কলগীতি, নির্ঝরের সঙ্গীত, সমুদ্রের কল্লোল,—এ সমস্তই তো বাতাসে রয়েছে; আর আমার বিশ্বাস, এদের সাময়িক বর্ষণই দেশবিদেশের সঙ্গীতকুশলীদের মস্তিষ্ক উর্ব্বর করে' তোলে।"

নিজের খেয়ালী কল্পনায় নিজেই মোহিত হইয়া গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে সে শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইল, এবং যথারীতি ভ্রাতার পাঠকক্ষটী গুছাইয়া রাখিবার উদ্দেশে সেখানে প্রবেশ করিল।

ফেরাজ সন্তর্পণে দ্বারটী খুলিল, কেননা এল র্যামি এ সময় প্রায়ই গৃহকোণের ক্যাম্পখাট-খানিতে নিদ্রিত থাকেন। আজ কিন্তু সমস্তই গতরাত্রে সে যেভাবে রাখিয়া গিয়াছিল তেমনিই আছে এবং সারা কক্ষটী এমন একটা শূন্য ও পরিত্যক্ত চেহারা প্রকাশ করিতেছে যাহাতে আশঙ্কা হয় যে গৃহস্বামী বুঝিবা চিরদিনের জন্যই তাহা ছাড়িয়া গিয়াছেন। কেন যে এমন কথা ফেরাজের মনে হইল তাহা সে জানে না—কিন্তু তাহার বুক যেন কেমন দমিয়া গেল; একটী জানালা খুলিয়া দিতে দিতে সে ঘরখানির চারিদিক একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। কিছু স্থানচ্যুত হইয়াছে কি? কই—না! সমস্তই যেমন ছিল, তেমনিই তো রহিয়াছে। সেই আবলুস কাঠের চেয়ার—টেবিলের উপর সেই গ্রন্থস্তূপ—উপরন্তু, পাতা-খোলা অবস্থায় সেই আরবী কেতাবখানা, যাহা ফেরাজ একদিন পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিল। খোলা পাতাখানার দিকে নজর পড়িতেই বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা দেখা গেল—"মরণের রহস্য।" ফেরাজ পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল কেহ যেন তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। গ্রন্থ হইতে চোখ তুলিতেই সে দেখিল, উৎকণ্ঠা-বিবর্ণ মুখে দ্বারপথে দাঁড়াইয়া জ্যারোবা তর্জ্জনী-সঙ্কেতে তাহাকে সতর্ক করিতেছে।

"চুপ!"...অনুচ্চকণ্ঠে সে বলিল..."এল র্যামি কোথায়?"

ফেরাজ ইঙ্গিতে জানাইল—"পরীক্ষাগারে!"

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া জ্যারোবা একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

"আমার মনে কেমন কু গাইছে।" শঙ্কাবিবর্ণ মুখে সে নিম্নকণ্ঠে বলিল—"কু গাইছে; স্বপ্ন দেখেছি আমি—সে যে কি রকম স্বপ্ন! সারারাত ছট্ ফট্ করেছি,—এখনও মাথার মধ্যে যেন দপ্ দপ্ করছে, আর বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে! সাদা পোষাক পরা আশ্চর্য্য সব প্রাণী,—মরা মানুষের সারি সারি মুখ আমার পানে তাকিয়ে আছে—মরা ছেলে-মেয়েরা এসে আদর করছে—মরা স্বামী এসে আমাকে চুম্বন করছে! এসব ব্যাপারের মানে কি? ভাল না!—সমস্ত অশুভ!...মাথার মধ্যে শব্দ শুনছি—'দুঃখ! দুঃখ!'...নাঃ, এ-শব্দের ইঙ্গিত মানতে হবে"—সহসা গম্ভীর হইয়া জ্যারোবা বলিল—এই যে বাণী ক্রমাগতই বলছে আমার বুকের মধ্যে বলছে 'দুঃখ! দুঃখ!'...একে অবহেলা করা চলবে না। আমি

চললুম...বাতাসের বাণীর সত্যতা যাচাই করতে চললুম,—বাতাসের বুকে যে সব অদৃশ্য রসনা আছে তারা তো মিছে কথা বলে না।"...

ধীরে ধীরে সে কক্ষত্যাগে উদ্যত হইল—এবং ফেরাজ একটা আকস্মিক উত্তেজনাবশে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"দাঁড়াও, জ্যারোবা!"—কিন্তু পরক্ষণেই সে যে বধির তাহা স্মরণ হওয়ায় তাহার গমনে বাধা না দিয়া ফিরিয়া আসিল।

"জাগো ফেরাজ! আজ স্বপ্নের অবসান, আর জীবনের আরম্ভ"—ঘুম ভাঙিতেই সে নিজেও তা ঐ আশ্চর্য্য কথাগুলি শুনিয়াছিল,—কেন? কি অর্থ তার? যদি বাস্তবিকই স্বপ্নের অবসান হয়, তবে সে দুঃখিতই হইবে—আর সাধারণে যাকে জীবন বলে সত্যই যদি তা আরম্ভ হয় তবে তার দুঃখ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ক্ষুব্ধ ও বিহ্বল হইয়া মিথ্যা অমঙ্গল চিন্তাগুলিকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে সে প্রাতরাশের আয়োজনে ব্যাপৃত হইল। এমন সময় উপরের কক্ষ হইতে একটা চীৎকার-শব্দে সমস্ত বাড়ীটা যেন কাঁপিয়া উঠিল এবং হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া উৎকণ্ঠা-স্পন্দিত-হৃদয়ে ফেরাজ সোপান-পথে ধাবমান হইল।

উপরে উঠিতেই সে দেখিল যে জ্যারোবা কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছে,—ভয়ে, হতাশায় ও দারুণ উদ্বেগে সে যেন উন্মাদিনী।

"সিলিথ!"...সে ডুকারিয়া উঠিল......"সিলিথ চলে গেছে···চলে গেছে!.... আর এল র‍্যামি মৃত!"

• • • •

ভীতি-বিকম্পিতা জ্যারোবাকে পাশ কাটাইয়া ও ক্ষিপ্রহস্তে ভেলভেটের পর্দ্দা সরাইয়া ফেরাজ জীবনে এই দ্বিতীয়বার সেই গোপন কক্ষে প্রবেশ করিল। ঐশ্বর্য্য-ঝলমল সুন্দর কক্ষখানির মাঝখানে বারেকের জন্য যেন আকস্মিক পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় তাহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল এবং তাহার দেহের প্রতি ধমনীটী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সত্য!.... সত্যই সিলিথ আর সেখানে নাই! এই বিস্ময়কর ঘটনাটীই তাহার বিহ্বল চিত্তে সর্ব্বপ্রথম ছায়াপাত করিল;—পরক্ষণেই নজরে পড়িল, শূন্য পালঙ্ক-পার্শ্বে বিলুণ্ঠিত তাহার অগ্রজের অসাড় দেহখানি।

যে সাটীন-শয়নে এককাল কুমারী লিলিয়েনের অনিন্দ্যসুন্দর তনুখানি শয়ান ছিল তাহার শুভ্র শূন্যতার দিকে আর একবার চাহিয়া সভীতি-বিস্ময়ে ফেরাজ দেখিল, যেথায় যেথায় পুঞ্জীভূত অবশেষটুকুও সেই ধূলি-সজ্জা হইতে চিনিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া সে আপন মনে তর্ক করিল—'এই ধূলি—এ কি সম্ভব—যে এই ধূলিই লিলিয়েনের শেষ অস্তিত্ব চিহ্ন?...সারারাত্রি না জানি কি ভয়ানক বিয়োগান্ত দৃশ্যই অভিনীত হয়েছে?'.....ক্যারোলা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, এইবার ফেরাজের ইঙ্গিত অনুসারে ভূলুণ্ঠিত এল র‍্যামিকে তুলিবার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল এবং কোনো প্রকারে ভূমি হইতে তাঁহাকে চেয়ারের উপর তুলিয়া সজ্ঞান করিবার যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিল।

ঐ যে, হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে না? হাঁ—বড়ই ক্ষীণ ও অনিয়মিত;—পরক্ষণেই দু'একবার ক্ষীণ দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেই ফেরাজ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"জয় ভগবান! যাই ঘটে থাক্—এখনও আশা আছে—এখনও প্রাণ আছে! একটু সুস্থ হলেই সমস্ত শুন্‌তে পাব।"

দেখিতে দেখিতে এল র‍্যামির আয়ত নেত্র-পল্লব সহসা উন্মীলিত হইয়া কেমন এক প্রকার শূন্যদৃষ্টিতে ফেরাজের দিকে নিবদ্ধ হইল। তাঁহার সর্ব্বশরীর একবার শিহরিয়া উঠিল—ফেরাজ তাঁহার হাতদুটী ধীরে ধীরে আপন হস্তে তুলিয়া লইলে তিনি বিস্মিত-দৃষ্টিতে নিজের হাত দু'খানির দিকে চাহিলেন, এবং সপ্রশ্ন-বিস্ময়ে ঘরখানির চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই সে-দৃষ্টি আবার ফেরাজের মুখে নিবদ্ধ হইল, ওষ্ঠ-দু'খানি একটু কাঁপিল, কিন্তু কিছুই উচ্চারিত হইল না।

"একটু ভাল বোধ হ'চ্ছে কি এল র‍্যামি, ভাই আমার?"—উদ্বিগ্ন-আনন্দের আতিশয্যে প্রায় কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল—"কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না তো?"

কিছুক্ষণ এল র‍্যামি নিরুত্তর; বিহ্বল ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফেরাজকে দেখিতে লাগিলেন—পরে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন সহ যেন কোনো সমস্যা-জটীল ব্যাপারের সূত্র অন্বেষণই করিতে লাগিলেন—তৎপরে কতকটা ক্লান্তির ভাব প্রকাশ করিয়া সৌজন্য-নম্রবচনে বলিলেন—

"আশা করি, আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আপনার নামটা আমার ঠিক মনে নেই। কোথায় যেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু জায়গাটি স্মরণ হচ্ছে না।"

ফেরাজের বুক দমিয়া গেল, অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—কিন্তু আপন আশঙ্কাটুকু প্রকাশ করিতে সে সাহস করিল না; সবলে সমস্ত আবেগ সংযত করিল।

"ফেরাজকে তোমার স্মরণ হচ্ছে না?"—কোমল কণ্ঠে সে বলিল—"তোমার আপন হাতে গড়া ফেরাজ...তোমার ছোট ভাইটি, যার জীবন, আশা, আনন্দ, কর্ম্ম—এ জগতের যা কিছু মূল্যবান—সমস্তই তুমি!"...ফেরাজের কণ্ঠে এইখানে ক্রন্দন ঠেলিয়া আসিল এবং চোখে জল দেখা দিল।

"আপনি খুবই সহৃদয়!"—নম্রকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতাকে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন। আমি যে আপনার কাজে লেগেছি এতে আমি সুখী—খুবই সুখী!"

তিনি থামিলেন;—মাথাটি বুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং চোখ দুটি বুজিয়া আসিল।

"এল র‍্যামি!"...অশ্রুপ্লাবিত গণ্ডে ফেরাজ ডুকারিয়া উঠিল—"ভাই আমার,—আমার জন্যে কি তোমার কোনো ভাবনা নেই?"

এল র‍্যামি মুখ তুলিয়া উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিলেন; পরে একটু হাসিয়া বলিলেন "ভাবনা নেই? না, আপনি ভুল করছেন! আমি অনেক ভেবেছি,—অনেক,—নানা বিষয়ে। আপনার সম্বন্ধে হয় তো নয়,—কারণ আপনাকে আমি চিনি নে। আপনি বলছেন আপনার নাম ফেরাজ,—এটি খুবই আশ্চর্য্য, কারণ এরকম নাম সচরাচর দেখা যায় না! আমি শুধু একজন ফেরাজকে জানতুম,—সে ছিল আমার ভাই, অন্ততঃ কিছু দিন সেই রকমই বোধ হয়েছিল,—কিন্তু শেষে দেখলুম,—চুপ!...একটু এগিয়ে আসুন!"...কানের কাছে মুখ দিয়া এল র‍্যামি চুপি চুপি বলিলেন—"শেষে দেখলুম সে মানুষ নয়, দেবতা—নক্ষত্রলোকের দেবতা। আমার চেয়ে নক্ষত্রেরাই তাকে বেশী চেনে।

ফেরাজ মুখ ফিরাইয়া লইল—তাহার কপোল দুটি জলে ভাসিয়া যাইতেছিল—কথা কহিবার শক্তি ছিল না। নিষ্ঠুর সত্যটুকু বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না—অত্যধিক যন্ত্রণায় ও আবেগের প্রাবল্যে তাহার ভ্রাতার চিত্তযন্ত্র বিগড়াইয়া গিয়াছে, সেই গর্ব্বী, তীক্ষ্ণ, সংযত ও বিদ্রোহী মনীষা বিশৃঙ্খল হইয়া বুঝি বা চিরদিনের জন্যই, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এল র‍্যামি কিন্তু ফেরাজের দুঃখ কিছু কিছু অনুভব করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল, কারণ তিনি কম্পিত হস্তে তাহার মুখখানি ধীরে ধীরে নিজের দিকে ফিরাইয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "অশ্রু? কেন, দুঃখ কিসের? দুঃখ করবার কিছুই নেই। ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

পরে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। পুষ্পাধারটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ফেরাজ এই সময় তাঁহার হাত ধরিবামাত্র ভয়ানক ভয় পাইয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

"সে শপথ করেছে...শপথ করেছে!" অসংলগ্ন অস্বচ্ছকণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন—"বাধা দেবেন না, আমাকে তার আদেশ পালন করতে দিন। 'গোলাপ-পুষ্পাধারের দিকে চাও; ঐখানে আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবো!' এই কথা সে বলেছে, সুতরাং নিশ্চয়ই সে কথা রাখবে। বাধা দেবেন না,—আমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে,—আপনিও আমার সহায় হোন্—বাধা দিলে একদণ্ডও আমি বাঁচবো না।"

"না, না!"—উত্তেজিত ভ্রাতাকে শান্ত করিবার জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় ফেরাজ বলিল—"তোমাকে কেউ বাধা দেবে না—আমি তোমার সহায় হব—আমিও তোমার সঙ্গে প্রতীক্ষা করবো, প্রার্থনা করবো......" এইখানে বেচারী পুনরায় বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল।

"নিশ্চয়!"—আগ্রহভরে এল র‍্যামি বলিলেন—"প্রার্থনা! তুমিও প্রার্থনা করবে—আর, আমিও করবো; সেই ভাল,—তাই আমার দরকার; লোকে বলে, 'প্রার্থনা স্বর্গকে মর্ত্ত্যে টেনে আনে।' আশ্চর্য্য—কিন্তু ভারী সত্য কথা। তুমি জান"—সহসা এল র‍্যামির নয়ন দুটীতে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইল এবং তিনি বলিলেন—"জানো যে লিলিথ এখানে নেই! এখানেও না, ওখানেও না,......সে সর্ব্বত্র!"

একটা মৃত্যু-পাণ্ডুর আভায় তাঁহার মুখখানি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল; এবং ফেরাজ ভয় পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিল। এল র‍্যামি শিহরিয়া উঠিলেন এবং যেন বা কোনো সম্ভাব্য ঘূর্ণিবাত্যার প্রচণ্ডতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই উভয় চক্ষু আবৃত করিয়া ফেরাজের বুকে আশ্রয় লইলেন।

"সর্ব্বত্র!"—তিনি বলিতে লাগিলেন—ফুলের গন্ধে, বৃক্ষের মর্ম্মরে, সাগরের কল্লোলে, নিশার নিস্তব্ধতায়, উষার বিকাশে—সর্ব্বত্রই লিলিথের আত্মা আছে! সুন্দর, অমর, নিষ্ঠুর

নিনিখ! জগতের অণুতে অণুতে, আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সে কখনও সাকার হয়ে ওঠে, কখনও বা বিলীন হয়ে যায়।' সে ইচ্ছা মত উড়ে বেড়ায়, ভেসে ওঠে, ঘুমিয়ে পড়ে; রূপে, সে একখানি মেঘ—বর্ণে, একখানি ইন্দ্রধনু! অশরীর আকৃতিতে সে ভগবৎ-দীপ্তি! সে উর্দ্ধ গতিতে দূরদূরান্তে উড়ে চলে—কুয়াশার মত অনন্ত অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়! আমি—আমি কখনও তাকে খুঁজে পাবো না—জানতে পারব না—কখনও, আর কখনও তাকে দেখতেও পাবো না!"

যে উদাস স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে ফেরাজের হৃদয়খানি কাঁদিয়া উঠিল—তথাপি প্রাণপণে অন্তরের আবেগ চাপিয়া নম্রকণ্ঠে সে ব'লল—"এস, এখানে আর থেকো না এল র‍্যামি, আমার সঙ্গে এস। তুমি দুর্ব্বল, আমার কাঁধে ভর দাও; একটু সবল হবার চেষ্টা কর ভাই,—ভুলে যেও না, অনেক কাজ করবার আছে।"

"ঠিক"—সোৎসাহে এল র‍্যামি বলিলেন—"ঠিক বলেছো, অনেক কাজ করবার আছে। সহিষ্ণুতার মত কিছুই শক্ত নয়—নিঃসঙ্গতা আর সহিষ্ণুতা, বড় শক্ত—কিন্তু চল যাচ্ছি।

সারাদিন ঝিমাইয়া ও মধ্যে মধ্যে তুচ্ছ বিষয়ে কতক সংলগ্ন এবং কতক বা অসংলগ্ন কথা কহিয়া, সন্ধ্যার সময় এল র‍্যামি যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ফেরাজ এই সময় দেখিতে চেষ্টা করিল, সঙ্গীত তদবস্থায় কার্য্যকরী হয় কি না। পিয়ানোর নিকট গিয়া, সে কোমল ও স্বপ্নময় গৎ বাজাইতে লাগিল....কিন্তু বাজাইতে বাজাইতে সে আবিষ্কার করিল, সঙ্গীতকলার কঙ্কালটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও তাহার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিটী অন্তর্হিত হইয়াছে! তাহার চক্ষে জল দেখা দিল,—কি যে হারাইয়াছে তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না,—ভ্রাতার যে পরমাশ্চর্য্য প্রভাব এতকাল তাহার মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া আসিয়াছে তাহাই যখন আজ বিনষ্ট; তখন তাহার কবিত্ব-শক্তিও যে অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনায় সে শিহরিয়া উঠিল। তৎসত্ত্বেই, পরিচিত চাবীগুলির উপর তাহার অঙ্গুলির অভ্যস্ত ক্রীড়া মৃদু-কোমলভাবেই চলিতে লাগিল—বিশেষতঃ, আপন রচনাশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া সে যখন বাউল-সঙ্গীত ধরণের এক প্রকার সুমধুর গীতি নির্ব্বাচন

করিয়া বাজাইতে লাগিল, তখন এল র‍্যামির মুখখানি আনন্দ-উজ্জল হইয়া উঠায় সে আশাতীত সন্তোষ অনুভব করিল।

প্রশান্ত নত নয়নে তিনি বলিলেন--"বড় মিষ্টি এই সুরটা"—এবং পরক্ষণেই চেয়ারে হেলিয়া পড়িলেন। অপরপক্ষে ফেরাজ উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বাজাইয়া চলিল। সত্য, অতি সত্য যে তাহার পক্ষে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়া জীবন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কি করিবে সে? ..জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন কেমন করিয়া চালাইবে? কোথা হইতে ভ্রাতার ও নিজের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিবে? সাইপ্রাসের সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ, যেখানে একদিন সে দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, একেবারেই তাহার মন সেখানে ছুটিয়া গেল— সে স্থানটী নির্জ্জন ও শান্তিময়,—সেখানে প্রবেশ অধিকার পাইবার জন্য সে ভ্রাতৃ-সঙ্ঘকে অনুরোধ করিবে,—যেহেতু লৌকিক জীবন-যাপন তাহার নিকট অপ্রীতিকর এবং তাহার ভ্রাতার বর্ত্তমান অবস্থায় নির্জ্জনতা অত্যাবশ্যক। এইরূপে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যখন সে ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল, ঠিক সেই সময় দ্বারদেশে করাঘাত-শব্দ শ্রুত হওয়ায়, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল এবং নিজের শিরোনামা লেখা একখানি টেলিগ্রাম পাইল। যেখানকার কথা সে ভাবিতেছিল টেলিগ্রামখানি সেই স্থান হইতেই আগত; তাহাতে লেখা আছে:—

"আমরা সবই জানি। ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এল র‍্যামিকে এখানে আনিবে— আমাদের সংঘ-দ্বার তোমাদের উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত।"

কৃতজ্ঞতায় ফেরাজের হৃদয় ভরিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে সে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল—এ কেমন করিয়া সম্ভব যে সেই সুদূরে অবস্থিত ভ্রাতৃসঙ্ঘ "সবই জানে!" বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া সেই শান্ত সমাহিত সন্ন্যাসী-প্রবরের কথা সে ভাবিতে লাগিল যাঁহাকে লোকে অপ্সরাবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া বিশ্বাস করে—এবং সেই সঙ্গে লিলিথের তিরোধান ঘটিবার পূর্ব্বরাত্রে সে নিজে যে অপ্সরা-ঘটিত স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহাও স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় এল র‍্যামি তাঁহার ক্লান্ত নয়ন দুখানি মেলিয়া কনিষ্ঠের দিকে চাহিলেন।

"কি ব্যাপার?" ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গান থেমে গেল কেন?"

ফেরাজ ধীরে ধীরে চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া বিনম্র বচনে জানাইল—"পরে আবার শোনাবো; এখন একটু ঘুমিয়ে সুস্থ হবার চেষ্টা কর,—যেহেতু শিগ্‌গির ই আমাদের দেশভ্রমণে বেরুতে হবে—খুব সুন্দর একটা দূরদেশে—অনেকদূর—"

"স্বর্গে?"—এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ, আমি জানি—সে দেশ অনেক দূর।"

ফেরাজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না, স্বর্গে নয়—অন্ততঃ এখন নয়। সেখানকার পথ আমরা ক্রমে ক্রমে খুঁজে বের করবো। আপাততঃ আমরা এখন কোনো জায়গায় যাব যে জায়গা শস্যভরা ও পুষ্পভরা, যে জায়গা সৌরকরোজ্জ্বল ও স্বাস্থ্য-সুন্দর। সেখানে অনেক বন্ধুবান্ধব আছে যারা তোমাকে দেখ্‌লে সুখী হবে।"

"আমার কোনো বন্ধুই নেই"—ক্ষুণ্ণকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"যদি না তুমি নিজে একজন বন্ধু হও। তুমি বন্ধু কি না জানিনে—বোধ হয় বটে, তবে নিশ্চিত নই। তোমার মুখখানি দেবতাদের মতন, দেবতারা চিরদিনই আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছেন—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি যাবো, তা' সে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও। সে জায়গা কি এই পৃথিবীতে না অন্য কোনো গ্রহে?"

"এই পৃথিবীতেই ভাই"—ফেরাজ উত্তর করিল—"এই জগতেরই এক নির্জ্জন দূর প্রান্তে।"

"ও"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"অন্য জগতে হলেও মন্দ হোত না। এত কোটী কোটী জগত আছে যে একটাতেই খুব বেশীদিন থাকায় বুদ্ধির আর সময়ের অপব্যয় ঘটে বলেই মনে হয়।"

এল র‍্যামির চক্ষুদুটি আবার নিমীলিত হইয়া আসিল এবং ফেরাজ তাঁহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করিতে লাগিল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

সমাপ্ত।

প্রার্থনা।

—:০:—

(১)

বিশ্বমাঝে দাঁড়াতে হবে তোমারি 'পরে করি ভর
শক্তিরূপা, দাও গো মোরে শকতি,
সত্তার মাঝে তোমার তরে না যেন মরি সরমে,
দৈন্য হ'তে দাও গো মোরে মুকতি।
দূরিতে যেন পারি গো সদা লজ্জা তব অসম্মান
বজ্রসম মমতাহীন করে,
সকল মোর কর্ম্ম মাঝে, স্বার্থ সুখ মরণ ভয়,
জাগে না যেন হৃদয়ে ক্ষণ তরে।

(২)

বিশ্রামে আর শান্তি সুখে ভুলিয়া যেন না যাই কভু
দুঃখ তব আমারি হাতে পাওয়া;
সকল মোর কর্ম্ম মাঝে স্মরণে যেন জাগে গো সদা
তোমারি ওই দীপ্ত চোখে চাওয়া।
তোমারি স্নেহ লতার সম জড়ায়ে যেন রহে গো মোর
তর্ক-শুষ্ক হৃদয়-তরু ঘিরি;
বেদনা-ভরা সজল দিঠি রাখিয়ো তুমি অনুক্ষণ—
রাখিয়ো তুমি আমারি মুখ 'পরি।

(৩)

শ্রাবণ রাতে অশ্রু তব বিরাম বাধা হীন—
মর্ম্ম ভোর ভরিয়া যেন উঠে,
শারদ-প্রাতে তাহাই যেন হাস্যরূপে, শক্তিরূপে,
দিগন্তরে ব্যাপ্ত করি ছুটে।
মাধবী রাতে তোমার বীণা জাগিবে যবে সঙ্গীতে,
বাজে গো যেন নিত্য একই সুর—
রাগিণী-ঘাতে চূর্ণ করি সর্ব্ব দৈন্য লজ্জা মোর,
সকল ভয় করিয়া দিয়া দূর।

শ্রীমতী হেমপ্রভা ঘোষ।

চয়ন।

—:০:—

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

চুল পড়া নিবারণ।

ইংলণ্ডের ডাক্তার উডস হাচিনসন বলেন যে, চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়ান অপেক্ষা বুরুস দিয়া চুল আঁচড়াইলে বেশী উপকার হয়। চিরুণী দিয়া চুল কেবল এক স্থানে হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু বুরুস ব্যবহার করিলে মাথার ত্বকে যে ঘর্ষণ পায় ও চুলে যে টান পড়ে তাহাতে চুলের গোড়ায় রক্ত আসে এবং সমস্ত মাথায় রক্ত সঞ্চালন হয়। বয়স যখন কম থাকে তখন হইতে মাথায় বুরুস ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে বেশী বয়সে আর টাক পড়ে না; অবশ্য পূর্ব্বপুরুষের টাক থাকিলে কোন ফল হইবে না। তাহাতেও চল্লিশ জনের মধ্যে একজন মাত্র এইরূপ হয়।

আমাদিগের চুল অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন; ইহা পরিষ্কার রাখা, বুরুস করা, আঁচড়ান, সাবান দিয়া ধোওয়া বেণী বাঁধা এবং চুল লম্বা হইলে তাহা ফুলাইয়া রাখা উচিত, তাহা না হইলে চুল স্বাস্থ্যপূর্ণ ও বর্দ্ধনশীল রাখিতে হইলে অধুনা কালেও ইহার যত্ন করা প্রয়োজন।

এই জন্যই সভ্যতা প্রাপ্ত মহিলাগণ এবং পুরুষ অসভ্যগণ তাহাদের চুল সুন্দরভাবে রাখিতে পারে কিন্তু সভ্যতা প্রাপ্ত পুরুষগণ তাহাদের চুলের যত্ন করে না বলিয়া তাহাদের চুল থাকে না। অসভ্যদিগের মধ্যে পুরুষেরা তাহাদের চুল আঁচড়াইয়া, তৈল দিয়া, বেণী বানাইয়া, চুলে পাখীর পালক গুঁজিয়া ও অলঙ্কার দিয়া এমনভাবে চুল রাখে যাহাতে তাহাদের চুলের প্রসার ও বৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে পুরুষদিগের চুল তথাকার স্ত্রীলোকদিগের চুলের অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও ভাল।

মাথার ত্বকের উপর হইতে প্রায় সিকি ইঞ্চি নীচে টাক পড়ার কারণ বর্ত্তমান থাকে। আমাদিগের চুল অতি আশ্চর্য্য রকম শক্ত এবং ইহার গোড়া ভাল করিয়া আটকান। শিশু-কালে দুই একবার মাথার ত্বকের রোগ হওয়ায় কম বা বেশী করিয়া চুল পড়া রোগ হয়। শিশুদের দাদ, স্থানিক টাক (ইহা সিকির আকার হইতে ক্রমে বড় হইয়া যায়) হয় এবং বয়স বেশী হইলে নানা প্রকার জ্বর এবং সংক্রামক রোগ যথা টাইফয়েড জ্বর হইয়া চুল পড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণ দূষিত রক্ত, সংক্রামক রোগে রক্ত দূষিত হইয়া চুলের গোড়া আক্রমণ করে এবং উহা আলগা হওয়ায় চুল পড়িয়া যায়। শরীর স্বাস্থ্যবান হওয়ার মতন চুলও স্বাস্থ্যপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় ঘন হইয়া নূতন চুল উঠিতে থাকে। মাথার মরামাস বা খুস্কিই সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ রোগ। ইহাই চুলের স্বাস্থ্য এবং বর্দ্ধনশীলতা নষ্ট করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার রোগ বীজাণু চুলে থাকে। আজকাল এইরূপ অবস্থা হইলে বলা হয় যে মস্তকের ত্বক এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থায় নাই যাহাতে এই সকলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে এবং সেই জন্য মরামাস প্রভৃতি হওয়াটাই রোগের কারণ নহে। মরামাসের একমাত্র ঔষধ মাথার চুলে চর্ব্বি দেওয়া এবং সকালে ও রাত্রে ভাল করিয়া বুরুস করা। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতি ভাল্লুকের চর্ব্বি চুলে দেয় বলিয়া তাহাদের মাথায় কখনও টাক পড়ে না এবং তাহাদের চুল অনেক বেশী।

প্রতি লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য এবং কি প্রকার ধাতুবিশিষ্ট তাহার উপর টাক পড়া নির্ভর করে। আপনার পাকস্থলী, যকৃৎ, অথবা মুত্রাশয় ঠিক মত কার্য্য করে না বলিয়া যদি আপনার রক্ত কেবল মাত্র রসায়নিক বিষে পূর্ণ থাকে তাহা হইলে আপনার চুলের গোড়া শক্ত থাকিবে কিসে? কিম্বা যদি আপনি অতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়া ক্লান্ত হন, নিদ্রা যদি কম হয়, অথবা হৃদযন্ত্র যদি দুর্ব্বল হয়, এবং তজ্জন্য শরীরে অবসাদ আনয়নকারী বিষে পূর্ণ হয় তাহা হইলে চুলের কোষ সকল দুর্ব্বল হয় এবং রক্তসঞ্চালন না পাইয়া যদি চুলের গোড়া এই ভারী এবং গুরু অলঙ্কার ফেলিয়া দেয় তাহা হইলে ইহা কি একটা আশ্চর্য্যের বিষয় হয়। সপ্তাহে চারি দিন অন্তর যদি আঙ্গুল দিয়া মস্তকের ত্বক মর্দ্দন করা, ঘষা ত্বকে চাপ দিয়া নাড়া দেওয়া হয় তাহা হইলে চুলের প্রাণ বাঁচান যায়। বুরুস দিয়া ঘসার জন্য চুল পরিষ্কার হয় ও চুলের গোড়ার রক্ত সঞ্চালন হয়, দ্বিতীয়তঃ বুরুস ব্যবহারে চুলের গোড়ায় টান পড়ায়, গোড়ার দুই পাশে যে তৈল ভাণ্ড আছে তাহা হইতে স্বাভাবিক তৈল বাহির হইতে আরম্ভ করে, তৃতীয়তঃ দ্রুত বুরুস ব্যবহারে এবং চাপ দিয়া চুলের মধ্য দিয়া মস্তকের ত্বকে বুরুস করার দরুণ রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়া যায়। ইহা পাম্পের ন্যায় কার্য্য করে এবং ধমনী দিয়া সমস্ত রক্ত শিরার মধ্যে চালনা করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া বুরুস ব্যবহারে চুল ও ত্বকে হাওয়া লাগিতে পারে।

বুরুস পছন্দ করিবার একটী মাত্র উপায় আছে,—ইহা ব্যবহার করিতে আরাম পাওয়া চাই। ইহাতে চুল সহজে বেঁকান যাইবে, মাথা সরু হইবে না এবং ইহা এরূপ শক্ত হইবে যাহাতে চুলের মধ্য দিয়া যাইতে পারে অথচ মাথার ত্বকে যেন বিঁধে না যায়। মাথায় বুরুস করিতে এটা মনে রাখা চাই যে চুল বুরুস করিতে হইবে, মাথার ত্বকে নহে মাথার চুলের মধ্য দিয়া বুরুস ব্যবহারেও তাহার চাপের জন্য মাথায় ত্বকের ঘর্ষণের জন্য অমূল্য উপকার হয়। যে বুরুস ব্যবহার করিবেন তাহা লইয়া আপনার হাতের পিছন দিকে ঘষিয়া দেখিতে হইবে যে উহা ঠিক মত কঠিন কি তাহার কম বা বেশী কারণ কেবল এই উপায়েই বুঝিতে পারা যাইবে যে বুরুস নিজের উপযোগী হইবে কিনা। যখন ঠিক বুরুস পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা প্রত্যহ প্রাতে এবং রাত্রে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট দ্রুত বুরুস করিতে হইবে। জন্তুর লোম যেমন করিয়া বুরুস দিয়া পরিষ্কার করা হয় সেইরূপ করা দরকার। যাঁহারা

ঘোড়া বুরুস করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন আমি কি বলিতেছি। মাথার যে জীবাণু থাকে তাহা বুরুসের মধ্যেও জমে। এই জীবাণু নষ্ট করা প্রয়োজন তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে কার্ব্বলিক সাবান দিয়া মাথা ধুইয়া ফেলা উচিত এবং সেই সঙ্গে কার্ব্বলিক বা লাইসলের জলে বুরুসও ধোওয়া উচিত, তাহা না করিলে বুরুস হইতে পুনরায় জীবাণু মাথায় আসিবে। যে বুরুস ব্যবহার করা যায় তাহা ভাল করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং যে বুরুস নীচের দিকটা ধাতুদ্রব্যে তৈয়ারী তাহাই ভাল কারণ তাহা বেশ করিয়া পরিষ্কার রাখা যায়। এই সঙ্গে পুনরায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ত্বকের তেজ থাকিলে মাথায় চুলে জীবাণু বাস করিতে পারে না এবং কোনও রূপে তাহা আসিলে খাদ্য না পাইয়া আপনি নষ্ট হয়।

প্রথম প্রথম বুরুস ব্যবহার করিতে একটু কষ্ট হইবে কিন্তু শীঘ্রই মাংস শক্ত হইয়া যায় তখন বুরুস করিলে আরাম বোধ হইবে। যদি বুরুস ব্যবহারে মাথার চুল পরিষ্কার রাখা যায় তাহা হইলে তবে মাথার ত্বক আপনি পরিষ্কার থাকিবে এবং চুল বাড়িয়া উঠার সঙ্গে ময়ামাস ও ময়লা মাথার ত্বক হইতে লইয়া উঠিবে। শিশুকাল হইতে প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে বুরুস ব্যবহারের অভ্যাস রাখা উচিত, সপ্তাহে একবার অন্ততঃ পুরুষগণ সাবান দিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিবেন এবং মহিলাগণ অন্ততঃ এক পক্ষে একবার চুল ধুইবেন, দিনের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ চুলে রৌদ্র ও হাওয়া লাগান উচিত এবং এইরূপে করিলে আমরা যতদিন বাঁচিব ততদিন চুল থাকিবে।

অনেকের মাথায় তৈল না দিলেও মাথার ঘামের সহিত স্বাভাবিক তৈলে চুল সিক্ত থাকে তাহা নিবারণ করিতে পারিসের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাবুরো নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

Camphorated spirit	দশভাগ
Tincture of Lauvender	ঐ
Precihitated sulphur	ঐ
Distilled water	সোতর ভাগ

প্রত্যহ রাত্রে তুলি দিয়া মাথায় এই ঔষধ লাগাইতে হইবে এবং পরদিন প্রাতে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। পুরুষগণ প্রত্যহ রাত্রে ইহা ব্যবহার করিবেন এবং মহিলাগণ

সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করিবেন। ইহার পরে ডাঃ সাবুরোর নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতে আর এই রোগ না হইবার সম্ভাবনা।

Tincture of Lavender	কুড়ি ভাগ
Anhydrous Acetone	ত্রিশ ভাগ
Distilled wrter	ঐ
Potassium nitrate	পাঁচ ভাগ
Alcohol (90 p.c.)	তিনশ ভাগ

বেশ শক্ত বুরুস দিয়া ইহা প্রত্যহ মাথায় পুরুষগণ চার মিনিট এবং মহিলাগণ দশ মিনিট ঘষিলে উপকার পাইবেন।

শীত আতপ ও জন্মের হার।

ডাঃ ম্যাগেলসেঁ ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও প্রাণীতত্ত্ববিদ, শীত আতপের জন্য যে জন্মমৃত্যুর হারের কম বৃদ্ধি হয় তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়া জগৎকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইয়ুরোপের লোক দুর্নীতিপরায়ণ বা বিলাসী হওয়ার জন্য জন্মের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ইয়ুরোপের উত্তাপ কমিয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে জন্মের হার কমিয়া যাওয়ায় নীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রবিদ্গণ বিচলিত হইয়াছেন।

যদিও বাটি নির্ম্মাণ ও থাকিবার সুবিধা, উত্তম শিশু-হাসপাতাল প্রভৃতি করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে বৃহৎ পরিবার হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত তথাপি বিজ্ঞানবিদ্গণের মানুষের শরীরের উপর জলবায়ুর প্রভাব বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত যাহাতে সামাজিক অবস্থা দেখিয়া কোন্ সময়ে কি করিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারিবে। উত্তাপের জন্য পরিবর্ত্তনের ফল তৎক্ষণাৎ ঘটিতে পারে যথা সর্দ্দিগর্ম্মি, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কিন্তু সাধারণতঃ উত্তাপের ফল আরও গভীরতর যদিও তাহার ফল কিছু কম নয়। মানুষের গ্রন্থি ও কোষাণু সকলে অতি উত্তাপ ও শীতের জন্য যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় তাহা স্থায়ী এবং তাহার ফল পুরুষ-পরম্পরা ভোগ করে। এই রাসায়নিক

পরিবর্ত্তনের ফলে জন্ম মৃত্যুর হারের পরিবর্ত্তন হয় এবং ইহারই ফলে অনেকে অপুত্রক হয়। কেবল যে শীত ও উত্তাপের ফলে শরীরের মধ্যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে কিন্তু অতিরিক্ত বারিপাত, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা তেমনি পরিবর্ত্তন হয়।

নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে শরীরের উপর বহুদিন ধরিয়া উত্তাপের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করা যায়। গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে স্থানীয় সাধারণ উত্তাপ অপেক্ষা কখন উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে জন্মের সংখ্যা বাড়ে এবং শীত বেশী হইলে জন্মের হার কমে। প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনা সহরে কখন কি উত্তাপ হইয়াছে এবং সেই সময়ে জন্মের হার কি ছিল তাহার বিবরণ আছে। তাহা দ্বারা প্রকাশ পায় যে গ্রীষ্মকালে বেশী গরম হইলে জন্মের হার বাড়ে। ফ্রান্সে যুদ্ধের জন্য লোক সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বেশী শীত হওয়ায় জন্মের সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু আজকাল যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে গত বৎসর হইতে বেশী উত্তাপ হওয়ায় জন্মের হার বাড়িতেছে।

উত্তম দন্ত।

উত্তম দন্ত, বিশেষতঃ শিশুদের অনেক পরিমাণে কিরূপ জল পান করা যায় তাহার উপর নির্ভর করে। যে সকল যায়গায় জলে অনেক পরিমাণ খনিজদ্রব্য মিশ্রিত আছে অর্থাৎ যে দেশের জলে অধিক পরিমাণে চুণ আছে সে স্থানের লোকের দন্তরোগ অনেক কম। দন্ত তৈয়ারীতে চুণের দরকার হয়। দন্ত খারাপ থাকিলে স্বাস্থ্যহানি হয় সেই জন্য পাশ্চত্য দেশে স্কুল সমূহের বালকদিগের দন্তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। যে সকল শিশুর শরীর ক্ষীণ তাহাদিগের সাধারণতঃ দন্ত খারাপ হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে খারাপ দন্ত থাকার জন্য দৃষ্টি দোষ ঘটিয়াছে।

যে জল পান করা যায় তাহা যেরূপ হয় তাহার উপর দন্ত ভাল বা মন্দ থাকা নির্ভর করে এই মত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে দেশের জলে চুণ বেশী তথাকার শিশু বা বালক বালিকাগণের মধ্যে মৃত্যুর হার কম, ইহা কেবল মাত্র ভাল দন্ত থাকার জন্য হইয়াছে কারণ তাহাতে তাহারা ভাল করিয়া চিবাইতে পারে। জলে চুণের ও খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ

যতই বেশী, দন্ত ততই ভাল থাকে এবং স্বাস্থ্যও তৎসঙ্গে ভাল থাকে। যে স্থানের জলে চুণ নাই তথাকার শিশুদিগকে চুণের জল পান করিতে দেওয়া উচিত। শিশুদিগের দুগ্ধের সহিত বাঙলা দেশে সাধারণতঃ চুণের জল মিশান হয় এবং তাহাতে শিশুদিগের খুবই উপকার হয়।

স্বাস্থ্যের কথা।

স্বাস্থ্যের কয়েকটি সোজা নিয়ম।

আহার—

১। ক্ষুধা বুঝিয়া আহার করিবে। ক্ষুধা না পাইলে জোর করিয়া খাইবে না। ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে খাওয়া বন্ধ করিবে। যখন ক্ষুধা না পায় তখন কিম্বা ক্ষুধা নিবৃত্তির পর, লোভে পড়িয়া, কিম্বা কাহারও উপরোধে পড়িয়া অথবা অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অনিচ্ছার সহিত যাহা কিছু খাইবে, তাহা হজম হইবে না। সে খাদ্য খাওয়া না-খাওয়া সমান। তাহাতে শরীরের কোন উপকার হয় না; বরং অধিকাংশ স্থলেই অনিষ্ট হইয়া থাকে।

২। খাদ্য দ্রব্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। ঈশ্বর মুখের ভিতর যে ৩২টি দন্ত দিয়াছেন, তাহা খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া খাইবার জন্য; উহা কেবল অনাবশ্যক শোভার জন্য নহে। জীবের পাকস্থলী একটী প্রকাণ্ড রসায়ন-বিজ্ঞানাগার। এখানে খাদ্য দ্রব্য রাসায়নিক প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরে শোষিত হইয়া রক্ত, অস্থি, মেদ, মজ্জা, মাংসে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণের ফলে যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়, পরিপাক ক্রিয়াও তত সহজে হইয়া আসে। কঠিন খাদ্য বিনা চর্ব্বণে উদরস্থ করিলে, পাচক-রস তাহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। খাদ্য দ্রব্য যতক্ষণ মুখের ভিতর থাকে, ততক্ষণই কেবল তাহা চর্ব্বণ করিবার সুযোগ থাকে। উদরস্থ হইবার পর সে সুযোগ থাকে না; কারণ, পাকস্থলীতে দন্ত বা দন্তের ন্যায় খাদ্য দ্রব্য পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিবার উপযোগী কোন পেষণ যন্ত্র নাই। খাদ্য দ্রব্য ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে খাদ্যের পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায়; মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল হওয়াতে পরিপাক ক্রিয়ার বিলক্ষণ সাহায্য হইয়া থাকে।

৩। গুরু ভোজন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পাচক রসের পরিমাণ এবং শক্তি অসীম নহে। পাচক রস যে পরিমাণ খাদ্য জীর্ণ করিতে পারিবে, তাহাই কেবল শরীরের মধ্যে শোষিত হইতে পারিবে। বাকী অংশটা অজীর্ণ থাকিয়া কেবল ক্লেশ দিয়া অবশেষে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া যায়।

৪। যাহা সহ্য হইবে, এবং যে খাদ্যে রুচি হইবে, তাহাই খাইবে। ইহার অন্যথা করিলে যে কি ফল হয়, তাহা সকলকেই সময়ে সময়ে অনুভব করিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও লোভ সংবরণ করিতে অভ্যাস করা উচিত।

৫। দুইবার পূর্ণ আহারের মাঝখানে যদি জলখাবার খাইতে হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ফলমূল হইলেই খুব ভাল হয়।

৬। যখন শরীর ক্লান্ত থাকিবে, কিম্বা যখন তুমি ক্রুদ্ধ থাকিবে, তখন কিছুই খাইও না। সে সময় যাহা কিছু খাইবে, তাহাই শরীরে বিষবৎ কার্য্য করিবে।

৭। বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত আহার করিবে। খাদ্য এবং আহার ক্রিয়া দুইই যেন আনন্দ-দায়ক হয়। ইহার ফল অতি চমৎকার এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপকারী।

৮। পিঠা পরমান্ন এবং মিষ্টান্ন অল্প পরিমাণে খাইবে। কেবল মিষ্টতার লোভে অধিক মিষ্টান্ন খাওয়া উচিত নয়। খাদ্য অধিক মিষ্ট হইলেই তাহা বেশী পুষ্টিকর হয় না।

৯। খাইবার সময়ে বরফ দেওয়া জল পান করিও না। বরফ জল পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়।

নিদ্রা—

১। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক।

২। পুরাতন একটী প্রবচন আছে যে, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে এক ঘণ্টার নিদ্রা মধ্যরাত্রির পরবর্ত্তী দুই ঘণ্টার নিদ্রার সমান। এই প্রবচনটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিদ্রা যাইবার সময় এই প্রবচনটি স্মরণ রাখিবে।

৩। যে ঘরে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালন হয়, শয়ন করিবার পক্ষে সেই ঘরই প্রশস্ত।

৪। ধনী লোকেরা পক্ষীর নরম পালক-নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করেন। পালকের শয্যা খুব দামী, ধনগর্ব্বের পরিচায়ক, এবং খুব আরামদায়ক হইতে পারে; কিন্তু তাহা একটুও স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়; বরং প্রতিকূলই বলা যায়।

৫। যাঁহাদের সুনিদ্রা হয় না, কিম্বা সহজে ঘুম আসে না, তাঁহারা যদি রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে এক মাইল অন্ততঃ, অর্দ্ধ মাইলও, ভ্রমণ করিয়া আসেন, তাহা হইলে সুনিদ্রার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

৬। চিৎ হইয়া শয়ন করিবে না; পাশ ফিরিয়া শুইবে।

স্নান—

১। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে একখানি ভাল সাবান মাখিলে গাত্রের সমস্ত ময়লা দূর হয়, এবং রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা হয়।

২। প্রত্যহই আহারের পূর্ব্বে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিয়া, শীতল জলে ধারা-স্নান করিবে। সঙ্গে সঙ্গে একখানি হনিকোম্ব বা তোয়ালে বা খস্‌খসে গামছার দ্বারা গা উত্তমরূপে রগড়াইয়া ফেলিবে। গাত্র মর্দ্দনের ফলে গায়ের ময়লা, অতিরিক্ত তৈল প্রভৃতি ত উঠিয়া যায়ই; অধিকন্তু ইহার দ্বারা চর্ম্ম সতেজ হয়, রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া দ্রুত হয়। সুতরাং স্নান-কালে গাত্র মার্জ্জনা বলকারক ঔষধের (টনিকের) কাজ করে। যাঁহারা স্নানের পরই শীতবোধ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ধারা-স্নান প্রশস্ত নহে।

৩। স্নানের অব্যবহিত পরে, গা মুছিয়া কাপড় না ছাড়িয়া, হঠাৎ কোন ঠাণ্ডা ঘরে যাওয়া, কিম্বা যে ঘরে থাকিবে সে ঘরের জানালা-দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতে দেওয়া উচিত নয়। স্নানের পর গায়ে একটা জামা দিলে ভাল হয়।

৪। রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ জলে গামছা বা তোয়ালে ভিজাইয়া গা একবার মুছিয়া ফেলিতে পারিতে সুনিদ্রার সহায়তা হয়।

দন্ত—

১। প্রত্যেকবার আহারের পর দাঁত মাজিয়া ফেলা উচিত। কেবল কুলকুচা করিয়া মুখ ধোওয়া নয়, দাঁত রীতিমত মাজা কর্ত্তব্য; যেন দাঁতের গায়ে, কিম্বা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে

খাদ্যকণা লাগিয়া না থাকে। আর প্রত্যহ নিদ্রা ভঙ্গের পর এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার করিয়া দাঁত উত্তমরূপে মাজিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

২। দাঁত মাজিবার জন্য কোন একটা ভাল রকম দন্তমঞ্জন ব্যবহার করা উচিত।

৩। দাঁত মাজিবার জন্য দন্তমঞ্জনের সঙ্গে চিয়াড়ী, দাঁতন, টুথ ব্রাস, কিম্বা ডেণ্টাল ফ্লস বা ফ্লানেলের মত দাঁত মাজিবার এক প্রকার বস্ত্র খণ্ড ব্যবহার করিলে, দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণা দূর হইয়া যায়। চেয়াড়ী বা দাঁতন ব্যবহার করিতে হইলে, দাঁতের মাড়ীর যাহাতে ক্ষতি না হয়, সে পক্ষে সাবধান হইতে হইবে। ডেণ্টাল ফ্লস প্রায় সকল বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

৪। শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় দন্তেরও ব্যায়াম আবশ্যক। কঠিন খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া খাইলে দাঁতের বেশ ব্যায়ামের কাজ হয়।

৫। দাঁতের মাড়ী আঙ্গুল দিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিলে সেখানে খাদ্যকণা লাগিয়া থাকিতে পারে না, মাড়ীর কোন ক্ষতিও হয় না।

৬। বিশেষ প্রয়োজন না বুঝিলে দাঁত তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। দাঁত তোলাইবার প্রয়োজন বুঝিলে আগে অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে, এবং উপযুক্ত ডাক্তারের দ্বারাই দাঁত তোলাইতে হইবে।

সাধারণ—

১। প্রত্যহ নির্দ্ধারিত সময়ে নিয়মিত ভাবে এমন ব্যায়াম করা উচিত, যাহাতে চামড়ার ঠিক নীচে পর্য্যন্ত রক্ত সঞ্চালন হয়। ব্যায়াম প্রণালী সুনির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে শরীরের সকল অংশে সমান ভাবে রক্ত সঞ্চালন হয়।

২। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ও নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ উত্তমরূপে সাফ হওয়া কর্ত্তব্য।

৩। কাফি, চা ও মাদক দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যহ, প্রতি মুহূর্ত্তে, যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ বায়ু, যত বেশী পরিমাণে সম্ভব, সেবন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

৪। প্রত্যহ, হাসি-মুখে শয্যা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে; তাহা হইলে সমস্ত দিনই হাসি-মুখে কাটাইতে পারিবে। মনের প্রসন্নতার তুল্য স্বাস্থ্যকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

৫। কখনও বিরক্ত হইও না। বিরক্তির কারণ ঘটিলেও নিজেকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিবে।

স্বাস্থ্য-সমাচার।

কৃষি-কথা

—:•:—

পাল্‌টা পাল্‌টী চাষ।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন উর্ব্বরা ভূমিতে প্রথম বৎসর যেরূপ শস্য উৎপন্ন হয়, তৎপর বৎসর অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর তাহা অপেক্ষা পরিমাণে কম হয়, এবং ক্রমাগত একই ফশলের চাষ করিলে উত্তরোত্তর ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইয়া যায়। এইরূপে বহু বৎসর অতীত হইলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া থাকে। সকল ফশলের খাদ্য একরূপ নহে, শ্রেণীভেদে খাদ্যেরও ভেদ হয়, এক জমীতে একই ফশলের ক্রমিক চাষ করিলে যে খাদ্য সেই ফশলের বিশেষ আবশ্যক, জমী হইতে সেই খাদ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী ধাতব ও বাষ্পীয় প্রভৃতি বহু পদার্থই সঞ্চিত থাকে। জল বায়ু ও উত্তাপ সংযোগে উক্ত পদার্থগুলিতে রাসায়নিক ক্রিয়া আরব্ধ হয়, এবং এই কার্য্যের ফলেই সঞ্চিত খাদ্য বিগলিত হইয়া, রসের সহিত উদ্ভিদ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। সঞ্চিত খাদ্য বিগলিত হইলে তাহা হইতে শিকড়গুলি আপনার খাদ্যদ্রব্য শোষণ করিয়া লয়, অন্যান্য দ্রব্যগুলি মৃত্তিকাতেই থাকিয়া যায়। ক্রমাগত একই খাদ্য শোষণ করাতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। ফলে অপর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও সে ফশল আর হয় না। কিন্তু সেই জমীতে অন্যান্য শস্যের চাষ করিলে, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, এ জন্য একই জমীতে প্রতি বৎসর এক জাতীয় শস্যের চাষ না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এইরূপে এক ফশলের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার শস্য রোপণ করাকেই পাল্‌টা-পাল্‌টী চাষ বলে।

পাল্‌টা-পাল্‌টী চাষে ভূমির উর্ব্বরতা সহজে নষ্ট হইতে পারে না। অধিকন্তু বহু প্রকার ফল লাভ হয়। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) ধান্য, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি এক জাতীয় ফশল এবং মটর, মসুর, মুগ, অরহর প্রভৃতি অন্য জাতীয়, প্রথমোক্ত ফশলগুলিকে অন্ন জাতীয় ও শেষোক্তগুলিকে দাইল জাতীয় বলা যায়। দাইল জাতীয় ফশলগুলি বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজান বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আপন দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে। এ ক্ষমতা অন্ন জাতীয় ফশলের নাই, অথচ ইহাদেরও পুষ্টির জন্য নাইট্রোজান বিশেষ আবশ্যক, এইজন্যই ধান্য গম প্রভৃতি বপন করিবার পূর্ব্বে দাইল জাতীয় শুঁঠাধারা ফশলের চাষ করিয়া লইতে পারিলে যথেষ্ট সুফল লাভ করা যায়। দাইল জাতীয় ফশলের চাষ করিলে মৃত্তিকায় যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজান সঞ্চিত হয়, তৎপর ধান্যাদির চাষ করিলে সুফল লাভ সুনিশ্চিত। বিশেষতঃ ইহাতে মৃত্তিকার পূর্ব্ব-সঞ্চিত নাইট্রোজানের অভাব হয় না, ভূমির খাদ্য ভূমিতেই সঞ্চিত থাকে। অথচ পর্য্যায় রোপণের ফলে সুফল লাভেও বঞ্চিত হইতে হয় না।

(২) প্রতি বৎসর একই জমীতে এক প্রকার ফশলের চাষ করিলে সেই ফশলের বিঘ্নকর নানা প্রকার কীটের উপদ্রব বড়ই বৃদ্ধি পায়। যে-জাতীয় পোকা যে শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সেই জাতীয় শস্যেই তাহারা বাস করে, এবং ঐ শস্য ভক্ষণ করিয়াই উহারা জীবন ধারণ করে। শস্য উঠিয়া গেলেও তাহাদের বংশধরগণ জমীতেই থাকিয়া যায়, শস্য একটু বড় হইলেই তাহারা আবার কার্য্যারম্ভ করে। ইহাদের হস্ত হইতে শস্য রক্ষা করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু অন্য কোন শস্য রোপণ করিলে কীটগুলির খাদ্যের অভাব উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া যায়। পাল্‌টা-পাল্‌টি চাষ করিলে, এই ভাবে কীটের হস্ত হইতে শস্য রক্ষিত হইয়া থাকে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এক জমীতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর বেগুন করিয়াছিলাম, প্রথম বৎসরে খুব সামান্য পোকার উপদ্রব হইল, দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিগুণাপেক্ষাও বেশী হইল। তৃতীয় বৎসরে এতদূর উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল যে গাছগুলি কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলাম না। তৎপরে অন্য জমীতে চাষ করিয়া বেশ সুফল পাইতেছি।

(৩) প্রতি বৎসর এক জমীতে একই ফশলের আবাদ করিলে কেবল যে কীটেরই উপদ্রব বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, উহাতে নানা প্রকার জঙ্গল আগাছাদি জন্মিয়াও শস্যের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। আশু ধান্যের জমীতে ঘাসের উপদ্রব খুবই হয়, সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া তুলিতে ব্যয় ও পরিশ্রম আবশ্যক। কৃষকেরা যথোপযুক্ত ঘাস বাছিয়া ফেলিতে পারে না বলিয়াই আশানুরূপ শস্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ঘাসের উপদ্রব বেশী হইলে মোটেই শস্য জন্মে না, পাল্‌টা-পাল্‌টী চাষ ভিন্ন ঘাসের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করিবার অন্য কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। ধান্যের জমীতে শণ, পাট ইত্যাদি ঘন সন্নিবেশ বিশিষ্ট ফশল অথবা মূলা, গাজর, সালগমাদি মূলপ্রধান ফশলের চাষ করিলে আগাছা বাড়িতে পারে না। ধান্যের খাদ্য খাইয়া যাহারা জীবন ধারণ করিতে পারে, পাটের খাদ্য তাহাদের পোষণোপযোগী নহে, সুতরাং খাদ্যাভাবে অথবা যথোপযুক্ত পরিমাণে আলো, বাতাস ও উত্তাপের অভাবেই আগাছাগুলি বাড়িতে পারে না, কাজেই মরিয়া যায়। মৃত আগাছাগুলি মৃত্তিকায় পচিয়া গলিয়া যে খাদ্যসংগ্রহ করিয়াছিল তাহা মৃত্তিকাতেই ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া যায়। এবং অন্য ফশলের আবাদ করিলে তাহা উহার সাররূপে প্রদান করে, অধিকন্তু ফশলও ভাল হয়।

(৪) কোন কোন শস্যের শিকড় ভূপৃষ্ঠের দিকে অধিক নিম্নদেশে প্রসারিত হয় না। এই সকল শস্য মৃত্তিকার নিম্নস্তরের খাদ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, পক্ষান্তরে যে সকল শস্যের শিকড় মৃত্তিকার বেশী নিম্নভাগে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে পারে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়। পাল্‌টা চাষে উক্ত উভয় প্রকার শস্য রোপণ দ্বারা মৃত্তিকায় বহু দিন পর্য্যন্ত খাদ্যাভাব হয় না। ও শস্যক্ষেত্রও ক্রমশঃ অনুর্ব্বরা হইতে পারে না।

(৫) পাল্‌টা চাষের ফলে শস্যের এক প্রকার খাদ্য একেবারে নিঃশেষ হইতে পারে না, যে জাতীয় শস্যের প্রধান খাদ্য পটাশ, ক্রমাগত ২।৩ বৎসর সেই শস্যের আবাদ করিলে মৃত্তিকায় পটাশের অভাব হয়, কিন্তু পাল্‌টা চাষে যে বৎসর পটাশ ব্যয়িত হইয়া গেল, তৎপর বৎসর সোরাজানই ব্যয় হইবে সুতরাং মৃত্তিকার পটাশ বহু পরিমাণেই মৃত্তিকায় সঞ্চিত

থাকিয়া গেল। কৃষকের অভিজ্ঞতানুযায়ী এই প্রকার চাষ আবাদ করিলে কখনই সুফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না।

"সম্মিলনী।" শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

রাঙ্গা ও ভাঙ্গা।

রাঙ্গা হয়েই আদিম রবি উঠলো প্রথম প্রভাতে
নূতন ধরার জন্মকথা লুকিয়ে ছিল শোভাতে।
রাঙ্গা চেলীর গৌরবেতে ছালনাতলা আলো যে,
রাঙ্গা মুখের রুচি চুমায় ভুবন ভুলে গেল যে।
সীমন্তেরি সিঁদূর রাঙ্গা, দোল যে রাঙ্গা আবীরে
সবার চেয়ে অধিক জবর রক্ত রাঙ্গার দাবী রে।
রাঙ্গাজবা রক্তকমল খুঁজছে শ্যামার দেশবাসী
সাধু সারাজীবন শুধু রাঙ্গাচরণপিয়াসী।
ভাঙ্গা তুষার ভেদ করিয়া গঙ্গা নামেন ভূলোকে,
ছুটে চলেন সাগর পানে ভাঙ্গা গড়ার পুলকে।
ভাঙ্গা দেউল সম্রাটেরও নামেই লেপে কালিমা
ভাঙ্গা ডালিম দেখায় তাহার রাঙ্গা বুকের লালিমা
রাঙ্গা ভাঙ্গায় মেশা-মেশি অশ্রু এবং হাসিতে,
মিলন এবং বিচ্ছেদেতে অসি এবং বাঁশীতে।
রাঙ্গা বুকের উপর দিয়ে চলছে ধরা গড়িয়ে,
ভাঙ্গা বুকের ভিতর দিয়ে আসেন কেবল হরি হে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অবাক্।

(১)

ব্যারিষ্টার সাহেবদের বাড়ীর স্কুল-কলেজ-ফেরৎ ছেলেরা সেই মাত্র জল খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। আফিস আদালত ফেরতা'রা তখনও বাড়ী পেঁছান নাই, সুতরাং অন্তঃপুরের দিকটায় তখন বেশ বৈকালিক-নিশ্চিন্ততা বিরাজ করিতেছিল।

ত্রিতলের হল ঘরের মধ্যে দাঁড়া-আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া, ব্যারিষ্টার সাহেবের ভাইঝি সোফিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া, ব্যারিষ্টার-কন্যা বেগম অর্গান বাজাইতেছিল। দুজনেই সমবয়সী, ঠিক নয়। বেগমের বয়স,—বছর আঠারো উনিশের মধ্যেই আপাততঃ আছে। সোফিয়া তদপেক্ষা দুচার বছরের বড়।

চুলের উপর চিরুণী চালাইতে চালাইতে সোফিয়া বলিল "বুঝ্‌লি বেগম, তুই আর সত্যিকার কচি খুকিটি নেই—"

বাজনার উপর দ্রুতবেগে আঙুল চালাইতে চালাইতে বেগম সেইদিকে চোখ রাখিয়া হাসিমুখে উত্তর দিল "সেটা তো তোমার দিকে চাইলে বেশই বুঝ্‌তে পারি,—তারপর?

সোফিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল 'আর ভাল দেখায় না, এবার বিয়েটা কর।.

হাসি সামলাইবার জন্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, বেগম খুব গম্ভীর হইয়া বলিল "তোমাদের পাঁচজনের বিয়ের পরিণাম-ফল দেখে আমার চোখ এখন জুড়িয়ে গেছে, আর তোমাদের ছেলেপিলেগুলির চাৎকারের কল্যাণে আমার কানে এমন 'তালা' ধরে গেছে যে,—দোহাই সোফি, সত্যি বলছি, ও সব দিকে চোখ কাণ দেবার শক্তি এখন আমার মোটেই নাই! কিন্তু, ঐ যাঃ! বাজ্‌না ভুল করে যাচ্ছে, একটু থামো ভাই—একটু সবুর আপাততঃ—,"

চোখ বুজিয়া, ঘাড় দুলাইয়া সে তন্ময়ভাবে বাজ্‌নার উপর দুহাতের অঙুলগুলি খেলাইতে লাগিল। সোফিয়া খানিকটা চুপ করিয়া বাজনা শুনিয়া, সহসা বলিয়া উঠিল 'সত্যি বেগম, তোর হাত বড় মিঠা?—ওটা কি গান রে?"

বেগম চোখ বুজিয়া, বাজাইতে বাজাইতে উত্তর দিল "একটা খুব উঁচু ভাবের গান।"—কথাটা বলিয়াই হঠাৎ সে হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া বলিল "আচ্ছা ভাই সোফি, আমি খুব আধ্যাত্মিক-প্যাটার্ণের হয়ে পড়েছি, না ?"

সোফিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল "উঃ! বেজায় বিকট! একেবারে অসহ্য মারাত্মক রকমের!—"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বেগম বলিল "দেখ্‌ছ তো ভাই,—আমার আশাভরসা আর বাধা দিচ্ছে ?"

"হাঁ হাঁ, সবুর! বিয়ের জোয়াল কাঁধে পড়্‌লে, ও-আধ্যাত্মিকতা তিনদিনে ছিব্‌ড়ে যাবে !"

"সত্যি না কি ?—শুন্‌লেও যে ভয় হয় !"

"থাম না, ফাজ্‌লামো করিস্ কেন ? কি বল্‌ব ! আমি যে আধ্যাত্মিক হবার সময় পেলুম না ! অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে পড়লুম,—না হলে দেখ্‌তিস্, আমি আবার এমন চমৎকার প্যাটার্ণের আধ্যাত্মিক হতুম, যে তার জলুস, তোদের চোখ ঝল্‌সে কপালে উঠে যেত !"

"বল কি ! বল কি ! শুনে যে আমার আহ্লাদে হার্টফেল কর্‌বার যোগাড় হচ্ছে !—" বেগম মুক্ত-উচ্ছ্বাসে খুব জোরে, বেজায় হাসিতে সুরু দিল।

"দ্যাখ্, তুই বিটকেল্ রকমের ফিলজফার্ হয়ে পড়েছিস্ !"

"এই নাও ! এত জোরে হাস্‌ছি, তবু বল্‌বে ফিলজফি ! নাঃ, দুনীয়াশুদ্ধ মানুষগুলোকে বিয়ে করবার জন্যে পরামর্শ দিতে দিতে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল দেখ্‌ছি ! দ্যাখো বাপু, ছেলেগুলোকে মানুষ কর্‌তে হবে, মা হওয়া অম্নি নয়,—একটু সম্‌ঝে চলো। অমন যা তা অবিবেচনার হাতে নিজেকে যথেচ্ছভাবে ছেড়ে দিয়ে বোসো না, ছেলেগুলোও তোমার বুদ্ধি পাবে !"

"উঃ ! গোষ্টিশুদ্ধ সকল ছেলের মা'দের ওপর তো খুব তম্বি জানিয়ে বেড়াচ্ছিস, কিন্তু—"

"রোসো, রোসো, গানটা হতে দাও,—" বাজনার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উচ্চে সুর তুলিয়া সে গান সুরু করিল—

"সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত গান !
যখনি গাহিতে চাই, কেবলি থামিয়া যাই
ক্ষোভে মন হয় ম্রিয়মান !
জীবনের জটিলতা, অসুন্দর আবিলতা
সহে না যে বুকে দেয়া স্থান !
শান্ত করুণামাখা, উছলিত-স্নেহ ঢাকা
আমি চাই, সুন্দর প্রাণ !
সে প্রাণে সহজ হয়ে যেতে চাই গান গেয়ে
তব সুরে ঢেলে সুর তান !"

সোফিয়া মুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া, একমনে গান শুনিল। তারপর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দ্যাখ বেগম, তোদের ঐ হেঁয়ালীওলা গানগুলোর মানে আমি বুঝ্‌তে পারিনে বটে, কিন্তু ওগুলোর সুর আমায় বেশ ভাল লাগে। গানটা তৈরী করেছে কে রে ?"

"স্রষ্টার খোঁজে দরকার কি ভাই ? তাকে আড়ালে নিরুপদ্রবে থাক্‌তে দাও; দেখছ তো দুনীয়াখানার চেহারা ! দুনীয়ার স্রষ্টার চিরদিন আড়ালে রয়ে গেলেন, অথচ তাঁর সৃষ্টিটা মানুষের সামনে বহু বৈচিত্রে ক্রম-বিকশিত হয়ে উঠছে,—আপনা থেকেই,—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে সোফিয়া বলিল "দ্যাখ বেগম, থাম্‌ বল্‌ছি। ফের যদি কথায় কথায় ফিলজফিক্যাল্ টুস্ আমদানী কর্‌বি, তবে তোর মাথা ঠুকে ভেঙে দেব !"

হাসিমুখে বেগম বলিল "দ্যাখো ভাই, আমার মাথার খুলির হাড়টা ভয়ানক শক্ত; যত জোরেই তোমরা ওর উপর ঠোকাঠুকির অত্যাচার চালাও, মগজ থেঁতো হবার নয় আমার ! দেখ্‌লে তো, কাল জানালা বন্ধ কর্‌তে গিয়ে তোমাদের সামনেই কত জোরে মাথা ঠুকে গেল, তোমরা সবাই, আহা আহা করে চেঁচিয়ে মেচিয়ে হুতোশে মর্‌বার যোগাড় হলে, আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দে মাথায় একবার হাত বুলিয়েই গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালুম !

"তুই হচ্ছিস্ আস্ত পাষণ্ড ক্লাশের লোক! নিজের ওপর কি তোদের দয়ামায়া আছে, তাই দুঃখদরদ বুঝবি?—তুই চিরদিনই এক অদ্ভুত সাইজের হয়ে রইলি।"

কি করব বল? নাচার হয়ে অগত্যা স্বীকার করতে হচ্ছে, ওইটেই আমার নসীবের ফল! কিন্তু দ্যাখো বাপু, তোদের সব ক'টীকে যোড়হাত করে বলে রাখছি, ছেলেদের মা যখন হয়েছ, তখন ছেলে মানুষ করার ব্যাপারটা যেন বিগড়ে-শিগড়ে সুসম্পন্ন করো না; ছেলেগুলি যাতে ছেলেবেলা থেকে সোজাসোজি মানুষ হবার পথ পায়, তোমরা 'মা-বাবা'র দল সেই দিকটায় দয়ার দৃষ্টি রেখো! একটু বুঝেসুঝে চলতে শেখো।"

আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিয়া সোফিয়া বলিল "আমি অত পারিনে, যাঃ! বলে আমকেই কে 'মানুষ' করে, তার ঠিক নেই,—"

"সত্যি! তোদের ঘোরতর-নাবালকত্ব ঘুচতে না ঘুচতেই তোদের হাতে ছেলে মানুষ করবার ভার দেওয়াই যে কতবড় অবিচারের কাজ হচ্ছে সেটা তোদের হাতে মানুষ করা ছেলেদের বুদ্ধিকে যখনি ঠুকে বাজিয়ে দিতে যাই তখনি বুঝতে পারি! সত্যি সোফি তোরা তো উচ্ছন্নে গেছিস, তোদের জন্যে দুঃখ করা না হক্ লোকসান! কিন্তু তোদের ছেলেদের লোকসানের কথা ভেবে ভেবে, আমার সত্যিই দুঃখ হয়।—"

"তাই বুঝি নিজে বিয়ে-থা' না করে, একেবারে খিজি-পীর হবার মতলবে আছিস্?"

"খিজি হবার মতলবও নাই, পীর হবার ফরভিসন্ধিও নাই। তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে আপাততঃ একটু ফুরসুৎ পেলে—নিজেকে মানুষ করে গড়ে তুলে বাঁচি! দোহাই সোফি, আমার মত দীনদরিদ্রের ওপর এতটা বিষাক্ত কড়া দৃষ্টি তোরা হানিস নে ভাই! ওতে আমার আত্মাটা শুকিয়ে দম্ আটকে মরবার যো হয়েছে!—"

চুল বাঁধা শেষ করিয়া তোয়ালেতে ঘাড়মুখ রগড়াইয়া পরিষ্কার করিতে করিতে সোফিয়া ফিরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। চুপ করিয়া কি একটু ভাবিয়া সহসা ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিল "তোদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি! সাধে পুরুষেরা মেয়েদের লেখাপড়ার উপর চটেন্—এই সব অতি সৌখিন্ 'রকম-সকমের' জন্যেই তাঁদের পিত্তি জ্বলে যায়!—"

ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল "পুরুষেরা, অর্থাৎ ? তোমার এম-এ, বি-এল-টি তো ? সেই জন্যেই তো তাঁর দৃষ্টি-পীড়া উৎপাদনের ভয়ে তাঁর সাম্‌নে বেরুই না! তাতেও তিনি আমার ওপর চটেন ?—"

উত্তেজিত হইয়া সোফিয়া বলিল "কেন চট্‌বেন না ? খুব কর্‌বেন চট্‌বেন একশোবার চট্‌বেন্ ! 'থাকে ধাঁড়া উৎরে যাবে' সত্যি কথাই বলছি,—চাচাজী তোকে কলেজে পড়্‌বার স্বাধীনতা দিয়ে ভয়ানক অন্যায় করেছেন ! তোর বড় স্বাধীনতা বেড়ে গেছে তাইতো সবাই তোর সম্বন্ধে বলে যে—

বাধা দিয়া হাসিমুখে বেগম বলিল "কি বলে ? যে 'She is good for nothing but the slaughter house ?' এই তো ? আচ্ছা ভাই, তোমরা মনে কর যে আমি জবাই হয়েই গেছি ! আমি আর ইহজগতে নেই-ই এইবার আমার ওপর রাগ-টাগ ছেড়ে দাও !"

"কেন রাগ ছাড়ব ? কক্‌খোনো না ! তুই যদ্দিন না বিয়ে কর্‌ছিস, তদ্দিন তোর ওপর আমার রাগ থাক্‌বে ! কেন তোর যোগ্য পাত্র কি কেউ নাই ? তুই কাকে পছন্দ করিস্ বল্-না আমায় ! শুনি একবার তার নামটা ?—"

বালিশ ছাড়িয়া বেগম সোজা হইয়া বসিল। দুষ্ট কৌতুকের হাস্যদীপ্তি উজ্জ্বল মুখে সোফিয়ার দিকে চাহিয়া টুক্‌টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আমি যাকে পছন্দ করি তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে তো ঠিক্ ? দ্যাখো তা হলে আমি আজই বিয়ে করতে রাজি আছি।"

সাগ্রহে সোফিয়া বলিল " হাঁ হাঁ বল-না তার নামটা শুনি আগে কে সে ?"

"যেই হোক কিন্তু বিয়েটা দেবে তো ?"

"বাপ ! ধাড়ি বয়েস পর্য্যন্ত বিয়ে না হলে, মেয়েগুলো এমিই বেহায়া হয়ে পড়ে ; ছিঃ, নিজের বিয়ের সম্বন্ধে আমরা কিন্তু এত মুরুব্বিয়ানা কখনোই কর্‌তে পারি নি।—তোরা হলি কি রে'?"

"পৃথিবীটা ক্রমশঃই ক্রমবিকাশের দিকে চল্‌ছে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা একরকম ছিলেন, আমরা আর একরকম হয়েছি আবার আমাদের পরবর্ত্তীরা আর কি রকম হবেন—তা বেঁচে থাক্‌লে সময়ে দেখ্‌তেই পাবে !"

"ছেঁদো কথা রাখ, বেগমের মনের-মত বাদশাটী এখন কে ঠিক্ হয়েছে শুনি ?"

"বলি সত্যি সত্যি বিয়েটা দেবে তো ? না পত্নী-মেয়ে নামটা জেনে নিয়ে,—একলাকে চৌকাঠ ডিঙিয়ে চীৎকার করে চারিদিকে ঢাক পিট্‌তে সুরু দেবে ? দ্যাখো বাপু তাহলে আমি কিছু বলতে-কইতে রাজী নাই।—একেই তো পরকুৎসা-চর্চ্চায় তোমাদের যুগল মূর্ত্তির যা অসাধারণ দক্ষতা, যা অপরীসীম কল্পনা-কুশলতা তাতে তোমাকে নিজের সঙ্গে নিভৃত-আলাপের সুযোগ দিতেই ভয় হচ্ছে! তার ওপর আবার যদি এই অবসরে উচ্ছ্বাসের মাথায় অন্তরঙ্গ-জন মনে করে তোমার কাছে মনের কথা প্রাণের কথা বুকের ব্যাথা কিছু প্রকাশ করে ফেলি তা হ'লে তো রক্ষেই থাকবে না।"

বেগমের চেয়ার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মাত্রাতিরিক্ত ঔৎসুক্যের সহিত সোফিয়া বলিল "থাম্ না, এত পাকামো করিস্ কেন ? সত্যি সত্যি যেন আমি ওঁর বিশ্বাস-করে বলা কথা, কাউকে বলে দিতে যাচ্ছি;—তাই অত ভয়! বল্ না রে, কে সে লোকটা ?—"

বেগম খুব গম্ভীর হইয়া বলিল দ্যাখো বাপু, তোমরা ভবের হাটে দোকান-পাট সাজিয়ে বসে, পুরোদমে ব্যবসাদারী সুরু করে দিয়েছে,—আমার মত অব্যবসায়ী ক্লাশের লোক, তোমাদের স্বভাবতঃই একটু ভয় করে চল্‌তে বাধ্য হয়—"

বাধা দিয়া সোফিয়া অধৈর্য্যভাবে বলিল "দ্যাখ্, ফের যদি চিবিয়ে চিবিয়ে চিপ্‌টেন্ ঝাড়্‌বি, তাহলে তো'র ঘাড়ে এবার এক থাবড়া বসাবো ! বল-না লোকটা কে ?"

"বলি, বিয়েটা দেবে তো সত্যি ?—"

একান্ত—সহৃদয়তা জানাইয়া, সোফিয়া খুব মিষ্টি সুরে বলিল "দ্যাখ্ ভাই, আমি তো একলা শুধু তোর মুরুব্বি নই, মাথার ওপর আরো বড় দরের মুরুব্বি সবাই আছেন। তবে আমি কসম্ খেয়ে বল্‌ছি, যাকে তোর আন্তরিক পছন্দ, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্যে মুরুব্বিদের কাছে আমি প্রাণপণে ঘট্‌কালী কর্‌ব !"

খুব আশ্বস্তভাব প্রকাশ করিয়া বেগম বলিল "দ্যাখো, ঠিক পাকা কথা দিচ্ছ তো ?"

"আলবৎ !"—বলিয়া সোফিয়া একটু হাসিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল "কিন্তু কুলশীলে আমাদের সঙ্গে মিল্‌বে তো ?"

বেগম সজোরে বলিল "ঘটে আর কি! আমার পছন্দ-শক্তিটা এম্নিই কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত যেন! তাই বিয়ে করবার জন্য পছন্দ করে বস্‌ব যেন তোমার সেই হীরেমন তোতাটার রং'এর বাহারকে! আমি এম্নিই উজবুক্ আর কি!"

"আচ্ছা আচ্ছা, বল্‌ সে কে?"

"দ্যাখো-জি, 'যাচিয়ে সাঙা' করছ, এর পর আমার কসুরের দায়ে ফেল্‌লে চল্‌বে না, বুঝলে? রাজি?"

বারে বারে সেই এক কথা! সোফিয়া অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া বলিল "দ্যাখ, আমার ইচ্ছে করে, তোর ঠোঁট দুখানার ওপর খানিকটা নাইট্রিক এ্যাসিড্ ঢেলে দি,—যেন জন্মের মত ও-দুটো গোল্লায় যায়! বাপ্ বাপ্,—কি বক্তার মেয়েই হয়েছিস্! যেন আস্ত উকিল একেবারে!—"

হাসি মুখে চুমকুড়ি দিয়া সবিদ্রূপে বেগম বলিল "আহা মরি মরি! দুনিয়ার মধ্যে কি অপূর্ব্ব চিত্রই তুমি চিনেছ দাদা! কথায় কথায় ওরই উপমা!—আহা! কি অনুপম সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ-বিশেষণ! উ—কীল! উ—কীল!! উ—কীল!!!— শুনলেই আমার মনে পড়ে, সত্যপীরের কথায় সেই—" বলিয়াই বেগম সহাস্যে হাত মুখ নাড়িয়া, সুমিষ্ট সাধা গলায় গানের সুরে আবৃত্তি করিল "বুকে বসে বসন্ত কোকিল ডাকে!—"

সোফিয়া হাসিয়া ফেলিল! সস্নেহে বেগমের কাঁধ চাপড়াইয়া বলিল "আহা! আল্লা করেন, তুই একটা উকিলের পাল্লায় পড়িস্!—"

"দোহাই দাদা!—চন্দ্রের ক্ষেত্রে সমাগত বৃহস্পতির তুঙ্গী মূর্ত্তি ধারণের মত ও-চিজটি চরম উজ্জ্বলতায় খাস বাহা—র দিয়েছে তোমাকেই! এ—মকরবাশির নামটা আর উচ্চারণ কোর-না, চেহারায় জলুস্ চটে যাবে!—বলি এখন আমার বিয়ের ঘটকালী করবে?"

"আমর্! সেই থেকে তো সাধ্‌ছি, বল না তোর আন্তরিক পছন্দ কাকে বলছি তো; তার সঙ্গেই—"

অতিশয় গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "দ্যাখো ঠিক?"

"কতবার বল্‌তে হবে? ঠিক, ঠিক, ঠিক,!—"

ঝুঁকিয়া,—সামনের বহির আলমারীকে তর্জনীনির্দ্দেশে দেখাইয়া,—হঠাৎ একান্ত নির্ভীক ভাবে, সোৎসাহে বেগম বলিল "তবে, দাও ভাই, ঐ বই-ভরা আলমারীটার সঙ্গে আমার বিয়ে! দোহাই ধর্ম্ম, সাচ্চা বলছি লোক,—ওকেই আপাততঃ আমি আন্তরিক পছন্দ করি, ভয়ানক ভালবাসি! ওর হাতেই আমি—সেই যে গো, কি বলো তোমরা,—সেই "মন-প্রাণ সঁপা" নয়? সেটা ওর হাতেই সঁপে দিয়েছি? এবার—নিয়ে এস ভাই, বরমাল্য!—"

অসহ্য ক্রোধে লাল হইয়া, সশব্দে বেগমের পিঠে এক প্রচণ্ড চড় বসাইয়া সোফিয়া সক্ষোভে বলিল "মুখে আগুন মেয়ের! বাপরে বাপ্, আমায় জ্বালাতন করে মারলে! এতক্ষণ ধরে, মিছেই আকাশকের ভড়ং করে, তাক্ লাগিয়ে দিলে? মর্ গে যা! তোর কপালেই শাদি নেই!"

"বহুৎ খুব! বহুৎ খুব খুশীর তসলীম,! হে বন্ধু, তোমার মঙ্গল হোক্! খোদা তোমায় দোয়া করুন, তুমি রাজা হও, বাদসা হও—"

সোফিয়া রাগভরে প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, বেগমের শেষ কথাটা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল 'কি বল্লি? বাদসা হব? তা হলে বেগম তুই?" সে সকৌতুকে একটা অর্থসূচক কটাক্ষে চাহিল!

তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বেগম কবিতাচ্ছন্দে আওড়াইল,—

"সেই ভাল!—গজ, বাজী, রাজ্য নাহি চাই!
যদি পাই ও হৃদয়ে চার-আঙুল ঠাঁই!"

সোফিয়া সোৎসাহে বলিল "এই কথা? আচ্ছা, তাহ'লে নিশ্চিন্দি হলুম! তোর বিয়ের জন্যে আর তোদের সাধ্যি নেই যে, এবার আমার হাতেই তোর সব ভার!—আচ্ছা এখন তাহ'লে চল্লুম বেগম-সাহেবা, বিদায়—"

"আরে, থামো-জি! এমন একটা পাকাপাকি ঘনিষ্ঠতার পর, এর মধ্যেই চলাচলির কথা কি? খোদো বাদসার মেজাজকে একটু বাদশাই কায়দায় অভ্যর্থনায়—"

"না, ভাই," আমার ছোট ছেলের বেড়িয়ে আসবার সময় হয়েছে, এখন বাদশাই কায়দায় অভ্যর্থনা সহ্য করা শক্ত।—"

"তবে আমি এখন একটু দুঃখের গান গেয়ে কাঁদি ?"

"তা কাঁদ, তাতে বাদশাদের আপত্তি থাকে না।"

সোফিয়া বাহির হইয়া গেল। বেগম বাজনার উপর দ্রুত তালে আঙুল চালাইয়া মধুর সুরে গাহিয়া উঠিল —

"দিল্‌মে মেরি, আ'গ জ্বালায়ে,
কাঁহা গেলি বেইমান্ !"

কিন্তু সেটা ঐ পর্যন্তই ! পরক্ষণেই তরল-বিদ্রূপ-চপল কণ্ঠে, শিশু-সুলভ কলহাস্যে সমস্ত ঘর ভরাইয়া সে বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল ! সোফিয়া বারেণ্ডা দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে, হাস্য-মন্থর কণ্ঠে বলিল "জাহান্নামে যাও, জাহান্নামে যাও !—একেবারে কাফের্‌ হয়ে গেছিস্ !—"

"যাক্ ? এতক্ষণের পর ধড়ে প্রাণ পেয়ে বাঁচলুম ! এইবার কবুল করলে তো, কাফের ? দেখো ভাই, আর যেন 'ফিলজফি' 'স্পিরিচুয়ালিটি' করে গালাগালি দিও না ! অনেক কষ্টে তোমায় খুসী করে দিয়েছি, একটু বোধ-শোধ রেখো !"

"হুঁঃ ! কত বড় সুবোধ-বালিকা তুমি !"

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

'হোরি'।

—:০:—

রাজপুতনার যেমন ফাগ উৎসব—ত্রিপুরায় তেমনি হোরি। রাজা হইতে প্রজাবৃন্দ এ উৎসবে সকলে মাতোয়ারা; সাধ্য কি কাহারও যে সে-দিন পরিধেয় বস্ত্রের শুভ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে! সে দিন যে লালে লাল, ফাগের দাগে ত্রিপুরার হৃদয় রক্ত-রাঙ্গা,—ভাবময়,—সে দিন কে কাহাকে মান্য করে! কে ছোট কে বড়— আনন্দ—আনন্দ,—হোরি—ফাগুয়া!—হরষ-পরশে সব একাকার!!—সে দিনের সেই মাতোয়ারা ভাব স্মরণে আসিলে আগে মনে পড়ে ত্রিপুরাধীপতি বীরচন্দ্রের কথা-বার্ত্তা।—মনে পড়ে তাঁহার গান—

"লালে লাল আজি কাল তনু,
বৈর নারী শত, একলা কানু!
পড়েছে ছিঁড়িয়া নব গুঞ্জ-চূড়া,
হেলিয়া পড়েছে মোহন চূড়া।" ইত্যাদি—

সে রঙ্গ কি একা সম্ভোগ করিবার! রাজপ্রাসাদে সে দিনের আহ্বান আনন্দের আহ্বান, কুটুম্ব-মেয়ে-মহলে সে দিনের নিমন্ত্রণ আহারের জন্য নহে, আবির গীতিতে। রাজ-দরবারের তলব পড়িয়াছে দরবারের জন্য নহে, ফল্গু উৎসবে মাতিতে। এ সময় কর নহে রজত মুদ্রা—প্রজাবৃন্দের ভক্তিমিশ্রিত অঞ্জলীকৃত সুবাসিত আবির; আর প্রতি-দান তার রাজপ্রসাদপুষ্ট "প্রসাদী রাঙ্গাধূলীকণা।" সকলেই উৎসবে উন্মত্ত; রাস্তাময় বালকবৃন্দ মর্কট আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে, গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া আর ঐ রঙ্গের উৎস জলের পিচ্‌কারীর নল হাতে লইয়া। কাহারও সাধ্য নাই এই মর্কট শ্রেণীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগকে কোন উৎকোচই প্রলোভিত করিতে পারে না। বরং তাহাতে আরও তাহাদের উৎসাহ, অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। পঞ্চ দিবারাত্র এই ভাবে উৎসব চলে, পঞ্চ দিবস উৎসব শেষ করিয়া পরে "বস্ত্‌্যুৎসব" উপভোগ সমাপণ অন্তে শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

মনে পড়ে—সে দিন একটী তরুণ বয়স্ক ঠাকুর-লোক যে তান ধরিয়াছিলেন, বীরচন্দ্রের দরবারের তিনি দরবারী কবি (এখনও তিনি জীবিত আছেন; বোধ হয় অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিয়া থাকবেন) শ্রীযুত মদনমোহন মিত্র,—তিনি ছিলেন রাজকবি—সুরসিক—স্বভাবকবি—তিনি বীরচন্দ্রের সাথী ছিলেন, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ছিলেন ইয়ার। তাঁহারই কৃত একটী সময়োপযোগী সঙ্গীত আজও যেন ঝঙ্কৃত হইতেছে—

'রাঙ্গাধূলি ব্রজের পথে
কিবা রাঙ্গাধূলি
আবিরে ... ... ।
ব্রজ-গোপীকার চরণ পরশ রসিক
যমুনার পুলিন পথে, রাঙ্গাধূলি,
রাঙ্গা রেণু পরে ধেণুর পদচিহ্নরাজি রাজে
ব্রজগোপ শিশুগণের পদচিহ্ন মাঝে মাঝে
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ রেখা, আছে যেই পদে লেখা,
সে পদচিহ্ন যায় রে দেখা,
আবির মাখা গোঠের পথে।
কমলা যে ধূলা চাহে সে ধূলায় হব লীন
কবে হবে হেন ভাগ্য, কবে হবে হেন দিন
ভবের ধূলাখেলা ত্যজে ধূলার তরে যাব ব্রজে।
গায় মেখে সেই রাঙ্গা রজে,
বেড়া'ব পথে পথে, রাঙ্গাধূলি।

গানটী স্মরণে আসিয়া যুগপৎ একটী ভাবোদয় হইল। বলিতে গেলে বৈষ্ণব দার্শনিকের 'কিল কিঞ্চিৎ' ভাব উপস্থিত হইয়া শিশু কিশোর এবং যৌবন কালের কথা মনে হইল! পূর্ব্বে "ঝুলন লীলা" নামক প্রবন্ধে বীরচন্দ্রের দরবার সম্বন্ধে ঘটনা বশতঃ আনুসঙ্গিকরূপে সে কথা কিছু বলিয়াছি। আজ এই পরিণত বয়সে, যে সব ভাব সেবাধিকারীরূপে পাইয়াছিলাম; ফাগুনের আবিররঞ্জিত ধূলীকণার সহিত ফাগের রাগে তাহা আমায় মনে যে,

হোরি খেলায় ভাব উপস্থিত হইয়াছিল ; তাহা বলিতে কিম্বা লিখিতে আমি অসক্ত। 'গুণী গুণবান লোককে আর্কষণ করে ; যেমন চুম্বকলৌহ লৌহকেই আর্কষণ করিয়া থাকে কিন্তু নির্গুণকে গুনবান লোক পরিত্যাগ করেন যেমন চুম্বকলৌহ সুবর্ণকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বীরচন্দ্র যেমন নানা বিষয়ে রসিক ছিলেন তেমন সঙ্গীত জুটিয়াছিল, সংশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে সময় প্রত্যেক বিভাগে ছিলেন। কিন্তু বীরচন্দ্র সকলের নিকট দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিতেন, শুনিতেন এবং বিচার করিতেন। কোন দিনই তিনি কাহারও নিকট শিক্ষাও পান নাই এবং দীক্ষাও লন্ নাই। নিজ কামরায় বসিয়া আপন মনে সব বিদ্যার তত্বান্বেষণ করিতেন। এ বিষয় আমি কতক পূর্ব্বে 'পরিচারিকা'র প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার সেই বাগানবাটী সর্ব্ববিদ্যার সাধনাগার ছিল। সে বিষয় ডাক্তার মুখার্জ্জি কৃত—Travels to Independent Thpera নামক গ্রন্থে যে ভাবে বিবৃত আছে তাহাই আমি পরিচারিকার পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য সাহসী হইয়াছিলাম।

এ প্রবন্ধে তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যার সমালোচনা উপলক্ষে পাঠকবর্গের তৃপ্ত্যর্থে আমি যাহা জানি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। সর্ব্ব প্রথম বলিতে হয় তিনি শাস্ত্রানুসারে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁহাকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া কেহ বলিতে পারিত না। বর্ত্তমান সভ্যযুগে অদ্য পর্য্যন্ত বাই খেম্‌টা বা অভিনেতৃ-বর্গের দ্বারায় সঙ্গীতরস পাইবার জন্য সকলে বহু অর্থ্য ব্যয় করিয়া থাকেন এবং তাহাতে 'বাহবা' পান। যৌবন কালে বীরচন্দ্র কোন দিনও সে রসে রসিক হন নাই। কেন না তিনি জানিতেন এবং দেখিতেন ঐ সব উৎপাত আনিয়া গৃহ উৎপাতের পথ প্রশস্ত করা ব্যতীত তাহাতে সঙ্গীতরস পাওয়া আশা দুরাশা ; তিনি যেন মনে মনে বলিতেন 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।' একদিনের কথা মনে পড়ে। লৌক্ষ্ণ সহরের বাইজিগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে সরস্বতী-তুল্যা, ইহাদের তুলনা হয় না।" লৌক্ষ্ণনিবাসী কোন ভদ্রলোকের নিকট ইহা তিনি অবগত হন। তিনি সন্দিহান হইলেন বটে, কিন্তু কৌতুহলীও হইলেন। ঐ সহর হইতে প্রসিদ্ধা 'ইমামী বাইজি' আনা হইল এবং বহুতর বসবাসের অসুবিধা এবং প্রত্যেক বিষয়ে অভাব ইত্যাদি জানাইয়া বাইজি আমার পিতৃদেবকে হয়রাণ করিয়া তুলিলেন। বীরচন্দ্র তখন

বলিয়াছিলেন 'ইহা বারবনিতার আব্দার; ইহাতেই বুঝিতে পারি এ নটী সঙ্গীত শাস্ত্রের কিছু জানে না। তুমি সব আব্দার পূরণ করিয়া দেও।"

সে দিন ছিল দোলপূর্ণিমা। বাইজির চেহারাখানা 'ছল পূর্ণমাসির মত সুন্দর ও সুডৌল। 'পাউডার মাখা' দেখিয়াই বীরচন্দ্র মনে মনে হাসিলেন। বাইজী সাহেবা মনে করিয়াছিলেন; মহারাজ তাহাকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আগ্রহ সহকারে 'ইহাগচ্ছ, ইহাবহ' মন্ত্রে আদব কায়দার চূড়ান্ত অভিনয় করিবেন। কিন্তু বীরচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসুলভ গম্ভীর মূর্ত্তিতে হস্তিদন্তের চেয়ারে বসিয়া গেলেন। বাইজীকে নাচ আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষ্ণৌনিবাসী ভদ্রলোককে ইঙ্গিত করিলেন। নাচ আরম্ভ হইল এবং তিনি নাচিলেন ভাল কিন্তু তিনি যখন সে শারাকের বেনাটের কোণ ধরিয়া দু'হাতে অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া "কাহারোয়া" নামক পাঁচ দেখাইলেন, এবং পরে দু'হাতে আবির লইয়া চীৎকারের হাসিতে কুটীলকটাক্ষ নয়নে, বীরচন্দ্রের শুভ্র অঙ্গাভরণে ফেলিয়া দলেন, তৎক্ষণাৎ মহারাজা বীরচন্দ্র উঠিয়া গেলেন এবং পিতৃদেবকে হুকুম করিলেন 'বাইজীকে নাটমন্দিরে লইয়া যাও। সেখানে প্রকৃতিপুঞ্জের মনস্তুষ্টি করিতে পারিবে; তাহার মুজ্‌রা শেষ হইলে নগদ টাকা গণিয়া দিয়া বিদায় করিয়া দাও।' কিন্তু উপস্থিত সকলে টের পাইল, বীরচন্দ্রের বাক্যবাণের মধ্যে এমন চোখা চোখা অস্ত্র ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিব কারণ নাই। সে অবধি তিনি কখনও ঐ সব শ্রেণীর সঙ্গীত শুনিতেন না। বাৎসরিক পূজা, দোল প্রভৃতিতে এ সব নটীবর্গের আসা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ছিল বটে। আবহমান কাল হইতে প্রকৃতিপুঞ্জের তৃপ্ত্যর্থে, তাহা তিনি বন্ধ করিলেন না। কিন্তু নিজে সে আসরে বসিতেন না।

সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার সহায় ছিল "বীণ"বাদক প্রসিদ্ধ তানসেনের বংশধর কাশীমালী খাঁ। তিনি লৌক্ষ্ণ সহরবাসী ছিলেন। কাশীর রাজ্য হইতে আসিয়া জুটিলেন "কুলকর বর" নাট্যাচার্য্য। যিনি সঙ্গীতের হাব ভাব দেখাইয়া এমন সুন্দর নাচতে পারিতেন; সে নাচ দেখিলে আমার বোধ হয় অনেক নটীর উপকার হইত। তাঁহার উপাধি ছিল 'কথক।' গোয়ালীয়র রাজ্য হইতে আসিলেন প্রসিদ্ধ হায়দর খাঁ; সুরশৃঙ্গার এবং এস্রাজ বাদক। যিনি এসব বিদ্যা শিখিবার জন্য কাশীমালি খাঁর 'সাকেত' ছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি গুরু

তুল্য মান্য করিতেন। তিনি একজন ধনী ও মানীব্যক্তি। কলিকাতা নিবাসী পঞ্চানন্দ মিত্র সঙ্গীত শাস্ত্ররসে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়া যখন সর্ব্বস্বহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি বীরচন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন; কারণ স্বাধীন রাজ্যে বাস করিলে ব্রিটিশরাজ্যের দেনার দরুণ জেইল ভোগ করিতে হয় না। প্রথমে তিনি ছিলেন, চন্দননগর নামক স্থানে। তিনি মরফিয়া নামক অহিফেন নিত্যসেবী ছিলেন এবং পরিমাণ ছিল দৈনিক ছয় গ্রেন্, সাধারণ লোকে ইহার এক গ্রেণ খাইলেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। সঙ্গে ছিল একজন সঙ্গিনী, যিনি নিজ বস্ত্রালঙ্কার বিক্রয় করিয়া পঞ্চানন্দ মিত্রের আহার সংস্থান করিতেন। যখন সে উপায়ও নিঃশেষিত হইয়াছিল এমন সময় তিনি লোকপরম্পরায় বীরচন্দ্রের গুণাবলীর,—বিশেষ তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিতার সংবাদ পাইয়া রাজধানীতে আসিয়া জুটিলেন, সঙ্গিনী সহ। সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ বীরচন্দ্রের দরবারে তিনি পাখোয়াজ ঢোল উত্তম বাজাইতে পারিতেন। এবং তাহার চেহারাখানা ছিল শিব তুল্য। বীরচন্দ্রের উঠানো তাঁহার ফটো আমার নিকট আছে। ইহার সম্বন্ধে আমার বিশেষজ্ঞতার কারণ ছিল; ইনি আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন এবং পিতৃদেব তাঁহার নিকট পাখোয়াজ বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ জন্য পিতৃদেব তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ দেখিতেন ও তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। বিশেষ কারণ ছিল ইনি পুত্রহীন; এ জন্য তিনি আমাকে পুত্রবৎ দেখিতেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে আমাকে শিক্ষার্থে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। এবং তাঁহারই একজন ভায়রা ভাইয়ের বাড়ীতে আমি বাস করিতাম। এসূত্রে আমি কলিকাতা সমাজে মিশিতে পারিয়াছিলাম। একথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমার কর্ত্তব্যজ্ঞানে কৃতজ্ঞসংস্কারে ইহার উল্লেখ করিতে হইল।

পঞ্চানন্দ মিত্রের দরুণ আমাদের রাজ্যের পলিটিকাল এজেণ্টের সহিত বীরচন্দ্র মাণিক্যের কতক বচসার কারণ হইয়াছিল। তাঁহারই উত্তমর্ণগণ আগরতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দরবারিদের দরবার করিতে লাগিলেন সব দেশীয় রাজ্যের দরবারে যাহা ঘটিয়া থাকে ফল তাহাই হইল। মরফিয়া-সেবী বলিয়া এবং চরিত্রহীন বলিয়া পঞ্চানন্দ মিত্রের বিপক্ষে একদল দাঁড়াইলেন; এবং অপর দল পঞ্চানন্দ মিত্র ধনহীন ভদ্র সন্তান এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যখন প্রথমোক্ত দল বিফল মনোরথ

হইয়া পড়িলেন তখন উত্তমর্ণগণকে রাজ-দরজা উল্লঙ্ঘন করিয়া পলিটিক্যাল এজেন্টের দরজা দেখাইয়া দিলেন। ফল যাহা হয় তাহাই হইল। Jurisdiction বিহীন রাজ্যে জোর করিয়া অধমর্ণের দেনা শোধ করিয়া দিতে বীরচন্দ্র অক্ষম বলিয়া, উত্তর দিয়াছিলেন। Political Agent পলিটীক্যাল সাহেব রাজাকে 'আবগারীর গোলা' বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পঞ্চানন মিত্র ২২ বৎসর যাবত এ রাজ্যের ছিলেন এবং 'নিজ তহবিলে দেওয়ান' পদে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। পর জীবনে কাশীবাসী হইয়া বীরচন্দ্রের নিকট মাসিক ৫০৲ টাকা অবসর-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং তথাতেই পঞ্চানন্দ মিত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

পঞ্চানন্দ মিত্র আর একটি ভদ্রসন্তানকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় স্যার রমেশ মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশব মিত্র। তিনি একজন Amateur পাখোয়াজ বাদাকর। কলিকাতার কোনও এক প্রসিদ্ধ পরিবারের সন্তান। তিনি শিক্ষিত এবং সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বীরচন্দ্রের দরবারের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি পঞ্চানন্দ মিত্রের শরণাপন্ন হন এবং বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে দরবারি হন। তখন কলিকাতা আসাযাওয়ার পথ দুর্গম ছিল। E. B. Ry. লৌহবর্ত্মের শেষ সীমানা ছিল বর্ত্তমান কুষ্টিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত। তথা হইতে নৌযানে আগরতলায় পৌঁছিতে ১০। ২ দিন লাগিত। মেঘনা প্রভৃতি পাণ্ডব বর্জ্জিত (?) নদী বা নদসমূহ পারাপার হওয়া কি দুঃসাধ্য ছিল। আমরা অদ্যকার দিনে তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। কলিকাতানিবাসী ভদ্রসন্তানগণের আহার ও তাহার ঘটা ছিল। কিন্তু তাহা আগরতলায় পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। এখন তাহারা মিলিয়া একটি ফল, ফুল ও সবজী বাগান করিয়া লইলেন এবং সেই বাগানে অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষেই কলিকাতা হইতে পাচক এবং মোদকদিগকে আনান হইয়াছিল। 'ভীম নাগের' সন্দেশ তখন আমরা বালকবৃন্দ আগরতলায় বসিয়া উপভোগ করিয়াছিলাম। কলিকাতা যাইয়াও 'ভীম নাগের' দোকানে উপস্থিত হইয়া সেরূপ সন্দেশ না পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম, বাঁশপাতা আহারের দরুণ আগরতলার গাভীর দুগ্ধ যেমন ক্ষীরপূর্ণ তেমন ছানা কোথায়ও পাওয়া যায় না। কেশব মিত্র যেরূপ বাজাইতেন পিতাঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি; তেমন বাদ্য তিনি কাহারও নিকট হইতে কখনও শুনেন নাই। ইনিও আমাদের Next-door neighbour প্রতিবেশী ছিলেন। তখন আগরতলায় চতুষ্পার্শ্বে

জঙ্গলাবৃত ছিল। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন কালে 'চিনা জোঁক' তাহাদিগকে আক্রমণ করিত; কিন্তু তাঁহারা বলিতেন 'জোঁক' আর কত রক্ত খাইতে পারে। বাস্তবিক বীরচন্দ্রের দরবারে গুণী ও মানী গণের একটি অপূর্ব মিশ্রন ব্যাপার হইয়াছিল। সে সব কথা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

বিষ্ণুপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ স্বাভাবিক গায়ক (যিনি কলিকাতার বড় বড় লোকের দরবারেও গতিবিধি করিতেন) আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—কাশ্মীরের মহারাজা হইতে তান-রাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন তদানীন্তন কাশ্মীরের মহারাজা হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন 'একজন বাঙ্গালী রাজা সঙ্গীত শাস্ত্রে বড় গুণী আছেন। আপনি তাঁহাকে আপনার স্বরচিত সঙ্গীত শুনাইয়াছেন কি ?" তিনি তখন লজ্জিত হইয়া কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ রাজা দিগম্বর মিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহারই পরিচয়পত্র হাতে লইয়া ভট্ট মহাশয় ত্রিপুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার বিধাতা ত্রিপুরা দরবারে মণি-কাঞ্চন যোগ করিয়া দিলেন। যে মণিকাঞ্চন যোগ তৎকালে বীরচন্দ্রের দরবারে যে সঙ্গীত-উৎসব দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা স্মরণে আসিলে মরমে আজিও ব্যথা পাই। এখন পর্য্যন্ত কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে ভট্ট মহাশয়ের স্বরচিত সঙ্গীত শুনিয়া এবং তাহাতে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র নাম সংযুক্ত থাকার দরুণ এবং মাঝে মাঝে 'তানরাজ' শব্দ যোগ ছিল বলিয়া আমার স্বতঃই মনে হয় ;—

'রাজা রেণু পর ধেনুর পদচিহ্নরাজি রাজে
ব্রজগোপ শিশুগণের পদ চিহ্ন মাঝে মাঝে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা, আছে যেই পদে লেখা,
সেই পদচিহ্ন যায় রে দেখা,
আঁধারমাখা গোঠের পথে।'

সেই পরিত্যক্ত দরবার স্বপ্ন-আলোকে এখনও যে সব পদচিহ্ন মানস-নয়নে দেখিতেছি তাহা এই সঙ্গীতের সহিত প্রায় মিল হইয়া যায়। ১৮৮৩ খৃঃ পত্নী বিয়োগে বীরচন্দ্র আকুলিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তখন তাঁহার সব বিদ্যা রাজ অন্তঃকরণ হইতে একে একে লয় পাইতে লাগিল। তাহা স্মরণ হইলে মনে পড়িয়া যায় মাইকেল দত্তের কবিতা :—

'একে একে শুকাইছে ফুল, নিবিছে দেউটী
কায় রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে।'

উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা করি উপরোক্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের রসিকগণ কেবল যে শাস্ত্রের রস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নয়, পলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চে ও অনেক অভিনয় করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। পঞ্চানন্দ মিত্র ছিলেন একজন কৃতবিদ্য লোক।

ইনি সর্ব্ব প্রথম এ রাজ্যে Private Secretary পদে নিযুক্ত হন; যখন সর্ব্ব প্রথম এ রাজ্যে Political Agentএর পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার Diary ছিল; আমি তাহা তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর ৺কাশীধাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন এ রাজ্যের অনেক খবর পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন Political Agent ও মহারাজের মধ্যবর্ত্তী লোক। অনেক Political Agent তাঁহার বন্ধু ছিলেন; (আন্তরিক ও রাজনৈতিক ভাবে)। এখনও পঞ্চানন্দ মিত্রের বাড়ীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও 'পাঁচু বাবুর বাড়ী' 'পাঁচু বাবুর সন্দেশ' 'পাঁচু বাবুর সিরণ' প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য হইয়া আছে। বিলাতি শাঁক সব্জী ও আম্র প্রভৃতি ফল আজকালও 'পাঁচু বাবুর বাগান' হইতে কলম নিয়া গর্ব্ব করিতে হয়। কেশব বাবু দ্বারায় অনেক রাজনৈতিক কাজ বীরচন্দ্র ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। এমন কি তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতির সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতির বন্ধুত্ব ঘটাইবার কারণও কেশব বাবু ও রাজকুমারগণের শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়; যিনি পর জীবনে মহারাজা স্যার জ্যোতিন্দ্রমোহনের পারিষদ ছিলেন। ক্ষেত্র বাবুর উপাধি ছিল 'ধ্রুপদী' যাহাতে বীরচন্দ্র মাণিক্য সময় সময় রসিকতা করিয়া 'দ্রৌপদী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অমৃতলাল মিত্র ছিলেন একজন ভাল Chemist রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বীরচন্দ্রের কার্য্যতঃ ছিলেন Laboratory assistant কিন্তু নামে ছিলেন তোষাখানার দেওয়ান। শ্রীযুত মদনমোহন মিত্র রাজকবি ছিলেন কিন্তু নামে ছিলেন 'বীরচন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক। স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাক্তার শম্ভুচরণ মুখার্জ্জি যদিচ সঙ্গীতশাস্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিলনা, কিন্তু তিনি Associate minister রূপে এ রাজ্যের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ নীতিকে নিন্দা করিয়া ইংরেজ রাজপুরুষগণের চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র ত্রিপুরারাজ্যের Prestige (ইজ্জৎ) রক্ষা করিয়া, তিনি বাদপ্রতিবাদ করিয়া চলিয়াছিলেন। অদ্যকার দিনে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অল্প দিন হইল 'Hill Tippera' পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া 'Tripura State' নামে এই প্রাচীন রাজ্যকে অভিহিত করিতে হইয়াছে। বীরচন্দ্রের দরবারে এইভাবে বহুবিধ গুণীর সমাবেশ হইয়াছিল—সে যেন নবরত্নের সম্মিলন; সে নবরত্ন মহাসভার অধিপতি স্বয়ং সুরসিক সুকবি সুকণ্ঠ বীরচন্দ্র। আজও এদিনে মনে হয় ভাবে বিভোর ভঙ্গিতে গদ গদ প্রেমাশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত করিয়া যেন বীরচন্দ্র হোরির তান তুলিয়া গাহিতেছেন:—

১ম গীত।

খেলত রঙ্গলাল গোপালা,
ডারত রঙ্গলাল গোপালা,
দোহে দুহুঁ ভাব বিভোলা।

চৌদিকে সখীগণ নাচত
গ রত বায়ত দফ বীণা মৃদঙ্গ।
কৃতি ঘ্রিমি ঘ্রিমি থৈতা দৃমি দৃমি কৃতি ঝং।
সব সখীগণ বেণী মণ্ডলি করে কোই
কুম্ কুম্ কোই রঙ্গ গোলালা।
দুহুঁ গলে দুহুঁ ভুজে লিপটি ঝপটি
দুহুঁ দুহুঁ হৃদে মদন-হিলোলা।
দুহুঁ জন দুহুঁ রসে পুলকিত দেহ,
দুহুঁ ভাসত সুখে পাই না থেহ।
রসে ভাসল যত গোপ কোঙরী,
বীরচন্দ্র দাস যাও বলিহারি।

২য় গীত।

ঐছে খেলত আজু সুরঙ্গ হোরি,
ইথ মোহন উথ কোঁঙরী গোরী
শ্যাম ছোড়ত যব রঙ্গ গোলারী;
তৈ গোলালকি ঘটা আঁধেরী।
কেশব রঙ্গ ভরি লিয়ে পিচকারী,
মারতকি সখী সব ঔর গোরী।
করলে দফ নাচতহুঁ কানাই,
মধুমঙ্গল কহুঁ জিতে হো ভাই।
সখী খেলত রসরঙ্গ অতি ভোরি,
লিয়ে সখীয়ান নাচত প্যারী।
সব সখীয়ানা দেই করতারি।
হরষ পরশ সব নিরখত দো,
বীরচন্দ্র দাস মগন মন রো।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

এ দিনে—

উত্তর প্রত্যুত্তরে, কথা কাটাকাটিতে আসর বেশ জমিতে পারে, প্রকৃত কাজ হয় তাহাতে কমই। যেখানে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির অভাব, কেবল আপনার কোলের দিকে ঝোল টানিবার প্রয়াস সেখানে যুক্তিতর্ককে যতই সরস ও সবল করিতে চেষ্টা করা হউক না কেন সে সকল যুক্তির ফাঁকে ফাঁকে এমন একটা দৌর্ব্বল্য, অসত্যতা মাথা তুলিয়া থাকে যে আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে বাকী থাকে না। বিশেষতঃ ভুক্তভোগী ভাল মতই বুঝিতে পারে অপর পক্ষের দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে। ইহার উদাহরণ বর্ত্তমানে পরিলক্ষিত হইতেছে পদে পদে। এই নিরন্ন দেশের অন্নসংস্থানের জন্য আমাদিগের রক্ষক বাহ্যতঃ অক্লান্ত চেষ্টার অভিনয় করিলেও প্রকৃতপক্ষে যে নিত্যব্যবহার্য্য জীবনধারণোপযোগী খাদ্যোপকরণগুলিতেও তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট করিয়া দুঃস্থকে আরও বিপদগ্রস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তাহা ভুক্তভোগীর বুঝিতে বাকী নাই। যাহারা নিরক্ষর, আলোচনা গবেষণার ধার ধারে না, প্রত্যেক বস্তুর দুর্ম্মূল্যতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকেও বুঝিতে হইতেছে নানা প্রকার করের চরম লক্ষ্যস্থল তাহারাই। যেখানেই যাহা কিছুর হার বর্দ্ধিত হইতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া আঘাত করিতেছে এই নিরন্নদিগকে। অথচ তাহাদের কণ্ঠের বল এমন দৃঢ় নহে যে আহত স্থানে তাহা পৌঁছিতে পারে। আমলা-তন্ত্র দেশের উন্নততর ঢক্কা-নিনাদে গগণপট এরূপ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে সাধ্য কি যে সাধারণের ক্ষীণ কণ্ঠ পলকের জন্যও পালকের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে। তবুও চীৎকার না করিয়া আমাদের উপায় নাই। অবিরত আঘাত যেখানে হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে সে স্থলে ক্রন্দন নিরর্থক জানিলেও মুখ ফুটিয়া তাহা আপনি বাহির্গত হয়। অন্নবস্ত্র নুনটুকু পর্য্যন্ত যেখানে বিনা করে স্বাধীন ভাবে আত্মশক্তিতে আহরণ করিয়া ব্যবহার করিবার উপায় নাই সেখানে অন্য দাবীর কথা উল্লেখ না করাই শ্রেয়ঃ। বাহ্যতঃ সরকার আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য কতই না চেষ্টা, আয়োজন, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া দেশটা সরগরম করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু ফলে আমরা এই উপকারীর উপকারে ক্রমেই অর্থহীন ও হীনবল হইয়া পড়িতেছি। ডাকঘরে, হাটে, বিদ্যালয়ে কুইনিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসাটা জোরে চালাইবার পথ পরিস্কার করা হইয়াছে, সেই সঙ্গে নাকি ম্যালেরিয়া বিনাশের কথা—ও সেইটাই নাকি প্রধান উদ্দেশ্য এই আয়োজনের। কুইনিনের ম্যালেরিয়া নাশের অমোঘ শক্তি কেহই অস্বীকার করেন না কিন্তু যেখানে উদরে অন্ন নাই—পরিধানে বস্ত্র নাই, পথ্য সংগ্রহের উপায় নাই, এক বিন্দু দুগ্ধও দুর্লভ সেখানে কুইনিনের ম্যালেরিয়া বিনাশের অমোঘ শক্তি কি আর উপকারে আইসে! এই প্রকার ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র! মূল সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া বরং মূলচ্ছেদের আয়োজন পরোক্ষে সাধিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় আমাদের সরকারী মাঙ্গলিক প্রতিষ্ঠান।

কথা উঠিয়াছে 'সরকার সরকার' করিয়া তোমরা আত্মহারা হইতেছ কেন! নিজেদের মনে কি শক্তি নাই? কার্য্য করিবার ক্ষমতার এমনি কি অভাব ঘটিয়াছে যে পরের সহায়তা ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পার না! এমন কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ব্যাপারেও প্রার্থনা কর পরের সহায়তা; সত্যই সেই অবস্থা আমাদের। বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কঠোর সাধনা ব্যতীত আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। দেশে নিত্য ব্যবহার্য্য নানা বস্তুর এরূপ অভাব ঘটিয়াছে যে বহু আয়াসে কোন প্রকারে যোড়তাড় দিয়া আবশ্যকীয় বস্তুর সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইলেও কতকগুলি অনিবার্য্য বাহ্য বাধা কর্ম্মপথে আসিয়া পড়ে যাহা অতিক্রম করা আমাদের এ অবস্থায় বড় সহজ নহে। যাহা দেশে নাই তাহার ত কথাই নাই; না হয় সে সকল বৈদেশিক ভোগ বিলাসের লালসা এ দারিদ্র নিরন্ন দেশ পরিত্যাগই করিল কিন্তু আমাদের এ দেশে যাহা আছে তাহার ব্যবহারেও যদি অন্য দিক হইতে বাধা ঘটে তাহা হইলে আর পরিতাপের পরিসীমা থাকে না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প;—একখানি নেংটী,—সলবণ শাকান্ন, শিশুর জন্য একটুকু দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমরা ধন্য। নেংটীর উপর কর, নুনের উপর মাশুল, আর গরুর উপর বিদেশীর রাক্ষস-দৃষ্টি আমাদিগকে আরও বিপন্ন করিতেছে। কথাগুলির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই; কেবলই বলিতে ইচ্ছা হয়, 'হে বিদেশী বন্ধু, তোমাদের সহানুভূতি হইতে আমাদের রক্ষা কর,—রক্ষা কর। সত্য স্পষ্ট কথা বলিতে কি তোমাদের চক্ষে আমাদের যেটা সুখ প্রকৃত পক্ষে আমাদের সেইটাই চরম দুঃখ। খাঁচায় পোষা পাখীর ছোলা-খাদা যেমন তাহার পক্ষে অখাদ্য, তোমাদের দেওয়া সখের মিষ্ট আহারীয় তেমনই আমাদের প্রাণান্তক। তোমরা যাহাকে বল আমাদের প্রাচুর্য্য, আমাদের বাস্তব জীবনে অনুভব করিতে বাধ্য হই সেইটাই আমাদের দৈন্য। আমাদের এত বড় সহৃদয় বড় লাটের সে দিনের উক্তিতে একথা বেশ স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে তাঁহারা যতই পরদুঃখকাতর হউন না কেন আমাদের প্রকৃত অভাব তাঁহাদের চক্ষে পড়ে অন্য আকারেই। প্রত্যেক ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, এদেশের গো জাতির দ্রুত অবনতি। বিদেশে চর্ম্মের জন্য বা অন্য যে কারণেই হউক ভারতের গো রপ্তানী হয় কি না হয় সে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বাক্‌বিতণ্ডা আলোচনায় আত্মপ্রতারণার চেষ্টা না করিয়াও আত্ম অবস্থা হইতে আমরা গো জাতির ক্রমশঃ অবনতি ও সংখ্যার হ্রাস বেশ বুঝিতে পারি। নিখিল ভারতীয় গোরক্ষিণী সভা এই নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ভারতের প্রধান রাজপ্রতিনিধির নিকট ইহার প্রতীকার প্রার্থনায় উপস্থিত করিলে তাহাতে তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা সমর্থন যোগ্য নহে কিছুতেই এবং ইহাতে যে তাঁহার কপটতা আছে ইহাও আমাদের বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মনে হয় ইহা তাঁহার ভারতের প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত না থাকারই ফল। তিনি বলিয়াছেন 'এদেশ গো মহিষেতে পূর্ণ।' মনুষ্যকে গো

শ্রেণীভুক্ত করিলে এ উক্তির অনুভ্যতা দেখাইবার উপায় নাই কিন্তু চতুষ্পদ গো জাতির যে অধোগতি হইতেছে তাহা প্রত্যেক গৃহস্থের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান গোশালার অবস্থা বিবেচনা করিলেই বোঝা যায়। এ অবস্থায়ও যদি গো আদি ভারতীয় সম্পদে বিদেশীর ভাগ পূরাদস্তুর বণ্টন করা হয় তাহা হইলে আমরা আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া এ গোরগ্লানী বন্ধ করিব কিরূপে? অবশেষে কি অদৃষ্টকে সার জানিয়া এযুগেও বলিতে হইবে 'বিধাতার ইচ্ছাই এজাতির মৃত্যু.' এমন ভীষ্ম এ ভারত কে আছে যে প্রার্থনা করে ইচ্ছামরণ।

মরণোন্মুখ না হইয়া ভারতবাসী বরং 'মরিয়া' হইয়া এখন উঠিয়াছে। যে জন্যই হউক, হুদর বলে বা হুজুকে যে যাহাই মনে করুন—ভারতবাসী প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিতেছে,—অশেষ যন্ত্রণায় পলে পলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অপেক্ষা জীবন পাইবার জন্য জীবন-সংগ্রামে নিজকে উৎসর্গিত করা শতগুণে শ্রেয়ঃ, সে সাহস তাহার আজ তাহাতে মূর্ত্তিমান,—মরণের ভয়কে সে জয় করিয়াছে। সে মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছে যদি বাঁচিতেই হয় তাহাকে বাঁচিতে হইবে আপনার ভাবে। এতদিন যে মোহ প্রাণশক্তির এই শাশ্বত সত্তা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল আজ তাহা যেজন্যই হউক কথঞ্চিত যে অপসারিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রেল, মোটরকার, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিগ্রাফ, আমাদের যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সুবিধার উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইলেও আজ ভারতবাসী বেশ বুঝিতে পারিতেছে ঐ গুলিতে যে সুখের ব্যবস্থা সে সুখ প্রকৃত সুখ নহে। বরং ঐ সকল বিজাতীয় সভ্যতার পশ্চাতে অন্ধের মত অনুধাবন করিতে গিয়া ভারতবাসী শক্তির এরূপ অপব্যবহার করিয়াছে যে আজ ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া তাহাকে বুঝিতে হইতেছে এ-সভ্যতা ভারতের নাড়ীতে অসহ্য! যাহার মূলে নাই অভাবে আত্মশক্তির বিকাশ, আত্মসম্মান তাহা সুখ বা সভ্যতা যাহাই হউক মনুষ্য জীবনের চির প্রার্থনীয় হইতে পারে না কখনই। অন্যের কথা ত দূরের পরম স্নেহময়ী মাতা—শিশুজীবনের একমাত্র সহায়—তিনি শিশুকে কত যত্নে আহার করাইয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন কিন্তু মানুষ কি চিরকালই এই স্নেহশীলার স্নেহে বিমুগ্ধ হইয়া পরনির্ভর হইয়া সুখী হইতে পারে? জীবনে এমন দিন সকলেরই আসে যখন শিশু আর আহার করিতে ইচ্ছা করে না মাতার হস্তে,—সে চায় নিজের ভাবে নিজ শক্তিতে নিজ হস্তে আপন আহার্য্য আপনি গ্রহণ করিতে। জানিনা ভারতের রক্ষাকর্ত্তা জননীর মত স্নেহে তাঁহাকে আবৃত করিয়া তাহার জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন কি না, বৈদেশিক শক্তি ভাল বা মন্দ যাহাই করুন সে তর্ক তুলিয়া লাভ নাই কিন্তু এখন ইহাত স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে ভারতের অবস্থা শিশুর অবস্থা নহে—তাহার পক্ষে প্রার্থিত নহে আর পরের হস্তে ভোজন গ্রহণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে পরের সাহায্যপ্রার্থী হওয়া, সে চায় এখন আত্মশক্তিতে আত্মপুষ্টি। এই আত্মনির্ভরতাকে কেহ কেহ অসহযোগ বা হিংসার নামান্তর বলিয়া মনে

করেন কিন্তু তাহা যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট ইহা জীবের জীবনে স্বাভাবিক বৃত্তি। পোষা জন্তুর মত কেহ যদি কোনও কারণে পালকের স্বার্থপুষ্ট আচরণকে সুখের কারণ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে তাহা জাতীয় জীবনের পক্ষে সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না কখনই। মাতৃস্নেহের ন্যায় অমন মঙ্গলপ্রদ শক্তিও একদিন যখন আত্ম উন্নতির অন্তরায় রূপে বিবেচিত হয় তখন পর শক্তি, পররাষ্ট্রীয়ের প্রতি মানুষের মন যে বিমুখ হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? ইহা দ্বেষ নহে আত্মরক্ষার চেষ্টা।

যে জাতির চরিত্রে আত্মশক্তির উদ্বুদ্ধ করিবার আগ্রহ, জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা, পরিলক্ষিত হয় সে জাতি বনবাসী হইলেও সভ্য,—মানুষ। ভারতে এই ভাবের উন্মেষণ যদি উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া বিবেচিত হয় ও অঙ্কুরেই ইহাকে বিনষ্ট হইতে হয়, তাহা হইলে কঃ পন্থা! ইহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া আর অবজ্ঞা করিও না,—পরম আনন্দে আয়োজন কর ইহার পরিপুষ্টির জন্য। বৃথা আস্ফালনে আত্মশক্তির অবহেলা করিবার অবসর আর নাই ভারতের। বিশেষ ভাবে সমাহিত ও সংযত হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে এই সঙ্কট সময়ে, উত্তেজনা আবেগ দূরে রাখিয়া অতি ধীর অটল অচল ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে আজ আমাদিগকে। স্বার্থান্ধ—স্বার্থসংঘাতে আমাদের এই মহাজাতীয় জাগরণের দিনে মাঙ্গলিক দীপ নির্ব্বাণ করিয়া মহা অন্ধকারে পুনঃ যে তিমিরে সেই তিমিরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিবে সে ত স্বাভাবিক। আমরাও তাহাদের অত্যাচারে উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন খর্ব্ব না করি আমাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন চেষ্টাকে। খাই না খাই, পরি না পরি—শাক অন্ন ভক্ষ্য হয় হউক, জীর্ণ চীরে লজ্জা নিবারণ করিতে হয় সেও শ্রেয়ঃ, তথাপি আপনার শক্তিসম্ভূত নিজহস্তের দ্রব্যসম্ভারে আমার অভাব পূর্ণ হউক। মনুষ্যের সম্পদ ত নয় তাহার বাহ্যিক অশনবসনে। প্রকৃত সম্পদ যে তাহার হৃদয়ে। যে সেই সম্পদে সুখী তাহার নিকট কাচ ও কাঞ্চনে আর তফাৎ কি? সে ত সর্ব্ব বিষয়ে সুখী, স্বাধীন, স্বরাজ তাহার করতলগত। নির্ভীক তাহার হৃদয়,—সদা সন্তোষ তাহার প্রাণে বিরাজিত, সকল অবস্থায় সে আত্মসম্মানে, মনুষ্যোচিত গর্ব্বে নিজে গৌরবান্বিত। আনন্দময়ের সত্তা তাহার জীবনে অহরহঃ প্রকট; ভারত এই আনন্দ লক্ষ্য করিয়াই যুগে যুগে ছুটিয়াছে;—তাহার উক্তি;—আনন্দই সত্য, আত্মাই আনন্দ, ভারতের সিদ্ধ পিঠে ইহার প্রত্যবায় হইবে না কোন কালে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আনন্দময়ের আশীর্ব্বাদে ভারতবাসী আয়ত্ত করিতে ব্যগ্র হইয়াছে সেই শাশ্বত স্বরাজ,—হৃদয় মন আত্মার সম্পদ, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারে এমন কেহ এদিনে জগতে নাই।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
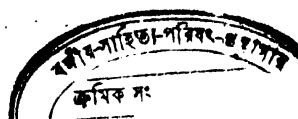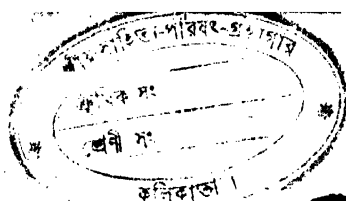
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৬ষ্ঠ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩২৮ সাল। { ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

ব্যবধান

হাসাহাসি ছুটাছুটি
ধূলাঘাসে লুটাপুটি,
নৃত্য যেন লেগে ছিল পায় ;
সেই গীত সুরহীন
গুন্ গুন্ রাতদিন
সে আরও লয়েছে বিদায়।
অনন্ত আড়াল হয়ে যায়।

২

অকারণ সে পুলক
চঞ্চল মুখ চোখ,
অঞ্চলে মোছা ছিল দায়,
স্ফূর্ত্তি সে অনাবিল
ভরে ছিল খাল বিল,
কহ্লার কুমুদের প্রায়।
আনন্দ আড়াল হয়ে যায়।

ঘুড়ি সাথে উড়ে যাওয়া
কপোতের পাছে ধাওয়া,
সে হৃদয় আর পাওয়া দায়;
তরণীর সনে ভাসা
মেঘ-সাথে যাওয়া আসা
সে পুলক পলকে মিলায়।
আনন্দ আড়াল হয়ে যায়।

দোলাদুলি দুখে সুখে
কোলাকুলি বুকে বুকে,
উল্লাসে সে মাধবী দোলায়,

নাহি আর নাহি আহা
ভেঙ্গেছে মধুর মায়া,
টান্ নাই ধনুর ছিলায়।
আনন্দ আড়াল হয়ে যায়।

৫

শৈশবের 'ও রে হাঁ রে'
অন্তর্হিত নমস্কারে
ব্যবধান কাল যে বিছায়।
নাহি সে সখার সাজ
আনন্দ অতিথি আজ,
প্রিয়জন পরিচয় চায়।
আনন্দ আড়াল হয়ে যায়।

৬

চাঁদ ডুবে যায় ধীরে
ধূসর তমাল শিরে,
কালো ছায়া জমে যমুনায়,
কেলিকদমের তল
শুধু চোখে আনে জল
বহে বায়ু করে হায় হায়।
আনন্দ আড়াল হয়ে যায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অবাক্।

-:০:-

(২)

পরদিন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া, খাতা ও বইয়ের গোছা কাঁধে চড়াইয়া, বেগম গুন্ গুন্ স্বরে কি একটা গান আওড়াইতে আওড়াইতে ত্রিতলে উঠিতেছিল, হঠাৎ সিঁড়ির পাশে দোতলার ঘরের দিকে নজর পড়িতেই, থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মাতৃদেবী নিতান্ত ভাল মানুষের মতই গায়ে একটা বিহরের লোমের কম্বল চাপা দিয়া, সেই অসময়ে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। পায়ের কাছে বসিয়া একটা বাঁদী পা টিপিতেছে।

বেগমের মুখ শুকাইয়া গেল! ত্রিতলের সিঁড়ি ছাড়িয়া সেই ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল, উদ্বিগ্নভাবে ডাকিল "আম্মা—"

জননী পাশ ফিরিয়া শুইয়া, সামনেই মেয়েকে দেখিয়া বেশ একটু সঙ্কুচিত হইলেন। খুব সহজভাবেই তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের সুরে বলিলেন "এ, আমার তেমন কিছু হয় নি,—শুধু জানটা একটু খারাপ,—"

উৎকণ্ঠার সহিত বেগম বলিল "জ্বর?"—

খুব কুণ্ঠিতভাবেই মাতা বলিলেন "ঐ, একটু—"

"হুঁ—" বলিয়া, হাতের বইগুলা সশব্দে চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিয়া, বেগম গুম হইয়া খাটের পাশে বসিল।

আম্মা আস্তে আস্তে মেয়ের পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহময় স্বরে বলিল "এখন এখানে বসতে হবে না, উঠে যা। হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে, তার পর একটু জিরিয়ে টিরিয়ে আসিস্, যা—"

কথাটায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া বেগম বাঁদীর দিকে চাহিয়া বলিল "কখন জ্বর এলো, রে?—"

সে উত্তর দিল, "তা কি করে জান্‌ব ? দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর, আমরা ঘুমিয়ে পড়িছি,—ও আল্লা ! খানিক পরে উঠে এসে দেখি, খুব জরে কাঁপ্‌ছেন্‌, আর কাশ্‌ছেন্‌ !—"

"বেশ !" বলিয়া বেগম পুনশ্চ নিঝুম।

মাতা বলিলেন "শুন্‌ছিস, ওঠ-না। মুখ টুখ শুকিয়ে যেন-কি হয়ে গেছে ! কখন সেই ছুটি দাঁতে কেটে গেছিস,—"

ফিরিয়া চাহিয়া, বেগম খুব গম্ভীর ভাবে বলিল "আচ্ছা, সকালবেলা যখনি আমি ওপর থেকে নেমে এসে দেখেছি, তুমি বারেণ্ডায় খালি গায়ে শুয়ে আছ শানের ওপর— তখনি আমি বলি নি আম্মা ?"

মাতা খুব নরম সুরে প্রতিবাদ-চ্ছলে বলিলেন "ওরে বাছা, যখন অসুখ হবার হয়, তখন আপনিই হয়। ও কি আর শানের ওপর পড়ে থাকায় হয় ? না, বারেণ্ডার খোলা-হাওয়ায় হয় ?—তোরা লেখাপড়া শিখে কি বেকুবই যে হয়েছিস্‌ !—কিচ্ছু বুঝিস্‌ না !—"

বেগম হাসিয়া ফেলিল। বলিল "তাই হবে ! কিন্তু চোখের ওপর অত্যাচার করে, এই যে তোমরা ভুগে ভুগে সারা হও, এটা দেখ্‌তে বড় কষ্ট লাগে ! এর চেয়ে যদি সোজাসুজি গলায় একটা চাকু বসিয়ে দাও, তবে সেটা বরং সইতে পারা যায় !—"

"তাই সয়ে নিস্‌, এখন উঠ্‌বি ?"

"দরকার কি ? অসুখ যখন হবার হয়, তখন আপনিই হয়, এত বড় কথাটা তুমি যখন বল্লে, তখন সেই বা সময় মত খিদে-তেষ্টার খোঁজ রাখ্‌লুম আম্মা ! অসুখ না হবার হলে, সে তো কিছুতেই হবে না, তবে আর ভয় কি ? ওরে শোভানি,—আর ওই বাগানের পচা, পাৎকুয়ার জল ছু টব এনে দিস্‌ তো আমায়।"

বাঁদী বিস্মিত হইয়া "কি করবে ?—"

"শাম্‌কো ব্যবহ আস্‌নান !"—বলিয়া বেগম খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল "কি বল আম্মা ? অত্যাচার কর্‌লে তো অসুখ হয় না, অসুখ হয় সে যখন হবার হয়, তখুনি ! আচ্ছা আমি পরখ করে দেখছি। ও রে জলটা এনে দিস্‌।"

মাতা বিলক্ষণ ব্যস্ত-বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখে এসে! বকিস্ নি যাঃ!— সোফি বলে মিছে নয়, কলেজে পড়ে তুই বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছিস্!—"

হাসিয়া বেগম বলিল "ভাগ্যে ওই উপসর্গটা আমার ছিল, তাই তোমার সোফি উঠতে বসতে জবাবদিহি করে বাঁচছে আম্মা!—নইলে ওর দুঃখের সীমা থাকৃত না! আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি আম্মা, রাগ করো না! বলি কলেজ পড়ার দোষে আমিই না-হয় বাড়াবাড়ি কর্‌ছি কিন্তু সোফি তো ইস্কুলে পড়েই মানুষ হয়েছে—ওর বাড়াবাড়ির সুর-কম্‌তিটে কোনখানে দেখতে পাও বলতো?"

এসব প্রশ্ন এড়াইতে হইলে, গুরুজনবর্গ সাধারণতঃ যা বলিয়া থাকেন মাতাও তাই বলিলেন অর্থাৎ—"বক্‌তে পারি নে বাছা, তোদের সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠবে বল?"

হাসিয়া বেগম নিরস্ত হইল। বইগুলি কাঁধে তুলিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল "সোফি, শয়তানিটা কোথা গেল রে? এ মুলুকে নাই, মর?—"

বাঁদী কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই জননী শঙ্কিতভাবে বলিলেন "কেন?—এবার চুলোচুলি সুরু কর্‌তে হবে না কি? দ্যাখ বেগম, দু মাসের হোক, দশ মাসের হোক—সে তোর বড় বহিন, তাকে এতটা থাতির-নাদারৎ চালে হতগ্রাহ্য করে চলিস্ নি! ছিঃ, ওকি......সে ছেলে-পিলের মা হয়েছে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তোর চেয়ে বেড়েছে, তার কথা শুনে চলিস্।"

মা'র কথার ভিতর একটা যে গূঢ় ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেটার পরিষ্কার অর্থ, বেগমের কাছে অতি পরিষ্কাররূপেই বহুদিন ধরা পড়িয়াছে। ওই যে সোফিয়ার কথা শুনিয়া চলিবার অনুযোগ, ওটার সূক্ষ্ম অর্থ,—সোফিয়ার কথানুসারে বেগম পড়াশুনা ছাড়িয়া বিবাহ করুক; এইটুকুই মাতার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু শিক্ষিত পিতার আন্তরিক ইচ্ছাটা ঠিক তাহার বিপরীত! তিনি চান, পুত্রদের সহিত কন্যাটিও, যতটা খুশী শিক্ষার পথে অগ্রসর হইয়া চলুক, আপাততঃ তাহাতে বাধা দিবার প্রয়োজন কি? তারপর বিবাহ? সেটা তো এক দিন আছেই! কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি কেন?

যাহার যতটুকু জ্ঞান-পিপাসা আছে, সেটুকু তাহাকে সার্থক করিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া যে, পিতৃমাতার পক্ষে অবশ্য-করণীয় ধর্ম-বিশেষ,—পিতা দৃঢ়-নিশ্চয়তার সঙ্গে এই মতবাই

প্রকাশ করিতেন। মাতা, আধা-সনাতন, আধা-আধুনিক শ্রেণীর মানুষ; ছেলেদের বিলাত যাওয়ার তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু মেয়েরা যেন আর পাঁচ জন মেয়ের মতই হইয়া চলে, এইটুকুই তাঁহার কামনা।

সুতরাং মাতার কথা শুনিয়া, বেগম বরাবর যেমন নিঃশব্দে একটু হাসে,—আজ তেমনি হাসিল। সংক্ষেপে একটা "আচ্ছা" বলিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া গা হাত ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া জলযোগ সমাপ্ত করিয়া যখন নীচে নামিবার জন্য সুপ্রস্তুত,—তখন সোফিয়া পিঠের উপর চুল এলাইয়া দিয়া ছেলে কোলে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া, দর্শন দিল। মুখে খুব খানিক অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্য টানিয়া,—মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল "এবার কি লিখন পঠন? না,—সেই হাড়-জ্বালানে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত?—কি হবে?"

"দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কর্‌ছি, দুয়ের কোনটাই আজ হবে না। সুতরাং আজ তোমার হাড়গুলো বরফ-চাপাই থাকবে।"

"অপরাধ?"

"তোমার চাচ-মহারাজটি কেমন লক্ষ্মীমেয়ের মত অসুখ যোগাড় করে শুয়েছেন দেখ্‌ছ তো?—যাই তাঁকে একটু বকুনী টকুনী দিয়ে শাসন করে রাখি গে, নইলে আবার অত্যাচার করে বাড়িয়ে তুলবেন, ভাই।"

গভীর অবজ্ঞার স্বরে সোফিয়া বলিল "হুঃ! অত্যাচার অম্নি করছেন! তাঁর কাছে বাঁদীরা রয়েছে, তোকে অত ভাব্‌তে হবে না, নে। এই তো খেটে খুটে এলি, একটু গান টান গেয়ে জিরো। আমিও একটু শুনি।"

হাসিয়া বেগম বলিল "সর্ব্বনাশ! আমার হাড়-জ্বালানে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ওপর হঠাৎ তোমার এমন অচিন্ত্যনীয় অনুগ্রহ কেন বল দেখি?—কলিজায় ছুরি টুরি বসাবার মতলবে আছ না কি?—"

অতিশয় উদাস গম্ভীর ভাবে সোফিয়া বলিল "আমার তো মরণ নাই, তাই তোমার কলিজায় ছুরি বসাবার মতলব করব! ও কলিজায় আছে কি? ও তো নিরেট পাথর!—"

হাসি মুখে বেগম বলিল "ধন্য হলুম! আহা, কি দরদী বন্ধু আমার! সত্য ভাই তুমি যে আমার কবিতার চেহারাটা চিনে ফেলেছ,—এই জন্যেই তোমার ওপর আমার বড্ড বেশী ভালবাসা পড়ে গেছে!"

সোফিয়া পূর্ব্বের মতই উদাস ভাবে বলিল "এর আর,—ভালবাসা পড়াপাড়ি কি? অত করে আধ্যাত্মিক গান গাইলে কি মানুষের পদার্থ থাকে! সে মানুষ ফকির-দরিদ্র হয়ে একেবারেই উচ্ছন্ন যায়!—"

বেগম বলিল "আহা সাধু সাধু, ভাই সোফি, আজ মোটে আমার হাতে দুটি পয়সা আছে, আর একটা পয়সা যদি দয়া করে ধার দিস্, তা হলে এখুনি বাজার থেকে একটা তিন পয়সা দামের মেডেল কিনে এনে তোকে পুরস্কার দিই! দে-না ভাই, একটা পয়সা ধার! তোর বক্তিমা শুনে আমি ভয়ানক মোহিত হয়ে পড়েছি!"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও সোফিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই অসাধারণ আত্ম-সংযম বলে, গাম্ভীর্য্যের ওজন ঠিক করিয়া লইয়া,—ভুরু কুঁচকাইয়া ধমক দিয়া বলিল "গান গাইবি?"

বেগম হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল।

খুব রুষ্ট ভাব প্রকাশ করিয়া সোফিয়া কড়া আদেশের স্বরে বলিল "হ্যাঁ, তোকে গাইতেই হবে! গা বলছি ভাল চাস্ তো!—"

"বাঃ! কি চমৎকার বাদশাই-কায়দার মেজাজ রে!—হে বাদশা, অত করে চটিতং মটিতং হোয়ো না, অবিলম্বে তা হলে বহুবিধ খটখটি ঘটিতং হয়ে যেতে পারে! এই আমি হাঁটু গেড়ে যোড় হাতে করুণ-বিনয়ের সুরে, কাতর অনুনয় জানাচ্ছি, প্রসন্ন হয়ে আজকের মত বিদায় দাও।"

"তিরকুটি রাখ্, সত্যিই গাইবি কি?"

"বাড়ীতে অসুখ ভাই, পথ ছাড়ো—"

"ওঃ! যেন আস্ত-হাকিম চলেছেন রে! 'বাড়ীতে অসুখ!—' আমার, তোর তাতে কি?"

"মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-হীনতা! সুতরাং সঙ্গীত চর্চ্চায় নিরুৎসাহতার দুঃখ!—"

"সত্যি সত্যি চললি ?—"

"অবশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"—বলিতে বেগম পাশ কাটাইয়া, দুয়ারের দিকে, অগ্রসর হইল ; সোফিয়া চক্ষের নিমেষে ফিরিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "আ-মোলো-রে ! বল্লে কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না ? সাধে যেতে বারণ করছি, হাকিম এসেছে যে !"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া, বেগম সংশয়ের স্বরে বলিল "সত্যি সত্যি, না মস্করা হচ্ছে ?—"

"তোমার সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা ! গলায় দড়ি আমার !—এখন নে, গান যদি না গাস্, তবে দু একখানা ভাল বই-টই দে, আর একটু পড়্ব।"

"আহা বইগুলোর আজ কি সৌভাগ্যের দিন, না ! কিন্তু হায় হায় ! তোমায় দিয়ে খুশী করতে পারি এমন ভাল বই যে আমার কিছুই সংগ্রহ করা নেই দাদা !—"

আলমারীর চাবিটা খোলাই ছিল, সোফিয়া ছেলে কোলে করিয়া, আলমারীর এদিক ওদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিল "এই লাল রংএর বইখানা দেখতে তো বেশ দিব্যি, পড়তে কেমন রে ?"

"তোবা তোবা ! ও-বই ছুঁয়ো না, তোমার মোটেই পছন্দ হবে না—ওটা রাখো।"

"কেন ? আধ্যাত্মিক ?"

"কাছাকাছি বটে।"

"অর্থাৎ ?"

বুঝে-পড়বার বই !—না বুঝে গড়গড়িয়ে পড়ে চলবার মত ওখানা আদপেই নয়। ও বইয়ের দাম আদায় করতে হলে, পাঠকপাঠিকার মন আর মগজের দস্তুর মত Exercise দরকার।"

"তবে, এটা আমার চাই না বাপু ! 'না বুঝে পড়বার' মত কিছু নাই ? এই যেমন, বর-কনের ঝগড়া-ঝাঁটি, ভাব-সাব, ছেলে-পিলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা,—এমিতর ? নাঃ, তুমি ফকীর-সন্ন্যাসী মানুষ, তুমি বুঝি এ সব-খবরের বই রাখো না ?"

সমর্থন সূচক ভাবে ঘাড় নাড়িয়া, একটু গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "রাখি, যদি ঐ ছেলে পিলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা ব্যাপারটার মধ্যে, বাপ মা'দের নিজের নিজের

২

যোগাতার ওজন না-বুঝে চলার জন্যে যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা, এবং রীতিমত সুশিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত দেখি—তা হলে রাখি।"

অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া সোফিয়া বলিল "আচ্ছা, তোদের ঐ লেখাপড়া শিখে হেঁয়ালী হয়ে ওঠার জন্যে, গালটাল দিয়ে, যাঁরা বই লেখেন, তাঁদের বই কিছু রাখ্‌তে পারিস না? নাঃ, সে যে লাগে-লাগে নয়?"

সুপ্রসন্ন হাস্য সুন্দর মুখে বেগম সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "কিছু মাত্র নয়! আমাদের মধ্যে যাঁরা লেখা পড়া শিখে শিক্ষার মর্যাদা আর দায়িত্ব ভুলে গিয়েছেন,—অন্যায় করা আর অন্যায় সওয়ার অনাচার থেকে জীবনের—পথ বাঁচিয়ে চল্‌বার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে যাঁরা জবাই করে চলেন, তাঁদের দুর্ব্বুদ্ধির পিঠে যিনি সুবিচার আর ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে চাবুক কস্‌তে চান, তাঁর হাতের গোড়ায় চাবুক এগিয়ে দেবার উৎসাহ আমার যথেষ্টই আছে,—কারণ, ওই চাবুকটা আমাদের হিতৈষী বন্ধুর কায করে! কিন্তু কই ভাই,—কই সে উদার প্রাণ? শিক্ষাভিমানীর দাম্ভিকতা,—মেয়েদের শিক্ষার ওপর যখন নির্ব্বিচারে অন্ধ-বিদ্বেষে ঈর্ষা প্রকাশ করতে উল্লসিত হয় দেখি, তখন সে উল্লাসের পায়ে ভক্তি-নিবেদন করবার কোন উৎসাহই আমার থাকে না! তা সে তিনি, তোমার এম, এ, বি, এল,—যিই হোন আর যিনিই হোন!—দেখো ভাই রাগ টাগ কোর না, কথাগুলো আমার কিছু বেশী রকম স্পষ্টাস্পষ্টি হোয়ে গেল, এতটা না হলেই ভাল হোত বোধ হয়।"

সোফিয়া ক্ষণেকের জন্য অবাক্ হইয়া,—হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল "আচ্ছা বেগম,—কথার কথা বল্‌ছি,—মনে কর, একটা যদি ঘোর স্ত্রীশিক্ষা-বিদ্বেষী মানুষের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তা হলে?"

"তা হলে, সচরাচর যা ঘটে থাকে, আমারও তাই ঘটবে,—হয় ফাঁসি, নয় দ্বীপ-চালান্!"—কথাটা বলিয়াই সে চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িয়া, আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিয়া, হাসি হাসি মুখে বলিল "আচ্ছা সোফি, এই অবেলায় চুল বাঁধা নাই, ছেলের গায়ে জামা পরানো নেই,—হঠাৎ আমার কাছে ছুটে এসে যে আড্ডা জমাতে বস্‌লে, এর মানেটা কি বল দেখি?"

সে ফিয়া একটু হাসিয়া বলিল "দ্যাখ্ বেগম, তোকে আমি ভালবাসি না বটে, কিন্তু তোর কথাগুলোকে আমি বড্ড ভালবাসি। সংসারের কায করতে করতে কেবল মনে হয়, তোর কাছে ছুটে এসে, দুটো কথা শুনে যাই।"

হাসিয়া বেগম বলিল "আরে চুপ! চুপ! তোমার এম, এ, বি, এল, শুনতে পেলে, আমার বেশ খাটিয়ে ছাড়বে!"

সোফিয়া হাসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "অচ্ছা বেগম, তোর যেমন মাথা খুঁড়ে কথার ফোয়ারা ছোটে, তেমনি যদি একটা ক্ষুরের ধার বুদ্ধওলা লোক—"

"রক্ষে! ওটা ঐ পর্য্যন্ত থাক,—কারণ এবার নিশ্চয় ঐ সূত্রে তোমার সেই এলাহাবাদী ফুটবল-খেলওয়ার দ্যাওর-টির কথা এসে পড়বে! দোহাই তোমাদের বেকি, রাতদিন বিয়ের কথা মোটেই ভাল লাগে না ভাই।"

"তুমি এক আশাঘা-গোখরো! একটা কাযের কথা তুললেই, অমি ফোঁস্ করে উঠতে চাও!—"

"তা নইলে তোমাদের মত মুরুব্বিদের Surroundings এর মধ্যে বাস করে, আত্মরক্ষার পথ কৈ! দিন নেই, রাত নেই, সকাল নাই সন্ধ্যা নাই, খালি—বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে! কেন যে বাপু, দুনীয়ায় কি মানুষের করবার কায আর কিছু নাই? আরে, খেলে-যা কচুপোড়া, বিয়ে দিবি, তা আগে বিয়ের যোগ্য করে মানুষ গড়ে তোল্! তা নয়, সকলটাই আলুথালু ফক্কর দালালী!"

"বলি, মানুষ করে গড়তে গড়তে বয়স যে এ ধারে পঞ্চাশ পার হতে চল্ল?"

"তা হোক্, আমি একশো বছর বয়েসে বিয়ে করব সেও ভালো, তবু যতক্ষণ-না বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছি বুঝব, ততক্ষণ কিছুতেই বিয়ে করব না।"

"দ্যাখ্ বেগম, তুই ভয়ানক-উদ্ধত হয়ে উঠেছিস্"

"তোরা নম্র থাকতে দিলি কৈ, ভাই? কিন্তু আমার ওপর তো খুব রাগ ঝাড়ছ, ওদিকে খালি-গায়ে ছেলেটাকে নিয়ে যে বেড়াচ্ছ, ওর নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরছে যে, হুঁস আছে সে দিকে?"

ছিল না বটে, কিন্তু এইবার হইল। হেঁট হইয়া আঁচলের খুঁটে ছেলের ঠোঁট নাক পরিষ্কার করিতে করিতে, সোফিয়া অপ্রসন্ন ভাবে বলিল "আর পারি নে ভাই, দিনরাতই ছেলেদের অসুখ, জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।"

গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "অসুখ হয় কেন? অত্যাচার অনিয়ম থেকেই তো? ছেলেদের এই অত্যাচার অনিয়মের জন্যে দায়ী কে? মায়েরা নয়?—"

"তুই আর চিপ্‌টেন্ ঝাড়িস্ নি বাপু, থাম।"

"এর বেলা চিপ্‌টেন্! আর উনি যখন আমাদের শিক্ষা চর্চা অপরাধটার জন্যে হাড়ের ভেতর চিম্‌টি কেটে কোটি চিপ্‌টেন্ ঝাড়েন, তখন সেগুলি ঠিক 'আজানের' পবিত্র মধুর ধ্বনি! দ্যাখ্ সোফি, এই যে ঃরগিজ্ আমার কথা শুনে চলছিস্ না, এই ছোট বেলা থেকে, ছেলে গুলোকে অসাবধানে অনিয়মে ভুগিয়ে ভুগিয়ে জখম্ করে রাখছিস্, এর ফল তোকে হাড়ে হাড়ে ভুগতে হবে।"

সোফিয়া রাগিয়া বলিল "থাম্, থাম্,—ছেলে পিলের মা হয়ে যদি সংসারের ভার ঘাড়ে নিয়ে উপদেশ ঝাড়তিস্, তা হলে সহ্য করতে পারতুম—"

বাধা দিয়া বেগম বলিল "অর্থাৎ তোমাদের কাছে, সব চেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে, আমাদের এই,—বিয়ে না-করা টা, কেমন?—"

"নিশ্চয়, সেই-যে কি একটা কথা আছে, যে 'রণক্ষেত্র হতে দূরে, দাঁড়ায়ে কৃপাণ হাতে, উপদেশ দেওয়া বটে, বড়ই সহজ কথা—' তোরা হচ্ছিস্ সেই দরের বীর-বক্তার! হ'না আগে আমাদের মত সংসারী, হাতে-কলমে কায করে দৃষ্টান্ত দেখা, তারপর তোর উপদেশ শুনব। এখন তুই নিজেই ছেলে মানুষ!—তুই আবার আমাদের ছেলে 'মানুষ' করার কি বুঝিস্ যে রাত দিন ট্যাক্‌ট্যাক্ করে বচন ঝাড়িস্!"

একটু হাসিয়া বেগম বলিল "দ্যাখ সোফি, তোমার মত আমার স্মরণশক্তিটা এত কাঁচা নয় যে এর মধ্যে সেই ল্যাজ কাটা শেয়ালের গল্পটা ভুলে যাব। তুমি যতই চুটিয়ে চোবল্ বসাও,—আমি যে অগ্নি বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটিয়ে চট্‌পট্ বিয়ে করে ফেলব, এ কথা, মনেও কোর না!"

সোফিয়া যেন কতকটা হতাশ এবং নিরুপায় হইয়া-ই, নিতান্ত বিপন্নভাবে বলিল "ভাল, তা হ'লে এখন ক' গো বছর বয়েসে তুমি বিয়ের যোগ্য সাবালক্ হবে শুনি ?"

"সে সম্বন্ধে, আপাততঃ কোন গ্যারান্টি দিতে পারছি নে, তবে মোটের মাথায় এই বল্‌তে পারি, শীঘ্রী তোমার ছেলেটার গায়ে জামা দেওয়া দরকার হয়ে প'ড়েছে। আর আমাকেও রোগীর সেবায় চল্‌তে হবে,—অবিলম্বেই !"

"মর্-গে যা, তোদের দ্বারা যদি সংসারের একটা উপকারের আশা আছে !"

"আহা—ঠিক বলেছিস্ ! অযোগ্য অবস্থায় বিয়ে করে পাল-খানেক রুগ্ন, নির্জ্জীব অযোগ্য, দুর্ব্বল সন্তান সৃষ্টি করে, তাদের মরণ বাঁচনের ধাক্কায় সংসার শুদ্ধ আত্মীয়দের প্রাণ সমূলে। দায় করে তোলাই যে হচ্ছে,—সংসারের একমাত্র মহদুপকার-সাধন ! সত্যি সোফি, তোমরা যে রকম নির্ভাবনায় নিঃস্বার্থ করুণাময়ী-রূপে সংসারের উপকার করবার ব্রত গ্রহণ করেছ, তাতে, এই রকম নির্ভাবনায় চোখ বুজে আর কিছুদিন চল্‌লেই বোধহয় চণ্ডীখানার চেহারা সদ্যঃ সদ্যঃ ফিরে যাবে ! ভাবনা চিন্তে করবার কোন কারণই আর থাক্‌বে না !—"

"দ্যাখ্ ঐ 'ছেলের মত হাত পা, আর বুড়োর মত কথা'—আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারি না ! শরীর জ্বলে যায় আমার, তোর ঐ বুড়োমি দেখে !"

দুয়ারের দিকে মুখ বাড়াইয়া, ব্যঙ্গভরা অনুচ্চ স্বরে বেগম হাঁকিল "ওরে কে আছিস্, মণ-খানেক বরফ নিয়ে আয়, সোফির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে !—"

"থাম্ ! তোর ভিরকুটি আমি বার করে দিচ্ছি ! মুরুব্বিদের কাছে, তোর নামে, এখন গোটা কতক কথা লাগাচ্ছি, যে, ঘাড় হেঁট করে তোকে বিয়ে কর্‌তে হয় কি না তা দেখে নিচ্ছি !—"

"বহুৎ আচ্ছা ! হে করুণাময়ি, সংসারের অনেক উপকারই তোমার দ্বারা সংসাধিত হয়েছে, এবার এই উপকারটা যদি কর্‌তে পার, তা হলেই তোমার নারীজন্মটা সার্থক হয়ে যাবে ! পৃথিবীতে একটা অমর কীর্ত্তি রেখে যেতে পারবে ! চলো এখন।"

(৩)

কিন্তু সোফিয়ার তর্জ্জন গর্জ্জন বেশীদূর পর্য্যন্ত গড়াইবার সুবিধা হইল না। মনের কথা-গুলা বলিবার জন্য সে যখন সাজিয়া গুজিয়া অসুস্থা পিতৃব্য-পত্নীর রোগ-শয্যার পাশে উপস্থিত হইল, তখন বেগম কোথা হইতে আচমকা বাজবোরীর মত আসিয়া পড়িয়া, এমন অদ্ভুত ব্যঙ্গ-তৎপরতার সহিত সোফিয়ার অভিযোগটাকে সমর্থন সুরু করিয়া দিল যে 'মেয়ে ছটার জ্বালায়' মাতা বিশেষ বিব্রত হইয়া, মোকদ্দমা ফাঁসাইয়া দিলেন। পরাজিতা সোফিয়া অগত্যা রাগে আগুন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল, বেগমের কেতাবের আলমারীতে সে আগুন ধরাইয়া দিবে।—

বেগম হাসিয়া জয়জয়াকার দিয়া, তৎক্ষণাৎ এক ডজন দেশলাই আনিয়া সোফিয়াকে উপহার দিবার প্রস্তাব করিল; সোফিয়া আরও জলিয়া গেল! কিন্তু গুরুজনের সামনে গালাগালি, খুনোখুনি, চড়চাপড় তো চালান যায় না, তাই নিরুপায় ক্ষোভে ফুঁসিতে ফুঁসিতে কোন গতিকে পিতৃব্য-পত্নীর কান বাঁচাইয়া বেগমকে সম্বৎসরের মধ্যে পতিপুত্র লাভের অভিসম্পাৎ দান করিয়া দ্রুত অন্তর্দ্ধান হইল।

তারপর আর এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবসর কাহারও জুটিল না। যেহেতু মাতার সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা হইয়া বেগম রহিল অনন্যমনস্ক হইয়া,—আর সোফিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল তাহার ছোট ছেলেটির সর্দ্দি কাশি, আর বড় ছেলেটির পেটের অসুখ হইয়া! সোফিয়া একলা দুটি ছেলের অসুখের শুশ্রূষা সামলাইয়া উঠিতে পারিত না, সেজন্য বাড়ীর অন্য মেয়েদের সঙ্গে বেগমকেও এ বিষয়ে নজর রাখিতে হইত, এবং এই সুযোগে সে সন্তান পালনে—সোফিয়ার প্রত্যেক অযোগ্যতা-ত্রুটির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এমন চোখা চোখা বচন-বাণ বর্ষণ করিত যে সোফিয়ার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইত! এক দিন ক্ষোভের আতিশয্যে বেচারা মুক্তকণ্ঠেই বলিয়া ফেলিল "নাঃ, বেগম, তুই বেশ আছিস্, অল্প বয়সে তোরা কেউ আর বিয়ে করিস্ নি।"

বেগম উদার চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আক্ষেপটা ক'দিনের জন্য স্থায়ী হোল?"

নিদারুণ আক্ষেপের সহিত সোফিয়া উত্তর দিল, "তোর যদ্দিন খুশী!"

বাড়ীর রোগী কয়টি ক্রমশঃ একে একে ভাল হইয়া উঠিল, এবং সোফিয়ার বড় ছেলেটি যখন বেগমের মাতার দৌর্ব্বল্য-নিবারণের জন্য প্রত্যহ দুঠো করিয়া কঞ্জুস্ ছক্কণের পরামর্শ দিয়া, বাড়ীশুদ্ধ সকলকে আবার হাসাইয়া তুলিল,—তখন বেগম ছেলেটির সুবুদ্ধির পুরস্কার স্বরূপ, ছেলেটির পিতৃদেবের নূতন নামকরণ করিল "ফাজিলের সর্দ্দার!"

সে ভদ্রলোকটির সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে বেগমের কোন পরিচয় না থাকিলেও, প্রত্যেক সপ্তাহেই বেগম তাঁহার জন্য অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন নাম আবিষ্কার করিত। সৌভাগ্যের বিষয়, সেগুলা সোফিয়া ছাড়া আর কাহারও কাণে উঠিত না, এবং স্মরণ শক্তির দৌর্ব্বল্য বশে সোফিয়া বেচারা সেগুলা প্রায়ই শ্রবণ মাত্রেই বিস্মরণ হইয়া যাইত, সেজন্য বেগমের পক্ষে অকুতোভয়ে রসনা পরিচালনের বেশ সুবিধাই ছিল।

সেদিন রবিবার। পূর্ব্বদিন পিতা কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন, আজ সোফিয়ার স্বামীকেও তাঁহার উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইবে। বেলা এগারটার সময় তাঁহার রওনা হইবার কথা, সেজন্য যাত্রার আয়োজন গুছাইয়া দিতে সোফিয়া নিজালয়ে সকাল হইতে ব্যস্ত আছে। সোফিয়ার বাড়ীটা বেগমদের বাড়ীর পাশেই।

বেগম সকাল হইতে যথানিয়মে নমাজ সারিয়া নিজের মনে পড়াশুনা করিল, তারপর স্নানাহার শেষ করিয়া, হাত পা ছড়াইয়া বিছানায় শুইয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া,—যখন দেওয়াল ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক এগারটা বাজিয়াছে, তখন উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল,—

"মাননীয়াসু—

তুই কি করছিস্ রে সোফি? অনেকক্ষণ ঝগড়া করতে পাই নি, তাই মনটা উস্ খুস্ করছে! এবার শীগ্‌গীর—করে আয় ভাই। যদি না আসিস্, তবে বড় নিন্দা হবে, কুৎসা হবে,—ভাল চাস্ তো আয় বলছি, শীগ্‌গীর আয়! ইতি

সেবিকা—বেগম।"

চিঠিখানা লেখা শেষ করিয়া, বেগম বেশ প্রসন্ন-সুগম্ভীর মুখে সেটাকে আগাগোড়া পাড়িল। তারপর সেটাকে টেবিলের এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া, একটা রঙিন্ খাম লইয়া, খুব যত্ন সহকারে ধরিয়া ধরিয়া ছাপার অক্ষরের মত সুন্দর হরফে সোফিয়ার নাম লিখিয়া, তার নীচে লিখিল "কেয়ার অফ্ জনৈক ফাজিলের সর্দ্দার, উকীল।"

বেগম যখন একান্ত মনোযোগে এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যস্ত, তখন পিছনে নরম জুতার মৃদু ধ্বনি সহ একটি সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব ঘটিল। বেগম তাহার আগমন-শব্দ মোটেই টের পাইল না দেখিয়া, মেয়েটি কৌতুক-স্মিত মুখে আস্তে আস্তে আসিয়া চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। টেবিলের চিঠিখানার উপর নজর পড়িতেই, সে কৌতূহল ভরে ঝুঁকিয়া, নিঃশব্দে চিঠিখানা পড়িয়া লইল। তারপর বেগমের কাঁধে আস্তে চাপড় ঠুকিয়া বলিল "বাঃ, বেশ চমৎকার! একেবারে আপাদ-মস্তক বিনয় ভরা, চিঠি!—"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া বেগম বলিল "Oh dear! তুমি! মূর্ত্তিমতী মিস্—তোবা! মিসিস্ সুনীতি গুপ্তা!—"

হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি সলজ্জভাবে বলিল "মোটেই না! বাপ মা আমার নাম রেখেছেন সুনীতি রায়! আপাততঃ চেয়ারটা—"

"নিতে পার অবশ্য; কিন্তু সুনীতি তুমি মোটেই নও, তা হলে ইষ্টুপীড্ মেয়ের মত লেখাপড়া ছেড়ে সাত সকালে বিয়ের জন্যে সাজ-গোজ করতে বস্তে না! বরং বাপ মার দেওয়া অমন সুন্দর নামটার সার্থকতা যাতে রক্ষা হয়, সেই চেষ্টাই দেখ্তে!—" এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের মতন বেগে কথাগুলা উচ্চারণ করিয়া, বেগম গম্ভীর ভর্ৎসনার স্বরে বলিল "কি দরকার ছিল বল দেখি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবার? বিয়ের জন্যে তোর,—কি লাট গঙ্গামণ্ডল তালুক বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল, আমায় বল্!—কি এমন পণ্ডিত হয়েছিস্ যে তাড়াতাড়ি এইখানেই লেখাপড়া ছাড়ছিস্?"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মেয়েটি সলজ্জ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল "কেন? বিয়ের পর কি আর লেখাপড়া হয় না?"

"হয়! যেমন সোফি টোফিদের হয়েছে।—পড়া বলে পড়া-সে!—একদম্—'স্বর্গ থেকে প—ত—ন্'—চমৎকার পড়া!"

সুনীতি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "আহা তোর কবে এমন পড়ার দিন হবে বেগম ?

বেগম একটু হাসিয়া বলিল "সন তারিখ এখন ঠিক করে বল্‌তে পারছি নে। তবে আমায় যদি পড়তে হয় তো, স্বর্গবাসের মত কায়েমী যোগাতাটা লাভ করেই, তবে পড়তে বস্‌ব, নচেৎ নয়! তোমাদের মত ননসেন্সী চালে ও-পথে চল্‌ছি নে!" কথাটা বলিয়াই বেগম হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "দাঁড়া, সোফিকে ডাকি,—সে পুরোণো পাপী, তোমার মত নূতন পাপী তার দলভুক্ত হতে যাচ্ছে শুনলে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে সে এখনি তোমায় দুশো 'থ্যাঙ্কের' ফার্ষ্ট প্রাইজ্ দিয়ে বস্‌বে!"

"আর তুমি ? হাজার দুই গলাধাক্কা ?—"

"সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ আছে ? হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কর্ত্তব্য যা, তা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তেই সম্পাদন করব। বস, এখন আমি আস্‌ছি।—" বেগম সদ্যঃ লেখা চিঠিখানা খামে মুড়িয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল "এখন নতুন বিয়ে করতে চলেছ,—এই বেলা প্রাণ খুলে চীৎকার করে তোমাদের সেই 'পিয়াসা তিয়াসা' নিয়ে রচা, বাঁধা গৎ' এর স্ফুর্ত্তির গানগুলো মনের সুখে গেয়ে নাও! কারণ, —"

যোড়হাত করিয়া সুনীতি বলিল "দোহাই বেগম আমাকে ঠাট্টা ঠুট্টা যা কিছু করতে চাস্, আড়ালেই সবটা করে নে ভাই, সোফি দি'র সামনে কিছু বলিস্ টলিস্ নি আমার ভয়ানক লজ্জা করে!"

সুগভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বেগম বলিল "তাই না কি? এখনও 'সলজ্জভাবটা' থাকে রইছে!—নাঃ, লক্ষণ মোটেই ভাল নয়! সোফিকে জরুরী তলব জানাতে হচ্ছে, এ সব ব্যাধির ঝাড়্‌ফুঁক তুক্‌তাকে সে বিলক্ষণ ওস্তাদ আছে!"

সুনীতি বিপন্ন-বিচলিত ভাবে বলিল "দ্যাখ্ পালাব, তা হলে এবার "

দারুণ অভিমানের সুরে বেগম বলিল "তা কি আর জানি নে গো ঠাকরুণ। প্রাণ তোমার এখন সদাই পালাই পালাই করছে, তুমি কি আর তোমাতে আছ ? নেহাৎ চক্ষুলজ্জার দায়ে একবার দর্শন দিতে এসেছ, তাও ছল চাওয়া মনসা ঠাক্‌রুণটি সেজে!"

হাসি মুখে সুনীতি বলিল "দ্যাখ্ বেগম, এবার মুখোমুখি ছেড়ে হাতাহাতি সুরু করতে হবে, না হলে তোর মুখ বন্ধ করবার উপায় নাই!—"

"ধ্যাঃ! তোমরা গোষ্ঠিসুদ্ধ সবাই দুনীয়ার সমস্ত কায ফেলে মনের সাধে একযাই বিয়ে করে চল,—আর আমি খুশী হয়ে দুহাথ্ হাত তালি পিটিয়ে চার লাখ বাহবা দিয়ে একটানে তারিফ্ করি, কেমন? দ্যাখ্, দশ বছর বয়েস থেকে আমার সঙ্গী সাথীদলের বিয়ে সুরু হওয়া দেখে আসছি প্রথম প্রথম বেশ আমোদ লাগত,—রাত জেগে বন্ধুদের "শুভ বিবাহে প্রীতি-উপহার" রচনা করতুমও ঝুড়ি ঝুড়ি! এগার বছর বয়েসের নেহাৎ নাবালক সরলাটার বিয়ের সময় প্রীতি উপহার লিখ্‌তে গিয়ে, অকুতো ভয়ে বুক ঠুকে কবিবর নবীন সেনের বই থেকে 'কোট' করে দিয়েছিলুম:—

"এতদিন এ অরণ্যে করিয়া ভ্রমণ,
স্থানে স্থানে মরীচিকা করি দরশন।
বেড়েছিল তৃষ্ণা তব, সুখের কারণ
জুড়াও,—পেয়েছ এবে অমৃত সদন।"

"সেই এগার বছর বয়েসে সরলার মত একটা আস্ত বোকা জীব, যে কি 'মরীচিকাই' জীবনে দেখবার সময় পেলে, আর বিয়ে থেকে কি 'অমৃতসদন'ই লাভ করে কৃতার্থ হয়ে গেল,—তার বিচার বিবেচনায় আমার লেশ মাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বিয়ে বাড়ীর পাঠক পাঠিকা'রা দেখলুম, আমার চেয়েও বেশী কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন! তাঁরা কবিতা পড়ে, এইসা তারিফ্ ঝাড়্‌লেন, যে দুঃখের কথা বল্‌ব কি,—মগজে রক্ত চড়ে আমি সাত দিন ঘুমুতেই পারলুম না!—"

বিদ্রূপের স্বরে সুনীতি বলিল "তারপর, আট দিনের দিন ঘুমটা অবশ্য ভাল রকমই হয়েছিল?"

"খুব ভাল রকম! কারণ সেই দিন সরলা শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে, তার দোজ-বরে বর, সপত্নী সন্তান চতুষ্টয়, এবং পরম পুণ্যশীলা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করে, 'অমৃত সদনের' রহস্যভেদ করে ফেল্লে যখন, তখন ভয়ে বুকের রক্ত এমন শুকিয়ে গেল যে, ঘুমিয়ে পড়ে স্বস্তি লাভ করা ছাড়া আর পন্থা খুঁজে পেলুম না! সেই থেকে বিয়ের পদ্য লেখার সথ্ জন্মের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!—"

প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ সুরে, কপট অনুনয়ের সহিত সুনীতি বলিল "আমি অনুরোধ কর্‌ছি ভাই,—আমার বিয়েটার একটা 'আনন্দোচ্ছ্বাস' টানন্দোচ্ছ্বাস লিখে উপহার দিস্।"

"দেব! দস্তুরমত আনন্দোচ্ছ্বাস 'টের' পাইয়েই দেব! চাঁদের আলো, মলয়ের হাওয়া কোকিলের ডাক,—সব কটাকে গলা টিপে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদেয় করে সোজাসুজি নিরেট গদা ভরা Life is dutyর ছবিখানা চোখের সামনে উজ্জ্বল বর্ণে এঁকে দেখিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি সুরেই বল্‌ব,—"ওগো অসময়ে বিয়ে করবার জন্য, একান্ত অত্রাহি,—কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বর্জ্জিত, বাংলার অকালকুষ্মাণ্ডদ্বয়! আর দিন কতক সবুর করে, জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে, একটু যোগ্যতর হয়ে বিবাহটা কর্‌লেই কি, এটা সত্যিকার 'শুভ বিবাহ' হোত না? এই যে শরীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান অর্থ বিজ্ঞানকে আড়ে গিলে 'লেইফ্ফে-ঝেইফ্ফে' সাত-তাড়াতাড়ি তুফানে নৌকো ছেড়ে বাহাদুরী কর্‌তে যাচ্ছ,—মাঝ দরিয়ায় কালাপানির ঢেউয়ের তোড় সাম্‌লে চলবার মত শিক্ষা এবং শক্তিটা অর্জ্জন করা হয়েছে কি? না, ব্যস্ততার তাড়ায় সে-সবের তোয়াক্কা না রেখেই, দুই ষ্টুপীডে দুজনের চোখ কাণা করে, অন্ধে অন্ধা ঠেলিয়ে নির্জ্জলা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছ?—"

সুনীতি বাধা দিয়া ব্যস্ত বিব্রত হইয়া বলিল "আহা, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই আমি কারুর চোখ কাণা করে দিতে যাব! বয়ে গেছে আমার! স্যাখ বেগম যাকে যা বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল গে যা, আমায় কিন্তু, কিছু বল্‌তে পাবি নি, খবর্দ্দার! আমি ও-সবের কিছু জানিনে।"

বেগম খুব বিজ্ঞ ভাবে বলিল "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে টের পেয়েছি, এই যা কথা! তোমার সন্দেহ থাকে,—বিয়ের গোলমাল চুকে গেলে ফুরসৎ' মত সে ভদ্রলোকের সঙ্গে মোকাবিলা করে নিও, তখন তো মুখোমুখি কথা বল্‌তে পার্‌বে বেশ চট্‌পট্ করে?

সুনীতি সকোপে বলিল "তোর ঠ্যাং ধরে আছাড় লাগাতে পার্‌লে তবে আমার গায়ের জ্বালা মেটে!"

"দোহাই মিসিস্ গুপ্তা! তুমি না হয়, বিয়েই করছ, তাই বলে গরীবের ঠ্যাং দুখানা যেন আহ্লাদের চোটে জখম করে দিও না ভাই! আমায় এখন নিজের-পায়ে হাঁটতে হবে,—বহুদূর!"

"কিন্তু এই বহুদূরের মাঝখানেই কেউ যেন আচমকা রক্তোদ্ধ এসে তোমার গলা টিপে—"

"থাম্! থাম্! বেকায়া আর কাকে বলেরে? 'বিয়ের-কল' তো নয়, যেন শিকারী বুল্‌ডগ্‌টি! চুপ্‌ করে, বিয়ের কবিতাটার উপসংহারটা কি হবে শোন—"

"আর উপসংহারের উপদ্রব সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না, তুই দূর্‌ হ। সোফিদি'কে ডাক, তিনি তোর চেয়ে ঢের বেশী ভদ্দর-সদ্দর। খবর্দ্দার বল্‌ছি তাঁর সামনে বেয়াড়াপণা করিস্‌ নি।"

"সে দেখা যাবে।"—চৌকাঠ ডিঙাইয়া দুয়ারের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া, বেগম প্রচ্ছন্ন দুষ্টামীর হাসিমাখা মুখে সবিনয়ে বলিল "কবিতার উপসংহার সোফির সামনেই আওড়াব কি বল দোস্ত? হাজার হোক্‌ সে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী সিনিয়ার! আমার নির্জ্জলা গদ্যভরা কবিতাটার ওপর তার মতন ভুক্তভোগীরা কি মত প্রকাশ করে,—সেটা জেনে নিতে হবে, কেমন?—"

"তা হলে আমার পক্ষে এই বেলা চম্পটদানই পরম শ্রেয়ঃ। কি বল?—"

"স্বচ্ছন্দে যাও! আমিও সকলের সামনে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দিচ্ছি, যে রবিবারে শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলে একটি 'ভদ্দর-আদ্‌মি' সুনীতিদের বাড়ীতে এসে হাজির হন,—"বহুদূর হতে বহু আশা করে!" সুনীতি তারি টানে, তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে,—শুধু মাত্র "বারেক ফিরিয়া চাহিতে!"

"দ্যাখ্‌ বেগম—"

"চোখ রাঙিও না বন্ধু, কথাগুলা অত্যন্ত স্পষ্টাস্পষ্টি রকমে উচ্চারণ কর্‌তে হচ্ছে, বড় দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে না বল্‌লে,—তোমাদের আহাম্মকী ব্যাধির দাওয়াই বাৎলানো যাচ্ছে না যে!—"

সুনীতি অধীর ভাবে কি একটা কথা বলিতে গেল, কিন্তু বেগম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অনাদৃতা।

—:*:—

আমার সময় ফুরিয়ে আসে অই
তোমার কখন সময় হবে বল ?
তোমার অবসরের আশে আশে
তারুণ্য মোর ক্রমেই গত হলো।
ফুল পরেছি দুল মাকড়ি ছ ড়ি
পরি না আর চওড়া পেড়ে শাড়ী,
দেখ কোণের বৌটি নহি আর
অটল ঠাকুর বারেক তুমি টলো।
বেঁধে এ চুল নানান রকম করে'
পান খেয়ে আর কাঁকণ জোড়া পরে'
ঘুরে বেড়াই তোমায় টলাইতে
প্রাণের তিয়াষ ছটু ফটিয়ে মলো।
কথার জবাব দাও না কভু হেসে'
কইলে কথা তপ বুঝি যায় ভেসে,
দেবেন্দ্র পদ হারাবে হায় শেষে
তাই রোষে কি আগুন হয়ে জ্বলো।
মরেছে যে হাজার বছর আগে
তারো লাগি অশ্রু তোমার জাগে
বিরহিণীর জন্য ফাটে হিয়া,
প্রিয়ার বুকে শুধু পাষাণ ঢলো।
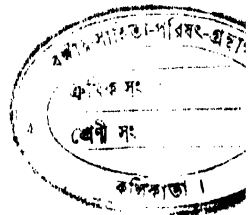
খাতা পুঁথি পত্র কেড়ে নিয়ে
ইচ্ছা করে পোড়াই আগুন দিয়ে
দেখি আমি কি নিয়ে বা থাক'
কেমন ক'রে হেলা করেই চলো।

শ্রীকালিদাস রায়।

দেশীয় রাজ্য।

(২)

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক হইবে—দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে এই বিস্তীর্ণ ভারতের শাসন সংরক্ষণের ভার দিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা তাহার অনুকূল হইবে কিনা এবং তাঁহারা সে গুরুভার বহন করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত আছেন কিনা! গুটিকয়েক আদর্শ রাজ্যের বর্ত্তমান সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে ভারতীয় নৃপতিগণ যে রাজ্য শাসনে ও প্রকৃতিপুঞ্জের অশেষ কল্যাণ বিধানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে বিষয় আর কাহারও দ্বিধা থাকে না, এমন কি অনেক শিক্ষিত ইয়োরোপীয়ান পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গের ধীরতা দেখিয়া সে কথা স্বীকার করেন—কিন্তু এসব রাজ্য ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ এখনও সেরূপ উন্নতমনা (অবশ্য আধুনিক মতে) হইতে পারে নাই বলিয়া অধিকাংশ ভিন্নদেশীয় ও ভারতবাসীর বিশ্বাস। অবশ্য তখনকার ভাবের কথা বলা যাইতেছে যে এই সব শ্রেণীর নৃপতিবৃন্দকে, আমার বিশ্বাস সেই কালের Consorvativo Government এর কর্ম্মচারীবর্গ এখনকার উদারনীতি গভর্ণমেণ্টের অনুকূল শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে মাত্র কতকগুলি figuro head (পুত্তলিকা) রূপে স্থাপন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। এবিষয় আলোচনার পূর্ব্বে History বন্ধ রাখিয়া Geography বলা অত্যুক্তি হইবে না।

আমরা যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের ক্লাশে দুই জন মদন নামে বালক ছিল। "নামে মাত্র যমে টানে" এবং স্কুলমাষ্টারও টানিয়া থাকে। একের দোষ ও গুণ মধ্যে মধ্যে অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অনেক সময়ে বিভ্রাট ঘটাইত। এক সময়ে এক মদন উৎকট

জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়। ইংরেজ ডাক্তার নিজ বাড়ী হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া দিত। মদন আরোগ্য লাভ করিল বটে কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া বসিল মদন মুরগীর জুস খাইয়া ফেলিয়াছে। মদনের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য পর্যান্ত বেচারার নাম রহিয়া গেল 'মুরগী-মদন'। হিন্দুকে মুরগীর জুস খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেমন চিকিৎসকের অন্যায়, দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে বিলাতী উপায়ে শিক্ষিত করাও তেমন,—প্রাণটা হয় ত তাহাতে বাঁচে কিন্তু দেশের নিয়ম ও সংস্কারাদিতে সেটা এত আঘাত করে এবং এমন ভয়ানক আপদ জঞ্জাল আসিয়া জুটে যে প্রাণ না থাকা সে অবস্থায় শ্রেয় হইয়া উঠে, বিদেশী ভাবে অমঙ্গলও কম হয় না। সেকালের ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রয়াস ছিল রাজাকে public money & public utility বুঝাইতে এবং সে উপায়ে সোজা রাখিতে। অপর পক্ষে রাজন্যবর্গ কিন্তু কিছুতেই তাহা বুঝিতে চান না; কারণ তাঁহারা public money কি তাহা বুঝেন না এবং public utility কি তাহার তত্ত্ব রাখেন না। তাঁহারা বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তের ভাবে utility অর্থে বুঝেন—'তোমরা কেবল চাষ করিয়াই খাও।' তাঁহাদের প্রজাবর্গও বুঝে চাষ করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য; চাষের জমীর মূল্য রাজার প্রাপ্য। কেবলমাত্র এজন্যই ইংরেজকর্ম্মচারী ও ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের মধ্যে অনেক রাজ্যে (with few honourable exception) খটখটি এবং মসীযুদ্ধ, তৎপরে প্রকাশ্য আদালত পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ গড়াইয়াছিল; ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। দৃষ্টান্ত, উত্তরপশ্চিমের প্রান্তপ্রদেশের কাশ্মীরের মহারাজা,—প্রমাণ, তদানিন্তন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের নিকট কাশ্মীর অধিপতি মহারাজার পত্র;—

'In case this liberty is not allowed to me by the Supreme Government and I have to remain in my present most miserable condition, I would most humbly ask Your Excellency to summon me before you (and I will be most happy to obey such summons) and shoot me through the heart with your hands and thus at once relieve an unfortunate Prince from unbearable misery, contempt and disgrace forever'.

ভাবার্থ—যদি সুপ্রিম গবর্ণমেন্ট আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করা শ্রেয় না মনে করেন এবং আমাকে এই অতি শোচনীয় অবস্থায় রাখাই তাঁহাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে

হে রাজপ্রতিনিধি বড়লাট সাহেব মহোদয়! আপনার নিকট আমার সানুনয় অনুরোধ আমাকে আপনি আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইতে অনুমতি করুন। স্বহস্তে আমার বক্ষে গুলি করিয়া এই হতভাগ্য রাজা নামধারী জীবকে, তাহার এই হেয় ঘৃণ্য অবস্থা হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি দিন।

পক্ষান্তরেতুল্য অবস্থায় ভারতের উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশে ত্রিপুরার মহারাজা একই কারণে যাহা করিয়াছিলেন, অমৃতবাজার পত্রিকার নিম্ন উদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে।

'The incident naturally caused great consternation in Bengal, firstly because it happened immediately after the abdication of the throne by the Maharajah of Kashmere ; and, secondly, because, the Maharaja of Tippera was regarded as one of the model Princes in India. When we announced the startling news of the practical dethronement of the Maharaja, we were informed that the Government had no knowledge of the fact, and that Mr. Greer had acted of his own motion'.

ভাবার্থ—ত্রিপুরা-রাজের সিংহাসনচ্যুতিতে বঙ্গদেশে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ প্রথমতঃ ঘটনাটা কাশ্মীররাজের সিংহাসনচ্যুতির পরই ঘটিল, দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরার মহারাজকে সর্ব্বসাধারণে আদর্শ নৃপতিরূপে ভক্তি করে। কিন্তু এ ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট দোষী নন, এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের আদেশ না লইয়াই গ্রিয়র সাহেব নিজ দায়িত্বে এ হঠকারিতা করিয়া বসিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে একজন নৃপতি যেখানে গুলি দ্বারায় মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিলেন, অপর পক্ষে, অন্য নৃপতি স্বীয় তেজবলে ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও প্রাচীন রাজ্য বটে এবং তাহার ভিমরুলের চাকের মত Frontier policy ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরার পেছনে অনেক দেশীয় শত্রু চাটুকার বৃত্তি দ্বারায় স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এ আপদ হইতে এখনও কোন রাজা, এমন কি ক্ষুদ্র জমিদার পর্য্যন্ত, মুক্ত নন।

চাটুকারগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য, রাজার কি যে মহা অপকার ঘটায় তাহা সকলেই অবগত আছেন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—ত্রিপুরাতেও ইহার অভিনয় অনেক প্রকারে হইয়া গিয়াছে। দেশের সুপ্রিম গভর্ণমেণ্ট ও পার্শ্বসহচর দ্বারাই রাজন্যবর্গের কেন, সমস্ত লোকেরই মনের ভাব গঠিত হয়, সঙ্গ যে চরিত্রের প্রধান উন্নতি অবনতির কারণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

মোগল সময়ে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ হিন্দুভাব প্রায় পরিত্যাগ করিয়া মোগলাই হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের "দরবার," "লেবাস্," "চোপদার," "পানদান," "খানাদান," "উজীর" প্রভৃতি শব্দের দ্বারায় ইহা বুঝিবার পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া মনে করি। এমন কি সে অবধি কোন কোন বংশে মুসলমান পত্নীর আমদানী হইয়াছিল; এবং এখনও অনেক "রাজকুলে" তাহা রীতি নীতি বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে। সে সময় সাগর পার হইতে এক সভ্য জাতি আসিয়া ভারতে Constitutional ভাব পৌঁছাইয়া দিল এবং ক্রমে ক্রমে ভারত লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া পড়িল। এক্ষণে ইংরেজ চান সমস্ত নৃপতিবর্গকে Constitutional Prince (Native prince or chief) সদা দধির মত বানাইয়া তুলেন; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলে "সদা দধি প্রাণহারী হইয়া থাকে" এমন সময় স্বনামধন্যা ভিক্টোরিয়া মহোদয়া Empres of India ভারতেশ্বরী আখ্যান গ্রহণ করিয়া ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে নিজ কোলে আশ্রয় দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে "রাজা" বানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময় বিখ্যাত রাজা Sir T. Madhab Rao বলিতেছেন:—

'Native Princes being absolute rulers they appear at first sight to be the sole source of all obstacles to any change; but a nearer acquaintance will show that view to be not quite correct. As a body they are undoubtedly intelligent, and they are not all equally devoid of a love for their subjects, or the desire to govern them well, yet the general complaint is that their rule is oppressive. How is this to be accounted for? The fact is the princes are after all individuals and are not only subject to the unwholesome influences of their early training, but in the absence of any system are helplessly in the hands of their *surroundings*. Now these surroundings consist

of vested interests of all sorts in whose eyes the one merit on which the existence of the State rests indiscriminate charity to *idlers of sorts and indulgence to the privilege and official classes,* and the one sin is strictness in the expenditure of the taxes or justice to the toiling Ryot. *In such a situation zeal for reform or love of economy cannot be expected to flourish nor can any reform,* if introduced by a strong-welled ruler, be trusted to be safely carried out for any time or continued *by a successor.* Is it then a wonder that they should let well alone ?'

প্রথম দর্শনে ভারতীয় নৃপতিগণকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইলেও, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইবার সুযোগ ঘটলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এ ধারণা নির্ভুল নহে, ভারতীয় নৃপতিগণের অধিকাংশই সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও প্রজার হিতসাধনে সদা চেষ্টিত কিন্তু তথাপি তাঁহারা প্রজাপীড়ক একথা উঠে কেন ? ইহার কারণ আছে, রাজন্যবর্গও মানুষ, তাঁহাদের মতিগতিও তাঁহাদের বাল্যশিক্ষা, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধা, অবস্থা বলিতে এখন বুঝিতে হয়... অন্যের চক্ষু—অন্যের দয়া—সরকারী আমলাতন্ত্রের খেয়াল,—এ অবস্থায় কি কাহারও সংস্কারের জন্য উৎসাহ থাকিতে পারে ?

Sir Madhab Rao এ সমস্যা পূরণার্থে একটা প্রকৃষ্ট উপায় বলিতেন :—

'How, then, is reform to be introduced and maintained in the face of these obstacles? It has been already shown that, though a ruler is inclined to introduce measures of reform, the inertia of his surroundings and the vested interests arrayed against the change would thwart their successful execution even during his own life-time and the changes after him would be still more uncertain unless there was continuous extraneous help against which such obstacles would be powerless ; and this help would be effectually forthcoming if the Political Agents were to share with the Raja his respon-

sibility for efficient administration. In that case the Political Officer will be able to realise the difficulties in the way of the Prince better than he now can, and then but not till then, will his authority, and influence be truly utilized in the promotion of good Government in the State. The anomaly of the present system is that the Rajas are backward and even if they are personally educated their surroundings rivet them to that condition. To enable them, to rise above it, which the British Government not unreasonably expects of them, it is bound to give them the needful aid especially when it can do it without inconvenience or sacrifice and this I submit it can do by holding its Political officers formally responsible along with the Native Rulers for the character of their administration."

এই সকল বাধার পথে তাহা হইলে কি উন্নতি মূলক সংস্কার সম্ভব নহে? রাজন্যবর্গের পারিপার্শ্বিক পারিষদ ও প্রধান পাণ্ডাগণের আধিপত্যে সকল চেষ্টাকেই কি ব্যর্থ করিয়া দিবে? উপায় কি নাই? আছে! যদি রাজার ন্যায় পলিটিক্যাল অফিসারগণকেও রাজ্যের উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী করা হয় তাহা হইলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া সম্ভব! যে অবস্থায় রাজ্যের রাজার ন্যায় পলিটিক্যাল অফিসারকেও রাজ্যের উন্নতির জন্য বাধ্য হইতে হইবে (চাকুরির মায়া বড় দায়!) ও একণে পলিটিক্যাল প্রভুগণ যে শক্তি ও প্রাধান্য 'রাজা চরাইতে' নিয়োজিত রাজ্যের উন্নতি অবনতিতে চাকুরি রক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাদের সে শক্তি রাজ্যের কল্যাণে প্রয়োগ করিতে হইবে নিশ্চয় ও রাজন্যবর্গকে তাঁহারা সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।

তাৎকালীক দুইটি স্বাধীন রাজ্যের ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথার সারবত্তা পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা নিজ ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করায় কিরূপ সুফল প্রসব করিয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায়—

"This work as well as his work as Chief Judge was so satisfactorily performed that the Maharaja, in token of approbation almost doubled his

remuneration. Shortly after this, the silk industry was started in Cashmere and Mr. Mookerjee was placed in charge of it. The industry rapidly developed and expanded, and Mr. Mookerjee was favoured with the commendatory notice of the Government of India and the Secretary of State.

ভাবার্থ—মহারাজার প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য ও তৎসঙ্গে অন্যান্য কার্য্য এরূপ দক্ষতার সহিত তিনি (নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়) সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন যে কাশ্মীরাধিপতি তাঁহার গুণবত্তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে রেশম বিভাগের ভার প্রদত্ত হয়; অচিরে কাশ্মীরে রেশম শিল্প এরূপ আশাতিরিক্ত উন্নত ও প্রসারিত হইয়াছিল যে ভারত গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

ইহা হইতেই প্রতীত হয়, রাজন্যবর্গ যদি নিজ নিজ ইচ্ছা মত উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজ্যের প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অধিকারবান্ হন ও মন্ত্রীগণ যদি রাজ্যের উন্নতির জন্য দায়ী থাকিয়া কার্য্য করেন, রাজার মানসম্ভ্রম উন্নতি যদি তাঁহারা নিজের বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে সরকার নিযুক্ত পলিটিক্যাল অফিসার হইতে সে সকল দেশীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা রাজ্যের কম মঙ্গল সাধিত হয় না। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। তাৎকালীক পুস্তিকা ও দৈনিক ইংরাজী পত্রিকায় ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

প্রথমে যে সব উদ্দেশ্যে পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হন, তাহা কতদূর সার্থক হইয়াছিল তাহা সে কালের বৃদ্ধেরা বেশ জানেন। ধরুন, যে উদ্দেশ্যে সার মাধব রাওয়ের সঙ্গে পলিটিক্যাল মহাশয়কে জুড়িয়া দেওয়া হয় তার কতখানি সফল হইয়াছিল? কাজকর্ম্মের সুবিধা হওয়া দূরের কথা, ফলে ত দাঁড়াইয়াছিল—উভয়ের মধ্যে খাদ্যখাদক ভাব। রাজা রাজ্যের জমা পাশ্চাত্য সভ্য উপায়ে চালাতে চান না, আর Political Agent রাজাকে বাধ্য করিয়া যে মুরগীর ঝুল খাওয়াইতে চান ও জেদ করেন। কিন্তু এ কথা কাহারও মনে আসে না যে, যে পর্য্যন্ত রাজার স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিজ ইচ্ছামত প্রজাপালনের আশা অল্প এবং মন্ত্রীর উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না।

এ বিষয় বিখ্যাত জার্ম্মেণ পণ্ডিত Max Muller (যিনি জীবনে ভারতে পদার্পণ করেন নাই এবং Indian Politics সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন) বলিতেছেন—

"But when an opening had once been made for native talent was not wanting. The names of such men as Sir Salar Jung in Hyderabad, Sir T. Madao Rao in Travancore, Indore, and Baroda, Sir Dinkar Rao in Gwalior, are well known not in India only, but in England also, and not the least successful among them was our friend Gauri-Samkara.

With all the narrow prejudices of Oriental Society, particularly in India, there was always carrier *auverte aux* talents. Gauri-Samkara was the son of a poor man, though he belonged to a good Brahmanic family. His education would not perhaps, have enabled him to pass the Indian Civil Service Examination, and yet what an excellent Civil servant would he have made. Examinations prevent many evils, but they cannot create or even discover the qualities necessary for a ruler of men.

The clock on the tower of the Houses of Parliament strikes louder than the repeater in our waistcoat pocket, but the machinery, the wheels within wheels, and particularly the spring have all the same tasks to perform as in Big Ben himself. Even man like Disraeli or Gladstone, if placed in the position of these native statesmen, could hardly have been more successful in grappling with the difficulties of a new state, with rebellious subjects, envious neighbours, a weak sovereign, and an all powerful suzerain, to say nothing of court intrigues, religious squabbles, and corrupt officials. We are too much given to measure the capacity of Ministers and statesmen by the magnitude of the results which they achieve with the immense forces placed at their disposal. But most of

them are very ordinary mortals.

If Bismarck made Germany, Gauri-sam-kara made Bhavnagar. The two achievements are so different that even to compare them seems absurd, but the methods to be followed in either case are after all, the same; nay, it is well known that the making or regulating of a small watch may require more nimble and careful fingers than the large clock of a cathedral'.

ভাবার্থ—সুযোগ প্রদান করিলে ভারতীয় মেধার অভাব হয় না। হায়দ্রাবাদের স্যার স্যালারজঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর ও বরোদার মাধব রাও, গোয়ালিয়রের স্যার দিনকর রাও কেবল ভারতে সুপরিচিত নহেন ইংলণ্ডেও তাঁহারা সুবিদিত। ইঁহাদের মত আমাদের বন্ধু, গৌরীশঙ্কর ও কম শক্তি সম্পন্ন ও সুযশাঃ নহেন। গৌরীশঙ্কর বর্ণশ্রেষ্ঠ উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাসমৃদ্ধি এমন ছিল না যে তদ্দ্বারা তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ একজন শ্রেষ্ঠ সিভিল সার্ভেণ্ট হইয়াছিলেন। পরীক্ষা হয় ত অনেক দোষ নিবারণ করিতে সমর্থ কিন্তু উহা প্রকৃত লোক শাসক হইতে হইলে যে সব গুণের আবশ্যক পরীক্ষা তাহার আবিষ্কারক বলিয়া কিছুতেই বিবেচিত হইতে পারে না।

পার্লামেণ্ট সৌধের চূড়াস্থিত প্রকাণ্ড ঘটিকা যন্ত্রটি একটি ক্ষুদ্র পকেট ঘড়ি হইতে অধিকতর উচ্চ শব্দ করে সত্য কিন্তু তাহাদের কল কব্জা, যন্ত্র অস্ত্র, কারিগরি একই এবং ক্ষুদ্র পকেট ঘড়ি ও প্রকাণ্ড বিগ-বেনের কার্য্য একই। এমন কি ডিজ্‌রেলি অথবা গ্লাসটোনের ন্যায় ব্যক্তিও যদি এই সকল ভারতীয় রাজনৈতিকগণের অবস্থায় পতিত হইতেন,—যদি তাহাদিগকেও বিদ্রোহ প্রজা অসূয়াপরবশ প্রতিবাসী, প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহারাও ভারতীয় ষ্টেট্‌স্‌ম্যান হইতে অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

বিসমার্ক যদি জার্ম্মেনী প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন গৌরীশঙ্করও ভবনগরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যদিচ উভয়ের সাফল্যের মধ্যে অনেক অন্তর, দুইটি বস্তুর একত্র তুলনাই হয়

না, তথাপি মূলগত নীতিতে দুইটি এক। উপাসনালয়ের সুবৃহৎ ঘটিকা যন্ত্র হইতে অতিক্ষুদ্র ট্যাঁক ঘড়ি সংস্কার ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতার সহিত অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভট্ট মোক্ষমূলার ভারতের উপর শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান ছিলেন; সে কারণে তিনিই ইউরোপে বসিয়া হংস যেমন জলটুকু পরিত্যাগ করিয়া দুধটুকু গ্রহণ করিয়া থাকে; তেমনি তিনি ভারতীয় নৃপতিকুলের খবর রাখিতেন, সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে। তাই তাঁহার প্রণীত Auld Lang Syne, My Indian Friends গ্রন্থে ভারতীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে যতটুকু বলিয়াছিলেন, লিখকের মনে হয় ঐ লিখার ভাবে, দুধটুকু ক্ষীর হইয়া গিয়াছে। উপরি উক্ত উদ্ধৃতাংশে তাহা বেশ অনুভব হয়।

ইংরেজ রাজপুরুষ যিনি এক্ষণে Parliamentএর member, Sir, J, Rees তাঁহার Real India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The case is still worse where it happens that the right of the chief to choose his own minister is practically taken from him, in consequence of advice tendered by the resident or by tho local Government. There are always factions at these courts, one or another of which frequently gets the ear of the Political Agent, and able officers of the State, well fitted to become ministers to their Maharajas, may not be popular with the little European clique at the capital. The craze for reform after British patterns, whether or not required, is such that it ever points towards the expediency of bringing in outsiders. The officer thus introduced, almost invariably a capable Brahmin, who has eventually to revert to Bitish employ and knows on which side his bread is buttered, immediately proceeds to justify his appointment by the introduction of wholesale changes in the administration or of ambitious chemes which dissipate the cash

reserves of the State, and do not necessarily add to the happiness of its inhabitant'.

উপরি উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, ইংরেজ পর্য্যন্ত ধার করা গবর্ণমেণ্ট কর্মচারীকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে চায় না। অপিচ রিজ সাহেব বোম্বে প্রদেশের সিভিলিয়ান ছিলেন এবং পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ম্ম কর্ত্তা ছিলেন। বোম্বাই প্রদেশে শত শত দেশীয় রাজা আছে, যাহারা শত উপায়ে রাজ্য শাসন করেন, তাঁহাদের রোগ ছিল 'Harpis' (সহস্র জ্বালা) কাজেই রিজ সাহেব, স্বীয় অভিজ্ঞতার ও সহানুভূতি দ্বারায় তিনি যে কথা বুঝিয়াছেন, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। বোধ হয় এই জন্যেই ভূতপূর্ব্ব Viceroy Lord chalmsford Chiefs conference এ ওরা নবেম্বর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাকে আমরা বলি 'Viceroy's warning'.

"There is no reason why you Nobles and Jagirdars should be in the future as they were when you first entered into possession of Your State, the bulwarks of your rule if you place your reliance upon them and educate to work with you in your task and if they on their part recognise that it is their duty to serve you with loyalty".

আমাদের একান্ত বিশ্বাস Viceroy এর উপদেশ মত, ও বন্ধুভাবে যে উপায় অবলম্বন করিতে নরেন্দ্রমণ্ডলকে বলিয়াছিলেন, তাহা আজ হউক বা কাল হউক কিংবা শতাব্দী কালেই হউক, তাহা অবলম্বিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন দেশীয় রাজাই হিন্দুরাজ নামে অভিহিত হইতে পারিবেন না, এই Warning যদি বিশ কিম্বা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হইত, তাহা হইলে কতকগুলি হিন্দু রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিত। পর প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাহা বলা হইবে। পাঠকবর্গ মনে রাখিবেন যখন কেমন করিয়া এবং কি উদ্দেশ্যে কতীতে যাথান হইত! সুখের বিষয় অধুনা তিমির রজনী গত হইয়াছে। 'যত্র তিষ্টতি সর্ব্বরি' অতএব অরুণ উদয় কাল অতি নিকটবর্ত্তী। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে ভারতের Moderates and extremistগণ যেভাবে স্বীয় স্বীয় রাজ্য বা 'স্বরাজ' পাইলেও এই ভারতের স্তম্ভ তুল্য Native States গুলিকে কোন প্রকারেই ত্যাগ করিতে পারিবে না। সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন এবং 'বেসবুর' দল দূরবীক্ষণ

এবং অণুবীক্ষণ দ্বারায় বিশ্লেষণ করিতে থাকুন যে, ইংহাদের জন্য স্থান কোথায় রাখা হইবে ?

ত্রিপুরা হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ডাক্তার শম্ভুচরণ মুখার্জ্জি কি কারণে ত্রিপুরার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

"Why do you not publish an account of your life as Minister of Tippera?" The answer is—because I might then compromise my master and the little State I served and secondly, because I might thereby close the only career open to me in Native India. British officials try their utmost to keep able and writing natives out of the Native States, and any indiscretion on my part would arm them with a deadly weapon against me and the small class of aspiring natives educated in western learning who can manage states.

এ ভদ্র লোককে স্বয়ং ত্রিপুরাধিপতি বাছনী করিয়া আনিয়াছিলেন। যদি তাঁহার আসন না টলিত তাহা হইলে ত্রিপুরার ইতিহাস অন্যরূপ হইত। এই সময়ে কতগুলি দেশীয় রাজ্যের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সদ্ভাব ছিল না। মালাবারি লিখিয়াছেন—

"Owing to the incapacity of many of the ruling chiefs, the political agents slowly encroached upon the power and authority of the former and came to exercise, indirectly at any rate, supreme control. This position has now become crystallized. The Supreme Government, no doubt, desires to ameliorate the condition of the Native States and their people through their accredited agents. A masterful 'political' loves to brush aside the ruler as of little account, practically relieving him of all responsibility. Lord Mayo described him as 'a dangerous official.' He himself rules through a Prime Minister or a Council who intrigue against their own chief. It is to their advantage to prevent all good understanding between the Rajah and his political."

তারপর Lord curzon আসিয়া ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে সহানুভূতির সহিত এবং অনেক সময় School Master এর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোয়ালিয়র রাজ্যে রাজ-ভোজের দিনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন আমার বিশ্বাস সকলের তাহা মুখরোচক হয় নাই। কারণ Curzon রাজাদিগকে Subordinate officer রূপে পাইতে ও দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

"The Native Chief has become, by our policy, an integral factor in the imperial organisation of India. He is concerned not less than the Viceroy or the Lieutenant-Governor in the administration of the country. I claim him as my colleague and partner. He cannot remain *vis-a-vis* of the Empire a loyal subject of Her Majesty the Queen Empress, and *vis-a-vis* of his own people a frivolous or irresponsible despot. He must justify and not abuse the authority committed to him, he must be the servant as well as the master of the people."

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে তিনি রাজাদের লইয়া যেমন "প্রদর্শনী" করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় শিল্প দ্রব্যের প্রতি অনুরাগী হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তেমন তাঁহাদিগকে পশ্চাৎবর্ত্তী রাখিয়া হস্তীর শোভা যাত্রা করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। দরবারের দিনে একটা ঘটনা আমাদের চক্ষে পড়িয়াছিল, 'রাজগণকে' কেবলমাত্র Viceroyকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর দেওয়া হইয়াছিল এবং পরে করমর্দ্দন করিয়া লাট সাহেব তাঁহাদিগকে প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রাজ সহোদর Duke of Conoughtকে বাদে রাখিয়া; ইহা অবশ্য ইংরেজী কায়দা। কিন্তু বরদার গাইকোয়ার সে "কায়দার" বিরুদ্ধে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। Viceroyকে তিনি কর মর্দ্দন করিয়াছিলেন কিন্তু রাজ ভ্রাতাকে তিনি "সেলাম অভিবাদন" করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। দর্শকগণ ইহাই অনুভব করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সে ছিল এক যুগ, ভবিষ্যত যুগের অবতার না হইলেও Morley Minto ভারতে যে উদার নীতির প্রথম ধাপ তাহার মর্ম্ম মতে দিয়াছিলেন তখন Lord Minto উদয়পুরের মহারাজের রাজ-ভোজে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,

তাহাতে তিনি ভারতের রাজনীতির সহিত বর্ত্তমানে Govt.এর সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহা তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে অতীতে কি হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কি হইতেছে এ বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

স্বরাজ সঙ্গীত।

—:০:—

ও হে বিশ্বরাজ আন হে স্বরাজ,
ক'রো না অরাজ এ ভারত ভূমে।
তুমি হে ঈশ্বর, রাজ রাজেশ্বর,
হয় না স্বরাজ তব কৃপা বিনে।
স্বরাজের মূলে সত্যের আশ্রয়
সত্য বিনা কভু স্বরাজ কি হয়?
মিথ্যা-প্রিয় জন পারে কি কখন
লভিতে স্বরাজ কভু এ জীবনে?
আসিবে স্বরাজ সজ্ঞানে বিজ্ঞানে,
হইবে না লব্ধ বিজ্ঞান-অপমানে,
জড়জ্ঞান বলে স্বার্থ বিষ ফলে
পাবে কি স্বরাজ অজ্ঞান সাধনে?
অনন্ত উন্নতি আকাঙ্খা যাহার,
করতলগত স্বরাজ তাহার,
কুটিল সংকীর্ণ যাহার জীবন
স্বরাজ তাহার আকাশ-কুসুমে।
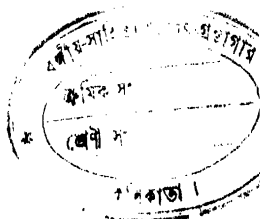
মহাপ্রেমে হবে স্বরাজ স্থাপন,
স্বদেশে বিদেশে প্রেমেতে মিলন,
অপ্রেম বিদ্বেষে ভেদ বুদ্ধি বশে
হয় কি স্বরাজ সংযোগ বিহনে ?

স্বরাজ আসিবে মাতৃভক্তি বলে
রাজভক্তি বিনা স্বরাজ কি মেলে ?
অরাজকতায় রাজ দ্রোহতায়
হয় না স্বরাজ কভু ত্রিভুবনে।

একমেবাদ্বৈত স্বরাজ্যের পতি,
একত্ব সংযোগেই স্বরাজ্যের স্থিতি,
একেরই সেবায় স্বরাজ উদয়,
(এক) অখণ্ড-মানব-পরিবার সনে।

স্বরগের ছবি স্বরাজ ধরায়,
আমিত্ব অহং রহে না তথায়,
(হয়ে) ঈশ্বর-ইচ্ছাধীন পাপভার হীন
হয় যে স্বাধীন দীন হীনও জনে।

হবে না স্বরাজ বিধি অতিক্রমে,
মানিতে হইবে বিধির বিধানে,
সর্ব্ব দেশ জাতে প্রেমে যদি মাতে
আসিবে স্বরাজ তবে তো ভুবনে।

স্বরাজ যে চির ব্রহ্মানন্দ ধাম,
নিরানন্দ তথায় পায় না ত স্থান,
পূরবে পশ্চিমে আনন্দ মিলনে,
আনিবে স্বরাজ নিত্য ধরাধামে।
তাই তব পদে দিয়ে আত্মবলি,
স্বইচ্ছা-স্বরাজ চির জলাঞ্জলি,
(তাই) হে স্বরগ রাজ ব্রহ্মানন্দ-র'জ
সত্য স্বরাজ বিশ্ব মাতৃভূমে।

দীন সেবক—শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

তটিনী

—:•:—

(৭)

সেদিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে যে টিপ্‌টিপুনি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল বৈকালেও তার ছাড়িবার নাম নাই! প্রকাণ্ড একটা বাগানের মধ্যে জমিদার রাজেন বাবুর অতিথশালা। এই অতিথশালার কাছেই একটা খাপ্‌রার বাড্‌লায় আরও জন তিনেক সঙ্গীর সঙ্গে বারীন্দ্রও থাকিত।

আকাশময় কালো কালো মেঘের স্তূপ, সেই 'বপ্রক্রীড়া'রত করিবরের মত পরস্পরকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া বেড়াইতেছিল। আলোকের আভাস মাত্র হীন এই মলিন সন্ধ্যায় একটা চৌকীর উপর বসিয়া বারীন খোলা জানালা দিয়া আকাশ পানেই চাহিয়াছিল। তার সামনেই মেডিকেল কলেজের অবশ্য জ্ঞাতব্য মোটা বইখানিতে ভয়াবহ, নরকঙ্কালের চিত্রের উপর মালীর ছেলের করুণার দান, কয়েকটা চামেলীফুল ছড়ানো পড়িয়াছিল।

সশব্দে ঘরের কপাট খুলিয়া অতুল ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। অন্যমনস্ক বারীন সে শব্দে ঘুরিয়া চাহিল না দেখিয়া অতুল হাসিতে হাসিতে বলিল "কি হে,—

ধূম জ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘ"

"সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটু করণৈঃ প্রাণিভি প্রাপণীয়"

এবার বারীন মুখ ফিরাইয়া হাসিল, অতুল ছড়ানো ফুলগুলির দিকে চাহিয়া বলিল "মেঘের কি প্রাণ আছে হে, যে সে তোমার ওই অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রবে? জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি যে কোথায় পাঠানো হচ্চে তোমার ওই অশরীরি দূতকে?"

"ফুল কয়টি চৌকীর উপর নামাইয়া রাখিয়া বারীন বই মুড়িয়া রাখিয়া বলিল "আমি বক বক কিছু একটা নই, কিন্তু তুমি দেখ্‌চি এই দুর্দ্দিনেও বেরিয়েছ, আমি তো কাল সেই ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসেচি যে আর কোথাও যাইনি।"

"তুমি বন্ধ হয়ে থাকতে পারো, আমি তা পারিনে আমার এই রকম মেঘলা দিনে চুপ করে ঘরে বসে থাক্‌তে ভারি বিশ্রী লাগে।"

কিন্তু এ ঘরেও এখন, তোমায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসতে হবে, আমি একটু বেরুবো, অবিশ্যি বেশী দূর যাব না।"

"সে কি? তুমি আবার কোথায় যাবে এখন?"

"একটু ডাক্তারি করতে যাবো ভাই, এই বাগানের মালীর কোন্ আত্মীয় হয় তাদেরই ছোট একটী মেয়ে রুগী হয়েছে, আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস সেধে আসি।"

"মন্দ নয়, এখনি আসচো তো!"

"এক্ষণি আস্‌চি ভাই" বলিয়া বারীন একটা Water proof ঘাড়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। অতুল একা ঘরে বসিয়া প্রথমে টেবলের বইগুলি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, বারীনের সব বইগুলিই ডাক্তারি শাস্ত্র আঁকা! অতুল সেগুলাকে অপাঠ্য বলিত। ক্রমে বেশ অন্ধকার ঘোরালো হইয়া উঠিলে একটা চাকর আলো দিয়া গেল। অতুল বারীনের ফিরিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতে লাগিল। ছোট ঘরখানির তিন কোণে আরও তিনখানি চৌকী পাতা ছিল, তাতে আরও তিনজন এই ঘরে থাকিত, তাহারাও ছাত্র, জমিদার বাড়ীতে থাইয়া কলেজে পড়িত, এক কথায় জমিদারের

অনুগ্রহপুষ্ট। তারা তিন জন আসিয়া নিজের নিজের চৌকী দখল করিয়া বসিল, তার আধঘণ্টা পরে বারীন ফিরিল।

ওয়াটারপ্রুফটা দেয়ালের আলনায় ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে বারীন বলিল "এই যে অতুল, এখনো আছ দেখচি।"

"আছি বই কি, তুমি ব'লে গেলে শীগ্‌গীর ফিরবে কাজেই বসে আছি।"

"অশেষ অনুগ্রহ! কিন্তু আমার বোধহয় ফিরতে কিছু বেশী দেরী হয়ে গেছে?"

"থাক্ ও বাঁধা গৎ আমি শুনতে চাইনে বারীন, আমি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে আছি কিসের লোভে জানো? এই বাদলরাতে, একটা বাদলের গান শুনবো ব'লে।"

"ও বাবা, তাই নাকি? এই অসময়?"

"অসময় আবার কি? গাও।

বারীন চৌকার উপর বসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল "আচ্ছা দাওতো ওই টেব্‌লের ওপর 'গীতাঞ্জলী'খানা আছে, দেখি কোন্‌টা গাইব"

অতুল 'গীতাঞ্জলী'খানা বারীনের হাতে দিল। বারীন গীতাঞ্জলী দেখিতে দেখিতে একবার মেঘ আঁধার আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, বৃষ্টি থামিয়াছিল কিন্তু আর্দ্র সজল বাতাস তখনো ক্ষান্ত হয় নাই বারীন গাহিল—

"এস হে সজল ঘন বাদল বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে
এস হে গিরিশিখর চুমি
ছায়ায় ঘেরি' কানন ভূমি
গগন ছেয়ে এস হে তুমি
গভীর গরজনে।
ব্যথিয়ে ওঠে নীপের বন
পুলকভরা ফুলে।
উছলি ওঠে কল রোদন
নদীর কূলে কূলে।

এস হে এস হৃদয়ভরা
এস হে এস পিপাসাহরা
এস হে আঁখি শীতল করা
ঘনায়ে এস মনে।"

অতুল চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল "Thanks! আমি এখন চল্‌লাম,—এ বইখানা নিয়ে চল্‌লাম, কাল বাদে পরশু দিয়ে যাব, পরশু অবধি তুমি আছ তো?"

"তা আছি।"

"তোমাকে বিশ্বাস নেই, না ব'লে না ক'য়ে পালিয়ে যাওয়াও তোমার কিছু বিচিত্র নয়!"

"না, না, তা যাবোনা" বলিয়া বারীন হাসিল। অতুলও ছাতি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিয়া উঠিল "উঃ বাপ্‌ কি ভয়ানক অন্ধকার!"

লত্যই অবচ্ছিন্ন মেঘে সেদিন সারা আকাশখানি ঢাকা, এতটুকু নক্ষত্র দীপ্তিও কোথাও ছিল না। বাড়ী আসিয়া অতুল গীতাঞ্জলীখানা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেই তটিনী সেখানি দখল করিয়া লইল। পাতা উলটাইতে বইখানির ভিতর হইতে একখানি ছোট 'ফটো' বাহির হইয়া পড়িল। অতুল সেখানি টানিয়া লইয়া বলিল "আরে এ যে বারীনের ফটো!"

তটিনীর বিকশিত চোখদুটী একবার একটু চমকিয়া উঠিল, কিন্তু সে তখনি চোখ নামাইয়া লইল। অতুল ফটোখানি তটিনীর হাতে দিতে গেলে সে একটু হাসিয়া বলিল "ও তোমার বন্ধুর ফটো তুমিই দ্যাখো, আমি আবার ওর কি দেখ্‌বো!"

"তা তবে আমার বন্ধুর বইখানিই বা দেখ্‌বে কেন?"

"বইখানিতে তোমার বন্ধুর কেরামতি কিছু নেই, বইখানি তো রবীন্দ্রনাথের তা স্বীকার কর তো!"

"করি, কেন না ক'রে উপায় নেই, ভাল তবে ও বইখানি এখন তোমার থাক আর এই বারীনের ফটোখানি আমার থাক্‌।"

"থাক্‌।"

দিন তিনেক পরে সকাল আটটা নয়টার সময়ে অতুল এঘর ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মহেশ্বরী বারান্দায় বসিয়া পশ্চিমের নূতন ঝিকে বকিয়া বকিয়া কাজের নিয়ম শিখাইতেছিলেন।

তাঁর সুমুখের ঝুড়ীতে একরাশি তরকারী বোঝাই করা ছিল, তিনি বকিতে বকিতে তরকারী কাটিতেছিলেন এমন সময় অতুল ডাকিল "মা!"

"কেন রে?"

"তিনু কোথা গেল মা?"

"তিনু আবার কোথায় যাবে, হয় ওপরে উমাদাদার কাছে আছে, নয়তো তার নিজের ঘরেই আছে দেখ্‌গে।"

অতুল উপরের সব ঘরগুলি খুঁজিয়াও তটিনীর দেখা পাইল না। নীচেকার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দুয়ারের দিকে পিঠ করিয়া দাঁড়াইয়া তটিনী টেবিলের এলোমেলো কাগজপত্রের রাশি নাড়াচাড়া করিতেছে। পূর্ব্বদিকের খোলা জানালা দিয়া অবাধ উজ্জ্বল প্রভাতের মধুর আলো লাগিয়া তটিনীর জড়ি বসানো কাপড়ের পাড়টা ও কানের ছোট দুল্ দুটী ঝক্‌মক্ করিতেছিল। তার স্নাত সুন্দর মুখখানিও তরুণ আলোর দীপ্তি লাগিয়া স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। অতুলের পায়ের চটিজুতার শব্দ পাইয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অতুল একটু হাসিয়া বলিল "কেন, সেদিন আমি দেখ্‌তে দিয়েছিলাম তা ভদ্রতা করে দেখা হ'ল না, আজ কেন দেখা হচ্ছিল আমার বন্ধুর ফটো? কেন দেখ্‌ছিলে?"

"কি দেখ্‌ছিলুম?"

"আমার বন্ধুর ফটো!"

"তাই বল, অস্পৃশ্য কিছু নয় তো! টেবিল গোছাতে গিয়ে হাতে ঠেক্‌লো তাই সরিয়ে রাখ্‌ছিলাম, চোখ বুজতে যাই নি। তাতে তোমার আদরের জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় নি দাদা!"

"আদরের জিনিষ তো বটেই—"

"সে তোমার, আমার নয়!"

অতুল দেখিল তটিনীর মুখ যেন কেমন কঠিন হইয়া উঠিতেছে সে বলিল "আজ দেবে সেই বইখানা? বারীন কাল চ'লে যাবে তার বই তাকে ফেরত দিয়ে আসি।"

তটিনী দ্রুতপদে উপরে গিয়া বইখানি আনিয়া অতুলের হাতে দিল কিন্তু একটী কথাও আর বলিল না বা মুহূর্ত্তকালও অতুলের সুমুখে দাঁড়াইল না। অতুল আশ্চর্য্য ভাবে তার

মুখপানে চাহিতে গেল, কিন্তু সে তার পূর্ব্বেই ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল।

অন্যদিন তটিনী মহেশ্বরীর সঙ্গে সংসারের কাজেও কিছু কিছু যোগ দিত কিন্তু সেদিন সে একেবারে উপরের নির্জ্জন বারেন্দায় গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। উন্মনা ভাবে নিজের প্রতিকূলে নিজকে শাসন করিতে করিতে তার দু'চোখ ছাপাইয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে মনকে মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার সবল করিয়া লইয়া ভাবিল "ছিঃ ছিঃ একি এ মনের দুর্ব্বলতা! এই শক্তি যে তাকে সঞ্চয় করিতেই হইবে!"

বাবা? আমার বাবার চেয়েও কি আমি বেশী বিবেচনা করিবার শক্তি রাখি? একি মনের অনধিকার স্পন্দন?

নীচেকার সেই বারান্দা হইতে মহেশ্বরীর সপ্তমে চড়া গলা তটিনীর কানে পেঁাছিল কি জ্বালা! তিনু বুঝি এখনো কিছু খায় নি? নাঃ, অত বড় বুড়ো ধাড়ী মেয়েকে আর কাঁহাতক খোসামোদ ক'রে ঘুরবো বাপু! যা রে জান্‌কীয়া উপর থেকে দিদিমনিকে ডেকে আন্।"

জান্‌কীয়া মহেশ্বরীর হুকুম পালন করিবার আগেই তটিনী উপর ছাড়িয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। আহারের প্রয়োজনে যত না হউক মহেশ্বরীর সুদীর্ঘ বক্তৃতা একবার আরম্ভ হইলে যে তার জের শীঘ্র মরিতে চাহে না এ কথা সে জানিত, এবং তাই ওই জিনিষটাকে ভয়ও করিত।

(৮)

"বা—রে, তিনুদি এখনো তোমার রুমাল সেলাই হচ্ছে, কাপড় চোপড় প'রবে কখন্? পাঁচটা যে বাজ্‌লো তা খেয়ালই নেই, না?"

জমিদারের ছোট ভ্রাতার কিশোরী কন্যা মায়া আসিয়া তটিনীকে তাগাদা দিল।

তটিনী বলিল "তা বাজ্‌লোই বা পাঁচটা, তাতে কি হয়েছে?"

বিস্মিত চোখে তটিনীর মুখ পানে চাহিয়া মায়া বলিল "তুমি যাবে না?"

তটিনী হাসিয়া বলিল "যাঃ,—আমি তো তোর মত পাগল হইনি যে পাঁচটার সময় তৈরী হ'য়ে বস্‌বো, যাওয়া তো সেই সন্ধ্যের সময়!"

মায়া ঘরের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া বলিল "দেখো ঠিক তোমার দেরী হ'য়ে যাবে, এই ডজন খানেক রুমাল আজ না ক'রলে কি হ'ত বাপু?"

তটিনী সেলাইএর উপরই দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "তা বেশ্ তুই তৈরী আছিস, আমার দেরী হয় তো তুই তো যেতে পাবি, তোর ভাবনা কি ?"

মায়া রাগ করিয়া "সে আমি যেতে চাইনে, তুমি না গেলে কার সঙ্গে যাব ?"

"জ্যাঠামশায় যাবেন, অতুলদা যাবে আর তুই যাবি।"

"হ্যাঁ জ্যাঠামশায় তো বুড়ো মানুষ, তাঁর সঙ্গে আবার কি গল্প ক'রবো, তাই বল তো !"

"এক দেশে এক রাজা ছিল, এই সব !"

মায়া লজ্জা পাইয়া বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এখনো খুকী আছি কিনা ?"

পূর্ণিমা রাত্রে নৌকা করি। জল ভ্রমণের ব্যবস্থা উমাকান্তই করিয়াছিলেন, তারিণীবাবুর নিজে কখনই কোথাও একটু বেড়াইবার ইচ্ছা বলিয়া কিছু ছিল না। তাঁর অবাধ গতি কেবল তাঁর লাইব্রেরী ঘরেই বাঁধা ছিল। উমাকান্তের প্রস্তাবে তিনি রাজি হইলেও নিজে যাইতে চাহিলেন না, বলিলেন "তিনু যায় যাক্ কিন্তু আমাকে টেনো না !"

মহেশ্বরীও তাঁর সংসার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বাড়ীতে থাকাই ঠিক করিলেন, মায়া তটিনীর সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, তার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না। সন্ধ্যা হইতেই অতুলকে সঙ্গে করিয়া উমাকান্ত আসিয়া বলিলেন "তিনু মা চল, বেরিয়ে আসি।"

তটিনী যেমন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "চলুন।"

"ওকি কাপড় বদ্‌লাবে না !"

"আমার কাপড় তো বেশ পরিষ্কারই আছে,—এ প'রে গেলে হবে না? নৌকার ভেতর কেইবা দেখ্‌তে পাবে ?"

"না না, কাপড় বদ্‌লে নাও, দেরী করো না আর !"

তটিনী হেঁট হইয়া একবার নিজের কাপড় দেখিয়া লইয়া বলিল "আচ্ছা একটু দাঁড়ান আমি কাপড় বদ্‌লে আসচি।"

মায়া মাথা বাঁকাইয়া বলিল "সেই কখন্ থেকে বলচি আমি তা শোনা হ'ল না, এখন ?"

তটিনী কাপড় বদ্‌লাইয়া পিতার ঘরে ঢুকিল। তারিণীবাবু তখন বড় আরাম চেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন তার চশমার কালো কারটি বুকের পাশ দিয়া ঝুলিয়া ঘরের মেঝের লুটাইতেছিল, তটিনীর পোষা আদরের বিড়াল শিশুটী লাফাইয়া লাফাইয়া সেই কারটি লইয়া খেলা করিতেছিল। তটিনী হাসি মুখে একটু সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল "বাবা আমরা নৌকা ক'রে বেড়াতে যাচ্ছি, আপনি যাবেন ?"

খবরের কাগজ চেয়ারের হাতার উপর রাখিয়া তারিণীবাবু সোজা হইয়া বসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "আমি তো যাব না ব'লেই দিয়েছি, দাদা যাচ্ছেন তো !"

"হঁ্যা, জ্যাঠামশায় যাচ্ছেন আর অতুলদা যাবে ব'লচে।"

"বেশ তো! তা হলে তোমরা এই বেলা বেরিয়ে প'ড়, শীগ্‌গীর ফিরতে পারবে,—দেরী করো না যেন !"

কথা শেষ করিয়া একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া তারিণী বলিলেন "উঃ আজ ভয়ানক গরম মনে হচ্ছে।"

তটিনী উপরকার টানা পাখার দিকে তাকাইয়া বলিল "কই এ পাখা বন্ধ হয়ে রয়েচে কেন, ছট্টু কি আসে নি এখনো ?"

তারিণী বলিলেন "তাই তো! এই জন্যেই এত গরম লাগ্‌ছে !"

আচ্ছা, আমি ছট্টুকে ডেকে দিচ্ছি, সে নিশ্চয়ই কোথায় ব'সে গল্প জুড়ে দিয়েচে !"

বলিয়া তটিনী উপরকার বারান্দায় রেলিংএ ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল,—"এই ছট্টু—ছট্টু !"

পাখা টানা চাকর ছট্টু তখন অন্যান্য চাকরদের কাছে বসিয়া নিশ্চিন্ত আরামে গল্পই করিতেছিল, কেননা সে জানিত যে মাথার উপর চলন্ত পাখা থামিয়া যাওয়ার খেয়াল তারিণীর খুব কমই হইত, যতক্ষণ না অন্য কেহ তঁাকে এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিত। তটিনীর ডাক কানে যাইতেই হাতের তামাক ডলাটুকু মুখে ফেলিয়া ও ময়লা গামছা কাঁধে তুলিয়া লইয়া সে ছুটিয়া আসিল, তাকে পাখা টানিতে বলিয়া দিয়া তটিনী উমাকান্তের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

অম্লান শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে নদী যেন একখানি রূপার চাদরের মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল। ওপারে বিস্তীর্ণ ধৌত চামরের মত কাশের বনে বাতাসের হিল্লোল লাগিয়া দুধের মত শুভ্র তরঙ্গ

উঠিতেছিল। নৌকা যেখান দিয়া যাইতেছিল সেটা শ্মশান ঘাট। নির্ব্বাপিতপ্রায় একটা চিতা দেখা যাইতেছিল, মায়া বলিল "তিনুদি দ্যাখ আগুন!"

তটিনী বলিল "আমি অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, এখন ত প্রায় শেষ হয়ে আসচে।"

মায়া উমাকান্তর মুখপানে চাহিয়া বলিল "সত্যি, ওটা মানুষ পোড়া আগুন?"

"সত্যি মায়া, ওটা চিতার আগুনই বটে, তবে ওতে মানুষকে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করে দেয় একেবারে।"

"হ্যাঁ তা বৈ কি! আগুনে আবার মানুষকে ঠাণ্ডা করে, লণ্ঠনের গায়ে হাত লেগেই আমার এই দেখুন না হাতে কি রকম পুড়ে ঘা হয়েচে!" মায়া ব্লাউসের আস্তিন গুটাইয়া হাতের ঘা দেখাইল। উমাকান্ত বলিলেন "ওটা লণ্ঠনের আগুন কিনা, তাই ঘা হয়েছে!"

অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মায়া তটিনীর কোলের কাছে বসিয়া এক মনে নদীর ঢেউগুলির দিকে চাহিয়াছিল, একটার পর একটা করিয়া সমস্ত তরঙ্গ-গুলিই একই দিকে যে চলিয়াছে এ ব্যাপারে সে বড় আশ্চর্য্য হইল, তাই খুব ভালো করিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিল "আচ্ছা তিনুদি, এ নদীটা কি রকম বলতো, যেন পা ফেলে ফেলে এক দিকে হেঁটেই চলেচে।"

অতুল বলিল "তুমি বুঝি জন্মে কখনো আর নদী দেখনি?"

"কতবার দেখেছি,—তা নদী এমনি ক'রে হাঁটে নাকি? কোথায় যাবে?"

উমাকান্ত একটু হাসিয়া বলিলেন "সমুদ্রে।"

"সমুদ্রে! কেমন ক'রে সমুদ্রে যাবে,—সমুদ্র কত দূরে!"

"তা যতদূরেই থাক্, এমনি করে হেঁটে হেঁটে চলে যাবে।"

"আর যদি খুব বড় ক'রে পাঁচোল দিয়ে আটকানো যায়?"

সকলে হাসিয়া উঠিল। তটিনী বলিল "মাগো ওর কথার আর উত্তর দেবেন না জ্যাঠামশায়, ও একটা পাগল! পাঁচীল দিয়ে ও নদীকে ধ'রে রাখ্‌বে কি বুদ্ধি!"

উমাকান্ত বলিলেন "পাঁচীল দিয়ে কি নদী আটকানো যায় মায়া? মেঘনাদ বধে আছে "পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি, বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে, কার হেন আছে সাধ্য রোধে তার গতি?"

নৌকা ক্রমশঃ কিনারার দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। তীরে একটা ভাঙ্গা নৌকা উপুর হইয়া পড়িয়াছিল, দিনের বেলা তার উপর চড়িয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করিত, সেইখানার উপর বসিয়া কে যেন গান করিতেছে দেখিয়া উমাকান্ত বলিলেন "বেশ গাইচে তো,—কে ও?"

অতুল উৎসাহ পাইয়া বলিল "ও নিশ্চয়ই বারীন, এই জ্যোস্নারাতে দিব্যি নদীর ধারে ব'সে গান গাইচে!"

নৌকা হইতে যখন সকলে ঘাটে নামিল, তখন বারীন গান থামাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, উমাকান্ত তার খুব কাছে গিয়া ডাকিলেন "বাদল নাকি?"

হাত বাড়াইয়া উমাকান্ত বারীনের মাথার উপর হাত রাখিতে যাইতেছিলেন দু'পা পিছাইয়া গিয়া বারীন বলিল "আজ্ঞে,—আমায় ছোঁবেন না!"

আশ্চর্য্য হইয়া উমাকান্ত বলিলেন "সে কি কেন!"

"আমি এখনি একটা মৃতদাহ ক'রে আস্‌চি, এখনো স্নান করিনি।"

মৃতদাহ ক'রে আস্‌চো? কোন্ বাড়ীর?

"সে আপনি চিন্‌বেন না, আমিও চিনিনে, যাদের প্রজা তারা,"

তা যা হ'ক, তুমি স্নান করে নাও, রাত হয়ে যাচ্ছে, বেশী রাত্রে স্নান ক'রলে শরীর খারাপ হতে পারে, একে তো এ তোমার বিদেশ!"

তটিনী চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়াছিল। তার স্তম্ভিত চৈতন্য স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মূর্চ্ছিতের মত নিজেকে টানিয়া টানিয়া বাড়ী ফিরিয়া একেবারে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। খোলা জানালা দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো আসিয়া তার বিছানায় পড়িয়াছিল। তার মনে হইতেছিল অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাকে কেহ না ডাকিত তা হইলেও সে বাঁচিয়া যাইত।

জানলার একটু দূরে একটা ফলভরা পেয়ারা গাছের ডালে ডালে বাদুড়ের ঝট্‌পট শব্দ শুনা যাইতেছিল, পরিষ্কার চন্দ্রালোকে কিছু কিছু দেখাও যাইতেছিল। এই গাছটার নীচে দিয়া বাহির হইতে ভিতর বাড়ী ঢুকিবার পথ, তটিনী যখন উমাকান্তের জুতার শব্দ শুনিল তখনি বুঝিল এখনি তার ডাক পড়িবে! তাড়াতাড়ি খোলা চুলগুলি হাতে জড়াইয়া বাঁধিয়া

সে কাপড় ছাড়িয়া, নামিয়া গেল। কিন্তু মহেশ্বরী তাকে দেখিয়াই বলিলেন "বেড়িয়ে এসেই যে বড় বিছানায় শুয়ে প'ড়্‌লি তিনু, কি হয়েছে তোর ?

"কি আবার হবে,—বস্‌লাম কেন, শুয়েছিলাম কেন, অত জবাব কি দেওয়া যায় !"

মহেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন "মেয়ের কথা শুনলে গা জ'লে যায় ! অসময় শোয়া দেখ্‌লে সবাই জিজ্ঞাসা করে, অসুখ বিসুখ না করলেই ভাল বাপু, চারদিকে জরটর হচ্চে অসুখ হতেই বা কতক্ষণ !"

তটিনী আর কোনও উত্তর দিল না। উমাকান্ত বলিলেন "দেখো মা তিনু, অসুখ বিসুখ বাধিও না, তা হলে তোমার বাপ্‌ আমাকেই দোষ দেবেন, নদীতে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগেছে ব'লে, একে তো ঠাণ্ডা লাগার ভয় তাঁর বাতিক !

তটিনী মাথা নাড়িয়া বলিল "আঃ ! কি বলেন জ্যাঠামশায়, আমার কিছু হয় নি !"

(৯)

তিন সপ্তাহ থাকিয়াও উমাকান্ত তারিণীর মত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুই করিলেন না বা করিতে পারিলেন না। তারিণীর কন্যা যে কৃষ্ণবিহারীর পুত্রবধূ এ কথা খুলিয়া বলিতে গেলে তারিণী আরো বেশী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, এই ভয়ে অন্য কথায় বুঝাইয়া যাহা কিছু বলিলেন সকলই নিষ্ফল হইয়া গেল। প্রথম দিন তারিণী এ বিষয়ে কথা তুলিলে দু একটা কথার উত্তরও দিয়াছিলেন, কিন্তু তারপর আর কোনো কথার উত্তরও দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁর মুখে অসন্তোষ চিহ্ন দেখিয়া অপমানিত হইবার ভয়ে উমাকান্তও একেবারে নীরব হইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তারপর যখন বাড়ী ফিরিবার কথা তুলিলেন তখন মহেশ্বরী আর দু দিন থাকিয়া যাইতে বলিলেও তারিণী কোনও কথাই বলিলেন না।

তটিনী বলিল "আরও দিন কতক থাকুন না জ্যাঠামশায়, বাড়ীতেও তো কোনো কাজ নেই আপনার ?"

"না মা,—মা বুড়ো মানুষ, তিনি একা আছেন, অসুখ বিসুখ হ'লে আর কেউ দেখ্‌বার লোক নেই, আমায় যেতেই হবে, মনটা ভাল লাগচে না, আর যে জন্য আমি এসেছিলাম, তাই যখন হ'ল না আর থেকেই বা কি ক'র্‌ব !"

তটিনী চুপ করিয়া রহিল, কি জন্ত যে আসিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্ত কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। উমাকান্ত একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে কোথাও কেহ আছে কিনা? কেহ কোথাও ছিল না তিনি একটু কি ভাবিয়া দেখিলেন, বলিলেন "তিনু মা আমার সঙ্গে যাবে? মা তোমাকে দেখবার জন্য ভারী ব্যাকুল হয়ে আছেন, যাবে মা?"

"বাবা কি বলেছেন?"

"তোমার বাবা কিছু বলেন নি, বলবেনও না। তবে তুমি যদি যেতে চাও তা হ'লে তাঁকে বলি, তুমিও বলো, তুমি আমার কয়লে আর 'না' বলবেন না।"

"বাবা তো আমার কথা ভালবাসেন না, আর বাবা যদি নিজে না যান তা'হলে আমাকেও যেতে বলবেন না।"

"তা জানি কিন্তু তোমার যাওয়া যে নানা কারণে বড্ড দরকার, তোমার যেতেই হবে, তোমার যাওয়া যে কত দরকার তা' তোমার ওই একগুঁয়ে বাপটীকে কিছুতেই বোঝাতে পরালুম না এই দুঃখ। তুমি আমার সঙ্গে চল মা!"

"কেমন করে যাবো?"

"বাবাকে না বলে!"

"অসম্ভব! আমি তা পারবো না, তা করতে যাবো কিসের জন্য! আপনি একথা কেন বলছেন, এত কি দরকার আমার যাওয়ার।"

"তোমার শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে, আমি তোমাকে বারীনের হাতে সঁপে দিয়ে—"

অকস্মাৎ দৃপ্ত দৃঢ় কণ্ঠে তটিনী বলিল "জ্যাঠা মশায়! আবার আপনি তাই বলছেন? বাবার কাছ থেকে আমাকে আপনি লুকিয়ে নিয়ে যেতে চান আবারও?"

"তুমি স্বামীর ঘরে যাবে তাতে দোষ কি মা?"

"না, আমি আমার বাবাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই নে, কোথাও না, আপনি ও-কথা বলবেন না!"

"তিনু মা,—তিন দিনের জন্তে এখানে এসে বারীন এক মাস পুরোপুরি রয়ে গেল, শুনছি মায়ার সঙ্গে তার নাকি বিয়ের কথাও উঠেছে, এসব কি ভাল কথা! আমার যথাসাধ্য আমি করে গেলাম, বোঝ, যদি মায়ার সঙ্গে বারীনের বিয়েই হয়, তবে!"

তটিনী যেন অবহেলায় হাসিয়া বলিল—"তবে আর কি? অত পরের ঘরের ভাবনা ভেবে লাভ কি বলুন?"

• "কিছু যেন বুঝচো না মা, নিজের ভাবনাই ভাবো না কেন—"

"সে বাবাই আমার চেয়ে বেশী বুঝতে হয় বুঝবেন, না-হয় না বুঝবেন, বাবার বিদ্রোহী হতে পরামর্শ আমাকে দেবেন না জ্যাঠামশায়, সে আমি পারবোও না পারতে চাইও না।"

তটিনীর দৃপ্ত-কণ্ঠ অকস্মাৎ বেদনাহত আর্তস্বরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ব্যথায়, লজ্জায় তার মুখ ঘামিয়া কালো হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি মুহূর্তেই তার ভয় হইতেছিল বুঝি সে আর কথা বলিতে পারিবে না, আর তার নীরবতাই উমাকান্তের ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিবে! সে কেবলি ভাবিতেছিল যে কতক্ষণে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের হাত হইতে জ্যাঠামশায় তাকে নিষ্কৃতি দিবেন! উমাকান্ত আবারও গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করিলেন, তারপর খুব ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"রাত এগারোটায় ট্রেণ, আর এখন বেলা সাড়ে আটটা কি ন'টা হবে, এই এতক্ষণ সময় তুমি ভাল করে ভেবে দ্যাখ তিনু মা, তোমার কি মত হয় আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না বা লজ্জা করো না।"

তটিনী মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল, মত প্রকাশ সে আর কতবার করিবে? উমাকান্ত অশ্রু-সজল গাঢ় কণ্ঠে বলিলেন "জানিনে আমি তারিণীর একগুঁয়ে কঠোর স্বভাব জেনেশুনেও তার মেয়ের উপর কর্তাগিরি ক'রতে গিয়েছিলাম কেন? আজ মনে হয়, সবই ভগবান করেছেন, এ সব কাজে তিনি ভিন্ন কেউ কর্তা নেই; তবু নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে আজ আমার এ মনস্তাপ ভোগ কর্‌তে হচ্ছে, এ বুড়ো ছেলের দুঃখ মা তুইও গ্রাহ্য ক'রলি নে!"

এবারও তটিনীর মুখ হইতে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। উমাকান্ত ক্ষুণ্ণ মনে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে তারিণী যে অতিরিক্ত আদর দিয়া ও অতি সভ্যতার কায়দায় কন্যাকে প্রতিপালন করিতেছেন এই জন্যই আজ তটিনী স্বামীর জন্য এইটুকু ক্লেশ স্বীকার করিতে পারিল না। আপন মনে বলিলেন "আহা আর দুদিন আগে

যদি এ সব কথা শুনিয়ে দেখতাম, তা হ'লে পৌরাণিক সতীদের উপাখ্যান গোটাকয়েক ওকে শোনালেও হ'ত।"

পরক্ষণেই আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কি দরকার আমার ওদের কিছুতে হাত দিয়ে? একবার আপন মনে কাজ ক'রে তো এই ফল হয়েচে, আবার কেন? তবু তো ভগবানের ইচ্ছের সুপাত্রেই দ'য়েছিলাম তাই মনকে নির্দোষ বলে বোঝাতে পারছি এখন ওদের ন্যায় অন্যায় ওরা বুঝুক!"

কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত সাড়ে দশটায় উমাকান্ত প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তটিনী কোনও মতই জানাইল না, তিনিও তারিণীর কাছে আর কোনো কথা তুলিতে সাহস করিলেন না। তারিণী সেদিন অতিরিক্ত প্রসন্ন মনে ছিলেন। অত রাত্রেও তিনি উমাকান্তকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে যাইবার জন্য নিজেও তৈয়ারী হইয়া দাঁড়াইলেন। মায়ের কথা তুলিয়া উমাকান্তের সঙ্গে কিছু গল্পও করিলেন। তটিনী উমাকান্তকে প্রণাম করিলে তিনি তার মাথায় হাত দিয়া অনর্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া গেলেন।

তারিণী বলিলেন "তিনুমার বুঝি মন কেমন ক'রছে,—মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে যে!"

তটিনী লজ্জানত মুখে একটু হাসিল। গাড়ী সেই রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তটিনীও নীরবে নিজের বিছানায় গিয়া বসিয়া পড়িল। এই স্তব্ধ, স্পন্দনহীন রাত্রির নীরবতার সঙ্গে তার অন্তরও কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? সে রাজ্যেও যে আর কোনো অনুভব জাগ্রত নাই! সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র মূর্চ্ছিত!

পাশের ঘরে মহেশ্বরী তাঁর জপের মালা হুকে টাঙাইয়া রাখিয়া 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। আলোর দম কমাইয়া দিয়া মহেশ্বরীর মনস্তুষ্টির জন্য তটিনীও শুইয়া পড়িল।

সবেমাত্র পূর্ব্বাশায় অরুণের স্বর্ণ মুকুট একটুখানি দেখা দিয়াছিল। পশ্চিম কোণে পাংশুর চাঁদের আলো একটু একটু করিয়া শুভ্রতায় মিশাইয়া যাইতেছিল। দূরে একখানি নূতন সাদা বাড়ীর ছাদের মাথায় কয়েকটা পায়রা জাগিয়া তাদের জাতীয় ভাষায় কলরব করিতেছিল।, তখনো দিনের সাড়া আর কোথায় পৌঁছায় নাই, সর্ব্বত্র সুষুপ্তিমগ্ন!

এই অবসর সেদিন তটিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তার নিরুদ্বিগ্ন শান্ত মনে এই স্তব্ধতার অবসর অতীত শৈশবের স্মৃতি ওতোপ্রোতঃ ভাবে জাগিয়া উঠিল। সে অনাবশ্যক অতি তুচ্ছ কথা সে কোনো দিনও মনে করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করে নাই, সেইগুলিই এই অবসরে অত্যান্য প্রীতির পদার্থ হইয়া তার মনকে পুলকিত করিয়া তুলিল।

তার ঠাকুমা চিরদিন এমনি ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠিতেন ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল ঠা'কুমা মাতৃহীনা বলিয়া তাকে কতই না ভাল বাসিতেন, কত যত্ন কত সতর্কে তিনি তটিনীকে রাখিতেন। তার স্বপ্নের মত মনে পড়িল, সেই একদিন সাহানায় বিজয়ার কোমল করুণ সুর কাঁদিতেছিল, তটিনীর ঠাকুমা তাকে বুকে করিয়া অজস্র চুম্বনে তার মুখখানি ভরাইয়া দিতেছিলেন এমনি সময় তার বাবা আসিয়া বজ্রগর্জ্জনে ডাকিয়াছিলেন "মা!"

উৎসবের সমস্ত আলোক অনন্দ বজ্রাহত হইয়া নিবিয়া গেল। তারিণীর তেমন উগ্রমূর্ত্তি আর কেহ কখনো দেখে নাই। তটিনী তার বড়মার বুকের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কিছু বুঝিয়াছিল যে তার পিতার এই সংক্ষিপ্ত 'মা' ডাকটুকুই কি গভীর, কি মর্ম্মাহত তাঁর সে কণ্ঠ!

ঘরের মধ্যে যে কয়জন লোক ছিলেন সকলেই থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিলেন সেই সময়ে তটিনীই কেবল সজোরে বড়মার হাত ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বাপের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিল এমনি করিয়া সে পিতার এই ক্রোধাগ্নি নিভাইয়া বাড়ীর শান্তি ফিরাইয়া আনিবে।

নূতন শাঁখা শোভিত হাত দুখানি দেখাইয়া সে বলিয়াছিল "দ্যাখ বাবা, আমার বিয়ে হয়েছে!"

দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া তারিণী বলিয়াছিলেন "চুপ করো তিনু, তোমার বিয়ে হয় নি।"

"হয়েছে বাবা, দেখ না মাথায় সিঁদূর দিয়ে দিয়েছে যে!"

"আবার! আমি বল্‌চি তোমার বিয়ে হয় নি, খবরদার্‌ তিনু ওকথা আর ব'লবে না!"

সে সময়ে তাঁর মুখে অতি আঘাতের যে ভয়াবহ চিহ্ন ফুটিয়াছিল তাহা দেখিয়া তটিনীর শিশুচিত্ত ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে চলিয়া আসে তখনকার কথা মনে পড়িল। সমস্ত গ্রাম ভরা তুমুল আন্দোলন। মুখরিত বাড়ীখানা অস্পষ্ট চাপা কান্নার স্পন্দিত মাত্র। রৌদ্রের উত্তাপে কলার গাছ শুকাইয়া নুইয়া প'ড়িতেছিল, আনন্দের হাটে যেন সে অগ্নিকাণ্ডর মত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

তারপর যখন সে এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জন পুরীতে আসে, তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিলেন, তার বাবা, কিন্তু তাঁর তো সর্ব্বদাই বাহিরে কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত। একজন প্রবীণ পণ্ডিত আসিয়া তটিনীকে পড়াইতেন, তিনি যদি উদাহরণ দিতে বসিয়া কখনো দু একটা অসম্পূর্ণ গল্প বলিতেন তা হলে তটিনী কতই না তৃপ্ত হইত। রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে যদি কোনো দিন 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত; তাহার পরেই দেখিত কি আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়া তার বাবা তার শিয়রে দাঁড়াইয়াছে।

এ তার শৈশবের কথা। তার তুলনায় এখন সে অনেক সাথী, অনেক কাজ, পাইয়াছে, যা না হইলেও তার দিন কাটে, তবু এই তার অতৃপ্ত মন আরো কি কিছু চায়? হায় মানুষের মন! আকাঙ্ক্ষার যে আর সীমা পরিসীমা নাই! সত্যই কি সেও মনের গোপন পুরে নিজেরও অজানা কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে? তার পিতার অতি যত্নের এই প্রহরী ঘেরা সুদৃঢ় দুর্গে এদুর্গ্রহ আবার কেমন করিয়া কোন্ ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িল!

সূর্য্যের তপ্ত কিরণ গায়ে প'ড়তে তটিনী উঠিয়া বসিল। আপন মনে ভাবিল "ছিঃ ছিঃ একি ভাবছি ছাইভস্ম! কোনো কাজ না থাকলে যত ভূতের বাসা হয় মাথাটা, আমারও হয়েছে তাই!" ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া সে নীচে নামিয়া গেল! তার পোষা ময়নাটা তখন ক্ষুধার জ্বালায় খাঁচাময় লাফালাফি করিয়া চেঁচাইতেছিল।

রক্ত গোলাপের মত সুন্দর মুখখানিতে একমুখ হাসি ভরিয়া মায়া আসিয়া বলিল "বাপ্‌রে! তিনু দি এখনো ঘুমুচ্ছো তুমি?

"হুঁ,—এত সকালে যে মায়া?"

"আমার হাতের আংটী হারিয়েচে, তাই খুঁজতে এসেছিলাম যদি তোমাদের বাগানে ফেলে থাকি, মা যা বকুনি ব'কছেন, বাড়ী যেতে ভয় ক'রচে।"

"আংটী খুঁজে পাওয়া গেল না? খুঁজ্‌ছো তো ভালো করে?"

"খুঁজ্‌চিই তো! আর কত খুঁজ্‌বো, মা কাপড়ে গেরো দিয়ে দিয়েছেন, আংটী যদি পাই তা হ'লে দুধ গঙ্গাজল দিয়ে এ গেরো খুলতে হবে।"

"আর তা না পাওয়া গেলে? এস আমি একটানে খুলে ফেলে দি।"

"না ভাই, তা খুলতে নেই।"

"তবে যাও বন বাদার খুঁজে দেখগে, কোথায় ফেল্‌লে আংটী, আমার অন্য কাজ আছে আমি যাই।"

"আহা কত তো তোমার কাজ প'ড়ে রয়েছে, আমি আর জানিনে কিনা?"

"খুব জানো; তোমার আংটী খুঁজে দেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কাজ কর্ম্ম কিছু নেই, হ'ল তো!"

"তিনুদি সত্যি সত্যি তুমি ওপরের ঘরগুলো একটু ভালো করে খুঁজে দেখো ভাই, না পেলে মা বড্ড বক্‌বে!"

"আচ্ছা, আচ্ছা তুই যা,—ওপরের ঘরে যদি থাকে তো হারাবে না, আমি দেখবো এখন।"

মায়া চলিয়া গেল। বৈকালে বারান্দায় রৌদ্রে মাদুর পাতিয়া শুইয়া তটিনী চুল শুকাইতেছিল। পশ্চিমের রোদ একটু একটু করিয়া ক্রমে সরিয়া যাইতেছিল। বারান্দায় ছায়া পড়িয়া দিনান্তে রাঙ্গা আলো গাছপালার শীর্ষে আশ্রয় লইলে মহেশ্বরীর ধমকে তটিনী উঠিয়া চুল জড়াইয়া লইল; তার দীর্ঘ-ঘন-চুলের রাশি একটুও শুকায় নাই। ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বিনুণ ছুটিয়া মায়ার আংটীটা তার হাতে দিয়া গেল, তটিনী প্রফুল্লমুখে বলিল "এযে মায়ার সেই আংটীটা! যা দৌড়ে গিয়ে মায়াকে ডেকে নিয়ে আয়, বলগে দিদি ডাক্‌চেন"

মায়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল "ও তিনুদি তিনুদি আমার আংটী নাকি পাওয়া গেচে, সত্যি নাকি? কই দেখি?"

তটিনী একটু হাসিয়া বলিল "বিনুণ বুঝি ব'লে দিয়েছে? ভারী বোকা ও।"

"দাও আংটী!"

"কি খাওয়াবি আমাকে, দুধ গঙ্গাজল?"

"আগে দাও আমার জিনিষ,—তার পর তুমি যা খাবে তাই খাওয়াব, কই দিচ্চো না?"

"ছাই দেব, দেব না তো। আগে বল্ আমাকে কি দিবি!"

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে অতুল বলিল "আহা! কেন ছেলে মানুষকে কষ্ট দাও তিনু; দিয়ে দাও ওকে ওর জিনিষ, বেচারা কত বকুনিই খেয়েছে হয় তো ওরি জন্যে!

তটিনী হাসিতে হাসিতে আংটীটা মায়ার হাতে দিল। মায়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই তেমনি ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মা ব'লেছেন তিনুদির আজ আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন, যাবে তো তিনু দি?"

"এই রে! অবেই আমি গিয়েচি, নেমন্তন্ন কে চেয়েছিল তোর কাছে?"

"যাবে না?"

মায়ার শঙ্কিত মুখ দেখিয়া তটিনী বলিল "বাবাকে জিজ্ঞাসা করি আগে বলেন তো যাব, না ব'লে গেলে যে বকুনি খেতে হবে"

অতুল বলিল "ও তোমার বাজে কথা, ওদের বাড়ী গেলে তুমি বকুনি খাবে না, মা তোমার সঙ্গে যাবেন তো!"

"আচ্ছা! বাবাকে বল্‌তে তো হবে!"

মায়া তটিনীকে বারংবার অনুরোধ করিয়া বাড়ী গেল। অতুল বারান্দার রেলিংএর উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল "আমরা কাল ক'লকাতা যাচ্ছি জানো তো তিনু?"

"জানি, তুমিই বলেচ, ক'জন যাবে তাই আমি না বলে বহুবচন ব্যবহার করছো?"

"আমরা যে কজন আছি সেই কজন যাবো, বারীনও যাবে, বারীনের মাসতুতো ভাই প্রকাশও যাবে,—ও ভাল কথা, মায়ার দাদা কাল ব'লছিল যে বারীনের সঙ্গে নাকি মায়ার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রছে ওরা, কেবল বারীনের বাবার শরীর খুব খারাপ হয়ে আছে তাই পাকা কথা হ'তে পারছে না,"

তটিনী অন্যদিকে চাহিয়া বলিল "মায়া তো বেশ ভালো মেয়ে!"

উৎসাহিত অতুল তটিনীর মুখপানে না চাহিয়াই বলিল "বারীনও লোক খুব ভালো, তবে কিনা একটু অধিক মাত্রায় Senti mental!"

তটিনী এবারেও চুপ করিয়া নীচেকার উঠানে বড় মাটীর গামলায় করিয়া যে হৃষ্টপুষ্ট গরুটী তৃপ্তমনে জাব খাইতেছিল সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর বলিল "ওমা! বাবার জলখাবারের মিষ্টি তো আনানো হয় নি, দোখ গিয়ে বিষুণ টা কোথায় গেল!"

বলিয়া সে বিষুণের খোঁজে নিজেই উঠিয়া গেল। বিস্মিত অতুল ইহাকে তিনুর অকারণ ব্যস্ততা ছাড়া আর কিছুই বুঝিল না। কিছুক্ষণ সে বসিয়া থাকিয়া তারপর সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তার সমস্ত বন্ধুর দল হয় খেলার মাঠে, না হয় সরকারী পার্কে বসিয়া অপেক্ষা করিবে।

(১১)

পাম গাছের ছায়ায় একটা কৃত্রিম পাহাড়ের কাছে কোমল ঘাসের উপর বসিয়া বারীন একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। অনেক যায়গা ঘুরিয়া সেইখানে আসিয়া অতুল তার দেখা পাইয়া বলিল "ব্যাপার কি? এমন একা হয়ে বস্‌লে যে!"

বারীন বই বন্ধ করিয়া বলিল "আমি যে বহুক্ষণ এসেছি, ঘরে পাঁচ জনকার গোলমালে এই বইখানা এক সপ্তাহেও শেষ করতে পারি নি, কাল যেতে হবে কাজে কাজেই একটু নির্জ্জনে বসে এখানি শেষ করতে হল!"

অতুল হাসিয়া বলিল "মনুষের হাড়মাংসের চেয়ে আবার প্রেমের রাজ্যে মন দিতে শিখলে কবে থেকে? তোমার হাতে নভেল ত বড় সহজ কথা নয়?"

"বাঃ আমি কি নভেল কখনো পড়িনি নাকি, কত পড়ি।"

"এই এখানে এসে বুঝি? এ দেশটার গুণ আছে বলতে হবে কেমন? আশা করি তুমি আবারও এ দেশে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।"

"কক্ষণো নয়, এ দেশ ভাল হক মন্দ হক এখানে দ্বিতীয় বার আসবার ইচ্ছা আমার এতটুকুও নেই, আমি পালাতে পারলে বাঁচি।"

এটা সত্যই বারীনের মনের কথা উমাকান্তকে দেখিয়া অবধি সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল পাছে তার সত্য পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। উমাকান্ত চলিয়া যাওয়ার পর যদিও সে ভাবনা তত ছিল না, তবু তারিণী যেদেশে আছেন সে দেশ সে একটুও নিরাপদ মনে করিত না। অতুল এত কিছুর খবর রাখিত না সে হাসিয়াই বলিল "আর যদি মায়ার সঙ্গে বিয়ে হয়?"

"মামার সঙ্গে ? পাগল তুমি !"

"কেন, জমিদার বাড়ীর জামাই পদ পাবার প্রস্তাব কি তুমি শোন নি নাকি ?"

"আমি এ পদটাকে তত লোভনীয় মনে করি না। কি, আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছ যে ! ভাবছো মিছে কথা বলছি, কিন্তু সত্যি বলচি, মিথ্যে নয় ভাই।"

"কেন এ প্রস্তাব মন্দ কি ?"

"ভাল মন্দ বিবেচনা তো সবারি সমান নয়, বলতো তোমার জন্যেই ঘটকালি করি ?"

"না, বন্ধুতার মাঝখানে আর শত্রুতা টেনে আন্‌বার দরকার নেই, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইনে, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করচি কথাটা সত্যি কিনা ?"

"হতেও পারে সত্যি, তবে তা ওঁরা আমার সঙ্গে তো পরামর্শ করেন নি, আমার বাবার সঙ্গেই ক'রছেন, ওঁদের টাকা আছে খরচ ক'রলে বাবাকে চিঠি লিখ্‌লে বেগ পেতে হবে না।"

"তবে যে ন্যাকা সাজ্‌ছিলে, আগে তো বলা হত যে আমার বিয়ে বিধাতারই বারণ, এখন ?"

"হয় তো ভুল ব'লতাম বিধাতার কথা তো কেউ কানে শুন্‌তে পায় না, আমারও ভুল হ'য়েছিল, কিন্তু এখনি আমাকে অপদার্থ স্থির করে নেওয়া ঠিক নয় !"

"আচ্ছা ! মনে টনে রেখো ভাই আমাদের।"

"মন ! যদি সে অবস্থা হয় তো মন পাবো কোথায় ? আর একজনকে দান ক'রতে হবে যে !"

অতুল হাসিয়া উঠিল "বাপ্‌রে এ যে ব্যাধিগ্রস্তের কথা ! রোগে পড়েছ নাকি ?"

"না, না, এখনো আক্রান্ত হই নি, ডাক্তার মানুষ কিনা রোগব্যাধি কিছু কম।"

বারীনের পিতা কৃষ্ণবিহারী এই সময়ে বারীনের পূর্ব্ব বিবাহের কথা একেবারে গোপন করিয়া বারীনকে অবিবাহিত বলিয়াই পরিচয় দিতেন। তাঁর ঋণের বোঝা এতবেশী বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে অর্থের চেষ্টায় তাঁর সত্য মিথ্যা জ্ঞান লোপ হইয়া গিয়াছিল। তাঁর যথাসাধ্য সতর্কতা সত্বেও তাঁর অবস্থার সকল খবরই বারীন জানিয়া ফেলিয়াছিল। এই নিঃস্ব অবস্থায় একটা বিবাহ গোপন করিয়া অর্থলোভে নিজের ভার বাড়াইবার ইচ্ছা বারীনের ছিল না।

পিতার এই অবস্থার মাথায় করিয়া কোন্ অক্ষম সন্তান সংসার পাতিতে ইচ্ছা করে? আর তা ছাড়া প্রচুর যৌতুকের সঙ্গে যাঁরা কন্যাদান করিবেন তাঁদের এতবড় প্রবঞ্চনা সে কেমন করিয়া করিবে? কিন্তু পিতার অসন্তোষের ভয়ে সে কোন কথা খুলিয়া বলিতেও পারিত না।

ইদানিং নানা রকম রোগে কৃষ্ণবিহারী একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন শারীরিক দৌর্বল্যের উপর মনের আঘাত কোনো একটা গুরুতর ক্ষতি করিতে পারে ভয়ে বারীন তাঁকে যথা সম্ভব প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিত।

মায়ার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে যখন জমিদার রাজেনবাবু ও কৃষ্ণবিহারীর চিঠিপত্র চলিতেছে, সেই সময়েই হয় তো অসুস্থ শরীরের খেয়ালে কৃষ্ণবিহারী বারীনকে তারিণীর নামে একখানি চিঠি পাঠাইলেন যেন বারীন চিঠিখানি নিজের হাতে করিয়া তারিণীর হাতে দ্যায়। চিঠিতে একবার দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল অনুরোধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বারীন অত্যন্ত বিরক্ত হইল। সাধ্য মত সে তারিণীর বাড়ীর ছায়া মাড়াইতে যাইত না, উমাকান্তকে যেদিন দেখিয়াছিল সেই দিন হইতে সে তারিণীর বাড়ীর দিক দিয়াও চলিত না। সেই তারিণীবাবুর সঙ্গে পরিচয় পত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া দেখা করিতে যাইতে লজ্জায় তার মাথা কাটা যাইতেছিল।

তার কেবলি মনে হইতেছিল, ছি ছি তারিণীবাবু তাকে কি লুব্ধই মনে করিবেন, আর অপমান করিয়া যদি কিছু বলিয়া বসেন তো সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তবু যাইতেই হইবে, না হইলে কলিকাতায় গিয়া পিতাকে কি জবাব দিবে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচের মাথা খাইয়া সে ষ্টেশনে যাইবার পথে তারিণীবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। তারিণী বাসায় ছিলেন না, কোন্ মক্কেলের কাজে তাঁকে আবার মফঃস্বলে যাইতে হইয়াছিল। এই মিনিট দশ আগে অতুল রওনা হইয়া গিয়াছে, মহেশ্বরী সায়ং সন্ধ্যায় বসিয়াছেন এতক্ষণ তার অতুলের কাছেই কাটিয়াছিল এইমাত্র অবসর পাইলেন।

বাহির বারান্দায় ঠিক সামনে কৃশ দেবদারু গাছের মাথার উপর পঞ্চমীর অতি স্নিগ্ধ চাঁদের ফালি দ্রুত চলিয়া পড়িতেছিল। হাস্নাহানা ঝাড়ের ছায়া পড়িয়া বারান্দার যেখানে

তটিনী দাঁড়াইয়াছিল সেখানটুকু ঢাকিয়া গিয়াছিল, বারীন একেবারে সেই বারান্দার দাঁড়াইয়া ডাকিল "অতুল, অতুল !"

প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে তটিনীর সমস্ত মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল, তবু সে শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিল "দাদা, বাড়ী নেই।"

"বারীন বিপন্ন ভাবে মাথা নামাইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ করিল,তারপর বলিল' 'বাড়ীতে আর কেউ নেই কর্ত্তা ?"

ব্যগ্রভাবে বারীন ঘড়ি বাহির করিয়া চাঁদের আলোর দিকে আগাইয়া দেখিল দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিট, আর দেরী করিলে ট্রেন পাওয়া যাইবেনা। তটিনীও খুব চঞ্চল ভাবে বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল বারীন তাড়াতাড়ি বলিল "এই, একখানা চিঠি আছে কর্ত্তার নামে ?" যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া তটিনী বলিল "তিনি বাড়ী নেই তো !" "ফিরে এলে দিলেই চলবে, আর তাঁকে বলতে হবে যে, আমার ট্রেনের সময় হয়ে যাওয়াতে আমি নিজের হাতে তাঁকে চিঠি দিতে পারলাম না ও। হাঁ। আমাকে তো আর কেউ চেনেনা, আমার নাম বারীন ব'লে ব'ললেই তিনি চিনতে পারবেন।"

"আমিও চিনি"

বারীন একটু হাসিল, চিঠিখানি তটিনীর কাছে একটা বেঞ্চের উপর নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। তারা দুই জনেই পরস্পরকে চিনিয়াছিল, কিন্তু বারীনের শান্ত সংযত ভদ্র ব্যবহার সেই সুদূর সম্পর্কের ধার দিয়াও গেলনা। যেমন একজন নিসম্পর্কীয়া ভদ্রতরুণীকে হঠাৎ তুমি বলিয়া কথা বলিতেও পারিল না।

তটিনী ক্ষিপ্রগামী চন্দ্রলেখার পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। একটা জ্বালাময় উত্তাপ তার বুকের ভিতর ফেনাইয়া উঠিতেছিল। যে জ্বালার আবেগে পতঙ্গ বহ্নিমুখে ঝাঁপাইয়া পড়ে মৃত্যুর যন্ত্রনা তার তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক কিনা কে জানে ? মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের তথ্য মানুষের মনকে কে বুঝাইয়া দিবে। জীবনের গতিপ্রবাহ সে যে মরণ শরণ করিয়াই নিয়ত ছুটিয়াছে !

তারিণী বাবু ফিরিলে তটিনী চাকর নিতাইকে দিয়া চিঠিখানি পাঠাইয়া দিল নিজে গিয়া দিতে পারিল না। তারিণীবাবুও চিঠি পড়িয়া কাহাকেও কোনো প্রশ্ন করিলেন না, বা কৃষ্ণবিহারীর প্রার্থনা মত দেখা করিবার কোনো চেষ্টাও করিলেন না!

তিনি মনে করিলেন এও কৃষ্ণবিহারীর একটা ছল মাত্র। কোনো রকমে একবার দেখা করিয়া সে তটিনীর উপর দাবী করিতে চায়! এ স্থলে ঘনিষ্ঠতা করিতে তাঁর মন চাহিল না তিনি কৃষ্ণবিহারীর পত্র বার দুই তিন ভাল করিয়া পড়িয়া দেরাজে তুলিয়া চাবী দিলেন। বোধহয় বেখানে সেখানে রাখিলে তিনু দেখিতে পাইবে এ ভয় তাঁর ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

স্বদেশ সেবার আদিতে।

——:•:——

আজকেও কি কাউকে বলে দিতে হবে ঠকেছি আমরা কোন্ দোষে! নিজের ধন, অধীকৃত সম্পদ তুচ্ছ ভেবে, নিজের দিকে না চেয়ে, পরের ঘরে পরের ধন, পরের সভ্যতা আমাদের চক্ষে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তাই না আমাদের এত দুর্গতি! দুর্গতি বলে দুর্গতি! ধনে প্রাণে মনে আমরা যে কতখানি খাট হয়েছি সে কথা আজ কে না অনুভব করছে! আমাদের দীনতা হীনতা বেশ আজ উপলব্ধ করতে পারলেও মনটা এমনি ছোট হয়ে গেছে যে যেটাকে ভাল বলে বুঝেছি, নিজেদের উদ্ধারের পথ বলে মেনে নিয়েছি সেটা অবলম্বনেও দ্বিধা। সকলেই আমরা জানি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দেশমাতাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জেনে,—সবাই মাতার সন্তান, ভাই ভাই—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দেশবাসীকে আপনার জন বোধে প্রেমালিঙ্গনে যে মানবসঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, সেই প্রেমসঙ্ঘ, প্রেমমিলনফলে ভারত হয়েছিল সর্ব্বদেশের শীর্ষস্থানীয়। কর্ম্মের মর্ম্মে প্রবেশ করে—কর্ম্মকে হেয় না করে ছোট বড় কঠিন সহজসাধ্য

সকল কর্ম্মকেই ধর্ম্মের, প্রশংসার কার্য্যরূপে গ্রহণ ক'রে দেশকে যে গৌরবময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, কৃষি হতে দর্শনের সূক্ষ্ম তথ্যালোচনা যে দেশে সমভাবে গৌরবের বলে বিবেচিত হত; কৃষকই যে দেশের শাস্ত্রবেত্তা ঋষি; সে দেশের সন্তান আমরা যে কারণেই হ'ক অবসাদগ্রস্থ হয়ে জেনেও ভুলে গিয়েছি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সেই মহান্ মূল সত্য। এখন অনেকের মুখে শুনতে পাই এ দেশের ঋষিরা নাকি এ জগৎটাকে মিথ্যা বলেই জেনেছিলেন, আধ্যাত্মিকতাই তাঁদের ছিল মূল লক্ষ্য; এ হ'তে বড় মিথ্যা ধারণা আমাদের জীবনে আর একটি ঘটেছে কি না বলা কঠিন। যে ঋষি মানবজীবনের প্রত্যেক অংশ মানবজীবনের প্রত্যেক অভাব অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করে তার ভাল মন্দের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, এমন বস্তু নাই যাতে ভারতীয় ঋষির দৃষ্টি নিপতিত হয় নি পশু হতে মানুষ পর্য্যন্ত কোন জীবেরই হিতাহিত চিন্তা যাঁদের দৃষ্টি এড়ায় নি, তাঁরা সংসারের প্রতি বিরূপ ছিলেন এ কথা কল্পনা করা কোন ক্রমেই চলেনা। দেশের উন্নতির যে সর্ব্ব-উন্নতির মূলে এতথ্যের উদাহরণ উপদেশ শাস্ত্রীয় গ্রন্থে জাজ্বল্যমান। তাঁদের চক্ষে ভারতের উন্নতির যুগে জাতিধর্ম্মের, কর্ম্মবিভাগের গুণগরিমা জাতীয় উন্নতিকে বাধা দেয় নি তখনও সার্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বশ্রেণীর লোক নিয়োজিত হত যার যেরূপ শক্তি।

উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ সেখানে ছোট বড় বলে আর কি আছে! সমস্তই তার গৌরবের— সমস্ত আয়োজনই তার মানব জাতির হিতার্থে। ঋষি গভীর শাস্ত্রালোচনায় ধ্যানমগ্ন! ধ্যানস্থের সেই কঠোর সাধনার ফল বিতরণ করলেন তিনি নিখিল মানবের জন্য। এমন কোন বিষয় ছিল না যার উৎকর্ষতার জন্য ভারতঋষি অনন্যমনে ধ্যান রত না হয়েছেন। সেই মহাত্মাগণের বংশধর আমরা জানি না কোন্ মোহে কোন্ শিক্ষার ফলে, পোষাক পরিচ্ছদকে উন্নতির, সভ্যতার উপকরণ রূপে গ্রহণ ক'রে কর্ম্মত্যাগকেই সুখের সভ্যতার সোপান বলে বিবেচনা করেছি। আজ আমাদের এই কুকীর্ত্তির চরম ফলে উপনীত হয়ে আমাদের বেশ বুঝতে হয়েছে দেশমাতাকে উন্নত করতে হলে, নিজকে প্রাণে বেঁচে থাকতে হলে পরের পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে চলবে না আবার দেশের যে শিল্প যে কৃষি অবজ্ঞার চোখে এতদিন দেখে চরম অবনতি এনেছি,

তারই উন্নতির জন্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে হবে। কৃষক ভ্রাতাকে আর চাষা বলে উপেক্ষা করলে চলবে না, কৃষকের সঙ্গে নিজকেও চাষা হতে হবে। এখন যাতে কৃষি শিল্পাদি উন্নতিলাভ ক'রে দেশে মোটা ভাত কাপড়ের যোগাড় হয়, আমাদের সকল বিদ্যা সকল চিন্তাকে নিয়োজিত করতে হবে সেই সমস্যার মীমাংসায়। নিজে বড় বড় পাশ করে বড় মাহিনায় তুষ্ট হলে আর চলবে না, দেশের দশজন যাতে পুষ্ট হয়, প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে সর্ব্বাগ্রে। ভারতে এখন যাতে ভারতজ দ্রব্যসম্ভারের উন্নতি আপামর—ছোট বড়, উন্নত অনুন্নত সমস্ত ভারতবাসী মিলিত হয়ে চেষ্টিত হয় নিজের দেশের ধনে নিজে পুষ্ট হতে পারে সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষা চাই। ঋষি যেমন প্রথমে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের উন্নতিসাধন করে, ভারতে সবল সুস্থ জনসঙ্ঘ সৃজন করেছিলেন; সুস্থ দেহে সুস্থ মনে ভারতবাসী গভীর তত্ত্বালোচনায় সমর্থ হয়েছিলেন—সেই অবস্থা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে; বাঁচাতে হবে নিজকে; দেহটাকে পুষ্ট উৎকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতে হবে বিধিমত—মূল চেষ্টা আমাদের হতে হবে দেহমনে সবল সরল হবার জন্যে। সকলের স্বার্থ-সুখকে নিজের বলে মেনে নেওয়া—এ ভারতের সম্পদের আদিতে যেটি—সেইটির উৎকর্ষতা-সাধন-চেষ্টাই এখন আমাদের প্রধানতম চেষ্টা। কৃষি-প্রধান এ ভারত, প্রথম চেষ্টাই আমাদের হওয়া উচিত কৃষির উন্নতি সাধনে। বুঝতে হবে আমাদের মাটিই খাঁটী, সর্ব্ব-উন্নতির মূলাধার। কৃষিউৎপন্ন বস্তু আমাদের জীবনধারণের ও সম্পদ সুখের একমাত্র কারণ হলেও আমরা কৃষি কর্ম্মকে হেয় নিম্ন শ্রেণীর করণীয় বলে ঘৃণার চক্ষে দেখে এমনি উপেক্ষা করে এসেছি যে কৃষি সাধনের মূল উপকরণগুলির প্রতি ফিরে চাইনি বল্লেও বেশী বলা হয় না। সুবীজ রক্ষার ব্যবস্থা নাই, গো মহিষাদির অবস্থাও তদ্রূপ। এগুলির উন্নতি যাতে সংসাধিত হয়, সেইটার আগে ব্যবস্থা হক। আমাদের বংশধরগণ বাল্যকাল হ'তে যাতে আমাদের দেশের এই প্রধান ধনাগমের পথটাকে বেশ করে চিনে নিতে পারে তার চেষ্টা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, গ্রামে গ্রামে হওয়া দরকার। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মন মাহাত্ম্য স্মরণ করে, সার্ব্বজনীন হিতে লক্ষ্য রেখে, তাঁহাদেরি মত নিষ্ঠা সহকারে আমরা যাতে আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে পারি সেই চেষ্টাই আমাদের হক্ প্রধান চেষ্টা। মোটা ভাত কাপড়ে তুষ্ট হয়ে, বলিষ্ঠ দেহ মন,

অর্জনে আমরা সদা সন্তোষের অধিকারী হই যদি, জ্ঞান গরীমা উচ্চ চিন্তা আপনি আমাদের আয়ত্ত হবে। 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা'...এই চিন্তার নিরাকরণ না হলে জাতি সমাহিত হয়ে অন্য চিন্তায় মনঃ সংযোগ করতে পারবে না কিছুতেই।

বস্ত্রসমস্যা এদিনে আর একটা গুরুতর সমস্যা। সমস্যা সন্দেহ নেই কিন্তু এও ঘরের খাঁটী বস্তুকে তুচ্ছ ভেবে পরের বস্তুকে বড় করে দেখবার ফল। বিদেশী মিহি কাপড়ের মোহ—পরিধানের আরাম স্পৃহণীয় সন্দেহ নেই কিন্তু পেটের ক্ষুধায় যে জর্জ্জরিত তার পক্ষে এ-বিলাসীতা যে কত মারাত্মক সে কথাটা না বুঝেই না আমাদের আজ এ দুর্দ্দশা! বেশী দিনের কথা নয় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে গৃহেগৃহে বস্ত্র বয়নের ব্যবস্থা ছিল, যে দেশের লোক নিজের হাতে গড়া, 'গড়া' পরে সুখী হ'ত, নিজের মাতা, ভগিনী, বধূর দান—শিল্পসম্ভার নিত্য-ব্যবহার করে গৌরব অনুভব করত, সে দেশে আজ মিহি বিলাতী কাপড়ের মোহে কি দুর্দ্দশাই না হয়েছে! চরমে উপনীত হয়ে বিলাতী বস্ত্রের মোহ কেটে গেলেও আজ স্বদেশী বস্ত্রের অভাবে আমরা বাধ্য হচ্ছি সেই পরের দেওয়া—'আমাদের রক্তে ছোবান' বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করতে। যে কোচবিহারে এখনও পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান করলে পুরাতন চরকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় সেখানে এর পুনরুদ্ধার কষ্টকর হয়ে উঠেছে, কেননা বস্ত্রবয়ন শিল্পের দ্রুত অবনতিতে বস্ত্রবয়ন উপকরণের সত্যই অভাব ঘটেছে। শুধু উপকরণের অভাব নয়, ঠিক কথা বলতে গেলে মনটা আমাদের এমনি অবসাদগ্রস্ত, জড় হয়ে গেছে যে অভাবটা অনুভব করলেও তা নিরাকরণ করবার প্রবৃত্তিটা তেমনভাবে জেগে ওঠে না। তা না যদি হত, তা হলে এ রাজ্যে যেখানে এখনও বয়নকার্য্যে নিপুণা বহুনারী বিদ্যমান আছে সেখানে বয়নশিল্পের পুনরুদ্ধার কষ্টকর হত না। এক বিলাসের দিক ব্যতীত দেশের মোটা কাপড় যে বিলাতী হতে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কাহারও। এটা যেন আমরা বিলাসিতার মোহে এর পূর্ব্বে ভুলেই গিয়েছিলাম আবার যখন আমাদের দৃষ্টি মোটা কাপড়ের উপর পড়েছে আশা করা যায় অচিরে বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার হয়ে স্বদেশের লজ্জা স্বদেশী বস্ত্রে নিবারণ করবে। বহু দিনের নিদ্রার পর আলস্যভাব ও জৃম্ভন যেমন স্বাভাবিক, বহু দিনের মোহনিদ্রার পর শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য শিথিলযত্ন হওয়াও তদ্রূপ। মন জেগেও ঠিক কর্ম্মপথে এসে দাঁড়াতে পারে নি, তাতে নিরুৎসাহ হবার কি আছে? কর্ম্মশীল মন যখন জেগেছে—সে কর্ম্ম করবে

নিশ্চয়। আমরা পূর্ণপ্রাণে আশা করছি—আবার কৃষি, বস্ত্রশিল্প ও দেশজ বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের উন্নতিতে দেশ উন্নত হবে;—সেদিন বহু দূরে নহে।

এ আশার দিনেও আশঙ্কা করবার আছে আমাদের অনেকখানি। সব চাইতে আমাদের বড় বাধা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তিটাই। কথাটা প্রথমে প্রহেলিকাবৎ মনে হলেও বাস্তব জীবনে আমরা নিত্য এর সত্যতা প্রত্যক্ষ করছি। কর্ম্মী ঠিক নিজের গন্তব্য স্থির করতে না পেরে অনাবশ্যক ছুটাছুটিতে শক্তির এত অপব্যবহার করছে, কর্ম্মের নামে এরূপ মহাপকারী অকর্ম্ম গড়ে তুলছে যাতে করে উন্নতি ত দূরের কথা পিছিয়ে পড়ছি অনেকখানি। তা না যদি আজ হ'ত, তা হলে মহাত্মার অত বড় উদার মহৎ মনের প্রধান দান অহিংসা-অসহযোগীতা স্থলবিশেষে বিষ ফলে পরিণত হ'ত না—এই মুমূর্ষু জাতিকে সে আজ দান করত অমৃত, সকল অবস্থায়, সর্ব্বপ্রকার দেহ মনের আধিব্যাধি নিরাকরণ করে, ভারতীয় ঋষির যে আদি সত্য প্রচার করেছিলেন—অমৃতের পুত্র আমরা সেই সত্য আজ মহাত্মার মাহাত্ম্যে মূর্ত্তিমান হয়ে ঋষি বাক্য স্বার্থক করত। দেশ-মাতার অর্চ্চনায় নিজকে নিয়োজিত করতে হলে আত্মবলি যে তার প্রধান উপকরণ; তা না হয়ে অহংকার, আত্মসুখ, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা যদি কারও লক্ষ্য হয় তা হলেই মাতৃপূজা পণ্ড না হয়ে যায় না। মা যে নয় আমার একার; মার সন্তান আমরা সকলেই—যে মাতৃস্তন্য পীযুষ এক মুহূর্ত্তের জন্যেও পান করেছে, সে যে কুলে যে বংশেই জন্মুক না কেন সে যে আমার মাতার সন্তান—মা যাকে স্নেহভরে আদর করে এক মুহূর্ত্তের জন্যে কোলে টেনে নিয়েছেন সেও যে আমার ভাই, আজ মাতার এই মহা অর্চ্চনার দিনে একটী ভাইকে ভুললেও যে মাতৃ স্নেহের প্রতি অবজ্ঞা অবিচার করা হবে; আত্মস্বার্থ ভুলে তুলে নিতে হবে তাহকে আপনার বুকের কাছে। এই কথা ভুলে যাচ্ছি আমরা অনেক সময়, কোলে না তুলে অকৃতজ্ঞ ভ্রাতা যে তাকে ছুঁড়ে ফেলবার জন্যে চেষ্টা অনেক স্থলে করেছি তার ফলে আমাদের শক্তির অপব্যবহারই হয়েছে, মাতৃযজ্ঞে সাহায্য তাতে একটুকুও হয় নাই। মার সন্তোষবিধানকল্পে ভ্রাতার প্রতি অত্যাচার করে মার প্রাণে ব্যথারই সৃজন করা হয়, কেন না মার উদার অগাধ স্নেহময় বক্ষে ছোট বড় ভাল মন্দ সকল সন্তানের স্থানই যে এক,—দুষ্টের দমন সদা বাঞ্ছনীয়—লাঞ্ছনার নয়, বঞ্চনার নয়,—স্নেহ শিক্ষণে। উদারতার এমনি প্রভাব তাতে মুগ্ধ ও বাধ্য না

হয়ে কেউ পারে না। সেই উদারতা সস্নেহ-সমপ্রাণতায় মর্য্যাদা রক্ষিত হোক্ আজকার এই মহাযজ্ঞে।

যে অবোধ বোঝে নাই এই মাতৃ পূজার মূলমন্ত্র। বীজ মন্ত্রের মাহাত্ম্যের দিকে না যেঁষে যে বাহ্যিক উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উদ্দামনৃত্য আরম্ভ করেছে, যে বাহিরের আয়োজনকেই মনে করেছে অন্তরের পূজা। ও, আমার দরদী ভাই! অবোধের গোবধে আনন্দ দেখে হেসো না, শক্তির অপব্যবহার করছে বলে অবজ্ঞা করো না তাকে, ভাইকে ভায়ের মত বুকের কাছে টেনে এনে বুঝিয়ে দাও মাতৃপূজার মূলমন্ত্র কোন্‌টা। দুর্ব্বৃত্ত দস্যু দেশের শান্তির অপহারক তস্কর আজ এই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে সুযোগরূপে গ্রহণ করে দেশের কি অপকারটাই না সাধন করছে—দেশের সেই রত্নাকরগণকে অনুসন্ধান করে বের কর—নিয়োজিত কর তাদের, সুকর্ম্মের মাদকতা মধুরতায় তাদের আকৃষ্ট কর—তা হলে তার অনুগ্রহে জন্ম হবে শত শত বাল্মিকীর।

উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে দুষ্ট লোকের কারবার, সে যে পদমে নিয়মের শৃঙ্খলে ধরা দিতে চাইবে না সে ত স্বাভাবিক। সে বুঝতে চাইবে না উপকারীর উপকার—দেশের নিয়ম, আইন-কানুন, সে এই উৎসাহ উত্তেজনাকে নিজের মনোমত অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেই ত কিন্তু যাঁরা নিয়ামক, এযজ্ঞের প্রধান হোতা তাঁদের আনতে হবে ত সেই বিপথগামী ভাই-গুলিকে সুপথে। সেই কর্ম্মই না কর্ম্ম, সেই ব্রতই না সার্থক। মহিমাময়ী মার সার্ব্বজনীন স্নেহপীযুষধারায় এক হয়ে আজ আমরা সর্ব্ব ভ্রাতা ভগিনী একতাবলে জয়যুক্ত হই। আত্ম-উন্নতিতে মাতৃ উন্নতি সাধন করে হই ধন্য।

(নব পর্য্যায়)
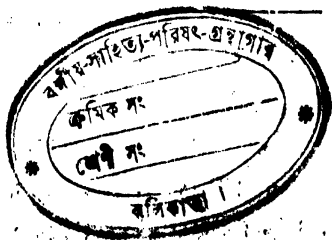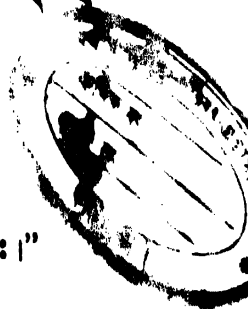
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৬ষ্ঠ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩২৯ সাল। { ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

জীবনের পথে।

—:*:—

জীবনের পথ সঙ্কট অতি
ভয়াকুল বড় ভয়াকুল,
ক্ষণে ক্ষণে শুধু পদে পদে কত
পথ ভুল।
তারি মাঝে মাঝে চোখে চোখে চাওয়া
কত জনমের হারানিধি পাওয়া
এ যেন সে ঘন কণ্টক মাঝে
বনফুল।
জীবনের পথ সঙ্কট অতি
ভয়াকুল বড় ভয়াকুল।

দু'পাশে কেবল অচেনা মুখের
　　ঠেলাঠেলি এ যে কত ভিড়,
এ যেন রাতের অন্ধ তমসা
　　সুনিবিড় !
পথিকে পথিকে কেহ না সুধায়
নিজ মনে শুধু পথে চলে যায়
দু'চারিটি প্রাণ তারি মাঝে যেন
　　ধ্রুব-তারকার শুভ নীড়।
দুপাশে কেবল অচেনা মুখের
　　ঠেলাঠেলি এ যে কত ভিড়।

কে বলিবে এই জীবন-পথের
　　আছে কি না আছে কভু শেষ,
সত্য কি মিছে পথিকে পথিকে
　　প্রেমাবেশ !
এই দু'চারিটি মধুময়ী বাণী
নয়নে নয়নে মন জানাজানি
রবে না কি এই মোহন পরশ-
　　সুখলেশ ?
কে বলিবে এই জীবন-পথের
　　আছে কি না আছে কভু শেষ।

জীবন-পথের প্রান্তে এসে কি
ছিঁড়ে যাবে এই বাহু-ডোর ?
নির্ম্মম কোন বিধান আছে কি
সুকঠোর ?
কেহ চিনিবে না কে কাহার সাথী,
কণ্টক বুকে নিয়েছিল পাতি'
চিনিবে না এই পংচেনা হাসি
আঁখি-লোর !
জীবন-পথের প্রান্তে এসে কি
ছিঁড়ে যাবে এই প্রেম-ডোর ?

তাই যদি হয় তাই হোক্ তবে
দুখ নাই কিছু দুখ নাই,
যারে মন চায় তারে আমি মন
দিব ভাই !
পথিকের নেশা পথিকের থাক্
ত্রিভুবন যায় রসাতলে যাক্
সবটুকু আমি ঢেলে যাব কভু
ফিরে পাই আর নাহি পাই !
তাই যদি হয় তাই হোক্ তবে
দুখ নাই কিছু দুখ নাই !

অবাক্।

—:০:—

(৪)

বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র লঘু চরণে, তুড়্ তুড়্ করিয়া সিঁড়ি বহিয়া দ্বিতলে পৌঁছিয়া বেগম, সতর্ক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মাতার ঘরের দিকে চাহিল। দেখিল, তিনি খাটের উপর একটা বিলাতী কম্বল মুড়ি দিয়া, নিশ্চিন্ত মুখে ঘুমাইতেছেন. তাঁহার খাটের চারিপাশের ছয়টা বড় বড় জানালাই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বর্ষা—দ্বিপ্রহরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের, কোল বহিয়া হু হু শব্দে উত্তুরে-বাতাস আসিয়া ঘরে ঢুকিতেছে।

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বেগম অস্ফুট স্বরে বলিল "হুঁ! রোগা শরীরে এই 'জলো'-হাওয়ায় ঘুমুলে,—" কিন্তু মাতা সম্পূর্ণই নিদ্রিত! সুতরাং বাকী কথাটা সামলাইয়া লইয়া, বেগম নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, সন্তর্পণে পাঁচটা জানালা বন্ধ করিল। মার গায়ে হাওয়া না লাগিয়াও যাহাতে ঘরে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খেলিতে পারে, এমন ভাবে হিসাব করিয়া দুইটা দুয়ার ও জানালা খুলিয়া রাখিল।

আবার প্রত্যাবর্ত্তন। নীচের সিঁড়ি ধরিয়া নামিতে নামিতে, চিঠিখানা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া, অত যত্নে দাগা হাতের অক্ষরগুলা,—ঠিক ছাপার অক্ষরের মত হইবার পক্ষে কোথাও কিছু ত্রুটি রহিল কি না, নিপুণ মনোযোগে, সেই ব্যাপারটা পরীক্ষা করিতে করিতে বেগম ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া ধাপ বহিয়া নামিতে লাগিল।

হঠাৎ দুটি কচি বাহুর বাঞ্ছা-কোমল বেষ্টনে চলন্ত হাঁটু দুইটা অতর্কিতে বন্দী হইয়া গেল! চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বেগম দেখিল, ছয় বছর বয়সের ছোট বোনটি! হাসিয়া বেগম মিহিসুরে বলিল "কি মৎলব Signior?"

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখে বলিল "কিছু নয়, তুমি বেহুঁস্ হয়ে পড়্তে পড়্তে আস্‌ছ কি না, তাই, একটু ভয় মালুম্ করাবার মৎলবে ছিলুম।"

হাসি মুখে হেঁট হইয়া বোনটির কপালে স্নেহের চুম্বন অর্পণ করিয়া বেগম উচ্ছ্বসিত প্রশংসার স্বরে বলিল "আহা সাধু সাধু! বহু ধন্যবাদ! এবার হাত দুখানি খুলে নাও।"

খুলিয়া লওয়া দূরে থাক্,—সে গভীর মমতাভরে প্রাণপণ শক্তিতে বেগমের পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া পরম আগ্রহ ভরে হাসিমুখে আব্দারের সুরে বলিল "আচ্ছা, তুমি একবার এইখেনে 'সুপ্টি' করে বোস-না, আমি তোমায় একটু আদর করি,—বেশী কিছু নয়, শুধু চুমো খাব।"

কারণে অকারণে বোনটির যখন তখন এমনি ভাবে বড় ভাই বোনদের আদর করিবার ঝোঁক চাপে। উচ্ছ্বাসের মাথায় তাড়াতাড়ি কথা বলিতে গেলেও বেচারা, তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণে গোলমাল বড় বেশী রকম করিয়া ফেলে!—সুতরাং 'সুপ্টি' করিয়া বসিবার আদেশ পাইয়া বেগম বিনাবাক্যে চুপটি করিয়া সেইখানেই সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

মেয়েটি দুহাতে বেগমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, এগালে ওগালে চুমা খাইতে খাইতে সহসা কি মনে পড়ায়—থামিয়া, হাসিমুখে বলিল "আমি একটা নতুন 'গাল'—শিখেছি, তুমি শুন্‌লে রাগ কর্‌বে না বুবু?"

গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "গাল? কি গাল?"

"নাক্-কুচি!"

অর্থাৎ, রাক্ষসী!—ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল "তা নাক্-কুচি কান্-কুচির গাল শেখার সময় নষ্ট না করে পড়ার বানানগুলো শেখায় মন দিলে, অনেক কাজ হয়। চট্ করে বানান্ কর,—'বড় গাছ'।"

সে অম্লান-বদনে তৎক্ষণাৎ বলিল "ব' ওয়ে শূন্য ড়, আর ঘ' এ আকার, ত? বড় গাছ!"

"বাঃ! চমৎকার বানান্! 'বড় ঘাত'! 'ঘাত' মানে কি জানো? এই এম্নি করে তোমার মাথাটা ধরে দেয়ালে ঠুকে দিলে, ঠক্ করে ওই যে লাগ্‌বে, ওই লাগ টাকে 'ঘাত' বা আঘাত বলে, যেমন চপেটাঘাত। এই দ্যাখ না,—একবার ঠুকে দেখিয়ে দি, শিক্ষা হয়—"

মহা আপত্তির সহিত বড় বোনকে নিরস্ত করিয়া, ছোট বোন বলিল "আঃ, তাই বুঝি! যা—আর ত, 'গাছ' নয়? যাও তুমি বড়-বোকা।"

মহা তর্ক বাধিয়া গেল! কিন্তু তর্কটা বেশি দূর পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই, বাড়ীর পাশের সদর রাস্তা দিয়া কোন এক সঙ্গীত-বিজ্ঞান পারদর্শী বালক-পথিক নিজমনেই বেখাপ্পা সুরে কি একটা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তে শিশুর ক্ষিপ্র মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল! তর্ক ছাড়িয়া—হঠাৎ সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "আহা-হা! 'লোকে' কি গানই 'গাইলেন্'!"—বলিয়াই সে উৎকট ব্যঙ্গভরা সুরে নিজ মনেই সকৌতুকে ঘাড় দুলাইয়া আবৃত্তি করিল, "আমায়—মেরো না, মেরো না, মেরো না!"—আবার সুটুতে সুটুতে রাস্তায় যাওয়া হচ্ছে!—নিশ্চয় কোনো 'গোষ্ঠ' মত্‌ন্ 'লোকে'।—"

শিশু চিত্তের দ্রুত-অনুধাবন শক্তি দেখিয়া বেগম প্রীত মুখে হাসিল! কিন্তু শিশু-মনো-বিজ্ঞান লইয়া আলোচনার সময় তখন নাই,—সোফিয়ার চিঠিখানা, সত্বর বিলি করা চাই। উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলিল "হোসেন কোথায় রে?"

হোসেন বাড়ীর ছোট একটি চাকর।

হোসেনের নাম শুনিয়া, মেয়েটি হঠাৎ যেন অবাক্ হইয়া গেল!—নিষ্পলক নয়নে বেগমের মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া,—সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল "কেন বল দেখি?

সংসারের অনেক ব্যাপারে বেগম মনোযোগ দিবার সময় পাইত না বটে, কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য—পর্য্যবেক্ষণ করিবার দিকে তাহার উৎসাহ ছিল অসীম! সুতরাং প্রত্যেক মানুষের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়ে, তাহার চক্ষু কর্ণ সর্ব্বদাই অচেতন হইয়া থাকিত।

বোনটির বিচলিত ভাব ও আকস্মিক প্রশ্নের ভঙ্গী দেখিয়া, বেগম স্পষ্ট বুঝিল, নিশ্চয়ই সেই নিরীহ বোকারাম ছেলেটার সম্বন্ধে কোন গুরুতর দুঃসংবাদ আছে! ঝি চাকর মহলে বোনটির দৌরাত্ম্যের প্রতাপ, সর্ব্বজনবিদিত! তাহারা সহজে কেউ অভিযোগ করিতে চাহে না, এমন কি পুরাতন ঝি চাকররা, এই দুষ্ট শিশুটাকে বেশ অযথা রকমেই প্রশ্রয় দিয়া চলে; কিন্তু সেটা খুব আনন্দের বিষয় নয়।—শিশুই আদরের জিনিস, কিন্তু শিশুর অন্যায়টাও

যে আদর পাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবে, এটা কখনই প্রার্থনীয় নয়। বরং অন্যায়ের মাহাত্ম্যটা শিশু যাহাতে চট্ পট্ বুঝিতে পারে, এবং নিজেই নিজকে ন্যায় পথে চালাইবার জন্য সতর্ক হইতে শিখে,—সেদিকে অভিভাবকদের দায়িত্ব জ্ঞান থাকা খুব দরকার।

পিতার আদেশে, বেগম এ দিকটায় সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। বোনটির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বেশ কোমলভাবে বলিল "কোথায় সে? তাকে আমার দরকার আছে।"

চতুর শিশু সে প্রশ্নটা বেমালুম চাপা দিয়া, পরম আগ্রহে বেগমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিশেষ অগ্রহভরে তাদের জানাইয়া বলিল "কেন বল-না? চিঠি ফেল্‌তে হবে, নয়? দাও-না আমায়, বুড়ো দরওয়ানকে দিয়ে আস্‌ছি, সে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আস্‌বে। নর্দামায় ফেল্‌লেত 'মানা' কর্‌ব,—সে নর্দামায় ফেল্‌বে না। হোসেন 'ছেলে' মানুষ, সে হয় ত নর্দামায় ফেলে দিয়ে আস্‌বে, আমায় দাও।"

মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বেগম বলিল "তোমার এত হিতৈষিতার মানেটা কি বল দেখি? নিশ্চয় কিছু অন্যায় কীর্ত্তি করা হয়েছে, নয়? দাঁড়াও সন্ধান নিতে হচ্ছে—"

মহা অপ্রস্তুত হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া, সে ব্যতিব্যস্তভাবে কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই, সিঁড়ির নীচ হইতে হোসেন সবিনয়ে জানাইল "সে বারেণ্ডায় বসিয়া আলোগুলা সাফ্ করিতেছিল, আর 'বুবুজী', অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া তাহার মাথায় একমুঠা বালি ছড়াইয়া দিয়া, এইমাত্র পলাইয়া আসিতেছেন!"

আর যায় কোথা! মুহূর্ত্তে সিঁড়ির উপর ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া, 'বুবু জী' প্রচুর অপ্রস্তুত লজ্জার উচ্ছ্বাসে মুক্ত কণ্ঠে খিল্ খিল্ হাসি সুরু করিয়া দিলেন! এত বড় ভীষণ দুষ্কার্য্যটা সাধন করিয়া আসিয়াও, সে কেমন সুন্দর দক্ষতার সহিত বেগমের পথ রোধ করিয়া, তাহাকে আদর আপ্যায়নের চোটে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল! বেগম এতক্ষণ কিছু টেরও পায় নাই!

হাসি চাপিয়া বেগম গম্ভীর হইয়া বলিল "ওঠো, জবাব দাও, কেন ও বেচারার মাথায় বালি ছড়িয়ে দিয়েছ?"

কিন্তু যাহাকে প্রশ্ন করা হইল, সে তখন,—হাস্যাবেগে অধীর! অগত্যা হোসেন বেচারাই সলজ্জ বিনীতভাবে যাহা জানাইল তাহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বেগম বুঝিল এই যে, ছোট

বোনটি উঠানে বসিয়া, এক গাদা বালি লইয়া, মনের সুখে খেলা করিতেছিল, এমন সময় বেগমের সেই দিকে নজর পড়ে; বর্ষার জল স্যাঁৎসেঁতে ভিজা উঠানে, ভিজা বালি লইয়া খেলা করাটা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ভাবিয়া, চোপেন তাহাকে পুনঃ পুনঃ উপরে যাইবার অনুরোধ করে। বোনটি অগত্যা খেলা ছাড়িয়া উঠে, এবং উপরে যাইবার সময় হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যটির মাথায় সাদরে একমুঠা বালি বর্ষণ করিয়া, তাহার শুভাকাঙ্ক্ষার পুরস্কার দান করিয়া যায়!

বেগম খুব কড়াভাবে বলিল "কথাটা ভাল হয় নি, মোটেই না! ওঠো, নিজের হাতে কাণ মলে নিজের গালে চড় লাগাও।"

বোনটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বিনাবাক্যে গম্ভীর মুখে আদেশ পালন করিল। তারপর বেগমের ভর্ৎসনায় তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য স্বীকার করিতে হইল যে, এরূপ অন্যায় বাড়ীর কাহারও সঙ্গে সে আর করিবে না. স্কুলের কোন মেয়ের সঙ্গেও নয়।

উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেগম বলিল "যাও, শ্লেট লেখ গে। সাবধান চেঁচামেচি করে আমার ঘুম ভাঙিও না যেন।"

সে ঘাড় গুঁজিয়া টুক্ টুক্ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

চোপেনের হাতে চিঠিখানি দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বেগম বলিল "সোফিকে দিয়ে এস। উকীল সাহেব চলে গেছেন, নয়?"

"অনেকক্ষণ।"

"আচ্ছা যাও।"—বলিয়া বেগম উপরে উঠিল, মাতার ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, তিনি নিরুপদ্রবে ঘুমাইতেছেন; অন্যদিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়া, সদ্যঃশাসিত ছোট বোনটির পড়ার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল সে শ্লেটপেন্সিল বর্ণপরিচয়, এবং একরাশ পুরাতন ও নূতন "সন্দেশ" মাসিক-পত্রিকা লইয়া ঘরের মেঝেয় বিপুল আয়োজন সাজাইয়া বসিয়া,—শ্লেটে দাড়ি টানিয়া "অজ" "আম" লিখিতে লিখিতে, নিজ মনেই গুণ্ গুণ্ সুরে প্রসন্ন মুখে কবিতা আওড়াইতেছে:—"বাছুরে আমার আদুরে গোপাল...।"

বেগমের মন পরিপূর্ণ সন্তোষে ভরিয়া উঠিল। অন্যায়ের জন্য শাসিত হইয়া বোনটি যে কোনও [illegible] করিয়া ফেলে নাই,—ইহাই যথেষ্ট

পাতির বিদায়! ঘরে ঢুকিয়া কিছুমাত্র অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া, প্রসন্ন মুখে বলিল "হ্যাখো--জি, তুমি কিছু মনে-টনে কোর না, বুঝ্লে? তোমায় আমি খুব ভালবাসি, কিন্তু তোমার অমায়কে মোটেই—চুচ্কে দেখ্তে পারি নে আমি, জান্লে?"

চট্ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ফ্রক্ উল্টাইয়া মুখে ঢাকা দিয়া বোনটি সলজ্জ অনুযোগের সুরে বলিল "আচ্ছা.যাও, পেস্।"

কাছে আসিয়া সস্নেহে বোনটির ঘাড় চাপ্ড়াইয়া বেগম বলিল "আহা, যেন, ঘাড়ভাঙা পুতুলটি রে! এবার সাতুর বইয়ের সেই কবিতাটা আওড়াও তো—"বলিয়াই ছোট বোনটির বিকৃত-উচ্চারণ ভঙ্গিমার অনুকরণে বেগম সহাস্যে বলিল "কি, কি,—"বোল্ ভলো পাখীগুলি কল্ কল্ কলে। কি মচুল আঁখি চুক্ নল্ নল্ কলে—" নয়-জি?"

'জী' মহাশয়া ভদুত্তরে বেগমের হাঁটুতে একটি ছোট্ট চপেটাঘাত বসাইয়া,—শোচনীয় দুঃখে, সানুনাসিক স্বরে বলিলেন "যঁ-ও!"

"বহুৎ আচ্ছা। চলুম, মন দিয়ে পড়।" বলিয়া হেঁট হইয়া বোনের কপালে চুমা খাইয়া বেগম হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। দুয়ারের বাহিরে পা বাড়াইবা মাত্র শুনিল ঘরের ভিতর উৎসাহ-মুখর কণ্ঠে পড়া সুরু হইয়া গিয়াছে,—"ব, ডয়ে শূন্য ড়, গ'এয়ে আকার ছ,—বড় গাছ।"

(৫)

ত্রিতলে উঠিয়া বেগম দেখিল সুনীতি ইতিমধ্যে তাহার ইজি চেয়ারখানায় এলাইয়া পড়িয়া, বেশ নিশ্চিন্ত নিদ্রার আয়োজন করিতেছে। চক্ষু দুটি সম্পূর্ণ বন্ধ।

কাছে আসিয়া বেগম বলিল, "কি বন্ধু, নির্জ্জনতার অবকাশ পেয়ে, এবার কি অখণ্ড মনোযোগে, 'গুপ্ত' তত্ত্ব ধ্যান সুরু করেছ?"

আলস্যের অবসাদ-জড়ানো চক্ষু দুটি কষ্টে-সৃষ্টে একটু খুলিয়া, মৃদু হাসিমাখা মুখে সুনীতি বলিল "সত্যি-সত্যি খেপিয়ে তুল্বি, না কি?"

"তুমি আর কোন্ খানটায় প্রকৃতিস্থ আছ বল—?"

"যা যা, বাঁদরামো করিস্ নি, সোফি দি কই?"
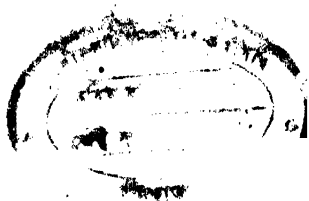
"সোফিদির জন্যে আজ নাড়ীর টান যে বড্ডই বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি, কেন বল দেখি? মৎলব কি?"

"তোমার শ্রাদ্ধ! আর পিণ্ডী! তুই আজকাল কি বে-আদব্ হয়ে উঠেছিস বল দেখি?"

"আহা বন্ধু আমার! তোমাদের চেহারা-মূর্ত্তিতে যা আদব-কায়দার জলুস ফুটে উঠেছে, তাইতেই চোখ আমার ধাঁধিয়ে গেছে! এর পর কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রেখে চল্‌তে গেলে তোমাদের সঙ্গে লাঠালাঠী হওয়াটা যে একদম্ অনিবার্য্য!—তার চেয়ে বে-আদবির ওপর দিয়ে রক্ষা করে চলাটাই মঙ্গল!—"

বেগম হাসিমুখে চেয়ারে বসিল! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল "নাঃ, সোফি আমায় দার্শনিক, আধ্যাত্মিক বলে বড্ড গালাগালি করে, এর শোধ আমি তুলবই! আমি এবার চটে-মটে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছি,—আমি খুব ভয়ানক ধরণের ফাজিল বে-আদব হব-ই! আর তোদের সব-কটাকে প্রত্যেক ভুলের জন্য, এমন জালিয়ে পুড়িয়ে মারব যে,—আচ্ছা, সেটা এখন মনে মনেই থাক, আপাততঃ Go your way ; you will be wiser when you have suffered for your folly."

ঈষৎ হাসিয়া সুনীতি বলিল "আমাদের ভুলের জন্য নির্দ্দয়ভাবে দণ্ড দেবার লোকের অভাব কখনই হয় না বেগম, অভাব শুধু সহৃদয়ভাবে সাহায্য করবার মানুষের! বাস্তবিক আমার মনটা এক এক সময় এমন বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে,—কি যে বুঝ্‌লেন্ বাপ মা, জানি নে, সাত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেল্লেন! আর দু পাঁচ বছর পরে হলে কি এমন ক্ষতি হোত? অথচ আমার ভবিষ্যতের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অনেক শিক্ষা-সাধনা, অভিজ্ঞতা আমি এই সময়টায় সঞ্চয় করে নিতে পারতুম্।"

ক্ষুণ্ণভাবে বেগম বলিল "দ্যাখ্ ভাই, এই খানটায় শুধু নির্ব্বিচারে মাথা হেঁট করে থাক্‌তে বাধ্য হই, যেখানটায় অভিভাবকদের বিচার বিবেচনা নিয়ে কথা ওঠে! তাঁরা আমাদের মঙ্গলের জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তা জানি,—কিন্তু তাঁরা অনেক সময়ই ভুলে যান যে, প্রত্যেক সত্যেরই দুটো দিক আছে,—আর সেই দুটো দিককেই বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরীক্ষা করা দরকার!—আচ্ছা,—এই যে তোর ছ' মাস পরে বি, এ,

এগ্জামিন, অ্যাটর্ণী-জীও কি এ কথাটা ভেবে দেখলেন্ না ? নাঃ, তিনি শুধুই জিতেন্দ্র শুধু নয় ?"

সুনীতি হাসিয়া ফেলিল ! এবং পরক্ষণে নিজের হাসিতে অপ্রস্তুত হইয়া সকোপে বলিল "আর বলিস্ কেন ভাই ? তিনিই তো যত অনিষ্টের মূল ! আমি যেন নিজের চাড়ে এদ্দিন কিছুই লেখাপড়া করতে পারি নি, তাই তিনি আমায় পরীক্ষা-সাগর পার করবার জন্যে তাড়াতাড়ি আজ আমার কর্ণধার হতে এলেন !"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বেগম বলিল "শুভ ! শুভ ! শুভ ! তা হলে মাষ্টারের হাতে নির্ভয়ে কাণ দুটো দান করে ফেল !—পয়লা নম্বরের লাফ মেরে পরীক্ষা সাগর ডিঙিয়ে যাবে, কুচ্ পরোয়া নেই,—মোদ্দা সমঝে চোলো—"

ব্যঙ্গ সুরে সুনীতি বলিল "বাধিত হলুম !—" তারপর হাসি মুখে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সলজ্জ স্মিত মুখে বলিল "আচ্ছা বেগম, অকপটে সত্যি বল,—এই সব যোগাযোগের সংঘটন সত্ত্বেও কি আমায় তুই 'take your wings and fly away' বলে আর পরামর্শ দিতে পারিস ?"

বেগমের মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর স্বরে বলিল "ঠাট্টা নয় সুনীতি, দুনিয়ার সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা এপর্য্যন্ত লাভ করেছি, আর নিজের চোখে, চার পাশের অবস্থাটা যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছি,—এ পর্য্যন্ত তাতে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি ! 'কাল তোর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, আচ্ছা, আজ তা'হলে তুই ডানা ঝাড়া দিয়ে উড়ে পালা,—' এ-কথাটা যে কেবল তোর মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই ঠাট্টা করে বলতে পারি, এটা মনেও করিস নি ভাই ! এখানে এমন নির্দ্দয় অবস্থাদ্বন্দ্বে তীব্র নিষ্পীড়িত অনেক দুর্ভগার শোচনীয় মরণ চোখের ওপর দেখলুম যাদের মৃত্যুশোক ব্যথাটার সঙ্গে ঐ কথাটার মত কতকগুলো বিষয় আমার বুকে তীরের মত গেঁথে গেছে চিরদিনের জন্য।"—হঠাৎ বেগম চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের মেঝেয় পায়চারী করিতে সুরু দিল। ভিতরে—অকস্মাৎ উদ্বেলিত একটা তীব্র ব্যথায় উত্তেজনাকে সে যে নিঃশব্দে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেটা তাহার ক্ষুব্ধ বিচলিত মুখভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল। সুনীতি চুপ করিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বেগম আসিয়া সুনীতির সামনে দাঁড়াইল। সুনীতির কাঁধে দুহাত রাখিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল "বিয়ে করে সংসার পাতাতে চলেছিস্, বেশ ভালই, খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন; কিন্তু ভুলে যাস্ নি ভাই, এদেশের অনেক হতভাগা হতভাগির জন্যে অনেক কিছু ভাববার আর করবার কাজ আমাদের আছে, তাদের দুঃখে নিশ্চিন্ত থাকাটা আমাদের চলবে না।"

দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া সুনীতি বলিল "আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বড় সঙ্কীর্ণ ভাই,—বড় সঙ্কীর্ণ! দুঃসাহসী আর emotional ভিন্ন কেউ সে কর্ম্মক্ষেত্রে বড় আশা নিয়ে এগোতে পারে না, কিন্তু তার পরিণাম কি হয়, তাও তো দেখেছ?"

বেগমের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। ঈষৎ তীব্র স্বরে সে বলিল "দেখেছি! কিন্তু discriminative এর সূক্ষ্ম দর্শিতার দোহাই দিয়ে অন্যায় দুর্ব্বলের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যাপারটাকে নির্ব্বিকার ঔদাস্যে বসে বসে দেখব, আর সস্তার হাততালি, আর আরাম উপভোগ করে পুণ্যসঞ্চয় কর্, এ প্রার্থনা আমার কুষ্ঠিতেই লেখে নাই। আর্ত্তের ব্যথায় যার প্রাণ বিচলিত হয়, বিপদগ্রস্ত অসহায়কে সাহায্য করবার জন্যে যে স্বেচ্ছায় নিজের বিপদকে ডেকে আনে, তাকে তোমরা emotional বল, অবিবেচক বল,—রাক্ষুসী বলে গাল দাও,—সে সে আমার পূজার্হ! কারণ সে সাহসী, আর তার উদ্দেশ্য সৎ!—"

"কিন্তু নিজের ক্ষমতার দৌড় বুঝে চলাটাও উচিত,—সকলের পক্ষে।"

"এক শো বার! কিন্তু ক্ষমতাও হাতপা গুটিয়ে বসে থাকলে, আচম্কা ভুঁই-কেঁড় হয়ে উঠে না। জ্ঞান আর কর্ম্মের পথ ধরে খাট্তে খাট্তেই মানুষের ক্ষমতা জেগে ওঠে,—এটা মনে রেখে চলতে হবে।"

হোসেন দুয়ারের সামনে আসিয়া বলিল "চিঠি দিলেন। আপনাদের ওইখানে যেতে বল্লেন।"

হোসেনের হাত হইতে চিঠি লইয়া বেগম নীরবে পড়িল। তারপর অপ্রসন্নভাবে বলিল দ্যাখ্‌দেখি ভাই, লোকি ষ্টুপীডের ওপর সাধে রাগ করি! আবার ছেলেটার সর্দ্দিজ্বর ধরিয়েছে!—আর, সর্দ্দিজ্বরেরই বা অপরাধ কি বল? পরশু রাত্রে,—এই বর্ষা-বাদলের দিনে, দুই মূর্ত্তিমান বায়স্কোপ দেখ্তে গেলেন, ছেলেগুলোকে নিয়ে! হুঁ!"

মিতাক্ষই অপ্রসন্নভাবে টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একটা থার্মমেটার ও একখানা ছোট খাতা বাহির করিয়া, বেগম বলিল "চল, একবার পাপের প্রাশ্চিত্তির ভোগ করতে যাওয়া যাক্! বাস্তবিক, এই সব পাপগুলোর জ্বালা ভোগ করতেই আমাদের সব সময় কেটে যায়,—এদের অত্যাচারে,—মাঃ! এতটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে যে দেশের দশের দুঃখ-দুশ্চিন্তা প্রতিকারের চেষ্টায়, আমাদের চিন্তাশক্তিকে খাটাব, কি কোন কাজে লাগ্‌ব,—তার ফুরসুৎ আমাদের মোটেই নাই!—"

বিদ্রূপের স্বরে সুনীতি বলিল, "হুঁ! এর ওপর আবার সোফি-দি তোমায় বলেন কি না বিয়ে কর্‌তে! কি ভয়ানক অন্যায়?"

বেগম কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করিয়া সুনীতি বলিল "গরম জবাবের পরিবর্ত্তে নরম হাসি! উহুঁঃ, লক্ষণ মোটেই ভাল নয়! নিম্‌রাজী, নাকি বন্ধু?"

"নিশ্চয়! তোমাদের এমন সব দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দুবেলা দেখেও যদি লোভে না পড়ি, তবে আমার জীবনটাই বৃথা! এখন চল।—"

সুনীতিকে টানিয়া লইয়া বেগম নীচে চলিল।

পাশাপাশি বাড়ী। দুই বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিবার জন্যে, নীচের উঠানের মধ্য দিয়া পথ। দুজনে আসিয়া সোফিয়ার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া, বরাবর খিতলে উঠিল।

খিতলের বারেণ্ডায় একটা দাসী উৎসুক-ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। বেগম ও সুনীতিকে দেখিয়াই তটস্থভাবে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া হাসিমুখে বলিল "আসুন, আসুন,—এই ঘরে—" সে হাত বাড়াইয়া সোফিয়ার শয়ন-কক্ষের দ্বার নির্দ্দেশ করিল।

বেগম হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সংশয়ের দৃষ্টিতে দাসীটার মুখপানে চাহিয়া,—সন্দিগ্ধভাবে বলিল "খবর কি? বিবিসাহেবার ফরমাস মত আমার পেছনে আবার ষড়যন্ত্রে লেগেছে, না কি?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া, হাসি সামলাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দিল। মাথা নাড়া দিয়া সলজ্জ বিনয়ে বলিল "তোবা! উকীল সাহেব এতক্ষণ 'টিহরণপর' চড়ে দেশ ছাড়া হয়ে গেছেন! আজ সত্যি বাড়ীতে কেউ নাই,—আসুন।"

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া বেগম বলিল "দ্যাখো, ঠিক বল্‌ছ তো? না, পট্টি বাজী?"

সে অত্যন্ত লজ্জা বিব্রত হইয়া বলিল "তোবা, আল্লা কসম!—আমি মিথ্যে বলি নি, আপনি নিজে দেখুন—"

সোফিয়ার শয়নকক্ষের পর্দাটা সরান'ই ছিল; বেগম অগ্রসর হইয়া, চৌকাঠের এদিক হইতেই মুখ বাড়াইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিল,—দেখিল ঘরে বাস্তবিকই তৃতীয় প্রাণী কেহ নাই; শুধু সোফিয়া তাহার ছোট ছেলেটিকে পাশে লইয়া বিছানার উপর শুইয়া আছে। সোফিয়া ঘুমাইতেছে কি জাগিয়া আছে, তাহা বলা কঠিন,—কারণ সে শুইয়া আছে সম্পূর্ণ নিস্পন্দ হইয়া,—আর তাহার মুখে চাপা রহিয়াছে একটা নীল রং'এর সিল্কের রুমাল।

সুনীতি পিছনে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেছিল, সে ইহাদের দুই ভগিনীর রঙ্গ-কৌতুকের সংবাদ জানে,—কিছু কিছু! বেগমের লেখাপড়া চর্চ্চার উৎসাহটার জন্য ভগিনীপতি না কি, তাহাকে বড় বেশী ঠাট্টা করেন!—অন্ততঃ সোফিয়া তো এই রকমই সাক্ষ্য দেয়! কিন্তু কার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা,—সে খবরের সন্ধান বেগম কখনই খোঁজ লইয়া দেখে নাই,—সে বিষয়ে সম্পূর্ণই উদাসীন! তবে সে একান্তই নারাজ ছিল, শুধু ভগিনীপতির সামনে বাহির হইতে।—

কিন্তু বেগম যে কাজে অনিচ্ছুক, সেই কাজটাই বেগমের দ্বারা সম্পাদন করাইতেই সোফিয়ার ব্রহ্মাণ্ড-ভেদী উৎসাহ!—ছল, বল, কৌশল,—অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল, কিন্তু বেগমের দৃষ্টি শক্তির নাকি—এমনিই একটা বিশেষত্ব ছিল,—সে সোফিয়ার মুখ দেখিলেই সে অক্লেশে তাহার মৎলব ঠাহরাইয়া ফেলিত! সুতরাং প্রতি বারই সোফিয়ার ষড়যন্ত্র পণ্ড হইত!

বারে বারে পরাজিত হইয়া, শেষে সোফিয়া অনেক কষ্টে ভাবিয়া চিন্তিয়া,—নিজের মুখখানা আড়ালে রাখিয়া কার্য্য হাঁসিল করিবার মত, একটা সহজ সদুপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সংসার খরচের মাসকাবারি হিসাব মিলাইবার জরুর তাগাদা জানাইয়া, নিরপরাধ স্বামীকে একদিন অসময়ে গৃহে আট্‌কাইয়া রাখিয়া,—মন্ত্র-দীক্ষিতা দাসীকে বেগমের কাছে পাঠাইয়া দিল।

দাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, সটান ত্রিতলে উঠিয়া, একেবারে বেগমের পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িয়া, উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখে, হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া জানাইল—"বড় বিপদ ! গৃহকর্ত্তা আদালত চলিয়া গিয়াছেন, গৃহিণী ঠাকুরাণী ইত্যবসরে মেঝের উপর পা পিছলাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছেন ! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে !":

বেগম সেইমাত্র কলেজ যাইবার সাজসজ্জা ঠিক করিয়া বইগুলি গুছাইতেছিল, দাসীর সংবাদ শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল !—অন্য সব সময় সতর্ক হইয়া চলা যায়,—কিন্তু এ হেন আকস্মিক দুর্ঘটনার মুখে কি, নিজের সম্বন্ধে কোন দুর্ভাবনা ভাবিবার সময় আছে ? বই ফেলিয়া সে নিঃসন্দেহে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ছুটিল। দাসীও যথাসাধ্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে করিতে পাছু লইল।

কিন্তু সোফিয়ার শয়নকক্ষে পা দিয়াই বেগম হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল !—এ কি ! গৃহকর্ত্তা যে সশরীরে চেয়ারে বসিয়া !—আর গৃহকর্ত্রীটি ততোধিক সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দ মেজাজে,—তাঁহার হিসাব বুঝিবার বুদ্ধির ত্রুটি লইয়া,—অত্যন্ত আরামে কি-সব কটুকাটব বর্ষণে নিযুক্ত !

বেগমের জুতার শব্দে দুজনেই উৎসুক-দৃষ্টিতে দুয়ারের দিকে চাহিলেন। বেগম অবাক্ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই,—মুহূর্ত্তে সোফিয়া হিসাবের খাতা ফেলিয়া, চক্ষের নিমেষে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া স্বামীকে বলিল "এই নাও ! এতক্ষণে আমার হিসেব মিলেছে ! বুঝ্‌লে ?"

সামনে অকস্মাৎ আবির্ভূত তরুণীর, বিস্ময়-বিমূঢ়—বিপন্ন ভাবটা চোখে ঠেকিতেই, ভদ্রলোকটি ত্রস্তে দৃষ্টি নামাইয়া, ব্যস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই,—নিতান্ত অপ্রত্যাশিভাবে, স্ত্রীর সুমধুর মন্তব্যটা কর্ণগোচর হইবামাত্র,—তিনি অধিকতর অপ্রস্তুত হইয়া, বিনাবাক্যে মুখ ফিরাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া ঘর ছাড়িবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু বেগম তাঁহাকে ততটা কষ্ট স্বীকারের সুযোগ দিতে মোটেই প্রস্তুত নয় !—সে, যাহাতক্ দেখিল ভগিনীপতি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজে সরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন,—তাহাতক্ ভগিনীটির ঘাড় ধরিয়া—বিনাবাক্যে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল ! সোফিয়াকে

অবশ্য টানিয়া লইয়াই, সোফিয়াও অবশ্য পরিত্রাণের চেষ্টায় ঝটাপটি করিতে কিছু মাত্র কসুর রাখিল না! কিন্তু, সব নিষ্ফল!—বেগমের কলেজ-পড়া বিদ্যা বুদ্ধির উপর সোফিয়ার রাগ, যতই জোরতালে বর্ষিত হইবার ক্ষমতা রাখুক, কিন্তু গায়ের জোরে বেগমের সঙ্গে 'পারিয়া উঠিবার' ক্ষমতা তাহার মোটেই ছিল না!"

বেগম ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বারেণ্ডায় আনিয়া সতর্ক-দৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও আছে কি না? তারপর সোফিয়াকে সামনাসামনি দাঁড় করাইয়া এক হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হাতের তর্জনী তাহার মুখের কাছে আস্ফালন করিয়া,—সদ্যঃপঠিত একখানা ইংরেজি উপন্যাসের মহাবল-পরাক্রান্ত মহামানুষ নায়কটির মতই ধীর-গম্ভীরভাবে বলিল "তুই আমার হাতে আত্মসমর্পণ করলি কি না বল? এই রকম বদমাইসি কূটবুদ্ধি নিয়ে আর আমার সঙ্গে লাগ্‌বি কখনো?"

সোফিয়া নিজের পীড়িত শ্বাসনালীটার উদ্ধার চেষ্টায় ঘাড় টানাটানি করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল "লাগ্‌বো! যদ্দিন বাঁচ্‌ব, তদ্দিন লাগ্‌বো!—"

"নির্লজ্জের সর্দ্দার!—আজ তবে এই খানেই তোকে 'উইণ্ড্‌ পাইপ্‌ চোক্‌' করেই পরলোকে পাঠাব!"—কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই বেগম, কথানুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হইল!—

সোফিয়া আত্মত্রাণের চেষ্টায় মহাবিক্রমে হুটোপাটি করিতে করিতে,—অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া হঠাৎ এক সুবুদ্ধি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল! গৃহাভ্যন্তরস্থ গৃহকর্ত্তাটির উদ্দেশে সহসা চেঁচাইয়া বলিল "ওগো, আমায় বাঁচাও!—বেগমটা সত্যি সত্যিই আমার 'গলা দাবায়কে' খুন করতে দাঁড়িয়েছে!"

এক তো ধার-করা দুষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে বেগমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা! আবার পরাজয়ের মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষার সাধ্য তো নিজের হাতে নাই,—সেটাও না-হয়, ক্ষমা করা যায়,—কিন্তু উল্টা কি না আবার,—অন্যের কাছে সাহায্য ভিক্ষা!—প্রচণ্ড অবজ্ঞার সঙ্গে সোফিয়ার পিঠে সশব্দে এক চড় বসাইয়া বেগম সক্রোধে বলিল "ষ্টুপীড্‌, কাওয়ার্ড! যা তোর রক্ষাকর্ত্তার আশ্রয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌গে! তোর মুখ আর আমি দেখ্‌তে চাই নে,—এই জন্মের মত 'আড়ি'!—"

সোফিয়াকে ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, সে দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে ছুটিল। সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিল—'নির্লজ্জের সর্দার সোফিয়া'টা তখন—উচ্ছ্বসিত হাসিতে অধীর হইয়া মাদুরেতে লুটাপুটি খাইতেছে। আর, আর একজন ভদ্রলোক সলজ্জ-অপ্রস্তুত ভাবে, নিম্নস্বরে ভর্ৎসনা সুরু করিয়াছেন,—'সোফিয়ার দুর্ব্বুদ্ধিটা নিতান্তই ভদ্র সমাজ বিরুদ্ধ! এরূপ ভাবে একটি নিরীহ ভদ্র মহিলাকে আচম্‌কা অপ্রস্তুতে ফেলিবার চেষ্টাটা আদৌ আইনানুমোদিত নয়!—চাই কি, তাঁহার ছোট শ্যালিকাটি যদি রাজদ্বারে নালিশ রুজু করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং 'কেস্ কনডাক্ট' করিবার ভার লইতেও পেছ্-পা হইবেন না।'

উকীল ভগিনী-পতিটির এই অযাচিত সহৃদয়তার বেগমের মনে যে কি-কতখানি কৃতজ্ঞতার উদয় হইল,—সে খবরটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই টের পাইল না। কিন্তু তার পর ঘড়ি ধরিয়া চব্বিশ ঘণ্টা পুরাপূর অপেক্ষা করিয়া সোফিয়া যখন, এক বোঝা বাছা বাছা সাদরসম্ভাষণ মনে বোঝাই করিয়া নিতান্তই ভাল মানুষের মত, গুটি গুটি চরণে বেগমকে আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশে উপস্থিত হইল,—তখন বেগম গভীর ঔদাস্যের সহিত এমন কঠোর মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল যে সোফিয়া বেচারা রাগে ক্ষোভে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইতেই বাধ্য হয়!—শেষে বেগমের পিতমাতা মাঝে পড়িয়া ব্যাপারটা সেবারের মত মিটমাট করিয়া দেন,—তবে রক্ষা!

সেই অবধি সোফিয়া কিঞ্চিৎ সমঝাইয়া চলিতে শিখিয়াছে। কিন্তু মানুষের স্বভাবটা না কি মরিলেও সংশোধন হইবার নয়, তাই মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে একটু-আধটু 'সেকরার ঠুক্‌ঠাক্' চালাইতে ত্রুটী রাখে না!—কিন্তু 'কামারের এক ঘা' পদার্থটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে সে এখন আর আদৌ পছন্দ করে না!—

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

রসিকদাস। *

—:•:—

সাঙ্গ সুধার পরিবেশন
কণ্ঠ কথা কয় না আর,
ভঙ্গ আজি কুঞ্জ গীতের
খুললো দ্বার ওই পূর্ব্বাসায়।
গীত যে তাহার বঁধুর টানে
যেত অকুল গোকুল পানে
অশ্রুজলের ইন্দ্রধনু
জমায় তেমন সাধ্য কার?

(২)

দরাজ সুদূর সে সুর মধুর
সাঙ্গ দেহের সঙ্গে কি?
কালিন্দী ঘাট ত্যজবে রাধা
মাটির কলস ভঙ্গে কি!
তাহার সে ডাক তাহার সাড়া
চরণ পেয়ে মরণ হারা
রসিক যে আজ রসময়ের
বংশীরবের অংশীদার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

---

* বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া।

তটিনী।

—:•:—

(১২)

হেমন্তের বেলা প্রায় পড়িয়া আসিতেছিল। কলিকাতার অন্ধকার প্রায় একটা সরু গলির মধ্যে আলো বাতাসের নামলেশহীন পায়রার খোপের মত, শেওলাধরা পুরাণো একটা বাড়ীর সামনের লাইটপোষ্টে মই লাগাইয়া সরকারী লোক খুব দ্রুতহাতে গ্যাস জ্বালিয়া দিয়া গেল। গলির মোড়ে ভাড়াটে থার্ডক্লাশ গাড়ীর বিকট শব্দ পাইয়া অন্ধকার ঘরের একটীমাত্র জানালার কাছে মুখ বাড়াইয়া রুগ্ন কৃষ্ণবিহারী পথের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া রহিলেন।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল, একটু পরে বারীন আসিয়া প্রণাম করিল, উদ্বিগ্ন মুখে বলিল "আবার বুঝি আপনার অসুখ বেড়েছে?"

"না তত বেশী নয়,—তুমি টাকা পেয়েছ তো? রাজেনবাবু টাকা দিয়েছেন তো!"

"দিয়েছেন কিছু, এই টাকার জন্যেই তো একমাস দেড়মাস আমি সেখানে আটকেছিলাম, আজ দেব কাল দেব করে তবে এত দিনে টাকা দিলেন!"

বারীন শঙ্কিত চক্ষে পিতার মুখপানে চাহিয়া দেখিল রক্তের অভাবে তাঁর মুখের রং অস্বাভাবিক সাদা হইয়া গিয়াছে, শীর্ণ হাতপাগুলি উঠিয়া দাঁড়াইতেও ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি ময়লা চাদরহীন ছেঁড়া তোষকের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "তারিণীকে আমার চিঠি দিয়েছিলে?"

"তিনি বাড়ী ছিলেন না, চিঠি তাঁর বাড়ীতে রেখে এসেছি, সে চিঠি তিনি ঠিক পাবেন।"

"আস্‌বে কি? আমার এমন অসময়, ও যদি একটীবার আসতো!"

"নাই বা এলেন তিনি,—কি এমন দরকার তাঁকে বাবা, তিনিও তো আমাদের মহাজন নন।"

কৃষ্ণবিহারী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "সে যে চিরদিন সমান কঠিন, সে আসবে না; কত দরকার ছিল তার সঙ্গে,—এ দেখছি বিরোধ নিয়েই আমাকে ম'রতে হবে।"

"কেন অত মন খারাপ ক'রছেন বাবা, আপনার শরীর ভালো হ'য়ে গেল—"

"আমার এ শরীর কি আর ভাল হবে বাদল ? এ আর সারবে না !"

বাদল নিজেও মেডিকেল কলেজের ছাত্র কিছু কিছু সবই বুঝিতেছিল, তার চক্ষে জল আসিল সে মুখ ফিরাইয়া লইল, কোনো উত্তর করিতে পারিল না। কৃষ্ণবিহারী বসিয়াছিলেন শুইয়া পড়িলেন, বলিলেন "না সারি তাতে দুঃখ নেই, এই রকম ক'রে ভোগার চেয়ে মরণ ভালো, কিন্তু তোকে যে একেবারে ডুবিয়ে রেখে যাচ্ছি এই যা ক্ষোভ! শুনেচি ঋণ রেখে মরলে গতি হয় না, তাই যত বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসচে আজীবনের ঋণের বোঝা ততই যেন গলা টিপে ধ'রচে আমার! সবই আমি তোরই কপালে ঝুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি যে!"

"আমাকে ও-ভার দিয়ে কি আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না বাবা ? বেশ'ত আমি ও-সব ঋণ শোধ করে দেব, ডাক্তারি পাশ করে কেউ বসে থাকে না, কাজ আমার একটা জুটবেই!"

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কৃষ্ণবিহারীর শরীর দিন দিন খারাপই হইতেছিল। তাঁর অফিসের চাকরীর মায়া ছাড়িতে হইল। সুতরাং আয়ের পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। আবার ঋণের টাকায় হাত পড়িল। রাজেন্দ্রবাবুর যে টাকা ঋণ শোধের জন্য আনা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ ভাগ খরচ হইতে লাগিল। একদিন কৃষ্ণবিহারী বলিলেন "বাদল একবার দোয়াত-কলম নিয়ে বসতো,—আমার ঋণের হিসেবগুলি লিখে নাও, যেন ভুল না হয়ে যায়!"

লিখিতে বসিয়া বারীন যখন লিখিল তারিণীবাবুর পাঁচ শত টাকা! তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া একবার কৃষ্ণবিহারীর মুখপানে চাহিল, কৃষ্ণবিহারী বলিলেন "হ্যাঁ,—ওই ধারটাই আমার সব চেয়ে পুরোণো, ওটাই আগে শোধ করো—"

"এর জন্যে আর আপনি কিছু ভাববেন না বাবা, এ সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বারীন সমস্ত ঋণের হিসাব, আর উত্তমর্ণদের নাম ধাম লিখিয়া লইল। এই হিসাবপত্র লিখাইবার পরদিন হইতেই কৃষ্ণবিহারীর রোগ খুব বেশী রকম বাড়াবাড়ি হইয়া তাঁর বাক্-রোধ হইয়া গেল। বাক্‌রোধ হইলেও জ্ঞান বেশ ছিল। মায়ার কাকা জমিদার রাজেন্দ্রবাবু

বিষয়ের কি কাজের জন্য সেই সময়টা কলিকাতা আসিয়া কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। মুমূর্ষু কৃষ্ণবিহারীর নিষ্প্রভ চক্ষু তাঁকে দেখিয়া আশার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রেই কৃষ্ণবিহারী লোকান্তরিত হইলেন।

সহায়হীন, সম্পদহীন কপর্দ্দকশূন্য বারীনকে কলিকাতার উত্তমর্ণরা অনবরত তাগাদা দিয়া অপমানিত করিতে লাগিল। বিশ্বভুবনে সে এতটুকু আত্মীয়তা, এতটুকু বন্ধুতা, কোথাও দেখিল না। পরের বাড়ীর সংবাদপত্র চাহিয়া আনিয়া পড়িতে পড়িতে দেখিল, দুর্ভিক্ষফণ্ডে তারিণীবাবু দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন! বারীন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল এঁরই পাঁচ শো টাকা সর্ব্বাগ্রে দিতে হবে আমায়!"

এই সময় বারীনের Final Examinatiou শেষ হইয়া গিয়াছে, তাই result এর পথ চাহিয়া সে ব্যগ্রভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছিল। এই result এর উপরই তার তখন সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছিল।

(১১)

যখন চারিদিককার তাড়নায় বারীনের অবস্থা এমনিধারা শোচনীয়, সেই সময় রাজেন্দ্রবাবু তাকে নিজের বাসায় লইয়া যাইতে চাহিলেন, বলিলেন "অন্ততঃ আমি যে ক'দিন কলিকাতা আছি সে ক'টা দিন তুমি আমার ওখানেই থাক।"

উত্তরে বারীন সবিনয়ে জানাইল যে পরীক্ষার খবর না পাইয়া সে কোথাও গিয়া থাকিতে পারিবে না। রাজেন্দ্রবাবু তবুও খুব পীড়াপিড়ি আরম্ভ করায় সে বলিল "কিন্তু আপনিও তো খুব অল্পদিনই এখানে আছেন! তারপর?"

"তারপর তুমিও আমার সঙ্গেই যাবে, মায়ার বিয়ের একটা পাকাপাকি করে ফেলা আমি দরকার মনে করি, তোমার বাবার সঙ্গে তো কোনো কথাই হতে পারলো না!"

"কিন্তু আমার অনুরোধ যে, বাবার মতকেই আপনারা পাকা কথা ধরে নেবেন না, আমারও কিছু বলবার আছে।"

রাজেন্দ্রবাবু খুব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কেন, কোনো অমত আছে?"

"আছে,—প্রথমতঃ আমার একবার বিয়ে হয়ে গেছে, তা ছাড়া আমি আমার পিতৃঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছি, মাথা তুলে দাঁড়াবার একটু ঠাঁই আমার কোথাও নেই, এ সব কি আপনি জানেন?"

"তুমি বিবাহিত না কি? কই তাতো জানতাম না, তবে তোমার মত বয়সের ছেলেকে দ্বিতীয় পক্ষ হলেও আমার কোনো আপত্তি হ'বার কথা নয়"—

"কিন্তু সে বেঁচেই যে আছে!"

রাজেন্দ্রবাবুর মুখ কালো হইয়া উঠিল। বারীনকে তিনি ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাকে জামতা করিবার সাধ তাঁর আর একটুও রহিল না। তবে বারীন যে সরলভাবে নিজের অবস্থা খুলিয়া বলিয়াছে এর জন্য বারীনের উপর তাঁর শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি বারীনকে কিছু সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু বারীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল "অনেক ঋণের বোঝায় এ মাথা বোঝাই করা আছে, আর বাড়াব না,—আমার ক্ষমা ক'রবেন!"

রাজেন্দ্রবাবু এরপর আর তাকে কোনো অনুরোধ করিলেন না। তিনি যখন বারীনকে মুক্তি দিয়া গেলেন, তখন বারীন পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। Result বাহির হইলে তার দুচোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। এই সাফল্যের আনন্দের ভাগ লইবার লোক আজ তার কেহ নাই! অনেক দুঃখ, অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও যে বাবা তার মেডিকেল কলেজের খরচ যোগাইয়া আসিতেছিলেন আজ তিনি কোথায়?

দুঃখ কিংবা অতি আনন্দের সময়েই লোকে আপনার লোককে বেশী করিয়া অনুভব করে! তাই অতি হর্ষের ঝড় বারীনের অবলম্বনহীন বুকের আগাগোড়া মন্থন করিয়া গেল! সে যখন গেজেটখানা সুমুখে মেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইতেছিল তখন সে দরিদ্র মেসের একটী মাত্র চাকর তাকে খাবার জন্য ডাকিতে আসিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বারীন তাকে দেখিয়া বলিল "কি রামু?"

রামু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "কিছু না বাবু,—রান্না হয়ে গিয়েছে বামনা হবে কি না তাই জিজ্ঞাসা ক'রতে এলাম!"

"আর সব বাবুরা বসছেন তো!"

"তাঁদের এখনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নি, —আপনি আজ বেড়াতে যান নি ব'লে ঠাকুর বল্লেন যে, বোধহয় বাবুর জরটর হয়ে থক্‌বে জেনে আর যে খাবেন কি না ?"

"জর হ'লে আমিই বারণ করে দিতে পারতাম,—যাও ভাত দিতে বল গে আমি যাচ্ছি।"

রামু চলিয়া যাইতেছিল, বারীন তাকে আবার ডাকিয়া ফিরাইল, নিজের যৎসামান্য সম্বল হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া তার হাতে দিয়া বলিল "এই নাও রামু, আমি পাশ করেচি তাই তোমাকে বক্‌শিশ দিলাম !"

রামু এ মেসের পুরানো লোক। সে প্রথমই বলিল "আহা বাবু আজ যদি কর্ত্তা বেঁচে থাকতেন তো কত খুসীই হ'তেন ; ভগবান যদি আর কিছু দিন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতেন !"

বারীন এই প্রথম চাকরের কাছে একটু সহানুভূতি পাইল, সে বলিল "সে আমার অদৃষ্ট। তাঁকে এতটুকু সুখী করতে পারি নি কখনো !"

রামু ঘরের বাহির হইবার পর বারীন যখন খাইতে গেল, তখন ভাত দিতে আসিয়া বামুন ঠাকুর হাসিয়া বলিল "বারীনবাবু পাশ করেছেন তা আমাকে বক্‌শিশ দেবেন না ?"

বারীনের সঙ্গে আরও যে দু চারটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বলিলেন "হাঁ, হ্যাঁ রাস্তায় আমাকে একটী ছেলে বলছিল বটে যে বারীনবাবু পাশ ক'রছেন,—তা কই বারীনবাবু যে কথা বলছেন না !"

বারীন বলিল "হ্যাঁ আমি পাশ করেছি।"

"তারপর! এখন কি চাকরী বাকরীর চেষ্টা করবেন, না কোথাও স্বাধীনভাবে বসে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ ক'রবেন ?"

"দেখি ভেবে, প্র্যাক্‌টিস করতে পারলে হয় তো ভাল হ'ত,—কিন্তু তাতে আমার সুবিধে হবে না, কোথাও কাজের চেষ্টাই দেখতে হবে।"

"তা হলে আমার সন্ধানে একটী কাজ আছে তবে বড় দূরদেশে !"

"কোথায় ? মেসোপটেমিয়া ?"

"হ্যাঁ সে আপনার সুবিধে হবে কি ? আয় কিন্তু যথেষ্ট !"

"আমার আবার দূর বা নিকট কি আছে ? আমি যেখানে বেশী আয় সেখানেই যেতে পারি।

"তা হ'লে আজ ভালো করে বিবেচনা করে রাখুন, ধরুন হয় তো হ'তে পারে যে বছর তিনেক এখন দেশে ফিরতেই পাবেন না।"

"সারা জন্মে না ফিরতে পারলেও ক্ষতি নেই, আপনি যদি এতে কিছু সাহায্য করতে পারেন, তা হ'লে দয়া করে তাই করবেন, আমি আর বিবেচনা কিছু ক'রতে চাইনে।"

"বেশ! তা হ'লে কাল আর কিছু হবে না, আমার অফিসের একটু বেশী রকম কাজ আজ আছে পরশু দিন আমি একটু চেষ্টা ক'রবো।"

সত্যই এই ভদ্রলোকটী বারীনের উপকারের জন্য চেষ্টা করিয়া তার মেসোপটেমিয়া যাইবার সুবিধা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। বারীন তখন মনে মনে ভাবিতেছিল "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই!"

সে তো এমন একজন কোনো বন্ধু পাইবে এমন কল্পনাও কোনোদিন করে নাই। আর এত শীঘ্রই যে ঋণ শোধ করিবার চেষ্টায় লাগিবে এমন আশাও তার ছিল না। ভাগ্যটাকে অনেক দিন পরে এই বার একটু অনুকূল দেখিয়া তার ভরসাই হইতেছিল না যে সত্য কি না? দিন কতক পরে সত্যই সে কলিকাতা ছাড়িয়া বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে হাওড়ার ট্রেণে চাপিয়া বসিল। একজনও স্বদেশী আত্মীয় ষ্টেষণে তাকে তুলিয়া দিতে আসে নাই!

আত্মীয় না হউক পরিচিত যে দু' একজন লোক তার ছিল, তাদেরও সে কোনো সংবাদ দেয় নাই। কেন না তার এ কাজ মিলিবে কি না শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল যদি কখনো আবার দেশে ফিরি, তো এই ঋণ তার মত মাথা নিয়া নয়! হাল্‌কা মন লইয়া উচু মাথায় এ দেশে যদি ফিরিতে পারি ফিরিব, নয় তো ফিরিব না!

(১৪)

দ্বিপ্রহর। পশ্চিমের রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে চারিদিক যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। তারিণী কোর্টে গিয়াছিলেন। বাড়ীর চাকরেরা সকলে নিশ্চিন্ত মনে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। এমন সময়ে তাদের দলে কোনো উৎপাতেই কখনো হয় না। দৈবাৎ যদি কোনো অর্ব্বাচীন ভিক্ষুক আসিয়া চেঁচাইয়া তাদের তন্দ্রাসুখে ব্যাঘাত জন্মায় তা হইলেই সেদিন সেই দলশুদ্ধ

সকলে মিলিয়া সে ভিক্ষুকটীর এমনি দশাই করিয়া ছাড়ে যে, ভিক্ষুক ভাল করিয়া বুঝিয়া যায় যে বড়লোকের বাড়ীর চাকরেদের মেজাজ কি উঁচু!

সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা চোখে জল দিয়া আসিয়া তটিনী অর্দ্ধেক পড়া একখানা বই শেষ করিতে বসিয়াছিল। নীচে হইতে ডাকপিওন চীৎকার করিয়া হাঁকিল "হো ভাণ্ডারী জী!"

সুখ-সুপ্ত ভাণ্ডারীজীর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না! পিওন আবার ডাকিল, "এবার খানসামাকে, কিন্তু সকলেরই অবস্থা তখন সমান। বারংবার চীৎকার শুনিয়া তটিনী জানালার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "ঐ দিকে সব ঘুমোচ্চে। ধাক্কা দিয়ে ওদের জাগিয়ে দাও।"

পিওন সরিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ঘুম চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে নিতাই আসিয়া জানাইল, কর্ত্তার নামে মণিঅর্ডার আছে পাঁচ শো টাকার।

তটিনী বলিল "বলে দাও, বাবা কোর্টে আছেন। লাইব্রেরিতে নিয়ে যাক্।"

তটিনী প্রথমে ভাবিয়াছিল কোনো মক্কেল হয় তো পাঠাইয়াছে, তাই নিজে না লইয়া তারিণীর কাছেই পাঠাইয়া দিতেছিল। তারপর কি ভাবিয়া বলিল "আচ্ছা নিতাই আন্ তো দেখি, আমি সই ক'রে নিতে পারি কি না?"

নিতাইএর হাত হইতে ফারম লইয়া তটিনী অবাক্ হইয়া গেল। বারীন্দ্র সেন এত টাকা পাঠাইয়াছেন, তারিণীবাবুকে, কেন? কোন্ সুদূর হইতে তারিণীকে মনে করিয়াই এত টাকা তিনি কেন পাঠাইলেন? অনেক ভাবিয়াও তটিনী অর্থ বুঝিতে পারিল না। নিতাই বলিল "পিওন যে দাঁড়িয়ে রয়েচে দিদিমণি, টাকা কি আপনি নেবেন?"

"না,—আমি এ টাকা নিতে পারবো না, বাবার কাছে পাঠিয়ে দিগে যা!

"আপনি নিলে হবে না?"

"না"

নিতাই চলিয়া গেল। তটিনী কেবলি ভাবিতে লাগিল যে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিবে? ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিয়া গেল। সেদিন এই সময় মামার মা তাঁর ছেলে মেয়ে লইয়া বেড়াইতে আসিবেন কথা ছিল। তটিনী তাই নীচে নামিয়া গেল।

যাঁদের আসিবার কথা ছিল তাঁরা আসিলেন। মায়া এদিন মায়ের সঙ্গে আসিয়াছিল বলিয়া শান্ত মেয়ে হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মহেশ্বরী বলিলেন "কি মায়া আজ যে তিনুদিকে সুমুখে পেয়েও চুপ ক'রে বসে রইলি,—একটু লাফালাফি ক'রবিনে ?"

মায়া, মায়ের মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল। তার মা বলিলেন "চিরকাল আয়ার লাফাবে কি ? বড় হচ্চে না ?"

"ওইটুকু মেয়ে আর কি এমন বড় হয়েছে! আমাদের তিনুর বাপই তো মনে করেন যে, মেয়ে তাঁর এখনো ছেলে মানুষ আছে!"

তাঁর মনে করার কথা আলাদা। আমাদের মেয়ের যে শশুর ঘর করতে হবে, চিরকাল খুকী থাক্‌লে চল্‌বে কি কোরে ?"

মহেশ্বরী আর কোনো কথা না পাইয়া বলিলেন "তা তো সত্যি।"

তটিনী বলিল "সত্যিই তো! আয় মায়া, দেখি তো তোর চুল পেকেছে কি না ? বুড়ো হয়ে গেলি যে!"

মায়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "যাও, তা বই কি! আমি তোমার চেয়ে কত ছোট, তা মনে থাকে না বুঝি ?"

"খুব থাকে। এখনও আমি বুড়ো হইনি তো! তাই দেখবো তুই কেমন ক'রে বুড়ো হ'য়ে গেলি"

মায়ার মা বলিলেন "তোমারও বুড়ো হ'তেই হ'ত, ছেলে মেয়ের মা হ'লে আর খুকী সেজে থাক্‌লে চলতো না, তবে কিনা তোমাদের উল্টো কাণ্ড কারখানা!"

মহেশ্বরী বলিলেন "আমি ও তো তাই বলি যে—"

"পিসিমা!"

"কেন রে ?"

বাবার কোর্ট থেকে আসবার সময় হ'ল যে! তাঁর খাবার ঠিক আছে তো!"

"তুমি আমাকে তা মনে করিয়ে দিচ্চো নাকি ? নিতাইএর কাছে সব দিয়ে রেখেছি।"

"নিতাই যে পানফলগুলো ছাড়াতে পারে না। সেদিন আমার অসুখ করেছিল তাই নিতাই অর্দ্ধেক খোসাশুদ্ধ রেখে দিয়েছিল, আমি একটাও খেতে পারিনি"

"তা ফলটলগুলো কি আর ওরা কেটে দিতে পারে ? সে নিজেদের দিতে হবে বই কি ?"

"তবে আমি যাই"

বলিয়া তটিনী সেখান হইতে পালাইয়া বাঁচিল। তা না হইলে তাকে লক্ষ্য করিয়া পিসিমা যা বলিতে বসিতেন, সে সব কথা মুখ বুজিয়া শুনিয়া যাওয়া তটিনীর পক্ষে নিতান্ত সহজ হইত না ! আর মহেশ্বরী তারিণীর মুখের উপর যে আলোচনা প্রাণান্তেও করিতে পারিতেন না সেই দুঃখের কথা তাঁর অন্য কোনো লোক দেখিলেই উথলিয়া উঠিত।

তিনি বলিলেন "এ ছাতুখোরের দেশে একটা কথা কহিবার মানুষ যদি মেলে,—আজ কতদিন পরে একটা দেশের মানুষের মুখ দেখে বাঁচলাম"

মায়ার মা বলিলেন "তা মাঝে সাঝে গেলেই তো পারেন আমাদের ওখানে।

"কেমন ক'রে যাই বলুন, ওই মেয়ে যে একদণ্ড বাড়ী থেকে বেরোয় না। ওকে বাড়ীতে একা রেখে তো আর কোথাও যেতে পারিনে, কাজেই আমিও বন্দী হ'য়ে আছি"

"তা হ'লে আর কি ব'লবো বলুন—"

বলিয়া মায়ার মা আরো কোনো কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নিতাই আসিয়া কর্ত্তার আগমন খবর জানাইয়া গেল। তটিনী ব্যস্ত ভাবে জল খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া তারিণীবাবুর ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তিনি তখনো অফিসের পোষাক ছাড়েন নাই। পোষাক পরিয়াই ইজি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাঁর শুষ্ক মুখপানে চাহিয়া তটিনী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তটিনীর পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন "আজ আর অন্য কিছু খাব না তিনুমা, শুধু জলের গ্লাসটা রেখে যাও।"

টেবিলের উপর জলের গ্লাস নামাইয়া তটিনী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "ফল ?"

"না, না, কিছু না। তুমি জলটা রেখে দিয়ে যাও, আমি খাব এখন।" তটিনী চলিয়া গেল। তারিণীবাবু উঠিয়া বহুদিন পরে কৃষ্ণবিহারীর শেষ পত্রখানি দেরাজ হইতে বাহির করিয়া আর একবার পড়িলেন। তাঁর উদ্ধত দর্প সেদিনকার বারীনের প্রেরিত টাকাগুলির ঘায়ে কেমন যেন মুষড়িয়া পড়িতেছিল।

তারিণীবাবু একবার এক পলক ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি এ টাকা ফেরত দিবেন, কিন্তু কি বলিয়া? বারীন তো তিনি বলিয়া তাঁকে টাকা পাঠায় নাই, সে কড়ায় গণ্ডায় পিতৃঋণ শোধ করিয়াছে, তবে যদি তিনি নিজেকে উত্তমর্ণ বলিয়া অস্বীকার করেন। সত্যের খাতিরে তাও তিনি পারিলেন না।

কৃষ্ণবিহারী আজীবন তারিণীর কাছে যে ঋণের জন্য ছোট হইয়া থাকিয়াছেন,—আজ কৃষ্ণবিহারীর তরুণ পুত্র, যাকে তারিণী সমস্ত মন দিয়া অবহেলা করিয়া চলিয়াছেন—সেই, সুদূর দেশে বসিয়া, এমনি করিয়া পিতার গোপন-ঋণ শোধ করিয়া মাথা তুলিয়া লইতে এ রকম আশা তারিণী কখনো করেন নাই!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল। মায়াকে লইয়া তার মা চলিয়া গিয়াছিলেন। বাগানের মালী মাথায় ময়লা গামছা বাঁধিয়া কপি ও বেগুনের কচি চারাগুলিতে ঝাঁঝড়ায় করিয়া জল সেচন করিতেছিল। কঞ্চির গা বেড়িয়া সীমের নধর লতায় বিচিত্র নীল পীত রংয়ের ছোট ছোট সুন্দর ফুলগুলির উপর মধুলব্ধ প্রজাপতিরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মালীর দুরন্ত ছেলেটা খায়ে প্রজাপতি ধরিবার ফন্দী করিতেছিল, এমন সময়ে বাগানের কাছে দিদিমণির আবির্ভাব! তাড়াতাড়ি লাঠি ফেলিয়া দিয়া সে মুখ ফিরাইয়া লাউএর চারা গাছে মাটী দিতে বসিয়া গেল। তটিনী বাগান ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে দু একটা সীমের হলদে ও বেগুনে রংয়ের ফুলই ছিঁড়িয়া লইল।

একখানি খুরপী হাতে করিয়া বিধুণ রান্নাঘরের জন্য আমাদার সন্ধানে আসিয়া বলিল "বাবুর কি শরীর ভাল নেই দিদিমণি?"

তটিনী নিজেও কিছু বুঝিতে পারে নাই, সে বলিল "জানিনে তো! কেন?"

"এখন অবধি পোষাক ছাড়েন নি শুয়ে আছেন।"

"শুয়ে আছেন?"

"হ্যাঁ,—চুপ চাপ শুয়ে আছেন, নিতাই তামাক দিয়ে এসে আমাকে বল্লে।"

তটিনী কিন্তু ভাবিয়া পাইল না যে এমনই কি ঘটিয়াছে যে তার বাবা হঠাৎ এমন চিন্তা-স মুদ্রে পড়িয়া গেলেন। মণিঅর্ডারে তার শান্ত মনে অল্প মাত্র তরঙ্গ সৃজন করিয়াছিল, সেই

কারণেই যে তার বাবার মত দৃঢ়চিত্তের মানুষ এত বিকল হইয়া উঠিবেন এও কি সম্ভব? কিন্তু টাকা! টাকা আসিল কেন?

তটিনী আপন মনেই ভাবিল দূর হউক, এ ভাবনা ভাব্‌বার আমার কি এত দরকার? দরকার কিছু থাক আর নাই থাক ভাবনাটা যে ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে আসে না সেই তো কথা! ভাবিবে না ভাবিয়াও যে ফুলের মত সুকুমার অম্লান মুখখানিতে ভাবনারই নিবিড় মেঘ নামিয়া আসিতেছিল তাকে সে নিবারণ করিবে কি দিয়া?

তটিনী সন্ধ্যার পূর্ব-মুহূর্ত্ত অবধি সেই সব্জীবাগানে ঘুরিয়া কেবল কয়েকটা গাঁদাফুল হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিল। হাতেপায়ে একটু জল দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল কর্ত্তা ঘরেই আছেন। সাহস করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ফুল কয়টা দেরাজের উপর রাখিয়া দিয়া সে টেবিলের উপরকার জল শূন্য গেলাসটা হাত দিয়া নাড়িতেছিল তারিণীবাবু বলিলেন "তিনুমা কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"নীচে ছিলাম বাবা, আপনি রাত্রে কি খাবেন? লুচি না ভাত?"

"যা রোজ খাই, তাই খাব, তুমি এই বইখানা পড়ে শোনাও তো আমায়!"

পিতার এরূপ অনুরোধ নূতন নয়। তটিনী বইখানা লইয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই সে বুঝিতে পারিল বই শোনার দিকে তাঁর মন নাই,—গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন! মণিঅর্ডারই কি পিতাকে এমন চিন্তিত—অন্যমনস্ক করিয়াছে, বুঝিবা পীড়া দিতেছে! বারীন্দ্র টাকা পাঠাইলেন কেন! কোথা হইতে টাকা পাঠাইলেন, ঠিকানাটা ত দেখা হয় নাই!

সমস্তেই গোলমাল! চিন্তা তটিনীকে ত্যাগ করিতে না চাহিলেও চিন্তা করিবার শক্তি তখন তার ছিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ভিখারী।

—:•:—

হায়, দেবি ! ভালে যার দিলে রাজটীকা,
তোমার বিহনে হের সে আজ ভিখারী—
ফিরিতেছে বিশ্বদ্বারে হইয়া ভুখারী।—
অন্তরে জ্বলিছে তার কি প্রবল শিখা !
যেখানে মন্দির দেখি যাই আমি ধেয়ে ;
ফিরি কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ-মনোরথ—
মরুমাঝে মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগবৎ—
মন্দিরে দেবীরে, হায়, দেখিতে না পেয়ে।
কেন আর মিছে তবে মরিস ঘুরিয়া
শ্রান্ত দেহ টেনে টেনে পাগলের পারা—
দ্বারে দ্বারে ? ওরে রিক্ত ! ওরে সর্ব্বহারা !
মানুষ কে দিবে তোর ও শূন্য পূরিয়া ?
মেঘে যদি জল নাই, রে অভাগা পাখি,
মিছামিছি কেন আর মরিতেছ ডাকি ?

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

———

চরকায় জাতীয় জীবন।

'কাহিনীর রাজকন্যার প্রাণের ক্রিয়া—জাগরণ ছিল সোনার কাঠিতে, আর এযুগে আমাদের জাগরণ, জাতীয় উন্নতি চরকায়'—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ উক্তি কেহ করিলে, কবিরাজ মহাশয় তাহার জন্য হিম-সাগর তৈলের ব্যবস্থা করিতেন নিশ্চয়—কিন্তু আজ আর এ মতটাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। দেশনায়ক সুধীগণ কেবল যুক্তিতর্কে নয়, হাতে-হাতিয়ারে ইহার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর ও সমস্যাটাকে সমাধানের দিকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া প্রয়োগ পরীক্ষায় প্রমাণ করিতেছেন—চরকার চক্র দেবহস্তস্থিত সুদর্শন-চক্রেরই ন্যায় দমন ও সংরক্ষণ ব্যাপারে কিরূপ শক্তিশালী। কেবল শিল্পের হিসাবে নয়, মানুষের মনের উপর চরকার চক্রের কি ক্ষিপ্র প্রভাব, চরকার মোটা সূতা ভারতসন্তানগণকে একত্র বাঁধিবার পক্ষে কতদূর দৃঢ়! অচেতন কোন কালেই কাজ করে না; অচেতন, সচেতন সুকৌশলীর হস্তে ন্যস্ত হইয়া হয় কার্যকরী,—অমোঘ অস্ত্র; মূলে প্রাণশক্তির ক্রিয়া—বাহিক প্রকাশ তাহার আয়োজন উপকরণে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিল্প সহায়রূপে চরকা মাহাত্ম্য যত নয়, মনের উপর পরোক্ষ প্রভাবে উহার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী! অচেতন চরকার কাঠ কয়খানির আর কিই বা শক্তি! তথাপি আজ ভারতসন্তানের হৃদয়ে যে অভাবের পীড়ন,—দেশব্যাপী দুঃখ অস্তিত্ব লাভ করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, তাহা নিরাকরণের অমোঘ অস্ত্র-এই চরকা;—নির্ব্বস্ত্রকে বস্ত্রদান করিতে, সমবেদনায় সমদুঃখীকে একত্র বাঁধিতে, সকলকে সমকর্ম্মী, একব্রতী করিতে পারে যদি কিছু তাহা এই চরকা। মহাত্মার বহু তপস্যা-লব্ধ, এ উক্তির এ যুক্তির সারবত্তা ভারতবাসীকে এই জাতীয় দুঃখের দিনে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে হইবে। পরের দেওয়া ঐশ্বর্য্য, বিলাস-উপকরণ, সুখের সামগ্রী আপাতঃ সুখদ হইলেও পরিণামে কি কষ্টদায়ক, জাতীয় অবনতির কারণ, ভারতবাসী তাহা পরের প্রেমে মজিয়া, অন্ধের মত তাহার খোসখেয়ালে ঔজিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া যে চরম দুরবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার নিকট আর অজ্ঞাত নাই;—পরদেশীর প্রভাব কি ভয়ানক,—দেশ-মাতাকে অবজ্ঞা করার ফল কি

বিষম! ঘরের ছেলে তাই আজ ঘরে ফিরিতে এত ব্যস্ত। মন তাহার ছুটিয়াছে গৃহপানে, জননী জন্মভূমির মহিমায়, ভাইভগিনীর স্নেহে, স্বদেশী ভাবে, গরীমায় প্রাণমন তাহার পূর্ণ! দেশের হৃত, নষ্ট, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত দ্রব্যসম্ভার, শিল্পাদির দুর্দ্দশা, দুরবস্থার কথা স্মরণে আসিয়া বিপথগামী সন্তান আজ অনুতপ্ত,—উন্মত্ত। সকলেরই প্রাণ এখন প্রার্থনা করিতেছে মাতৃ-অবস্থার সর্ব্ব উন্নতি, দেশের সর্ব্ববস্তুর দেশীয় ভাবে পরিণতি, পরিপুষ্টি, বিলুপ্ত, নষ্টপ্রায় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার,—প্রাণপ্রতিষ্ঠা—নিজের ধনে নিজে পুষ্ট হইবার চেষ্টা! ভারতব্যাপী এই চাঞ্চল্য, এই অদম্য আবেগ, বিনিষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, আত্মবলে সর্ব্বপ্রকার অভাব নিরাকরণের প্রবল ইচ্ছা, আত্মোন্নতির প্রয়াস—এ-সকল বিষয়ের সাফল্য কি নিহিত এই চরকায়? সত্যই—স্বতঃই এউক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে কেমন দ্বিধা আসে। কিন্তু স্থির মনে ধীর চিত্তে মূলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে মহাত্মার এ-উক্তির সারবত্তায় আর সন্দেহ থাকে না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় মূল অভাব কি? অন্নবস্ত্রের অভাব! এই অভাবই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব, অন্য অনটন ত ইহারই আনুষঙ্গিক। অর্থনীতির সূত্রে পরীক্ষা করিলে দেখান যায় অন্য বস্তুর অভাব বিলাস-বাসনা, এই অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যবিধানেরই পরোক্ষ পন্থা—প্রকৃত অভাব বলিতে বুঝায় অন্ন বস্ত্রের দৈন্য। নতুবা অন্য দৈন্যে, বিলাস উপকরণের অপ্রাচুর্য্যে মানুষ অশান্তি অনুভব করে সত্য, জীবনযাত্রার তাহাতে ব্যাঘাত ঘটায় না, বরং আরও জীবনপথ সরল করিয়া দেয়—মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে শিক্ষা পায় কিন্তু অন্নবস্ত্রের সমস্যায় যে জীবন লইয়াই টানাটানি, এ অভাবে মানুষ আর কয় দিন বাঁচিতে পারে? হয় মৃত্যু নয় উহার নিরাকরণ, দুয়ের এক ব্যতীত অন্য পথ নাই। ভারত আজ এই জীবনমরণ সমস্যায় দুলিতেছে—তাহার অভাব অন্নবস্ত্রের! যে কারণেই হউক ভারতবাসীর উদরে অন্ন নাই, পরিধানে উপযুক্ত বস্ত্র নাই! নিজের আহারীয় উৎপন্ন করিয়াও ইচ্ছামত ভোগ করিবার উপায় নাই, বস্ত্রের জন্য ত বিদেশীর উপর নির্ভর, এই বিষম অবস্থার পরিবর্ত্তন চেষ্টাতেই না এত!

কৃষিপ্রধান ভারত,—সুজলা সুফলা মা আমার,—মার বক্ষে সন্তানের উপযুক্ত স্তন্যের অভাব নাই—তাহার সপ্তকোটী সন্তানের আহারীয় তাহাতে আছে। অন্য দেশের তুলনায় কৃষিকার্য্যের বৈজ্ঞানিক উন্নতিসাধনে ভারত বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও এ-ভূমি স্বভাবতঃই

একরাশ ফুল হ'তে ক'রে, বাইরে দাঁড়িয়ে 'রাণী'। তার বড় বড় চোখদুটো মুখের উপর তুলে ধরে বল্‌ল, "কেমন আছ বিকাশদা আজ?"

"বেশ ত আছি বোন," বল্‌তেই সে তার মাথাটী নীচোয় নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, ওপারের জান্‌লাটা খুলে দিয়ে, আস্তে আস্তে টেবিল থেকে তোড়া-দানিটা নিয়ে, বাসিফুল আর জলগুলো জান্‌লা গলিয়ে ফেলে—নতুন ফুলগুলো বসিয়ে দিল।

এও কি একটা কম নেশা? সেই কখন আস্‌বে বলে, বুক-ভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে, ঐ আমবাগানের সরু পথটার পানে চেয়ে থাকা!

তোমরা ভাবছ—কি সব আবোল তা বোল বক্‌ছি—কিছু মিল নেই। সত্যি, সবই আমার আগোছাল, সব পাগলামী, সব খাপছাড়া।

তখনও স্কুল ছাড়াতে আমার বছর খানেক বাকী। বেশী কারুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা বল্‌তে মোটেই ইচ্ছে হ'তো না, হলেও জোর করে বল্‌তাম না। সবাই আমার এ রোগের কারণ খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল।

একদিন হঠাৎ ধরাও পড়ে গেলাম। গাছে গাছে লতায় পাতায় ও যে একটা ভালবাসা একটা মেলা মেশা করবার আকাঙ্ক্ষা দিন রাত সুযোগ খুঁজছে এ কথাটা তারা মেনে নেবার পূর্ব্বেই এক সঙ্গে এমনি জোরে হেসে উঠ্‌ল যে সেই থেকে আমি বোবা বনে গেলাম। গলার কাছে হাজার কথা এসে ভিড় করে দাঁড়ালেও মুখফুটে কিছুই বল্‌তাম না।

আমার ছোটখাটো কথাগুলোতেও তারা চোখ টেপাটেপি করে হাস্‌ত; কেউ কেউ মুখের উপর স্পষ্ট বিদ্রূপ করে বল্‌ত, "নে নে চুপ্‌ কর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ হ'য়ে গেলি যে।" লজ্জায় আমার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা থাক্‌ত না। বড় কষ্ট হ'ত এরা বোঝে না।

নইলে কি আমার কথাগুলো সব মিথ্যে! ঐ যে থোকা থোকা ঝুমকো ফুলের রাশ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে সুকোমল লতাটি সেজে গুজে তার পাশের গাছটিকে বুকে টেনে নিয়েছে—এ কি সব মিথ্যে কল্পনা, সব অবাস্তব? এর ভেতর কি কোন সত্য নেই? তোমরা ভাবতে পার না তাই!

ছিন্নমালা।

—:•:—

সহরে শান্তির বুকের উপর দাঁড়িয়ে কোলাহলের যে উন্মাদ নৃত্য, যে একবারে আমার সহ্যসীমার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাই এ নিরালা জায়গাটীতে এসে আশ্রয় নিয়েছি। পূবের দিকে ছোট্ট নদীটির অশ্রান্ত চরণের রুণ্ ঝুণ্ কোন্ সুদূর অপ্সরাদের অস্পষ্ট কলহাসির মত নিশিদিন কানের কাছে এসে বাজ্ছে। উত্তর, পশ্চিমে ধূধূ করে খোলা মাঠ—হাসির মতই স্নিগ্ধ, সবুজ। তার ওপারে বহুদূরে আকাশটা যেখানে ধানের খেতের ভিতর গায়ে লুটিয়ে পড়েচে, যেখানে ফাগের রঙের একটা অস্পষ্ট তুলির লেখা। ওখানে মিলনের উৎসবে রক্তিম।

জানি—এত হাসি এত গান এত উৎসবের আয়োজন না থাকলে, এ ভাঙা-চোরা দেহটা কবে শেষ হ'য়ে যেত, আর তখন একে বাধা দেবার বিশেষ প্রয়োজনও হ'তো না, কিন্তু এ জন্যে আবার বাঁচ্তে ইচ্ছে হচ্ছে।

সব চাইতে ভাল লাগে আমার এই ধারটা—এই দক্ষিণের দিকটা। কেমন নিবিড়—ঘন আহ্বান, যেন ব্যথা বেদনার গভীর, গম্ভীর।

এ গ্রামে মানুষ খুব বেশী নেই। কেবল আমি, আর ঐ আমগাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে তাদের খান বাড়ী। আগে মনে হ'তো, মানুষ কি করে এমন স্থানে বাস ক'রতে পারে, কিন্তু এখন যে এই বেশ লাগ্ছে। আর ভাল লাগ্বার হেতুও আছে। যেমন দ্রুত গতিতে, দেহটা অন্যায় চিন্তার লোভে ক্ষ্যাপার মত ছুটে চলেছিল আজ হঠাৎ তাই থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে, আড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জানিনা এ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের সর্ব্বশেষে দীপ্তরশ্মি কি না।

তারপর রাত ভাল ক'রে না শেষ হতেই যে দোরে ঘা দিয়ে ডাকে, "বিকাশদা"—তার 'পরে কি যে একটা ভীষণ টান হ'য়ে গিয়েচে আমার যা কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্তে পারছি নে। অতি কষ্টে, কোনও মতে উঠে গিয়ে দোর খুলে দিয়ে দেখি—সেই ভোরে,

কৃষ্ণরূপ।

--:*:--

আমি দেখিলাম একি রূপ,
আমি দেখিলাম একি সাজ,—
ওগো কালো রং এ একি আলোকরা সাজ
অপরূপ, অপরূপ।
তুমি সকল রূপের নেশা
মিটাইলে মনোরম,
ওগো, সুন্দর তুমি, অতুলন তুমি
অনুপম, অনুপম!

তব চরণ কমল রাগে
ওগো শ্যামসুন্দরময়
মোর জীবন-পদ্ম মেলিছে হৃদয়,
কদম শিহরি' জাগে
মোর দুলিছে নীপের শাখা,
কাঁপিছে তমাল বন,
ওগো মোহন তোমার রূপেতে মেতেছে
হৃদয় বৃন্দাবন।

আমি নমিব কি রাঙ্গা পায়
কিবা পূজিব অর্ঘ্য দিয়া
কিবা রক্ত-উজল-বক্ষ চিরিয়া
পাতিব চরণ ছায়?
আমি ধরিব কি কোলে চাপি'
তুলিব কি তোরে বুকে
মোর হৃদি-ভাণ্ডার শূন্য করে' কি
ননী দিব চাঁদ-মুখে?

প্রকৃত স্বদেশী, মাতার দুঃখের দরদী, মাতৃদৈন্যমোচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহা হইলে হই না কেন আমরা ক্ষুদ্র, স্বস্থানচ্যুত, বিজ্ঞানাদিতে হীন, আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে বাধা হইতে পারিবে না সংসারের কোন কিছুই! চাই এখন সংযম, শক্তির ব্যবহার! সামর্থ্য অনুযায়ী অনুষ্ঠান,—গৃহে গৃহে তপস্যা,—সাধনা—কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা,—একমন্ত্রী হইয়া নিজের জন্য, দেশের ভ্রাতাভগিনীর জন্য, স্বদেশের জন্য যথাশক্তি কর্ম্মপ্রবৃত্তি! এ অবস্থায় সে প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিতে কল মিল বিদেশীর অত্যুৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক কৌশল আমাদের সহায়ক হইবে না,—আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষে সেইটীতে সম্বল করিতে হইবে যাহাকে আমরা সহজে আঁটিতে পারি, যেটিতে কর্ম্মের সহিত আমাদের মর্ম্মের উন্নতি সাধিত হয়,—মহাত্মা নির্দ্দেশিত চরকায় তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব! আমার বস্ত্র আমি যদি নিজ হাতে বুনিতে পারি, আমার আত্মীয় আত্মীয়া সকলে যে কার্য্যে একাগ্র অনন্য মনে ব্রতী তাহাতে যদি আমি কৃতিত্ব দেখাইতে পারি, আমার স্নেহের উপহার যদি হয় আমারই শ্রমফল,—তাহা অপকৃষ্ট, মোটা, বা যাহাই হ'ক, এক প্রীতির প্রসাধনে, 'আমার' এই এক গুণেই তাহা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হইতেও আমার প্রিয়; পরিজন, প্রতিবেশী স্বজন, স্বদেশীর নিকট তাহা যে অতি আদরের, শ্লাঘার বলিয়া বিবেচিত হইবে বলাই বাহুল্য! এক প্রীতির পরশেই, আমার সে পণ্যের সকল ত্রুটি সকল দৈন্য নিরাকৃত হইয়া পরশ পাথর স্পর্শে পরিণত হইবে স্বর্ণে,—বর্ণে নহে কর্ম্ম ফলে—সমস্তই স্বর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ, উন্নত অনুন্নত হইয়া যাইবে এক—এক জাতী—ব্যষ্টির উন্নতিতে হইবে সমষ্টির উন্নতি—জাতীয় জীবনের সঞ্চার।

বস্ত্রের অভাব এখন আমাদের প্রধান অভাবের মধ্যে অন্যতম,—এ অভাব সকলের—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক জাতীর, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের—ইহার নিরাকরণ সকলেই প্রার্থনা করিতেছে, সকলেই ইহার উন্নতির জন্য উদ্গ্রীব—সকলের সমবেত চেষ্টা যদি এই জাতীয় অভাবের দিকে প্রেরিত হয়; চরকা যদি হয় তাহার সাধন অস্ত্র, কর্ম্মসহায়ক—তাহা হইলে চরকাকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে নিশ্চয়। সে উন্নতির সঙ্গে বাকসিদ্ধ মহাত্মার উক্তি সার্থক হইবে—চরকায় জাতীয় জীবন।

———

পক্ষে ও-সকল যন্ত্র দুর্লভই রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—বিদেশী সূতায় যে সকল তাঁত স্বদেশী মিহি কাপড় বুনিতেছে, তাহা দেশের তেমন উপকারে আসে নাই, বরং প্রকারান্তরে তাহাতে বিলাসিতার প্রশ্রয়ই দিতেছে। অথচ এ যুগে এ দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত, অঋমুক্ত হইতে হইলে বিলাসিতা বর্জ্জনই আমাদের আদিতে। ওরূপ তাঁত তাহার বিরোধী! বিশেষতঃ মনের উপর মিলের যে প্রভাব তাহা ভয়াবহ, আমাদের এ অবস্থায় সে ভাব অতি অপকারী কলকারখানা-কণ্টকাকীর্ণ-দেশ গুলিতে এ সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে—কল দ্বারা মানুষের মন কিরূপ কলুষিত ও সঙ্কুচিত হয়; কলে কাজ করিতে করিতে মানুষও ক্রমে কলের মত হইয়া যায়, থাকে কেবল তাহাদের ঠিক সময় মত ঘড়ি ধরিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা; মনুষ্যোচিত অন্য সকল গুণই কলের শ্রমজীবির অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। মিল দ্বারা অভাব মোচনের উপায় কালে হইলেও হইতে পারে কিন্তু উহাতে আমাদের আসল অভাব,—জাতীয় দৈন্য দূর করিতে নিশ্চয় পারিবে না। ভারতে এখন কল হইতে কৌশলের প্রয়োজনই অধিক,—প্রতি কার্য্যেই ভারতের এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত—প্রাণশক্তি, প্রেমের বিকাশ; যাহা তাহার অন্তরায় তাহাতে শত সুবিধা হইলেও অবশ্য-পরিত্যাজ্য। ভারতের মিলগুলি বিদেশী আদর্শে যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিবার এ দুর্দ্দিনে কিছু নাই! এখন চাই এ দেশে এমন সকল কার্য্যের প্রতিষ্ঠা যাহাতে আমাদের অভাব মোচনের সহিত মনুষ্যোচিত অন্যান্য গুণ বিকশিত হইয়া জাতীয় উন্নতি সূচিত হয়। সর্ব্ব প্রকার সাধনার আদিতে কৃচ্ছ্র সাধন, অশেষ অসুবিধা, বাহিরের অত্যাচার, নিগ্রহ নিহিত, তাহাতে ভীত, নিরাশ হইলে সিদ্ধি লাভের আশা সুদূরপরাহত! বিশেষতঃ ভারতের এ সাধনা সর্ব্ব-সাধনা হইতে ভয়ানক, দুরূহ, নিগূঢ়! অসাধ্য সাধন বলিলেই হয়! দুর্দ্দান্ত কল্পনাশা ভূত প্রেত সমাকুল মহাশ্মশানে এ জাতীয় সাধনার মহাপীঠ। পদে পদে বাধা বিপত্তি, আত্মশক্তি প্রকাশের নানা অন্তরায় বর্ত্তমান,—কেবল মনের বল, মনুষ্য মনের শাশ্বত স্বাভাবিক স্বাধীনতা, মানবিকতা, আর দেবতার আশীর্ব্বাদ, মাতৃভূমির প্রতি অগাধ প্রেমই এ ক্ষেত্রে সম্বল,—জাতীয় যজ্ঞের বীজমন্ত্র! সেই উচ্চ আদর্শে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া অবিচলিত চিত্তে, দৃঢ় মনে আমাদিগকে অবিরত অগ্রসর-প্রয়াসী হইতে হইবে! গৃহে গৃহে যদি চলে সে চেষ্টা, প্রত্যেকেই যদি হয়

আই, স্বদেশ উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ এত ক'মিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে ভারতের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে—যে কোন প্রকারে শীতাতপ লজ্জানিবারণ করিতে হইলে দেশের উৎপন্ন বস্ত্রে ভারতবাসীর অভাব সঙ্কুলান হয় না। কেবল ভারতবাসীর পরিধানের জন্য বাৎসরিক প্রায় চরিশত আটষট্টি কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ইহার প্রায় ⅘ বস্ত্রের জন্য ভারতকে পর-দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছে। চরকার কার্য্য এক প্রকার এ দেশ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁতে যে সকল স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার অধিকাংশই বিদেশী সূতায়,—স্বদেশী নামান্তর। সত্য বটে ভারতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কাপড়ের মিল ও সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারত উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং ১৯০৯-১০ সনে ৬৩৫৭৬০০০ পাউণ্ড সূতার স্থলে ১৯২০-২১ সনে ৬৬০০৩০০০ পাউণ্ড সূতা, অর্থাৎ ২৪৪৩০০০ পাউণ্ড বেশী ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ৮১২০০০০০০ গজ কাপড়ের স্থলে ১৯২০-২১ সনে ১৩২০০০০০০০ গজ কাপড় অর্থাৎ ২২ কোটী গজ বেশী ভারতের কাপড়ের মিলে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি ভারতবাসী এই সকল কল দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয় নাই। আমরা ভারতের আমদানী ও রপ্তানী প্রবন্ধে দেখিয়াছি, দেশে উৎপন্ন সূতা অপেক্ষা বিদেশী সূতার পসার ভারতে অধিক,—এ দেশের সূতা বিদেশেই রপ্তানী হইয়াছে অধিকাংশ, এ দেশের কলের উৎপন্ন সূতার কদর এদেশে হয় নাই। হিসাবে দেখা যায় তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রও পূর্ব্বে বৎসর হইতে বিগত বর্ষে বেশী। উপর উপর দেখিলে ইহাতে হাতে বোনা স্বদেশী বস্ত্রের উন্নতি বলিয়া মনে হয়—কিন্তু ইহাতেও আমাদের আটপ্রহরে পরিধেয় বস্ত্রদৈন্যের পরিপূরণসমস্যা নিরাকরণ হয় নাই। এই সকল তাঁতের কাপড় প্রায়ই পোষাকী,—দামী,—উহা আটপৌরে মোটা কাপড় নহে, দেশের মহিলাবর্গের মধ্যে ইহার প্রচলন পূর্ব্বেও ছিল, লৌকিকতা ইত্যাদি ব্যাপারে এই সকল কাপড়ই বরাবর ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে,—এক্ষণে বিদেশী বস্ত্রের প্রতি দেশের লোকের একটা অপ্রীতিকর ভাব আসায় ও যে সকল ধনী পূর্ব্বে বিলাতী মিহি কাপড় পরিতেন, এখন তাঁহারা তাঁতের মিহি ধুতি সাড়ী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় এ সকল মিহি সূতার দেশী বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু ইহা দ্বারা সাধারণের লজ্জা নিবারণের উপায় হয় নাই। কারণ এ সকল স্বদেশী বস্ত্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিই হইয়াছে, কমে নাই, সুতরাং সাধারণের

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি—ভারতের উৎপন্ন শস্য ভারতবাসী ব্যবহার করিতে পারিলে জীবন ধারণ উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ভারতে নাই। খাদ্যাভাবের মূলে দেশের শস্য দেশে ব্যবহার করিবার শক্তির ও সুযোগের অভাব। এ অভাব মোচন করিতে চরকা কিরূপে সমর্থ? চরকার অপ্রতিহত প্রচলনে তাহা হইলে ফল কি?

শস্যের উৎপন্ন, উহার আমদানি রপ্তানির সহিত চরকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও পরোক্ষে সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। সে যোগাযোগটা মানুষের মনের বরাবর প্রবৃত্তির দিক হইতে। চরকার মোটা সুতায় তাঁতের মোটা কাপড়ে তুষ্ট হইবার মত মনের অবস্থা দেশে আবার ঘরে ঘরে উদ্বুদ্ধ হয় যদি,—কৃষক যদি বিলাস বাসনা খর্ব্ব করিয়া স্বল্প ব্যয়ে তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হয়,—বিলাস উপকরণের জন্য তাহাদিগকে সাংসারিক ব্যাপারে বেশী ব্যয় করিতে না হয়,—তাহা হইলে, এই মোটা কাপড়ের মাতৃভূমি চরকাই পরোক্ষে, শস্যের রপ্তানি নিশ্চয় কমাইয়া দিবেই দিবে। মানুষ কেহই এমন নির্ব্বোধ নয় যে নিজের মুখের আহার্য্য অন্যের হস্তে সাধে তুলিয়া দেয়,—সে নিজের ভবিষ্যৎ না বুঝে এমন নহে,—কেবল দশটা অন্য অভাবের তাড়নেই ত তাহাকে খাদ্য সম্ভার পর্যন্ত পরের নিকট বিক্রয় করিয়া পরিণামে ফকির বনিতে হয়। এই দশটা অভাবের মধ্যে পাঁচটাই বিলাসের অভাব। বসবাসের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পূর্ব্বে যাহা ছিল বিলাসিতা, এখন তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তু। অভাবের সহিত ব্যয়ের তালিকারও বৃদ্ধি, অথচ আয়ের পথ তাদৃশ (খরচের তুলনায়) বৃদ্ধি না হওয়ায় যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষুদ্র সাদাসিধে চরকার সহিত সখ্যতা সাধন, তাহার সংসর্গে সঙ্গগুণে আবার যদি আমাদের মন সংযত হয়, স্বল্পে তুষ্ট হয়, দেশের যা কিছু, যেমনই হউক না কেন, তাহাতেই আমরা তৃপ্ত হই, তাহা হইলে বিদেশীর হস্তে অন্ন, দেশের প্রাণ নিজকে বঞ্চিত করিয়া বিক্রয় করিবার প্রবৃত্তি আর থাকিবে না। নিজের আহার্য্য সঞ্চয় ও সংগ্রহের দিকে দেশের লোকের মন সন্নিহিত হইবে।

শস্যের দিক হইতে চরকার সম্বন্ধ পরোক্ষ হইলেও বস্ত্রের সরবরাহ ব্যাপারে চরকার সম্বন্ধটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষও বটে। যদিও বহুপূর্ব্বে দেশের এমন একদিন ছিল যখন চরকা-সূতার বস্ত্রে ভারতের লজ্জানিবারণ করিত কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; ভারতের কৃষি অবজ্ঞাত হইয়াও ভারতসন্তানকে বঞ্চিত করে নাই কিন্তু চরকা তদ্রূপ উদারতা দেখাইতে পারে

এত উর্ব্বর যে ইহাতে উৎপন্ন শস্যাদি এদেশের অভাব মোচনের পক্ষে অপ্রচুর নহে। খাদ্য-দ্রব্যের অভাব ভারতে নাই, বর্ত্তমান খাদ্যাভাব ঘটাইয়াছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বিগত বর্ষে ভারতে শস্য ভাল হয় নাই, তথাপি উৎপন্ন হইয়াছিল ;—

ধান্য—	২৮০৩৩০০০	টন
গম—	১০১২২০০০	টন
যব—	৩২০১০০০	টন
যৈ—	৩৬৮৫০০০	টন
মোট—	৪৫,০৪১,০০০	

ইহা ভারতসন্তানের উদর-পূরণের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু আলোচ্য বর্ষে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল—

ধান্য—	১০৮২০০০	টন
গম—	৩১৪০০০	টন
যব—	৬০০০	টন
যৈ—	৬১০০	টন
মোট—	১৪১৮০০০	টন

ধান্য ও গমের রপ্তানীর সংখ্যাটা লক্ষ্য করিবার, অথচ এই দুইটি বস্তুই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য, জীবন ধারণের উপকরণ! তৎপূর্ব্ব বৎসরে শস্যের ফসল অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। সে বৎসর ধান্য জন্মিয়াছিল—৩২০০০০০০ টন, অথচ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ৬৩৯০০০ টন অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষ হইতে ৪৪৩০০০ টন কম, গমও বিগত বর্ষের পূর্ব্ব বৎসর হইতে ২৪৭০০০ টন বেশী রপ্তানি হইয়াছে। ক্রমেই বেশী! অথচ বিগত বর্ষের অধিকাংশ সময়ই গবর্ণমেণ্টের আদেশে শস্য রপ্তানি বন্ধ ছিল—যা বিদেশে গিয়াছে তাহা সরকারের কার্য্যে, আর বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ও অন্য আকারে। তবু রক্ষা গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি রহিত করিয়া দেশের মাল এক কালে নিঃশেষ করিয়া নিকাশ করিতে দেন নাই (এবার আবার সে পথ উন্মুক্ত হইয়াছে!) নতুবা এই অতি উর্ব্বর দেশেও দুর্ভিক্ষের হাহাকার আরও ভীষণ-ভাবে উত্থিত হইত।

ক্লাসে বসে পড়া আমার মোটেই হ'তো না। দূরে ফাল্গুনের দক্ষিণে হাওয়ার একটা শিশু গাছের সবুজ আঁচল উশৃঙ্খল উল্লাসে নেচে ছুটে বেড়াতে চাইত—গাছটা কিছুতেই তা সামলে উঠতে পারত না। অভিসারিকার বেশে ছুটো মন সে যে কি করে তার চঞ্চল অঞ্চলপ্রান্ত সংযত করে কার অপেক্ষায় নিশিদিন দাঁড়িয়ে থাকত, তাই দেখতাম চেয়ে চেয়ে।

পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা বলে একটা পাখী যখন ছাতের বহু উপর থেকে সমস্ত বুকখানি ভেঙ্গে দিয়ে, তার প্রিয়ের বার্ত্তা জানতে চাইত, মাষ্টার মশাইদের কথা তখন কানের ত্রিসীমার কাছেও ঘেঁসতে পারত না। হঠাৎ খুব একটা সহজ পড়া জিজ্ঞাসা করলেও আমার পক্ষে তখন জবাব দেওয়া অসম্ভব হ'ত। সবাই হাসত। কেউ অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখেই বলে ফেলত "কবিত্ব হচ্ছে।" কি করব? প্রশ্ন। যখন আদৌ শুনতে পাই নি, যার যা খুসি বলুক।

আমার জানালার পাশে বাতাবী লেবুর গাছ ভরে ফুল এসেছে। ভোমরাগুলো ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে একেকবার ঘরের ভেতর ঢুকে রাণীর দাওয়া ফুলগুলোয় দু'একবার বসেই আবার ভোঁ ভোঁ করে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। এদের নিয়েই আমার অবশ অলস দিনগুলো কাটছে বেশ।

(২)

আজ দুমাস এখানে এসেছি। রাণী প্রতিদিন এসে আমার খাবার করে দিয়ে যায়। ঘরের প্রত্যেকটী আসবাব তারই হাতের সাজান। এই একটা বেলার ভেতর সে নেহাৎ কম করে তিন চা'র বার আসত। আজ একটীবারও আসে নি। সে জানত সে না আসলে সারাটা দিনরাত আমার অভুক্ত অবস্থায় কাটাতে হবে, এত অক্ষম হ'য়ে গেছি আমি।

সারাটা দুপুর অনেকখানি অশোয়াস্তি বুকে নিয়ে ছট্ ফট্ করে কাটিয়েছি। উঠবার শক্তিও যেন আজ ছিল না। বড় নির্জ্জীব বড় অবসন্ন এ দেহটা। চোখ ভেঙ্গে ঘুম

আস্‌ছিল—তবুও জেগে জেগে কার পায়ের ধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিলাম। বুঝ্‌লাম তার কিছু হয়েছে, কিন্তু সেই খবরটাই বা আজ আমায় কে এনে দেয় ?

বালিশটা বুকের নীচে দিয়ে পড়েছিলাম। একবার মুখ তুলতেই দেখি অপরাধীর মত রাণী পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। তার মুখের ওপর একটা সুস্পষ্ট বেদনার গভীর ছায়া বাদলা দিনের মেঘের মতই সব হাসিটুকু আড়াল ক'রে রেখেছিল। আমি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লাম "কিরে দিদি ?"

তার চোক বেয়ে দু'ফোঁটা জল পড়ি পড়ি করেও পড়্‌ল না। সে কোনও মতে আসন্ন কান্নাটাকে জোড় করে রোধ করে বল্‌লে "আমার আজ্‌কের মত মাপ কর। বিকাশদা।" শেষ কথাটা তার চোখের জলে ভিজে ভারী হ'য়ে বের' হ'ল।—আমি একটুখানি হেসে বল্‌লাম, "কি হ'য়েছে তোর আজ ?" কান্নায় তখন বুক তার ভরে গিয়েছিল, কথা ফুটল না।

আজ মরণের মুহূর্ত্তে মনে পড়ে, পরের জন্যে পরের এই যে একটুখানি কান্না, এ না থাক্‌লে—জগতের কত বড় লোকসান হ'ত।

বাজার কাজের ভিড়ের ভেতরেও যে আমার কাজটা তার সব চেয়ে বড়, এ কেবল সে জান্‌তো না, আমিও বুঝেছিলাম। সে টেবিলটার দিকে একবার চেয়েই বুঝেছিল আমার অবস্থাটা। এ দৃশ্য আজ তার অন্তরের ভিতর অনেকখানি ব্যথা আর বেদনা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল।

আমার এ দুঃসময়ে সে যতটুকু করত এই ত আমার ঢের, এ তো তার দয়া; কিন্তু সে ভাব্‌ত, এটা তার কর্ত্তব্য। আর না করাটাই মস্ত বড় অপরাধ। বাইরে থেকে তার শাস্তি দেবার কেউ না থাক্‌লেও, নিজের ভেতর সে যে শাস্তি অনুভব কর্‌ত তাই সহস্র গুণ বেশী হ'য়ে তার বুকে আড় হ'য়ে বিঁধ্‌তো।

খাটের কাছে টিপয়ের ওপ খাবার রেখে সে জল আন্‌তে য চ্ছিল, আমি বল্‌লাম 'রাত হ'য়ে গেল যে, বাড়ী যাবি কি ক'রে ?'

রাণী খোলা জানলাটার ভেতর দিয়ে আম বাগানের ঝাপ্‌সা অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বল্‌ল, "কেউ নিয়ে যাবে এখন এসে।"

দক্ষিণে বাতাসে, নূতন মুকুলের গন্ধ এসে ঘরে ঢুক্‌ছিল। উত্তরের জানালাটা বন্ধই থাক্‌ত, রাণীকে বল্‌লাম, "খুলে দে।"

ঠাণ্ডা লাগ্‌বে বলে, শক্ত করে সে অস্বীকার জানাল। আমি জোড় দিয়ে বল্‌লাম, "লাগে লাগুক, তুই দে না।"

রাণী তেমনি মুখের দিকে চেয়ে রইল। শ্রাবণের মেঘের মত চোখ দুটো তার জলে ভরা।

বড় কষ্ট হচ্ছিল দেখে। একটু নরম হ'য়ে বল্‌লাম, "দেখ্—দুদিন বাদ আর কেউ তোকে খুলে দিতে বল্‌বে না; তখন যত পারিস্ বন্ধ করে রাখিস্।" কথাটা তাকে এতখানি আঘাত করবে পরে জান্‌লে হয়তো কখনই বল্‌তাম না। সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে তার কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝড়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দিল।

(৩)

আকাশ ভরা তারার ছড়াছড়ি। রাণীকে কাছে ডেকে বল্‌লাম, "বোস্।" সে বিছানার পাশে বসে আমার দুর্ব্বল হাতখানা তার কোলের ওপর টেনে নিল। আকাশের দিকে তারাগুলোকে দেখিয়ে বল্‌লাম, "ওগুলো কিরে?" প্রশ্ন শুনে প্রগল্‌ভা সে একটু-খানি অবাক্ হ'য়ে গেল, তারপর বল্‌ল, "কেন, ওগুলো তো তারা।"

একবার ভাব্‌লাম বলবো না। কিন্তু লেখার যে আর শক্তিও নেই, সময়ও পাব না। রাণীর কোল থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে চাঁদটা দেখিয়ে বল্‌লাম, "ঐ যে দেখছিস্, চন্দ্রালোক ও-বড় সুন্দর। ও-দেশের বনে বনে, গাছে গাছে, লতায় পাতায় বার মাস সবুজের ছাউনি বোনা থাকে, পাখীদের অফুরন্ত গানের উৎসব কখনও শেষ হ'য়ে যায় না।

ও-দেশের মানুষ কেউ কুৎসিত নেই। জ্যোৎস্নার মত শুভ্র তাদের গায়ের রং। আর সকলের চেয়ে বেশী সুন্দরী ছিল যে, সে ছিল ঐ দেশেরই রাজকুমারী। চাঁদের দেশ ছাড়া আরও দশটা দেশের রাজাদের চোখের দৃষ্টি রাজকুমারীর আল্‌তা জড়ান পায়ের আশে পাশে ঘুড়ে মরত।

কিন্তু সবার চাইতে রাজকুমারীকে যে আপনার চোখে দেখেছিল,—যে তার জন্যে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করতে পারতো সে ছিল ঐ দেশেরই মালির ছেলে। এ খবর কেউ জানতও না, সেও মুখ ফুটে বলবার মত সাহস তার বুকের তিন পরদা খুঁজেও পেত না। তাই সে ছিল নীরব পূজারী।

কিছুক্ষণ ধরে রাণী যে একটু কেমন কেমন করছিল, হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, "না বিকাশদা, তুমি চুপ কর, তোমার যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

"আমাকে একটু কথা বলতে দে বোন্। দুদিন বাদে যে একেবারেই চুপ মেরে যেতে হবে। সেদিন যে ডেকে দেখেও উত্তর পাবিনে", বলতে ইচ্ছে হল, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে মুখ ফুটল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আর একটুখানি শোন।"

একদিন রাজকুমারী প্রচার করলেন, যে তাঁকে সব চেয়ে মূল্যবান একছড়া মালা দিতে পারবে, তিনি তাকেই স্বামীত্বে বরণ করবেন।

দেশ বিদেশ, আকাশ পাতাল খুঁজে রাজারা মণি মুক্তা চুনি পান্না হীরে জহরতে তাঁদের নাম খোদাই করে মালা উপহার পাঠাইলেন। সহস্র সহস্র কোটী টাকা ব্যয় হ'ল তাঁদের এ আয়োজনে।

গরীব মালির ছেলে খবর পেয়ে, বাগানের ঘাসের উপর পড়ে, একচোট প্রাণ খুলে কেঁদে নিল। সে যে বড্ড গরীব। তার যে কিছুই ছিল না। তবুও ধীরে উঠে, তার সবখানি মনপ্রাণ উৎসর্গ করে দিয়ে, সে একছড়া ফুলের মালা গাঁথল। কিন্তু রাজকুমারীকে পাঠাতে তার বুকের রক্ত রিম ঝিম করে, কেঁপে কেঁপে বেজে উঠছিল। খুব সাহসে ভর করে যখন সে রাজকুমারীর প্রকোষ্ঠের কাছে এসে দাঁড়াল। তখন সন্ধ্যার কালো পরদা, তার চোখে নিরাশার গভীর ছায়ায় আরও গাঢ় হ'য়ে উঠেছে।

দেশ বিদেশের রাজা-রাজড়াদের আগমনে রাজকুমারীর কামরা তখন স্বয়ম্বর সভা হ'য়ে উঠেছিল। তাদের বেশভূষার উজ্জল আলোকে ঘরের ভিতরটা ঝলমল করছিল। মালির ছেলে তার অবাধ্য অবশ পা দুটো ঠেলে কম্পিত হস্তে মালাটি নিয়ে রাজকুমারীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

রাজকুমারী মুহূর্ত্তের জন্য একবার উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। রোষে ক্ষোভে লজ্জায় তিনি কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত হয়ে রইলেন—তারপর মালাটী ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বহুদূরে। এত বড় দুঃসাহসের জন্যে, মালির ছেলের প্রাণ দণ্ড হ'ল সেই দিনই।

কিন্তু তারই হাতের গাঁথা, ঐ ছিন্ন মালার এক একটা ভ্রষ্ট কুসুমে হ'ল সহস্র সহস্র নক্ষত্রের সৃষ্টি। আজও ঐ ফুলগুলো, ঐ চাঁদটাকে ঘিরে মিটমিট্ করে হাসে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ মজুমদার।

মূর্ত্তি বদল।

—:০:—

(১)

অচিন্ আমি থাক্‌ব না আর আজ্‌কে,
ফেলব ছুঁড়ে নূতন থাকার লাজকে ;
অন্দরেরি আঁধার হ'তে,
ছুটব এবার নগর-পথে,
রাখ্‌ব তুলে গোপন ক'রে ধার করা মোর সাজকে।
নূতন প্রভাত আজকে।

(২)

সরিৎ হয়ে গিরির হিয়ায় বন্ধ,
চোখটী বুজে থাক্‌ব না আর অন্ধ ;
নামব এবার নামব সুখে,
লুটব উদার সাগর বুকে,
ফুলের মত ছড়িয়ে দেব স্বার্থ বিহীন গন্ধ।
থাকব না আর বন্ধ।

(৩)

থাক্‌ব না আর তুষার সম শক্ত,
শিরার মাঝে জমাট-অচল রক্ত ;
এবার তরল—সরল হয়ে,
নূতন ধারায় যাবই বয়ে,
হবই আমি মুক্ত দেশে মুক্ত বায়ুর ভক্ত।
থাকব না আর গুপ্ত।

(৪)

কারায় ত্যজি' পাড়ায় পাড়ায় ঘুর্‌ব,
হিয়ায় মম নূতন সুরে পুর্‌ব ;
অথির পুলক ঝলক আঁকি,
ঝল্‌সে দেবই দুখের বাণী,
জাগাব আজ নূতন গানে নূতন হবার গর্ব্ব।
পাড়ায় পাড়ায় ঘুর্‌ব।

(৫)

পানসী আমার ঘাটটী ছেড়ে আজ্‌কে,
তরীর মত যাবেই নদীর মাঝ্‌কে ;
পুরাণ ওই আকাশ-বাতাস,
নূতন আলোর দিচ্ছে আভাষ,
দিচ্ছে এঁকে মানস পটে নূতন আশার 'তাজ্‌'কে।
মানব না আর লাজ্‌কে।

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়

স্বদেশী।

—:*:—

রাশি রাশি বিদেশী খদ্দরে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। দেশ খদ্দর ব্যবহার করার দিকে ঝোঁক দিয়েছে, আমরা তাদের অভাব পূরণ করতে পারি নাই, কাজেই সুযোগ বুঝে বিদেশী বণিক মোটা খদ্দর বেচে দু পয়সা কামিয়ে নিলে, খদ্দরের সুতা পর্য্যন্ত আমদানী হয়েছে—খাঁটি খদ্দর আর নকল খদ্দর চিনে উঠা ভার, হায়রে মরা জাত "অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুখায়ে যায়।"

আমরা স্বদেশীকে, রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আহাম্মুখী করেছি। পরাধীন জাতির রাজনীতি অর্থে, রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ করা, স্বদেশী এই সংঘর্ষে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে আমরা খুব অল্প ফলই পেয়েছি, দেশের লোকে স্বদেশীর উপকারিতা বুঝেছে, কিন্তু কর্ম্মীর অভাবে শৃঙ্খলিতভাবে সকল কাজ সময়মত গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে না, পাঁচশ হাজার কর্ম্মী যখন কারারুদ্ধ, তখন অবস্থা যে শোচনীয় হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু স্বদেশীর সাফল্য চাই। দেশের সকল লোকই কিছু রাজনীতিসাধনায় যোগদান করেন নাই, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত, অনেক দেশসেবকই স্বদেশীর সাধনায় আত্ম-নিয়োগ কর্‌তে পারে, কিন্তু স্বদেশীর সাফল্য প্রার্থনা সকল শ্রেণীর লোকই করেন, আমরা এই স্বদেশী ব্রত সাধনের জন্য দেশে একদল লোকের অভ্যুত্থান দেখ্‌তে চাই।

দেশ আমাদের দরিদ্র। শ্রমজীবি যারা—হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, কোন গতিকে দুই বেলা দুই মুঠা অন্নসংস্থান যারা করতে পারে, ব্যারাম হলে ঔষধ পথ্যের যোগাড় আর হয়ে উঠে না; পরনে কাপড় জুটে না, ঘরের মটকা ছাইতে এক আঁটি খড় কেনবারও তাদের সামর্থ্য নাই, শুধু শ্রমজীবি কেন, দেশের মধ্য-বিত্ত-গৃহস্থ ভদ্র পরিবারও দারিদ্র্যের তাড়নায় কি যন্ত্রণা ভোগ করছে তা আর বলবার নয়, এই অবস্থায় চরকা চালিয়ে, প্রায় পাঁচকোটী বাঙ্গালীর বস্ত্র সরবরাহ করবার মত আমাদের সামর্থ্য হয়ে উঠ্‌লে, অনেক পয়সা দেশেই থাক্‌বে, এবং সেই অর্থ, দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, দেশের সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনবার

পঙ্গুই হচ্ছে, কৃষি আর বস্ত্রশিল্প, স্বদেশীর এই দুইটী হস্ত স্বরূপ। রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে, দেশের জীবন, সমস্যা মীমাংসা করতে এই বাহুদুটীকে শক্ত করে' তুলতে হবে, দেশের জীবন ইহারই উপর নির্ভর করেছ।

অর্থের চেয়ে কর্ম্মীর প্রয়োজন অধিক। নিঃস্বার্থ ত্যাগী দেশসাধক এই কঠোর কার্য্যভার মাথায় তুলে না নিলে, স্বদেশী ব্রত উদ্‌যাপন হবে না। উপস্থিত কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে, সে অর্থ, আমরা আশা করতে পারি ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে। আমরা শুনেছি, খুলনা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁহার হাতে আছে, তা ছাড়া, বাসন্তী দেবীও জানিয়েছেন, তাঁর পুত্র কন্যাগণকর্ত্তৃক সংগৃহীত ভারতসেবক ভাণ্ডারের নামে কিছু টাকা আছে, কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটিও ইহার জন্য অর্থ সরবরাহ করতে পারেন, এই সব অর্থ একত্র করে' একটা শক্ত কমিটি গোড়ে তুললে ভাল হয়। এবং খদ্দর প্রচারে যোগ্য লোকের হাতে যাতে টাকা পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। আমাদের মনে হয়, টাকার দায়িত্ব নিতে পারবেন যাঁরা, তাঁদের হাতেই টাকা দেওয়া উচিত, ইহাতে ব্যাপক কাজ আজই না হ'তে পারে, কিন্তু যেটুকু হবে, সেটুকু খাঁটি ও স্থায়ী কাজ হবে, কর্ম্মীর উপরেই কর্ম্মসাফল্য নির্ভর করেছে, টাকার উপরে নয়, কংগ্রেস কমিটি যথেষ্ট টাকা ব্যয় করেছে, কিন্তু তদনুযায়ী সর্ব্বত্র যে কাজ হয়েছে, এখন বিশ্বাস আমাদের হয় না।

মনে রাখতে হবে, এই স্বদেশী ব্রত যাঁরা নেবেন, তাঁরা রাজনীতিক সংস্রবে না থাকতেও পারেন, কংগ্রেস কমিটি, আমাদের যুক্তি হয়তো সমীচিন ব'লে গ্রহণ করতে না পারেন, আমরা চাই না, শুধুই উত্তেজনা, আর আন্দোলন, রাজনীতির একটা নেশা আছে, জ্বালা আছে, বিশেষ পরাধীন জাতির রাজনীতির মূল কথা Destruction, এই ধ্বংসনীতি বিপ্লব দিয়েই হোক আর অসহযোগ নীতির দ্বারাই হোক, উদ্দেশ্য, প্রচলিত রাজশক্তির উচ্ছেদ সাধন, অথবা ইহাকে ব্যর্থ করে' নূতন শাসন সংস্কারের প্রবর্ত্তন করা। বর্ত্তমানকে পরিবর্ত্তন ক'রতে গেলেই, একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে, এবং এই সংঘর্ষ হীন যে রাজনীতি, তা স্বপ্নের মত নিরর্থক। কাজেই স্বদেশীকে রাজনীতি থেকে পৃথক ক'রে দেখাই আমরা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে করি।

স্বদেশী সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে, শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে, স্বদেশীকে ফলপ্রসূ ক'রে তোলবার জন্য একটা ব্যবস্থা ক'রতে বলি, দেশের সকল শ্রেণীর লোক নিয়েই, ইহার

আলোচনা হউক ইহাই আমাদের ইচ্ছা, কংগ্রেস কমিটি, খিলাফত, সহযোগী, সকলেই, স্বদেশী ব্যবসা হিসাবে দেশে যাতে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে, তার দিকে মনোযোগ দিন, অন্ন সমস্যা মীমাংসা না হ'লে জাতি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে না, স্বদেশীর সাহায্যে আমরা স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠতে পারবো, অন্ততঃ নিজের হাতে কাজ ক'রে এই অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি।

দেশের দিক থেকে আমারা ইহার সাড়া চাই, নেতৃশক্তির দৃষ্টি যদি এই দিকে আকর্ষিত না হয়, দেশের তরুণ যাঁরা, তাঁদের এই গুরুভার মাথায় নিয়ে এগিয়ে দাঁড়াতে হবে, বাঙ্গালী চিরদিনই স্বদেশীর অগ্রদূত, স্বদেশী সাধন ব্রত বাঙ্গালীকেই পালন ক'রতে হবে, ইহার সাফল্য বাঙ্গালীর জীবনেই প্রতিফলিত হবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

'নবসঙ্ঘ'

মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্রে।

—:•:—

পুরাণে কাব্যে ইতিহাসে অনেক পুরুষের আমরা পরিচয় পাই, যাঁহারা সুপিতা, সুপুত্র, সুপতি, সুভ্রাতা ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা যশস্বীও হইয়াছেন। কিন্তু জগতে পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা মহত্তম বলিয়া বিদিত, তাঁহারা পারিবারিক কোন-না-কোন সম্বন্ধে আদর্শস্থানীয় ছিলেন বলিয়াই মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির ক্ষেত্র পরিবারের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াছিল। বুদ্ধদেব কিম্বা চৈতন্য সুপুত্র ছিলেন না, এমন নয়; সুপুত্র হওয়া যে অতীব বাঞ্ছনীয়, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বুদ্ধ, চৈতন্য

প্রভৃতি পুরুষরত্ন তাঁহাদের পরিবারের বাহিরের মানুষদের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহাদের যে হিতসাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা পূজনীয় হইয়াছেন। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সুকুমার শিল্পে যাঁহারা যশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে পারিবারিক কোন-না-কোন সম্বন্ধে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। ইহা তাঁহাদের প্রশংসার বিষয়, এবং ইহার বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা উপকৃত হইও তাঁহাদের মত হইতে অভিলাষী হই। কিন্তু তাঁহাদের প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁদের সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বা শিল্পবিষয়িণী কীর্ত্তি। যাঁহারা স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরও পারিবারিক জীবন শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তাঁহাদেরও অমর কীর্ত্তির ভিত্তি প্রধানতঃ তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিকতার উপরই স্থাপিত। ইহার কারণ এই, যে, পুরুষজাতীয় মানুষেরা প্রধানতঃ পিতা, পুত্র, পতি, বা ভ্রাতা রূপে বিচারিত হয় না, মানুষ বলিয়াই বিচারিত হন। তাঁহারা পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্য করিয়াই জনসমাজের দাবী হইতে নিষ্কৃতি পান না। মানুষেরা তাঁহাদের নিকট হইতে আরও কিছু চায়। তাঁহারা বিশ্বনিয়ন্তা ও বিশ্বনিয়মকে কি পরিমাণে জানিয়া পরব্রহ্মের সহিত কি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, নিজদের ও অপরের আত্মার কি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, দেশকে জাতিকে তাঁহারা কি দুঃখ দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাব্য চিত্র প্রভৃতি রচনা করিয়া তাঁহারা মানুষকে কি আনন্দ অনুপ্রাণনা ও শিক্ষা দিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা কি রহস্য উদ্ভেদ কি তত্ত্ব নিরূপণ কি সন্দেহের মীমাংসা করিয়াছেন, মানুষ তাহা জানিতে চায়।

আমরা আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য সভ্যতার জন্য কেবলমাত্র পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই ঋণী নহি, সমুদয় সমাজ, সমুদয় জগৎ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আমাদের শিক্ষক ও আনন্দদাতা। সুতরাং আমরা সকলেই নরনারীনির্বিশেষে সমাজের, দেশের, জাতির ও জগতের ঋণশোধ করিতে বাধ্য। ঈশ্বরদত্ত সমুদয় শক্তির সুব্যবহার করিলে আমরা কিয়ৎ পরিমাণ এই ঋণ শোধ করিতে পারি।

পুরুষ যেমন মানুষ, নারীও তেমনি মানুষ, পুরুষের যেমন আত্মা আছে, নারীরও তেমনি আত্মা আছে; পুরুষকে যেমন বিধাতা নানা গুণ ও শক্তি দিয়াছেন, নারীকেও তেমন

দিয়াছেন; পুরুষের যেমন পারিবারিক জীবন আছে, নারীরও তেমনি পারিবারিক জীবন আছে। কিন্তু পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র প্রধানতঃ পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নহে, পুরুষের মহত্ত্বের পরিচয় মানুষ প্রধানতঃ তাহার পারিবারিক জীবনে অন্বেষণ করে না—যদিও মহত্ত্বের বীজ খুঁজিলে এই পারিবারিক জীবনেই তাহা পাওয়া যায়।

পরিবারিক জীবনের বাহিরে নারীরও কীর্ত্তি আছে। রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে স্বদেশ-বাৎসল্যপ্রণোদিত আত্মোৎসর্গ ও শৌর্য্য, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ও সুকুমার শিল্পে, ব্রহ্মজ্ঞানে ও ভগবদ্ভক্তিতে কেবল যে পুরুষদেরই কৃতিত্ব ও খ্যাতি আছে তাহা নহে, মহিলারাও এই সকল বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তথাপি, ইহা বলিলে অসত্য বলা হয় না, যে নারীরা প্রধানতঃ তাঁহাদের পারিবারিক জীবন দ্বারাই বিচারিত হন। কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াও তাঁহারা মানবসমাজের জন্যও কিছু করিতে পারেন। অনেক নারী তাহা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা একটা অনুমান, মত, বা অভিলাষ মাত্র নহে; ইহা বাস্তব সত্য। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া তাহার পর জগতের সেবা করা নারীরও যে কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, পুরুষদের মত তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, সভ্যতা ও আনন্দের জন্য পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ভিন্ন জগতের নিকটও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ঋণী; এবং এই ঋণ শোধ করা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, ভগবান্ নারীদিগকেও আত্মা দিয়াছেন এবং নানা গুণ ও শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও এই সকল গুণ ও শক্তির সদ্ব্যবহার করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পুরুষেরা যত রকম কাজ করেন, মহিলাদের সেই সমস্তই করা উচিত, আমি তাহা মনে করি না। কিন্তু এই প্রবন্ধে সকল রকম কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা না করিয়া আমি সাধারণ ভাবে কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, জগৎকে আনন্দ, অনুপ্রাণনা ও শিক্ষা দিবার জন্য মানবের দুঃখ দুর্গতি মোচনের জন্য পুরুষেরা যত রকম কাজ করেন, মহিলারাও তাহা করিতে পারেন, এবং তাহা করা তাঁহাদের উচিত।

পুরুষদের সম্বন্ধে কেহ একথা বলেন না, যে, বালকদিগকে ভবিষ্যতে গৃহস্থ হইতে হইবে, পতি ও পিতা হইতে হইবে, অতএব তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে এরূপ শিক্ষাই প্রধানতঃ দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সুপতি সুপিতা হইতে পারে। ইহা ঠিক্ যে

অধিকাংশ পুরুষ বিবাহ করে ও করিবে, সুতরাং তাহাদের সুপতি হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনেই পুরুষদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না। সমাজ এত সহজে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেয় না।

প্রধানতঃ পারিবারিক জীবনের দ্বারাই নারীরা বিচারিত হন বলিয়া, যাঁহারা বালিকাদের শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন তাঁহারাও বলেন, যে, তাহারা যাহাতে সুগৃহিণী, সুপত্নী ও সুমাতা হইতে পারেন, তাহাদিগকে প্রধানতঃ এইরূপ শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। বিস্তৃত ভাবে এই বিষয়টির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি মোটামোটা জানাইতেছি, যে, সন্তান পালনে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সময়, শক্তি, ও হৃদয়ের বিত্ত অধিক ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক ও উচিত, এবং তাহা বিধাতার অভিপ্রেত বলিয়া মনে করি। কারণ, তদ্ব্যতিরেকে শিশুরা মানুষ হইতে পারে না। পিতা, পুত্রকন্যাদিগকে মানুষ করিবার জন্য যতটুকু সময় ও শক্তি ব্যয় করেন, মাতার ততটুকু করিলে চলে না। পুত্রকন্যাদের জন্য সানন্দে অধিকতর পরিমাণে আত্মোৎসর্গ মহিলাদের পক্ষে ঈশ্বর যে স্বাভাবিক করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে। এই আত্মোৎসর্গ তাঁহাদিগকে পূজনীয় করিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, পারিবারিক কর্ত্তব্য ছাড়া মহিলারা সমাজের, দেশের ও জগতের কাজও অনেক করিতে পারেন। ইচ্ছা থাকিলে সময় ও শক্তির অভাব ঘটে না ; কারণ গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্ত্তব্য সাধনে সমভাবে নিষ্ঠাবতী মহিলা ভারতে ও অন্য দেশে আছেন তা ছাড়া, আমরা ত সকলেই মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবার এমন অনেক জানি যাহার মহিলারা গার্হস্থ্য কাজও বিশেষ কিছু করেন না, আলস্যে খেলায় ও গল্পগুজবে কাল কাটান। সময় ও শক্তির অভাবে তাঁহারা দেশের ঋণ শোধ করেন না, একথা ত বলিবার জো নাই।

নারীর মাতৃত্ব তাঁহার একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্ম্ম, ও স্বরূপ ; কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ নহে। পুরুষ যেমন আত্মা, নারীর ও তেমন আত্মা। পুরুষ যেমন মানুষ নারীও তেমন মানুষ। আমরা নারীর নিকট অবশ্যই এই আশা করিব, যে, তিনি সুকন্যা, সুভগিনী, সুপত্নী, ও সুমাতা হইবেন ; অবশ্যই এই আশা করিব, যে, তিনি নারী-

প্রকৃতির সমুদয় সদ্‌গুণে ভূষিত হইবেন। কিন্তু এ আশাও করিব, যে, তিনি মহৎমানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইবেন, সেই সব গুণ ও শক্তির বিকাশ তাঁহাতে হইবে যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি, সেই সব কাজ তিনি করিবেন যাহা লোক-শ্রেয়ঃ সাধনার্থ ও জগতের ঋণ পরিশোধার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে পারেন এবং উভয়েরই কর্ত্তব্য, সেই সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহার হইবে, যাহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হয় ও হইতে পারে, কেন-না উভয়েই জীবাত্মা এবং উভয়ের সহিতই পরমাত্মার একই প্রকার সম্বন্ধ। এই হেতু, আমি মনে করি বালকবালিকা পুরুষনারী উভয়েই মানুষ বলিয়া তাঁহাদের শিক্ষা অনেক বিষয় একই রকমের ও কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের, এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা অনেকটা একই রকমের ও কতকটা ভিন্ন রকমের হওয়া আবশ্যক।

আমার বিশ্বাস এইরূপ হইলেও যাঁহারা মাতৃধর্ম্ম পালনেই নারীদিগকে আবদ্ধ রাখিতে চান, তাঁহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে চাই না। তাঁহাদেরই কথা মানিয়া লইয়া কিছু বলিতে চাই।

সুমাতা বলিতে আমরা কি বুঝি? সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর যিনি শিশুটিকে সুস্থ ও সবল রাখিতে পারেন, এবং যিনি তাহার হৃদয়মনকে সদ্‌গুণসমূহে ও জ্ঞানে ভূষিত করিতে পারেন, তিনি সুমাতা। কিন্তু যদি শিশুর মাতা, পিতামহী, মাতামহী, পিতা, পিতামহ, মাতামহ সুস্থ সবল ও জ্ঞানেগুণে মণ্ডিত না হওয়ায়, শিশু অসুস্থ দেহ ও অসুস্থ অন্তরিন্দ্রিয় লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে তাহার দীর্ঘজীবী হইবার ও মানুষের মত মানুষ হইবার সম্ভাবনা কি পরিমাণে আছে, সমাজতত্ত্ববিদেরা তাহার বিচার করিবেন। বস্তুতঃ যে তরুণী শিশুর জননী হন, শিশুটির কল্যাণ শুধু তাঁহার উপর নির্ভর করে না। শিশুটির পিতৃকুল মাতৃকুলের উৎকর্ষ প্রতিবেশীদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ এবং জন্মভূমির স্বাস্থ্যকরতা বা অস্বাস্থ্যকরতার উপর, ভূমিষ্ঠ হইবার আগে হইতেই, তাহার কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করে। অতএব শিশুটি জন্মগ্রহণ করিবার আগে হইতে এবং তৎপরে পরিবারের মধ্যে সুমাতৃত্ব চাই। শিশুর কল্যাণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করার নাম সুমাতৃত্ব। পরিবারের মধ্যে রোগের সঞ্চার নিবারণ, পরিবারকে সুস্থ সবল জ্ঞানবান্ সদ্‌গুণশালী করিবার ও রাখিবার উপায় বিধান, সুমাতৃত্বের কাজ। আমরা যদি নিজের ঘর বাড়ী খুব পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন রাখি, কিন্তু পাড়া, গ্রাম, নগর, দেশ মহাদেশ অস্বাস্থ্যকর বা মহামারীগ্রস্ত হয় তাহা হইলে রোগের বীজ আমাদের বাড়ীতেও আসিতে পারে। সুতরাং শিশুর দেহবিষয়ে সুমাতৃত্ব তাহার কাম্‌রা, পরিচ্ছদ, খাদ্য ঘরবাড়ীতেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, সুমাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র গৃহস্থালীর বাহিরেও বিস্তৃত না হইলে গৃহস্থালীর মধ্যে উহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহা যে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যসম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে। হৃদয় মনের পক্ষেও ইহা সত্য। আমরা শৈশব হইতে কেবল পুস্তক হইতে বা শিক্ষক ও গুরুজনের মুখ হইতেই শিক্ষালাভ করি না; পাড়া প্রতিবেশী দেশবাসী বিদেশী সকলের নিকট হইতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা পাই, সুগুণ দুর্গুণ আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। খুব চরিত্রবান্ পরিবারের শিশুরাও ভৃত্যদের ও পাড়াপড়সীর শিশুদের সংশ্রবে কুকথা শিক্ষা করে ও কুকার্য্যে অভ্যস্ত হয়। শিশুর সমুদয় মানসিক পরিবেষ্টন তাহার জ্ঞান ও সুগুণলাভের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। এই দিকে দৃষ্টি রাখা ও তাহার ব্যবস্থা করা সুমাতৃত্বের কাজ।

সবাই সুখী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না, সকলে জ্ঞানী না হইলে কেহই মূর্খতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইতে পারে না, সকলে নীরোগ না থাকিলে কেহই সংক্রামক ব্যাধির সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে পারে না, সকলে যথেষ্ট ভোজনে পুষ্ট না হইলে অতি ধনীও দারিদ্র্য জনিত সংক্রামক রোগের কবলে পড়িতে পারে; সকলে নীতিমান্, সচ্চরিত্র এবং চিন্তা ভাব কল্পনা কথা কাজ ও ভঙ্গীতে শুচি না হইলে সাধুব্যক্তিদেরও শুচিতা ম্লান হইয়া যায়। এই সব কথা প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের জীবনে অধিকতর সত্য। তাহাদের দেহ ও মনে কল্যাণের কারণ প্রাপ্তবয়স্কদিগের অপেক্ষা অধিক সহজে সংক্রামিত ও সঞ্চারিত হয়। এই জন্য সন্তানের জননীরা কেবল নিজের শিশুগুলির দেহমন আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদিগকে নিজের গৃহস্থালীতে মা হইতে ত হইবেই, পাড়ার, সমাজের, দেশের, জগতের সুমাতৃত্বের কাজ তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া করিতে হইবে।

এই ব্যাপক, ব্যাপকতর ও ব্যাপকতম মাতৃত্ব নানাবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা এবং সাধনা সাপেক্ষ। রান্নাবাড়া ও কাপড় সেলাই করা খুব দরকারী কাজ। কিন্তু শুধু তাহা

জানিলেই, বাহিরের জগতের দূরে থাকুক, নিজের শিশুদেরও মাতৃত্ব করা যায় না। তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারা ত চাই-ই অধিকন্তু তাহাদের ন্যায্য স্বাধীনতাতে হাত না দিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানী, সাহসী, পরার্থপর, পবিত্রচেতা হইবার সুযোগ দেওয়া চাই। এরূপ মাতৃত্ব সহজলভ্য নহে, স্বভাবাসিদ্ধও নহে।

অতি দূরের অমঙ্গল কেমন করিয়া আমাদের শিশুদের পক্ষে সাংঘাতিক হয়, তাহা একটু ভাবিলেই আমরা স্থির করিতে পারি। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে। উহার আধুনিক আক্রমণের উৎপত্তি নাকি স্পেন দেশে হইয়াছিল। তাহা ইউরোপে; অথচ সুদূর বাংলা দেশের কত গ্রাম উহাতে প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। এইরূপ মহামারী উন্মূলন একটি পাড়া, গ্রাম, নগর, জেলা, প্রদেশ বা দেশের লোকের দ্বারা হয় না; অন্তর্জাতিক চেষ্টা চাই। তাহার মূলে কাজ করিবে অন্তর্জাতিক সুমাতৃত্ব।

মাতৃত্বের ব্যাপকতম ক্ষেত্র সূচিত হওয়ায় কোন জননীর ভীত বা হতোৎসাহ হইবার কারণ নাই। বিশ্বে সূর্য্যের কাজ আছে, আবার পর্ণকুটীরের তমোনাশক মাটীর প্রদীপেরও কাজ আছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুসারে কাজ করিলে তাহাতেই তাঁহার ও বিশ্বের মঙ্গল। যাঁহার মাতৃত্ব কেবল তাঁহার নিজের গৃহে আবদ্ধ, তাঁহার আত্মোৎসর্গের নৈবেদ্য ও বিশ্বজননী গ্রহণ করেন। কিন্তু এরূপ জননী কেহ আছেন কি, যিনি অন্ততঃ নিজের পাড়াটির স্বাস্থ্য ও নৈতিক শুচিতার জন্য কিছু করিতে পারেন না?

মাতৃত্বের ব্যাপকক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে মাতৃজাতীয়াদিগকে দলবদ্ধ হইতে হয়। পৃথিবীর নানা দেশের মহিলা-সভা লইয়া অনেকগুলি মহিলা-সমিতি আছে। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সুরাপান দূর করা এইরূপ একটি সমিতির উদ্দেশ্য।

সমস্ত পৃথিবী মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র বটে; কিন্তু এই ব্যাপকতম ক্ষেত্রে মাতৃত্ব করিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিলে চলিবে না। জননীরা নিজের নিজের শিশুদের শরীর মন আত্মার পুষ্টি, স্বাস্থ্য পবিত্রতা ও আনন্দ বিধানের জন্য যাহা যাহা চান, হাতের কাছের আরও যতগুলি সম্ভব শিশুর জন্য তাহার আয়োজন করিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ করিলে মাতৃত্বের আলোক জীবন-পথ আলোকিত করিবে। সেই আলোকে চলিতে চলিতে মাতৃত্বশক্তি বাড়িবে। তাহাতে নিজের এবং অন্যের শিশুদের মঙ্গল হইবে।

মাতৃত্ব কেবল যে শিশুদের জন্য তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও বটে। যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ তাপ মলিনতা, মায়ের মঙ্গলহস্ত সেখানেই কাজ করিবে।

অনেকে ভাবিতে পারেন, জগতে পুরুষকর্ম্মী থাকিতে মহিলাদের উপর ডাক পড়ে কেন? ইহার সোজা উত্তর এই যে, এই পৃথিবী একটি বৃহৎ পরিবারের গৃহস্থালী। ক্ষুদ্র গৃহস্থালীকে যেমন পুরুষ কর্ত্তা কেবল পুরুষ সহায়কদের সাহায্যে আনন্দনিকেতন ও মঙ্গলালয় করিয়া তুলিতে পারেন না, নারীর হৃদয় ও নারীর শক্তির সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয়, তেমনই জগতের ইতিহাসে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে পুরুষ একা জগতের শুচিতা, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতে পারে নাই, নারীর হৃদয় ও নারীর শক্তিকে জগতের ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপকতম ক্ষেত্রেও তেমনি মাতৃত্ব করিতে হইবে। অনেক দেশে প্রধানতঃ নারীদের সমবেত চেষ্টায় ঔষধার্থ ভিন্ন সুরার উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিবারিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ নারী শিশু সকলের কল্যাণ হইয়াছে; সৈনিকদের স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের চরিত্রভ্রংশ সুতরাং কতকগুলি অভাগিনী নারীর সর্ব্বনাশ একান্ত আবশ্যক, এই ধারণা ও তদনুরূপ নারকীয় ব্যবস্থা শ্রীমতী জোসেফিন্ বাট্‌লার প্রমুখ মহিলাদের প্রযত্নে উন্মূলিত হইয়াছে; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা যে উচ্ছৃঙ্খলতায় অভ্যস্ত হয়, তাহার ফলে সভ্যদেশ সকলে যে সব করাল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যুদ্ধের উচ্ছেদই যে তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রতীকার, এই বিশ্বাসও মাতৃজাতীয়াদের সমবেত চেষ্টায় বদ্ধমূল হইতেছে; অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তা মহিলাদের চেষ্টায় শিশু কল্যাণ প্রচেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে, এবং বিনা ব্যয়ে সূতিকাগার এবং প্রসূতিদের সেবা শুশ্রূষা ও খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশুদের ও বালকবালিকাদের যথেষ্টসংখ্যক ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থাও অনেক দেশে মাতৃজাতিদের চেষ্টায় হইয়াছে।

পুরুষেরা হাজার হাজার বৎসর সকল ক্ষমতা ও সুযোগের অধিকারী থাকিয়াও এই সকল দিকে যথেষ্ট মন দিতে পারেন নাই। পুরুষহৃদয় বাস্তবিকই প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির জন্যই নারীহৃদয় অপেক্ষা অধিক ব্যগ্র কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হয়, যে আপনা ভুলিয়া প্রীতি-দয়া-সেবা দিয়া অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি উপেক্ষিতকেও রক্ষা করা মাতৃহৃদয়ের কার্য্য। এই মাতৃবৎ হৃদয় অনেক পুরুষেরও থাকিতে দেখা গিয়াছে।

এই মাতৃহৃদয়ের কাজ গৃহে ও গৃহের বাহিরে রহিয়াছে। মাতৃজাতীয়ারা যাহাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, কেবল যে তাহাদেরই মাতৃত্ব করিতে পারেন, তাহা নহে; অপরেরও পারেন। আবার যাঁহারা দৈহিক অর্থে মাতা হন নাই, তাঁহারাও বহু শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের কারণ হইয়া প্রকৃত মাতৃপদবাচ্য হইতে পারেন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
"নব্যভারত,"—বৈশাখ, ১৩২৯।

দলাদলির গান।

[রচনা—শ্রীদিল্‌দরিয়া শর্ম্মা]

ডল্ বেঁধেছি, ডল্ বেঁধেছি, বল্ বেঁধেছি ভাই;
আমাদের এই ডলে ডাড়া ডলাডলি নাই।
আমরা করি গলাগলি— প্রেম-আবেগে ঢলাঢলি;
নেশার ঝোঁকে আছি কিন্তু টলাটলি নাই।
আমরা খাঁটি, নই ক মেকি— মস্ত সমজ্‌দার্;
হিমালয়ের চাইতে উঁচু বুদ্ধির অহঙ্কার;
আমরা জাতি-সমালোচক, বিজ্ঞ এবং সুবিবেচক;—
এ খোঁয়াড়ে 'পেয়ার্' ছাড়া নাই-ক কারো ঠাঁই!
আমরা যশের ফেরি-ও'লা— হাঁক্‌ছি দ্বারে দ্বার;
পেশা মোদের লেখক্-পেষা দলের যা'রা বা'র;
আমরা ক' ভাই নই-ক যা' তা' উঠ্‌ছি ফুঁড়ে ব্যাঙের ছাতা;—
অধঃপাতের অথই তলে তলিয়ে মোরা যাই!

এত দিনেও মিলায় নি'ক মোদের গলায় দাগ,
প্রাণের ব্যথায় রঙিন হয়ে জাগ্‌ছে অনুরাগ।
সোণার কাঠির পরশ্‌ পেয়ে আবাক হয়ে দেখ্‌চি চেয়ে,—
শ্রীচরণের ছুঁচো হ'য়ে কিচির্‌ মিচির্‌ গাই ॥

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফের্তা।

আস্থায়ী।

দাদরা।

১´ ০ ১´ ০
II{র্সা -া পা | পা পা । I ণা -া মা | মা মা । I
ড ল্ বেঁ ধে ছি ০ ড ল্ বেঁ ধে ছি ০

১´ ০ ১´ ০
I রা -া গা | মা পা । I গা -া -া | -মা । ।
ব ল্ বেঁ ধে ছি ০ ভা ০ ০ ই ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I না না -া | ননা নর্না । I র্সা র্রা -া | না র্সা । I
আ মা ০ দের্‌ এই ০ ড লে ০ ডা ডা ০

১´ ০ ১´ ০
I গা মা -া | পা র্সা -ণা I ধা -া -পা | -ধা । । }I
ড লা ০ ড লি ০ না ০ ০ ই ০ ০

জলদ একতালা।

২´ ৩ ০ ১
I{মা -া মা | গা রা -গা I গা মা পা | পা -া -া I
আ ম্ রা ক রি ০ গ লা গ লি ০ ০

২´　　　৩　　　০　　　১
I　গা -া মা | ধা ধা -া | পা র্স´ণা ণা | ধা -া -া }I
প্রে ম্ আ　বে গে ০　ঢ লা০ ঢ　লি ০ ০

দাদরা।

১´　　০　　১´　　০
I　না না -া | ধা -না না I র্সা র্রা -া | না -র্সা র্সা I
নে শা র্　ঝোঁ ০ কে　আ ছি ০　কি ন্ তু

১´　　০　　১´　　০
I　গা মা -া | পা ধা -া I -গমা পধা -র্সা | -ণা -ধা । II
ট লা ০　ট লি ০　০০ না০ ০　০ ই ০

অন্তরা।

দাদরা।

II{র্সা -া র্সা | ণা -ধা ধা I মা -া পধা | গা -মা মা I
আ ম্ রা　থাঁ ০ টি　ন ই ক০　মে ০ কি

১´　　০　　১´　　০
I　গা -া মা | পা র্সা -ণধা I ধা -া -া | -া । । I
ম স্ ত　স ম ০ন্　দা ০ ০　র্ ০ ০

I　না র্সা -ণা | ধা পা -া I মঃ -া মগা | রা রা -া I
হি মা ০　ল য়ে র্　চা ই তে০　উঁ চু ০

১´　　০　　১´　　০
I　সা -ররা -া | মা পা -া I ধা -পা -ধা | -রা । । }I
বু দ্ধি র্　অ হ ঙ্　কা ০ ০　র্ ০ ০

জলদ একতালা।

২´ ৩ ০ ১
I{র্সা -া র্গা | র্রা র্রা -া | র্সা র্সা -া | না না -া I
আ ম্‌ রা জা তি ০ স মা ০ লো চ ক্‌

২´ ৩ ০ ১
I পা -া ধা | না না -র্সা | ধা -া র্রা | না র্সা -া }I
বি ০ জ্ঞ এ ব ং সু ০ বি বে চ ক্‌

দাদরা।

১´ ০ ১´ ০
I র্সা -া র্গা | র্গা র্মা -া I র্গর্রা র্রা -া | নর্সা র্সা -া I
এ ০ খোঁ য়া ড়ে ০ পে০ য়া ব্‌ ছা০ ড়া ০

১´ ০ ১´ ০
I গা -া মা | পা ধা -া I গমা -পধা -র্সণা | -ধা -া I II
না ই ক কা রো ০ ঠাঁ০ ০০ ০০ ০ ই ০

সঞ্চারী।

জলদ একতালা।

২´ ৩ ০ ১
II{মা -া মগা | গা রগা -া | রা গমা পা | পা -া -া I
আ ম্‌ রা০ য শে০ র্‌ ফে রি০ ও' লা ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I রা -া মা | পা -র্সা ণা | ধা -পা -ধা | -া -া I }I
হাঁ ক্‌ ছি দ্বা ০ রে দ্বা ০ ০ ০ র্‌ ০

দাদরা।

১´ ০ ১´ ০
I{না না -া | নধা না -া I র্সা র্রা -া | না র্সা -া I
পে শা ০ মো০ দে র্‌ লে খ ক্‌ পে ষা ০

১´　　০　　১´　　০
I গা মা -া | পা র্সা -ণা I ধা -া -া | -া । । }I
দ লে র্ যা রা ০ বা ০ ০ র্ ০ ০

জলদ একতালা।

২´　　৩　　০　　১
I{না -র্সা র্সণা | ণা ধা -া | মপা মা পা | -মা গা -া I
আ ম্ রা০ ক' ভা ই ন ই ক থা ০ তা ০

২´　　৩　　০　　১
I সা -সনা সা | গা -া গা | মা পপা হ্মা | -পা পা -া }I
উ ০ঠ্ ছি ফুঁ ০ ড়ে ব্যো ঙের্ ছা ০ তা ০

দাদরা।

১　　০　　১´　　০
I{র্সা র্সা -ণা | ধা ধা -মা I মা ধা -া | মা মা -গা I
অ ধ : পা তে র্ অ থ ই ত লে ০

১´　　০　　১´　　০
I সা নন্া সা | গা -মপা হ্মপা I পা -া -া | -া । । }I
ত লি০ য়ে মো ০ ০ রা০ যা ০ ০ ই ০ ০

আভোগ।

জলদ একতালা।

২´　　৩　　০　　১
I -গমা মা -া | পা না -নর্সা | না র্সা -া | না -ননা পা I
০এ ত ০ দি নে ০ও মি শা য় নি ০০ ক

২´　　৩　　০　　১
I গা মা -া | পা নর্সা -া | না -র্সা -া | । -া । I
মো দে র্ গ লা০ য় দা ০ ০ গ্ ০ ০

২´
I র্সা গা -া | র্গা র্মা -া র্গা র্ম্া -া | র্সা -া না I
প্রা ণে র্ ব্য থা য় র ঙি ন্ হ ০ য়ে ·

২´ ৩ ০
I গা -া মা | পা না -র্সা না -র্সা -া | -া ׀ ׀ }I
জা গ্ ছে অ সু ০ রা গ্ ০ ০

দাদরা।

I{র্সা নর্সা -া | ণা ধা -া I মা পা -া | মা -া গা I
সো ণা০ র্ কা টি র্ প র শ্ পে ০ য়ে

১´ ০ ১´ ০
I রা সা -া | মা গা ׀ I ম্া -া পা | ম্াগা পা ׀ }I
অ বা ক্ হ য়ে ০ দে খ্ ছি চে০ য়ে ০

I{র্সা -র্গা র্গা | র্রা র্রা -া I র্সা র্সা -া | ণা ধা -া I
শ্রী ০ চ র ণে র্ ছুঁ চো ০ হ য়ে ০

I গা মা -া | পা ধা -া I গমা -পধা -পর্সা | -ধণা -ধা ׀ }II II
কি চি র্ মি চি র্ গা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই ০

শিক্ষাসমস্যা।

আজকাল দাঁড়িয়েছে শিক্ষা সমস্যাটা একটা জটিল সমস্যা। আমাদের অদৃষ্টে যা ছিল, যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে এখন এ দেশটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এর ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে এমন একটা বিদ্যা দেওয়া চাই যার হেকমতে তারা পরের পায়ে না হেঁটে নিজের বলে নিজকে ও দেশটাকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ত ভারতে যা শিক্ষনীয় হওয়া উচিত তার দিকে,—দেশকাল ও দেশবাসীর অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল বিদ্যা শিক্ষা দিয়েই সিদ্ধ হ'তে চেয়েছেন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের বিদ্যালয় রূপে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন, তার ফলে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় অপ্রয়োজনীয়,—বিশ্বের পক্ষে হয়তো অতি প্রয়োজনীয় এমন সমস্ত বিষয়ের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যাতে ক'রে গরীব দেশের পক্ষে শিক্ষাটা হয়েছে মহার্ঘ্য। শুধু তাই নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবককে ভবিষ্যৎ আশার স্বপ্নে দস্তুর মত উন্মত্তবৎ করে তুললেও বাস্তব জগতে তাকে বুঝতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তার জীবনের অন্যউন্নতি যতটুকু করুক না কেন আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন খুব কমই বরং তার পৈতৃক অর্থের অপব্যবহার করান নাই কম। শিক্ষা, এই ছার পার্থিব অর্থ হতে হয় ত তাকে এমন জিনিষ দান করেছে, যা কল্পনার চক্ষে,—আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে খুব বড় জিনিষ কিন্তু সংসারে সে পুঁথিগত বিদ্যা অচল। দেশের কল্যাণের জন্য এই বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত হওয়া হয় ত দু'এক জনের আবশ্যক কিন্তু সমগ্র জাতিকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনধারণের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জনে অভাব মোচনের উপায়: যদি না হয় তা হলে সে শিক্ষা যে পণ্ড, তা আজ আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাল করে প্রমাণ করেছেন, এর জন্য আর যুক্তিতর্কের নিষ্প্রয়োজন।

বেশী দিনের কথা নয় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ব্যবস্থার সঙ্গে এর বর্ত্তমান অবস্থা ব্যবস্থার তুলনা করলে বেশ বুঝা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ কাল

পাত্রের দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল নানাবিধ বিদ্যার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করতে গিয়ে নিজেও এমনি দেউলে হয়ে পড়েছেন, শিক্ষার ব্যয় বাহুল্য পূর্ব্বাপেক্ষা এমন বাড়িয়ে তুলেছেন যে সন্তানগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত করে বের করে আনতে দেশবাসীকেও সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে, অথচ এই বিশ্বের মহামন্দিরের গণ্ডীর বের হয়ে এসেই সেই শিক্ষিত যুবককেই দেখতে হচ্ছে জীবনধারণোপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অন্ধকার! লোকে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য লালায়িত হলেও আজ চরমে এসে তাদের বুঝতে হয়েছে এরূপ উচ্চ শিক্ষা তাদের রক্ষা করতে পারবে না। তারা চাইছে তাই এমন শিক্ষা যাতে তাদের রক্ষা করতে পারে; দেশের ছেলে দেশের জিনিসে দেশের ভাবে তুষ্ট পুষ্ট হয়ে দেহ ও মনকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। হয় ত তাতে না হতে পারে তাদের উচ্চস্তরের শিক্ষা;—ধী, জ্ঞান, মনীষার পরম ও চরম বিকাশ কিন্তু দেহটা যে সেই শিক্ষায় বাঁচবে। দেশ চায় এখন হাতে কলমে, হালে হাতিয়ারে, এমন শিক্ষা পেতে যাতে করে নিজেরাই পূরণ করতে পারে নিজেদের দৈনন্দিন অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশ্বের উপযুক্তই থাক্ তাতে আমাদের ক্ষতি নেই বরং সেটা গৌরব করবারই; দেশের দু'চার জন তাতে শিক্ষিত হয়ে সুপণ্ডিত হয় হক, শ্লাঘার কথা কিন্তু দেশ সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রার্থনা করে এমন শিক্ষাপদ্ধতি যা দান করতে পারে সর্ব্বসাধারণকে এমন বিদ্যা যে বিদ্যা সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত ও যাতে করে দেশের অভাব পূরণের সঙ্গে দেশের আর্থিক, নৈতিক ও স্বাস্থ্যাদির উন্নতি সাধিত হয়।

মনের উন্নতিসাধন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলেও দেহের উন্নতি ওর দ্বারা সাধিত না হয় যদি তা হলে মূলেই যে ভুল হয়ে যায় কারণ দেহীর দেহরক্ষা না হলে তার কিছুই রক্ষা হয় না, সংসারের অন্যান্য সুখের কথা ত আছেই সেগুলির ব্যবস্থা হবার পূর্ব্বেই শরীর রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস প্রভৃতির উন্নতি সাধন করে ছাত্রজীবনের দিন কটা স্বাস্থ্যের অনুকূল করে তুলতে চেষ্টা করেন নাই বললে মিথ্যাই বলা হবে কিন্তু বিদ্যালয় হতে যখনই তাদের দূরে দাঁড়াতে হবে তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত্তা ছাত্রদের অতিরিক্ত মানসিক শ্রমদুষ্ট অসুস্থদেহেও দুটো অন্নের জন্য কিরূপ কদর্য্য আহারে তুষ্ট থাকতে হবে সেকথা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমন্থন করেও বুঝে উঠতে পারেন নি। কল্পনায় তাঁরা

সেটাকে অতি সুখের বলে ভেবে নিয়েছেন বাস্তব জগতে দেখা যাচ্ছে সেটা আকাশ-কুসুম বিনে আর কিছুই নয়। কথাটা স্পষ্টকরে বলতে গেলে ভয় হয় সত্য কিন্তু কথাটা যে ঠিক সেকথা ঠেকে বুঝতে হয়েছে ;—যেবিদ্যা নিজের বলে অর্থ দিতে না পারে সে বিদ্যার গৌরব সংসারে নেই যত দিন বি-এ, এম-এ, যে কারণেই হক অর্থ দিতে পেরেছে সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক ছিল তত দিন ছিল ঐ ডিগ্রীগুলির গৌরব, দেশের লোকের ছিল ঐগুলি পাবার জন্য অদম্য উৎসাহ। এখন সেই উপাধিগুলিই যেমন দিতে পারছেনা অন্ন তখন লোকের মনও হয়ে গেছে ভিন্ন। এখন এমন একটা বিদ্যা যাতে দিতে পারে অর্থ, সেটা যদি উচ্চ-বিদ্যা হিসাবে হীনও হয় সেটার গৌরবই এদেশে বেশী। এই জন্যে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাইনেটা যদি বেশ মোটা হয় এমন অনেক কাজ আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা করছেন সেটা হয়ত ত্রিশ বছর পূর্ব্বে করতে হলে তাঁরা নিজকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা অর্থ-উপার্জ্জনের সহায়ক বলে বিবেচিত হওয়াতেই না অমন উন্নত বিদ্যাগুলিও হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের মনের দাস-ভাব পরিপুষ্টির উপকরণ। বিদ্যার সার্থকতা ব্যর্থ করে, কেবল বিদ্যালব্ধ উপাধির জোরে চাকুরী দাসত্বলাভের জন্যেই শিক্ষিত যুবক লাঞ্ছিত হয়ে সমস্তই করে দিয়েছেন পণ্ড। ডেপুটিগিরি বা অমন চাকুরীগুলির উমেদারদের অবস্থা ও ঐ সকল দেবদুর্ল্লভ চাকুরীগুলির হস্তগত করবার ব্যবস্থার মূলে, শিক্ষা অপেক্ষা তৈলদানের, অবিদ্যার প্রসার বিদ্যমান আছে তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। তথাপি তথাকথিত মুরুব্বিদিগের পদে অঞ্জলি দিয়েও, নিজকে অত বড় হীন করেও ঐ চাকুরীগুলি প্রকৃতই হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি দুর্ল্লভ। হক ক্ষতি নাই কিন্তু এই অবস্থারা শিক্ষাকে ব্যর্থ করে মানুষের মনকে এমন হেয় করে দিচ্ছে যাতে করে মনে হয় এ উচ্চশিক্ষা দাস-ভাবের দীক্ষা মানুষ জীবনে না পেলেই মঙ্গল। এত হতে যে শিক্ষায় দেশের লোক অন্নে তুষ্ট অন্নে পুষ্ট হয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে, অভাবের তাড়নায় নিজের মনকে পরের পায়ে লুটিয়ে না দেয়, অভাবে অপকর্ম্ম না করে, সে শিক্ষা উচ্চ অঙ্গের না হক বর্ত্তমানে এদেশে প্রয়োজন।

শিক্ষিত হক সকলেই, শিক্ষা স্বাবলম্বী করুক সকলকে। আক্ষরিক-শিক্ষার প্রয়োজন যে সকলেরই আছে সে বিষয় আর কিছুতেই সন্দেহ থাকতে পারে না ; লিখতে পড়তে, মোটামুটি

হিসাব পত্র রাখ্‌তে না শিখলে সাংসারিক ব্যাপারে অসুবিধা আছে যথেষ্ট কিন্তু সার্ব্বজনীন শিক্ষা ব্যাপারে এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার উপর ঝোঁক না দিয়া বরং যাতে করে দেশের শিল্পাদির উন্নতি অনাক্ষরিক শিক্ষার উন্নতি হয় সেই দিকে খরদৃষ্টি রাখা এখন হয়েছে নিতান্ত দরকার। উচ্চজ্ঞান পিপাসুর জন্য থাকুক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আপামর সাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সহিত অনাক্ষরিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে করা হক; দেশের শিল্পী যে ভাবে যেটিকে উন্নত করে তুলেছিল, উৎসাহের অভাবে যেটি মাটি হতে বসেছে, সেটীর উদ্ধার করে যদি সম্ভব হয় সেই অক্ষরজ্ঞানহীন দক্ষ শিল্পীকে উৎসাহ দিয়ে তার শিল্পের পুনরুদ্ধার করা হক। হয় ত সেই পুরাতন প্রণালীর শিক্ষিত দক্ষ শিল্পীর অভ্যস্ত বিদ্যায় বহু ত্রুটী পরিলক্ষিত হবে, আমাদের দেশের উন্নত প্রণালীতে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞগণ সে ত্রুটি স্খালনে যত্নবান হন। দেশের উপযুক্ত করে বিদেশী শিক্ষার অভিজ্ঞতায় দেশী নিরক্ষর শিল্পীর অভিজ্ঞতা সংযোজিত হক।

মালমসলার সরবরাহের অভাবে, তৈয়ারী জিনিষের কাট্‌তির বেবন্দোবস্তই আমাদের দেশের অনেক শিল্পের মরণ এনে দিয়েছে আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখিয়েছি; দেশজ এমন অনেক বস্তু লুপ্তপ্রায় হয়েছে যা—বৈদেশিক তুল্য বস্তুসম্ভার হতে সুলভ কিন্তু বাজারে সে সমস্ত বস্তুর বিক্রয়ের সুবিধা করতে না পারায় ঘরের জিনিষ ঘরে মজুত হয়ে শিল্পীর অবনতির কারণ হয়েছে। সুতরাং দেশের শিল্পের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে যাতে দেশজ বস্তুগুলির নানা স্থানে বিক্রয়ের সুবিধা হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একদল ব্যবসায়ীকে সৃষ্টি করে তুলতে হবে যারা ব্যবসা বুদ্ধিতে পাকা হয়ে এই পক্ষ উদ্ধারে সহায় হতে পারেন। ব্যবসাটা যে একটা শিক্ষনীয় বিষয় সে ধারণাটা আমাদের দেশে নেই বললে হয়, কিছু পুঁজি-পাটা সংগ্রহ হয় যদি সেইটেই ব্যবসা করবার পক্ষে প্রধান অবলম্বনীয় এই আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস কিন্তু এই বিশ্বাসের জন্যেই আমরা ব্যবসার পত্তন করতে না করতেই তার লালবাতি জ্বালবার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তখন দোষারোপ করি হয় নিজেদের অদৃষ্টকে, নয় সহকর্ম্মীদের অসাধুতাকে। মানুষ সংসারে কোনোকালেই একবারে ঋষি,—খাঁটি ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সমস্ত সাংসারিক কাজ উদ্‌যাপন করবে এ আশাটা যে দুরাশা সে বিষয়ে কি কারো সন্দেহ আছে, বরং বলা চলে লোক যতই এ সংসারের দিকে ঘেঁসে দাঁড়াবে ততই নিজের সুখ

সুবিধার চেষ্টা তার হবে তত বেশী। মোটা কথায় বল্‌তে গেলে তথাকথিত সভ্য সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর হয়ে ওঠে আরো বেশী। যে স্বার্থপরতাকে কেন্দ্র করে সংসারের কাজকর্ম্ম চলেছে সেটাকে ঘৃণা হেয় বলে দূরে ফেলে দিতে চাইলেই তো দূরে ফেলে দেওয়া যাবে না বরং সর্ব্বরক্ষা করতে হলে এমন ব্যবস্থা করা চাই যাতে করে এই স্বার্থ পরিণামে রক্ষা হতে পারে। আশু লাভের আশায় হাতের কাছের ধন আত্মসাৎ করলে যে পরিণামে সেই স্বার্থের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়,—ক্ষুদ্র স্বার্থ হতে নিজকে বঞ্চিত করলেই না বৃহৎ স্বার্থ রক্ষা হয়, এ সকল শিক্ষা বিশেষভাবে দেশবাসীকে অন্য শিক্ষার সঙ্গে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ব্যবসার হিসাবপত্র রাখবার কৌশল ইত্যাদি এমন ভাবে দেশের লোককে শিখিয়ে দিতে হবে যাতে করে সে বুঝে নিতে পারে যে কে কোথায় তাকে ঠকিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। এ সকল সকলই শিক্ষা সাপেক্ষ; ভূঁইফোঁড় হয়ে আপনা আপনি এ সকল জ্ঞান লাভ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে দেশজ বস্তুর সাহায্যে শিল্পের উন্নতি, তার কাট্‌তির ব্যবস্থা, ব্যবসা পরিচালনের মত শিক্ষা যাতে বৃদ্ধি হয় তা,—সততাই যে স্বার্থসিদ্ধির প্রধান উপায়, চরিত্র বলই যে মানুষের সুখস্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের প্রকৃষ্ট পথ তা যাতে দেশবাসী বুঝে সেই শিক্ষাই এখন আমাদের চাই। সর্ব্বসাধারণের জন্যে সেই শিক্ষাই হক্ ব্যবস্থিত।

রাখালের গান।

(কেঙাল)

—:*:—

যখন সকাল বেলায় নতুন আলো
রাঙায় নদীর জলের কালো,
বিহান-হাওয়া শস্যশিরে খেলে;—
মাঠের পথে আমরা ধাই
উঠি নামি উঠাই চরাই—
আকাশ ভরাই গানের লহর ঢেলে।

সামনে চলে গরুর পাল
উড়িয়ে ধূলি ডিঙিয়ে খাল—
শব্দ তাদের বড়ই মধুর লাগে ;
হাম্বা ডাকে গোধনগণ,
অশ্বখুরের ঝনন্ ঝন্,
ওহায় গিয়ে 'কুব্' 'দি' তারা
বন্-বালকে ডাকে,
গাছের ফাঁকে।
বরফ-মুখো তীরের মত
নিম্ন-ভূমির জল সে যত
চীৎকারিয়া কাঁপাই, খেলাই ঢেউ ;
খাসে ভরা মাঠের দখল
করতে চাই এই রাখাল সকল
ছুটে ছুটে, না-আস্‌তে আর কেউ ;
দেখি যদি কেউই নেই
পালটা তখন 'ডাকিয়ে' দেই
ক্ষেত খামারে—বাঁচুক্ আহা খেয়ে।
যাদের কাছে পাচ্ছি কাজ
তাদের তরে কিসের লাজ !
সইব প্রহার ক্ষেত্র-স্বামীর
এদেরই মুখ চেয়ে,
দুঃখ স'য়ে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।